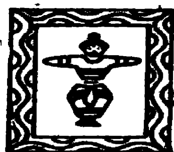
টুসু

টুসু

শান্তি সিংহ



লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ■ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Tusu by Santi Sinha

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

প্রকাশক : সচিব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ■ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মধুসূদন মঞ্চ ■ ঢাকুরিয়া
কলকাতা-৭০০ ০৬৮

মুদ্রক : সরকার এন্টারপ্রাইজ
৫০৭/৪, যশোহর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

প্রস্তাবনা

লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'টুসু' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। টুসু উৎসবের ব্যাপ্তি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও সন্নিহিত ছোটনাগপুরের ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনা, রাঁচি, হাজারিবাগ ও সিংভূমের বিস্তৃত অঞ্চল। পৌষ মাস জুড়ে এইসব এলাকায় লোকসমাজ যে টুসু পুজো ও উৎসব করেন তা আঞ্চলিক জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়। তখন আমন ধান কাটা ও ক্ষেতের সোনালি ফসল ঘরে তোলার সময়। প্রতিকূল পরিবেশের অবসানে তখন দেখা দেয় প্রাচুর্য, আর তারই প্রকাশ আনন্দ ও উচ্ছলতা। এই মানসিকতার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে টুসু উৎসবে।

এই অনন্য উৎসবে জনগোষ্ঠীর যে প্রাণের ছোঁয়া অনুভব করা যায় তা বহু গবেষককে আকর্ষণ করেছে। টুসু বিষয়ক অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। সেগুলি নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শ্রীশান্তি সিংহ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন, প্রাজ্ঞজনের মতো তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছেন। টুসু বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে শ্রীসিংহের গ্রন্থটি গভীর ও ব্যাপ্ত সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। অশেষ পরিশ্রম, অসাধারণ নিষ্ঠা ও বিশ্লেষণী মননের ফসল এই গ্রন্থ।

প্রদীপ ঘোষ
সচিব
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

ভূমিকা

ইতিহাসবিদ সাধারণত শিলালিপি পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি প্রাথমিক আকর নিয়ে গবেষণা ক'রে থাকেন, তাই মহামতি কার্লাইল তাঁদের 'dryasdust' বলেছেন। অথচ আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে (১৩১২ বঙ্গাব্দ), 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে, তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোন ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতে পারে না ...... আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতো বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকেই আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না।' ক্ষেত্রসমীক্ষার অন্যতম প্রধান জীবন্ত উপকরণ জনজীবন, 'জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে' বহমান সংস্কৃতির রূপ-রস-আনন্দেব অংশভাগী হওয়ার যে বিশেষ শিল্পকৌশল, তা আয়ত্ত হলেই সামাজিক-ইতিহাসবিদ ট্রেভেলিয়ান যে বলেছেন. 'Dryasdust at bottom is a poet'—একথা সত্য হয়।

রাঢ়-বঙ্গ এবং সন্নিহিত দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তিক বাংলার বহমান লোকসংস্কৃতির অন্তরস্বরূপ উপলব্ধি করতে হ'লে প্রাগৈতিহাসিক আদি-অস্ত্রাল জনগোষ্ঠী তথা পরবর্তীকালে আর্যীকরণ ভাবনার স্তরবিন্যাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা দরকার। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত 'আচারাঙ্গ সূত্ত' থেকে জানা যায়, জৈন মহাবীর যখন রাঢ়দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন, তখন এ অঞ্চলের রূঢ় মানুষ তাঁর পিছনে চু-চু শব্দে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তারা মূলত আদি-অস্ত্রাল জাতীয় মানুষ। তারা পাথর, নদী, গাছ প্রভৃতির মাঝে আত্মা (Spirit) বিশ্বাস করত; সেই Animism-ভাবনা থেকেই প্রকৃতি-পূজার উদ্ভব। তারা বিশ্বাস করত—জন্তু জানোয়ারদের শরীরে অনেক সময় বিশেষ শক্তির প্রকাশ ঘটে, সেই বিশেষ জীবগুলি 'কুলকেতু' (Totem)। দৈবী শক্তিতে বিশ্বাসী সেইসব মানুষ জীব বা জড় কোন-কোন বিষয়ে পবিত্রতাপূর্ণ কিছু নিষিদ্ধ ভাবনা (Taboo) মেনে চলত। আদিম ধর্মানুষ্ঠানের একটি হলো নরবলি বা নরমুণ্ড-নৃত্য। পরবর্তীকালে নরবলির স্থান নিয়েছিল—পশুপক্ষী বলি। ঐ অনুষ্ঠান পরবর্তীকালে রঙ্কিনীদেবী, ধর্মঠাকুর বা শিবের গাজনে টিকে আছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধমূর্তি পূজা এবং স্তূপপ্রতীক-পূজা বিশেষ ধর্মীয় ভাবনায় Totem হিসাবে রূপ পেয়েছে। আদিবাসী জীবনে বীরস্তম্ভ (Menhir) মেগালিথিক বা প্রস্তর স্মৃতিস্তম্ভযুগের পরিচায়ক।

একদা জৈন-বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাঢ়-বঙ্গে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলায় বিস্তৃত জনজীবনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপকরণের মাঝে

মিশ্রসংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। ফলত, আদি-অস্ট্রাল ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের ধর্মভাবনার সঙ্গে মিশেছে আর্য-সংস্কৃতির ধারা, সেই সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের (Acculturation) পরিচয় শিবের গাজনে, ইঁদ-ছাতা-করম-ভাদু-বাঁধনা-টুসু পরব প্রভৃতির মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।

ছোটনাগপুর মালভূমি-সংলগ্ন শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ যে বিশেষ অনুসন্ধান চালান, তা থেকে জানা যায়—শুশুনিয়া অঞ্চলে একদা-বিরাজিত মানব-সংস্কৃতি এশিয়া, ইউরোপ বা আফ্রিকায় বিরাজিত প্লিস্টোসীন কিংবা কোয়াটেরনারী যুগের প্রত্নাশ্মীয় জীবনধারার সঙ্গে তুলনীয়। উক্ত অনুসন্ধান শেষে গবেষকদের অভিমত—ভারতবর্ষে মধ্যাশ্মর অস্ত্রাদিকে সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব ৫০,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫,০০০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি অবশ্য আরও বহু পূর্বকালের সাক্ষ্য দিতে পারে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলা এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির বিশেষ ধারা যে টুসুগান—তার ঐতিহাসিক উৎস-অনুসন্ধান প্রসঙ্গে শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ রাঢ়-বঙ্গের প্রাচীন শিলালিপির কথাও অনিবার্যভাবে আসে, এবং খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার শিলালিপি ও বিষ্ণুচক্র প্রাকৃত জীবন-বহির্ভূত কোনও সুউচ্চ বিষয় নয়, পরন্তু লোকায়ত জীবনের সাংস্কৃতিক ভাবনার বিশেষ ইঙ্গিতবাহী—সে দিকটিও অবশ্যই গবেষণা নির্ভর। প্রসঙ্গত, টুসুগানের উৎস ও ক্রমপ্রসার ক্ষেত্রটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করলে, তার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রূপচিত্র ক্রমশই আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তিক বাংলার ভৌগোলিক রূপ প্রসঙ্গে ক্রমশ অতীতমুখী হ'লে—জঙ্গলমহল, ঝারিখণ্ড (ঝাড়খণ্ড), রাঢ়, সুহ্ম ইত্যাদি নামের কথা ঐতিহাসিক চেতনায় অনিবার্যতায় আসে। অথচ ব্যাপ্তগভীর যুক্তিবোধের অভাবে নিছক আবেগসর্বস্ব অতীতচারিতায়, অথবা বহমান সাংস্কৃতিক ভাবনায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক চেতনার আরোপ—অনৈতিহাসিক তথা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতনই খণ্ডবোধপ্রসূত অবৈজ্ঞানিক বিষয়মাত্র! যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদা মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল) যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'পশ্চিম রাঢ়ভূমির অন্তর্গত পশ্চিম মেদিনীপুরের সংলগ্ন ধলভূম ও সিংহভূম, পশ্চিম বাঁকুড়ার সংলগ্ন বীরভূম ও মানভূম এবং উত্তর রাঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগের পূর্ব অংশ—এই সমস্ত অঞ্চল রাঢ় খণ্ডেরই অধীন—ভাষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ বঙ্গেরই অংশ।'

একদাখ্যাত সুহ্ম বা রাঢ়দেশ এবং সন্নিহিত পশ্চিম সীমান্তের বিস্তীর্ণ ছোটনাগপুর অঞ্চল কালের বিবর্তনে এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন নামে অভিহিত হ'লেও সেখানের বিশাল জনজীবনের সাংস্কৃতিক চেতনা মূলত একই জীবনছন্দে বহমান।

ভালবাসার গভীরতায় একদা 'লাল মাটি নীল অরণ্য' কাব্যগ্রন্থের (১৯৭৩) শিরোনামযুক্ত দীর্ঘ ঐতিহাসিক কবিতায় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তথাকথিত উপেক্ষিত জনজীবনের সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা লিখেছিলাম। 'মাটিতে পা রেখে' (১৯৮২). 'নিরন্তর আলোকিত আশা' (১৯৮৮), 'মানুষ' (১৯৯৭), 'ম্রিয়মাণ দিন ঃ প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৯) কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় এই অঞ্চলের বিশাল জনজীবনের যন্ত্রণা-ক্ষোভ-অভিমানের কথা আছে। টাঁড়-বাইদ, লাল কাঁকুরে ভূমি-ই হলো আমার ভূমিকা---সেখানের মাটি ও মানুষ আজও খোয়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে আরণ্য প্রলেপ খোঁজে ব্যাকুল ইচ্ছায়! বস্তুত, কবিতার হাত ধরেই একদা লোকসংস্কৃতির সুপরিচিত আঙিনায় প্রথাসম্মতভাবে গবেষণা-ও করি। আলোচ্য বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপ্ত গভীর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছি 'ভূমিপুত্র' হিসাবেই। তাই সবিনয়ে জানাই—টুসুর ইতিহাস, বৈচিত্র্য ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে মিশেছে বিজ্ঞান-চেতনানির্ভর ঐতিহাসিক পরীক্ষা নিরীক্ষার যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা।

টুসু-বিষয়ে কেউ কেউ বিক্ষিপ্তভাবে নানা পত্র পত্রিকায় এ যাবৎ লিখেছেন, সেইসব লেখার নির্বাচিত সংকলন-সম্পাদনাও হয়েছে; তবু ব্যাপ্ত গভীরভাবে পরিপূর্ণ ক্ষেত্রসমীক্ষায় রাঢ়-বঙ্গের সুপ্রাচীন ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, পুরাকীর্তি, জনজীবনের বিচিত্র ধর্মীয় ভাবনা এবং তার ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে টুসুগানের উৎসভূমি, টুসুগানের ক্রমবিস্তার ও ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্য, এবং শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার আর্থ সামাজিক ভাবনার পাশাপাশি টুসুগানকে প্রধান হাতিয়ার ক'রেই বাংলা ভাষা আন্দোলন ও টুসু-সত্যাগ্রহ বিষয়ে রাজনৈতিক ঘটনার আনুপূর্বিক পরিচয় সম্বলিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধগ্রন্থ বাংলা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে এই প্রথম!

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ জীবনে শিকড় সঞ্চারী চেতনায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। সেই ধারার অনুবর্তনেই এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সাহিত্যপ্রাণ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান অধিকর্তা ও প্রিয় কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ গুহ এবং অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিত্ববর্গের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের শ্রদ্ধাপ্রীতিভাজন সচিব শ্রীযুক্ত প্রদীপ ঘোষ বাংলা-ভাষা সংস্কৃতিপ্রিয় নরনারীদের শ্রদ্ধাপ্রীতি পাবেন নিশ্চিত।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ও লোকসংস্কৃতিবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানী শ্রীযুক্ত পবিত্র সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সাহিত্যপ্রাণ সচিব শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, কৃতবিদ্য লোকসংস্কৃতিবিদ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার করণ, শ্রীযুক্ত বরুণকুমার চক্রবর্তী (বিভাগীয় প্রধান, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ) শ্রীযুক্ত সুহৃদকুমার ভৌমিক প্রমুখ গুণী ব্যক্তির কাছে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের ঋণ বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চাকে আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে লোকসংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে উন্নীত করায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পল্লব সেনগুপ্ত। এই গ্রন্থ রচনার প্রাক্‌মুহূর্তে তিনি সক্রিয়ভাবে নানা পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। শ্রদ্ধাবিনম্র কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর উদার প্রীতি ও নিরন্তর সহযোগিতা স্মরণ করি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও সন্নিহিত বিহার অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী বহু নরনারী অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবার সঙ্গে অনুজপ্রতিম কবি শ্রীঅনিল মাহাতো ও বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শ্রীবিশ্বনাথ লাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই।

পুরুলিয়ার লোকশিল্পীদের গাওয়া দশটি টুসুগান ক্যাসেটে বিধৃত ক'রে স্বরলিপি প্রণয়নের জন্য একদা দিয়েছিলাম বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ-সুরকার ও স্বরলিপি প্রণেতা বন্ধু ঋষিণ মিত্রকে। তিনি সানন্দে স্বরলিপি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রীতিঋণ অপরিশোধ্য।

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনের নেত্রী—পুরুলিয়াবাসীর কাছে 'মা' রূপে পরিচিতা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ তাঁর আয়ুষ্কালের শতবর্ষ পারে আজও মন ও মননে উজ্জীবিতা। তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র (৮৬ বছর) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র ঘোষ (পুরুলিয়ার 'মুক্তি' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক) ক্ষেত্রসমীক্ষাকালে ও গ্রন্থরচনায় নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকা ও সংকলন পুস্তিকা থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি ব্যবহারের সার্বিক অনুমতি সানন্দে দিয়েছেন। তাঁদের স্নেহ ভালবাসার ঋণও অপরিশোধ্য সবিনয়ে জানাই।

আলোচ্য গ্রন্থটি লোকসংস্কৃতিপ্রিয় নরনারীদের কাছে সমাদৃত হ'লে আমার প্রায় কুড়ি বছরব্যাপী ক্ষেত্রসমীক্ষার যাবতীয় শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত

টুসু-সংক্রান্তি, ১৪০৫। **শান্তি সিংহ**

উৎসর্গ

বিশিষ্ট আইনজীবীর ঘরণী হ'য়েও
লৌকিক ব্রতপার্বণের আচার-অনুষ্ঠানে
যিনি আজীবন সহজগভীর ছিলেন,
অন্তর্লীন চেতনায় তিনি আজো জেগে আছেন,
রাঢ়-লোকসংস্কৃতির মূর্তিমতীরূপ
আমার **মা**-কে।

বিষয়সূচি



পৌষালি বিজয়ায় টুসুর চৌডল হাতে কিশোরীরা।।

[আলোকচিত্রী ঃ বিশ্বনাথ লাই]



টুসু-গান গাইতে গাইতে টুসু-ভাসানের পথে।।

[আলোকচিত্রী ঃ বিশ্বনাথ লাই]



কাঁসাই নদীতে বিচিত্র সাজে পুরুষদের টুসু-ভাসান ॥

[আলোকচিত্রী ঃ বিশ্বনাথ লাই]

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গ-রাঢ়ের ইতিবৃত্তঃ প্রান্তিক বাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক সীমানা

'বঙ্গ' নামটির উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় প্রাচীন 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে; কিন্তু তা ভৌগোলিক অর্থে নয়, কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসাবে—

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যয় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যান্যা অর্কমভিতো বিমিশ্র ইতি।।[১]

আর্যগণের দৃষ্টিতে বৈদিক পথ লঙ্ঘন ক'রে যারা নিরুদিষ্ট বা নষ্ট হয়েছিল, তারা বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের (পশ্চিম বিহারের চেবজাতি) পক্ষিজাতীয় মানুষ।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহাভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি পূর্ব ভারতের তিনটি বিভাগের নাম করেছেন, সেগুলি হ'ল—অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম। অঙ্গের বেশিভাগ এখন বিহারে; কিছু অংশ মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম অঞ্চলে। গঙ্গা নদীর মোহনা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলময় স্থান বঙ্গ। 'বঙ্গ' কথার মূল অর্থ—জলাভূমি। রাঢ় অঞ্চলকে বলা হ'ত সুহ্ম।[২]

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণকালে পূর্বভারতের দু'টি বড় রাজ্য ছিল— (১) প্রাচী (২) গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাঢ়ী। গ্রীকগণ 'প্রাচী'-কে 'প্রাসই', এবং 'গঙ্গারাঢ়'-কে 'গঙ্গারিডই' (Gangaridai) উচ্চারণ করেছেন। অনেকের মতে, গঙ্গানদীর যে-দুটি স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পবিচিত—তার মধ্যবর্তী প্রদেশ 'গঙ্গারাঢ়' নামে পরিচিত ছিল। 'গঙ্গারাঢ়'-এর পশ্চিম দিক ছিল 'প্রাচী'; তার রাজধানী ছিল পালিবোথরা (পাটলিপুত্র)।

বাল্মীকির রামায়ণে সুহ্ম ও বঙ্গের নাম পাওয়া যায়—

সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মলয়ান কাশীকোশলান্।
মগধান দন্ত-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ।।[৩]

মহাভারতের আদিপর্বেও উল্লেখ আছে—

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুন্ড্রঃ সুহ্মঃশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।।[৪]

বলিরাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে, দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ ছেলের জন্ম হয়। তাদের নাম থেকে পরবর্তীকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি রাজ্য হয়। অঙ্গ ছিল মগধের পূর্বে। অঙ্গের পূর্বে সুহ্ম। সুহ্মের পূর্বে বঙ্গদেশ। সুহ্মের উত্তরে পুন্ড্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কলিঙ্গ। সুহ্ম হ'ল রাঢ়দেশ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠেরও মত—'সুহ্মাঃ রাঢ়া'।[৫]

প্রাচীন জৈনধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সুত্ত'-এ 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' দেশের কথা আছে। রাঢ়দেশের দুটি বিভাগ ছিল—(১) বজ্জ বা বজ্রভূমি, (২) সুব্ভ বা সুহ্মভূমি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠদশকে

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর অরণ্যসংকুল রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন; তখন বজ্রভূমি-সুহ্মভূমির কিছু মানুষ চু-চু শব্দে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে রূঢ় আচরণ দেখায়।[৬]

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় সুহ্ম ও কলিঙ্গদেশের কথা উল্লেখ করেছেন। দিগ্‌বিজয়ী রঘু নানাদেশ জয় ক'রে সুহ্মদেশে এসেছিলেন। সুহ্মবাসিগণ বেত্রসপত্রের ন্যায় নত হয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল।[৭] মহারাজ রঘু কপিলা (কাঁসাই) নদী পার হয়ে কলিঙ্গের পথে জয়যাত্রা করেন।

খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে 'সুহ্ম' নামের পরিবর্তে 'রাঢ়' নামের প্রচলন হয়। রাঢ়দেশের জনগণ রূঢ় এবং কিছুটা আত্মগর্বী[৮] হিসাবে কারো কারো মনে হলেও কবি ধোয়ী 'রসোময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ'[৯] ব'লে গঙ্গালহরীমুখর পুণ্যভূমির প্রশংসা করেছেন।

জৈন উপাঙ্গ 'পন্নাবণা' (প্রজ্ঞাপনা) গ্রন্থে রাঢ় ও বঙ্গের জনগণকে 'আর্য' বলা হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা পালি 'মহাবংশ'-এ 'লার' এবং নবম শতাব্দীতে ধর্মপালের সংস্কৃত তাম্রশাসনে 'লাট' কথা পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এগুলি রাঢ়দেশ বুঝাতে ব্যবহৃত।

দক্ষিণ ভারতের রাজেন্দ্র চোল দেব (খ্রিস্টিয় ১১দশ শতাব্দী) তিরুমলয় লিপিতে (Tirumalai inscription) 'উত্তীর-লাঢ়ম' (উত্তর-রাঢ়) এবং 'তক্কণ-লাঢ়ম' (দক্ষিণ-রাঢ়) কথা দু'টি উল্লেখ করেছেন। সমগ্র বীরভূম, সাঁওতাল পরগনার কিছু অংশ, দামোদর নদের উত্তর তীরবর্তী বর্ধমান জেলা উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত। হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুরের কিয়দংশ নিয়ে দক্ষিণ-রাঢ়।

নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব' গ্রন্থে বলেছেন, "ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। পশ্চিমে বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। রাজমহলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পুরাভূমি প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল, সাঁওতালভূম, মানভূম, সিংহভূম, ধলভূমের পূর্বশায়ী মালভূমি এই পুরাভূমির অন্তর্গত; তাহারই পূর্বদিক ঘেঁষিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকভূমি। মালভূমি অংশ একান্তই পার্বত্য, বনময়, অজলা এবং অনুর্বর। এখনও এই অংশে গভীর শালবন, পার্বত্য আকর ও কয়লার খনি। প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ের অনেক অংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ এবং তাম্রলিপ্ত রাজ্যেরও কিয়ৎ-পশ্চিমাংশ এই মালভূমি এবং উচ্চতর ভূমির অন্তর্গত। দক্ষিণ-রাঢ়ের রানীগঞ্জ-আসানসোলের পার্বত্য অঞ্চল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চল, বন-বিষ্ণুপুর রাজ্য, মেদিনীপুরের শালবনী-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর অঞ্চল এই পুরাভূমিরই নিম্ন অংশ। এইসব পার্বত্য ও গৈরিক অঞ্চল ভেদ করিয়াই ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী (শিলাই), কপিলা (কাঁসাই), সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদনদী সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে।"[১০]

শ্রী রায়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থানুসারে আরও বলা যায়, "বল্লাল সেনের নৈহাটি পট্টোলীতে-ও উত্তর-রাঢ় এবং তদন্তর্গত বাল্লহিট্ঠা, জলসোথী, খান্ডয়িল্লা, অম্বয়িল্লা এবং মোলাদন্ডী গ্রামের

উল্লেখ আছে। সব ক'টি গ্রামই বর্তমান বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ জেলার যোগসীমায়। নৈহাটিলিপি অনুসারে উত্তর-রাঢ় বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের আমলে দেখিতেছি উত্তর-রাঢ় মণ্ডল কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে; শক্তিপুর পট্টোলীতে এই খবর পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়ান-চোয়াঙের কজঙ্গলও এই উত্তর-রাঢ়ে। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড অধ্যায়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়ীখণ্ড-জাঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তদন্তর্গত বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূমি প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদনদীর উল্লেখ আছে। এই রাঢ়ীখণ্ড-জাঙ্গল-ও উত্তর-রাঢ়েরই অন্তর্গত। অনুমান হয়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমিসহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর-রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা।"[১১]

খ্রিস্টিয় ষষ্ঠশতক থেকে দ্বাদশ শতক অবধি রাঢ়ের বর্ধমানভুক্তির বিস্তার ছিল— উত্তরে অজয় নদীর উপত্যকা থেকে দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদী। বর্ধমানভুক্তির ঐতিহাসিক প্রামানিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রাম থেকে পাওয়া রাজা বিজয় সেনের নামাঙ্কিত তাম্রশাসন। সেখানে লেখা আছে—"সতত ধর্মক্রিয়া মানায়াং শ্রীবর্ধমান ভুক্তৌ।" তাম্রশাসনের কাল ষষ্ঠ শতক।

'পশ্চিম রাঢ তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থে মানিকলাল সিংহ বলেছেন, "ছোটনাগপুর মালভূমির কণ্ঠলগ্ন ধলভূম, সিংভূম, শবরভূম, বরাহভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূমের বাহুবেষ্টনীর মধ্যে দক্ষিণ রাঢ় আর সাঁওতাল পরগনার অঙ্কশায়ী উত্তর রাঢ় সুপ্রাচীন জনপদ। রুক্ষ এর প্রকৃতি, রূঢ় এর পরিবেশ। তরঙ্গায়িত এই ভূমি পত্রপতনশীল শাল, সেগুন, মহুয়া, পিয়াল, আবলুসের নিবিড় বনানীর শ্যাম-আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ। খেয়ালী নদনদীর কলকল স্বর আর খলখল হাসিতে উচ্ছল। এই রুক্ষ রূঢ় প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত রাঢ়ের আদিম সন্তানদেব জীবনের বিচিত্র লীলা-সংস্কৃতির সহজ বিকাশ, কলভাষার মন্থর প্রকাশ।"[১২]

ইংরেজরা যখন এ দেশের শাসক ছিলেন, তখন বাঙ্‌লার পশ্চিম সীমান্তের ও সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তাঁরা ইচ্ছা মতন ভাঙাচোরা করতেন; এক জেলার অংশ অন্য জেলায় জুড়ে দিতেন। সীমান্তবর্তী জেলার পরগনাগুলিকে জাদুকরের বলের মতো লোফালুফি করায় জেলাগুলির ভৌগোলিক রূপ ঘন ঘন পালটাত। এই বক্তব্যের সমর্থনে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে বর্ধমান আসে। তখন তাব নাম হয় চাকলা-বর্ধমান। বর্ধমানের বর্তমান অধিকাংশ অংশের সঙ্গে সমগ্র বিষ্ণুপুর পরগনা, বর্তমান হুগলি ও বীরভূম জেলার বিরাট অংশ নিয়ে চাকলা-বর্ধমান গঠিত হয়। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান আসানসোল মহকুমার কিছু অংশ, পরগনা সেনপাহাড়ি ও সেরগড় এবং পরগনা বিষ্ণুপুর বর্ধমান থেকে পৃথক হয়ে জঙ্গলমহল নামে নতুন জেলাব সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে এই পরগনাগুলি পুনরায় বর্ধমানে আসে। তার ঠিক পরেই ১৮৩৫-৩৬

খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর মহকুমা, কোতুলপুর, ইন্দাস নবগঠিত বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন জেলার সদর হয় বাঁকুড়া। আবার ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলা গঠিত হলে তার সঙ্গে পুরনো চাকলা-বর্ধমানের এক অংশ যুক্ত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কোতুলপুর, ইন্দাস এবং সোনামুখী থানা পশ্চিম বর্ধমান অর্থাৎ বাঁকুড়া থেকে আলাদা হয়ে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। অথচ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওই অংশ পুনরায় উক্ত জেলায় ফিরে আসে।

বর্ধমানেব পর আলোচ্য বাঁকুড়ার প্রসঙ্গ। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসার আগে বাঁকুড়া প্রধান দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল—(১) জঙ্গলমহল (২) বিষ্ণুপুর রাজ্য। ছাতনা, সুপুর, আমাইনগর, ফুলকুসমা, রায়পুর, শ্যামসুন্দরপুর, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা প্রভৃতি পরগনা জঙ্গলমহল নামে পরিচিত ছিল।

নবাব মুর্শেদকুলি খাঁ বা জাফর খাঁয়ের সময় জঙ্গলমহল চাকলা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিষ্ণুপুর চাকলা বর্ধমানে যায়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা বর্ধমান কোম্পানির হাতে আসে। শাসনকার্যের সুবিধার্থে পরগনা বিষ্ণুপুর যুক্ত হয় বর্ধমানের সঙ্গে। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরস্থিত কোম্পানির রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী লেফ্‌টন্যান্ট ফার্গুসনকে পাঠান হয় জঙ্গলমহলের সামন্তরাজদের দমনের জন্য। তখন সুপুর, আমাইনগর, ছাতনা বশ্যতা স্বীকার করে। তাদের চাকলা-মেদিনীপুরের অন্তর্গত করা হয়। রায়পুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তরাজগণও বশ্যতা স্বীকার করেন। ওই অঞ্চলগুলি চাকলা বর্ধমানেব সামিল হয়। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য বীরভূম ও বিষ্ণুপুরকে একই জেলায আনেন। রাখা হয় একজন ইংরেজ কালেক্টর। সদর দপ্তর হয় বিষ্ণুপুর। অবশ্য কিছুকাল পরে সদর দপ্তর সিউড়িতে যায়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর বর্ধমান কালেক্টরের আওতায় আসে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' হয়। ফলে ইংরেজ শাসন জোরদাব করার জন্য ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি নির্দেশনামা প্রবর্তন ক'রে তেইশটি পরগনা নিয়ে জঙ্গলমহল নামে নতুন একটি জেলার সৃষ্টি হয়। পনেরটি পরগনা আসে পঞ্চকোট ও বীরভূম থেকে। সেনপাহাড়ি, সেরগড় ও বিষ্ণুপুর তিনটি পরগনা আসে বর্ধমান থেকে। ছাতনা, সুপুর, অম্বিকা নগর প্রভৃতি পাঁচটি পরগনা আসে মেদিনীপুর থেকে। জঙ্গলমহলের ম্যাজিস্ট্রেট এবং জজসাহেবের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় বাঁকুড়ায়। সেখানে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি রাজস্ব বিষয়ে বর্ধমান কালেক্টরের অধীনে থাকেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ অবধি বাঁকুড়া জঙ্গলমহলের অন্তর্গত থাকে।

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে জঙ্গলমহলে ভূমিজ-বিদ্রোহ হয়। ১৮৩৩-এ এক নির্দেশনামা বা রেগুলেশন দ্বারা জঙ্গলমহল জেলার বিলোপ ঘটে। সেনপাহাড়ি, সেনগড় এবং বিষ্ণুপুর পরগনা বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাকি পরগনাগুলি নতুন গড়ে-ওঠা মানভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৩৩-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'নন রেগুলেশন এরিয়া' গড়ে তোলা হয়। শাসনের দায়িত্ব কমিশনার হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্টের হাতে আসে। তার ফলে বাঁকুড়া জেলার সম্পূর্ণ পশ্চিমাংশ প্রকৃত পক্ষে মানভূমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮৭২ খিস্টাব্দে সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, সেরগড়, সেনপাহাড়ি পরগনা বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্যদিকে ছাতনা মানভূম থেকে পশ্চিম বর্ধমানে যায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে খাতড়া, রায়পুর থানাসহ সুপুর, অম্বিকানগর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল, ভেলাইডিহা মানভূম থেকে আলাদা হয়ে বাঁকুড়ায় আসে। সেইসঙ্গে আসে সোনামুখী, ইন্দাস ও কোতুলপুর। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় আলোচ্য এলাকা—পুরুলিয়া

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবাব মীরকাশিমের কাছে রাজস্ব আদায়ের সনদ হিসাবে পেয়েছিলেন দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কিন্তু একরোখা, বুনো মানুষগুলোর দাপটে কোম্পানি ঐসব অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপনে ভরসা পাননি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর কোম্পানি মীরকাশিমের দেওয়া অঞ্চলগুলির ওপর পূর্ণ অধিকার স্থাপন করেন। ১৭৬৭-তে কোম্পানি দুর্গম অরণ্য রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনার অভিযান চালান। ঝাড়গ্রাম পতনের পর রামগড়, শাঁখাকুলি (লালগড়), ঝাঁটিবনি (শিলদা), জামবনী, আমাইনগর (অম্বিকানগর), রাইপুর, সুপুর, ছাতনা, বরাভূম প্রভৃতি অঞ্চল আনুগত্য দেখায়। কোম্পানি পাতকুম, তোড়াং, বুন্ডু, সিল্লি, তামাড়, পাঞ্চেত, কাশীপুর, ঝালদা, ঝরিয়া দখল করে। ধলভূম ব্যতীত অবশিষ্ট অরণ্য রাজ্যগুলিব নাম হ্য জঙ্গলমহল।

১৮৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গানারায়ণী বিদ্রোহ বা ভূমিজ বিদ্রোহ হয়। তখন এইসব অঞ্চল ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা হয়। ১৮৩৩-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐসব অঞ্চল নিয়ে একটি 'নন রেগুলেশন এরিয়া' গড়ে তোলা হয়। শাসন-দায়িত্ব কমিশনার হিসাবে বর্তায় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেন্টের হাতে।

১৮৩৪-এ তিনটি বিভাগ হয়। (১) মানভূম বিভাগে আনা হয় রেগুলেটেড জঙ্গলমহলসহ ধলভূম। (২) লোহারদাগা বিভাগে বুন্ডু, সিল্লি, তামাড়, সোনাহাতু আদি পাঁচ পরগনার সঙ্গে চুটিয়া নাগপুর ও পালামৌ। (৩) হাজারিবাগ বিভাগে রামগড়, খড়কডিহা এবং রামগড় জেলার রেগুলেশনের বাইরের রাজ্যগুলি।

১৮৩৮-এ মানভূমের সদর দপ্তর পুরুলিয়ায় আনা হয়। ১৮৪৫-এ সিংহভূমের সঙ্গে ধলভূম যুক্ত করা হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে মানভূমকে তিন টুকরো করা হয়। উত্তরের চাষ-চন্দনকিয়ারিসহ শিল্পাঞ্চলসমৃদ্ধ ধানবাদ বাংলাভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়। গড়ে ওঠে নতুন জেলা। ধানবাদ জেলার সঙ্গে ঝরিয়া, কাতরাস খনিজ অঞ্চলও যুক্ত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যুক্ত করা হয় সিংভূম জেলার নতুন মহকুমা সেরাইকেল্লার সঙ্গে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তোড়াং, পাতকুম, চাণ্ডিল ও পটমদা অঞ্চল। মাঝে বৃহৎ, মূলত টাঁইড়্-বাইদ্ অঞ্চল পুরুলিয়া নামে নতুন জেলা হয়ে পশ্চিম বাঙ্‌লার সঙ্গে যুক্ত

হয়। বিহারের মানভূম জেলার একুশটি থানার মধ্যে ষোলোটি থানা পশ্চিমবঙ্গে আসে, এবং তা নিয়ে ১৯৫৬-র ১লা নভেম্বর গড়ে ওঠে পুরুলিয়া জেলা।

পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষা এলাকা, অর্থাৎ বীরভূম-বর্ধমান (মূলত পশ্চিম বর্ধমান)-হুগলী (কিয়দংশ)-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া—যা একদা রাঢ়দেশের অংশ, সেখানে এবং তারই পার্শ্ববর্তী ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনা, হাজারিবাগ-রাঁচি; পশ্চিম মেদিনীপুর সংলগ্ন এলাকা ধলভূম-সিংভূম প্রভৃতি বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে শীতের রোদ যখন আনম্র ধান শিষে এনে দেয় কাঁচা সোনার রঙ, তখন ওখানকার মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের কিশোরী-যুবতী, এমনকি পুরুষ কণ্ঠেও গুনগুনিয়ে ওঠে শস্যোৎসবের গান। পৌষের ডালা পাকা ফসলে ভরায় টুসু গান।[১৩]

টুসুগানের উপরিউক্ত আঞ্চলিক সীমানার কথা সুহৃদকুমার ভৌমিক-ও স্বীকার করে বলেছেন, "..... টুসুকে কেন্দ্র ক'রে আমরা একটি সাংস্কৃতিক রেখা টেনে বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী জেলাগুলিকে একই গন্ডিতে আবদ্ধ করতে পারি এবং তার নাম দিতে পারি সীমান্ত বাঙলা। এক কথায় ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে প্রাচীন রাঢ়দেশ যাকে বলা হত তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে টুসুর আবাসস্থল। রাজনৈতিক কারণে সেই রাঢ়দেশ দুটি প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আজ। রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুরু ক'রে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ছাড়িয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত টুসু তার আধিপত্য বিস্তার ক'রে রেখেছে।"[১৪]

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলের বিচারে উপরিউক্ত অঞ্চলের অনেকখানি রাঢ়-বঙ্গের অন্তর্গত। বক্তব্যের সমর্থনে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করি—"পশ্চিম-রাঢ়ভূমির অন্তর্গত পশ্চিম মেদিনীপুরের সংলগ্ন বীরভূম ও মানভূম এবং উত্তর-রাঢ়ভূমি বীরভূমের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত বিহার প্রদেশের সাঁওতাল-পরগনা ও হাজারিবাগের পূর্ব অংশ—এই সমস্ত অঞ্চল, রাঢ় খণ্ডেরই অধীন—ভাষা ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ-বঙ্গেরই অংশ।"[১৫]

অথচ বাংলাভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ লোক-সাহিত্য আলোচনায় উগ্র আঞ্চলিকতাবাদে নিজেদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছেন। তাঁরা রাঢ়-বঙ্গের সুপ্রাচীন, ধারাবাহিক ঐতিহ্য বুঝি-বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্মৃত হয়ে, বাঙ্লার পশ্চিম দিকের ভৌগোলিক সীমা তথা ভাষা-সমাজ-কৌমাবিন্যাসের বৈজ্ঞানিক ভাবনায় উদাসীনতা দেখিয়ে, রাজনৈতিক চেতনার সংক্ষোভজাত রুদ্ধ অভিমানে কিছুটা বিচ্ছিন্নতাবাদী মন নিয়ে 'ঝাড়খণ্ড' অভিধায় এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চাইছেন।[১৬]

তাঁদের এই প্রস্তাবিত 'ঝাড়খণ্ড' অঞ্চলে আছে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা, বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চল, সমগ্র পুরুলিয়া জেলা, বিহারের ধানবাদ জেলা, সিংভূমের ধলভূম এবং সেরাইকেল্লা, রাঁচির বুন্ডু-সিল্লি-তামাড় ইত্যাদি পাঁচটি পরগনা। তাঁদের যুক্তি ঃ "ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে ঝাড়খণ্ড নামটিই আলোচ্য অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং দীর্ঘস্থায়ী নাম। জঙ্গলমহল, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি এবং ছোটনাগপুর নামগুলো অত্যন্ত অধুনাকালে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক নামকরণমাত্র।"[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য'-এ উপরিউক্ত মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডের প্রথম উল্লেখ সম্ভবত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থেই করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বহু উচ্চারিত পংক্তিগুলো হল—

ঝারিখণ্ড স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।

মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড।।"[১৮]

শ্রী মাহাতর ধারণা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা যায়—'চৈতন্য-চরিতামৃত' তো মধ্যযুগের সাহিত্যসৃষ্টি। তার রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ কিংবা সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগ। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "......চৈতন্য-চরিতামৃত ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে পরে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার পূর্বে কদাপি নহে।"[১৯] বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, "চৈতন্য-চরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়"।[২০]

তখন মল্লভূমে বীর হাম্বীর রাজা। তাঁর আশ্রয়পুষ্ট দস্যুরা মল্লভূমের কাছে গোপালপুরে একাধিক প্রহরীযুক্ত বোঝাই গোরুর গাড়ি দেখে দামী ধনসম্পদের লোভে গাড়ির জিনিসপত্র লুঠ করে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ঐ গোরুর গাড়িতে অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থরাজি পাঠাচ্ছিলেন গৌড়দেশে। ঐ লুণ্ঠিত বৈষ্ণব-সাহিত্য রত্নরাজির মধ্যে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থও ছিল—এ তথ্য সকলেরই জানা। বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে— "গ্রন্থাপহারক বীর হাম্‌বীর ১৫৮৭-১৬১৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।"[২১] 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "রাজা বীর হাম্বীরের শাসনকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বলে নির্ণীত হয়েছে।"[২২]

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে শাক্ত-শৈবপন্থী বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। অনেকের মতে বন-বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের পূজা তিনিই প্রবর্তন করেন।[২৩] বীর হাম্বীরের কাল থেকে পরবর্তী রাজা রঘুনাথ সিংহ, বীর সিংহ, দুর্জয় সিংহ প্রমুখের রাজত্বকালে মল্লভূমের গৌরবসূর্য তৎকালীন রাঢ়-বাঙলাকে উদ্ভাসিত করে। সেই সময় বিষ্ণুপুর স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে। রাঢ়ের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে 'ভূম' রাজ্যগুলির মধ্যে মল্লভূম তখন গৌরবের স্বর্ণশিখরে। পুরুলিয়ায় পঞ্চকোট পাহাড়ের ওপর যে পুরনো দুর্গ আছে, তার দুয়ারবন্ধ ও খড়িবাড়ি তোরণে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে— "শ্রীবীর হামির"।[২৪] সময়কাল ১৬৫৭ বা ১৬৫৯ সংবৎ = ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ। তার থেকে বোঝা যায়, পাশাপাশি 'ভূম' রাজ্যগুলিতে মল্লরাজদের প্রভাব। ডঃ অতুল সুর তাঁর "বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, "যদিও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে তাঁদের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তথাপি তাদের রাজশক্তি উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কো থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমানের অংশবিশেষ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের

অংশবিশেষ-ও তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[২৮] বরাভূম, তুঙ্গভূম, ধলভূমের সামন্তরাজগণ মল্লভূম রাজপরিবারের সঙ্গে সাগ্রহে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। আর মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মান সিংহের সুবাদে মল্লরাজ বীর হাম্বীর কিল্লাজাত মহলের অন্তর্গত বারোটি জমিদারি লাভ করেছিলেন। সেই জমিদারি মেদিনীপুর জেলার তমলুক-মহিষাদল থেকে আরম্ভ করে মানভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফলত, রাঢ়-বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের জনমানসে 'ঝাড়খণ্ড' চেতনার প্রকাশ তখনও ঘটে নি। সে সময় মল্লরাজগণের শৌর্যবীর্যগাথা লাল কাঁকুরে মাটির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জঙ্গলময় পরিবেশে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরত—

অয়ঃপাত্রে পয়ঃ পানম্ চিপিটকঞ্চ চর্বণম
শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লবাজস্য লক্ষণম্।

শৌর্যবীর্যশালী মল্লরাজগণ লোহার পাত্রে জলপান করতেন। কর্মক্ষম, দুর্দম শরীরের জন্য চিঁড়ে খেতেন; কারণ, চিঁড়ে খাওয়ায় অনেকক্ষণ দম থাকে। ঘোড়ার পিঠেই তাঁরা নিদ্রাকাল অতিবাহিত করতেন — অর্থাৎ তাঁরা অলসপ্রকৃতির ছিলেন না।

এই শ্লোকটি কোন-কোন-স্থানে ভিন্নরূপ প্রচলিত —

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্ শালপত্রে চ ভোজনম্।
শয়নম্ অশ্ব-পৃষ্ঠে চ মল্লজাতিনাং লক্ষণম।।

সম্ভবত এই শ্লোকেরই অনুকরণে অর্বাচীনকালে রচিত হয়েছে —

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্ শালপত্রে চ ভোজনম্।
শয়নম্ খর্জুরীপত্রে ঝাড়খণ্ডো বিধীয়তে।।

অর্বাচীন 'ঝাড়খন্ড' নামের তুলনায় সুহ্ম বা রাঢ়দেশের সুপ্রাচীনত্ব ও তার ধারাবাহিক ভাবনা ইতিহাস-মনস্ক নরনারীর অজানা নয়। 'ভবিষ্য পুরাণ'-এর 'ব্রহ্মখন্ড' অংশেও 'ঝাড়খন্ড' নয়, 'রাঢ়খন্ড-জাঙ্গলদেশ' কথার উল্লেখ আছে —

অথেদানীং রাঢ়ীখন্ড জাঙ্গলং দেশোরিচ্যতে।
দারিকেশী সাদুত্তরে চ দ্ব্যষ্ট যোজনামতঃ।।
পঞ্চকূট পার্শ্বভাগে ভাগীরথ্যাশ্চ পশ্চিমে।
জাঙ্গলো রাঢ়ীখন্ডাশ্চদেশঃ কীকট সন্নিধৌ।।
শালার্জুন সাকটানাং কন্টকানাঞ্চ ভূরিশঃ।।

[অতঃপর এখন দারিকেশী (দ্বারকেশ্বর) নদীর উত্তরে ষোলযোজন-বিস্তৃত রাঢ়খন্ডকে জাঙ্গলদেশ বলা হয়। ভাগীরথীর পশ্চিমে একপার্শ্বে পঞ্চকূট এবং কীকট দেশের সন্নিহিত এই জঙ্গলাকীর্ণ রাঢ়খন্ড প্রচুর শাল-অর্জুন ও কন্টকান্বিত বৃক্ষের দ্বারা সমাকীর্ণ।]

রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বাঙ্‌লার নাম ও সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাঙ্‌লা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র (অথবা বরেন্দ্রী), পশ্চিমবঙ্গে

রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। এই সমুদয় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে।"[২৬]

ফলত, বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত আবেগ কম্পিত কণ্ঠে যুক্তিহারা মনোভাব নিয়ে "চির পুরাতন চিরনূতন ঝাড়খণ্ড" প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাঙ্‌লা- বিহারে দ্বিধা বিভক্ত সেইসব বাংলাভাষী আদিবাসী 'ভূমি' বা 'ভূম' রাজ্যগুলো আজ যেন আমাদের স্মৃতি থেকে লুপ্ত হতে চলেছে। এইসব অঞ্চলের লুপ্ত গৌববকে অন্তত স্মৃতিতে সঞ্জীবিত করে তোলা যায়, যদি আমরা একে চিরপুরাতন চিরনূতন ঝাড়খণ্ড নামে অভিহিত করি। ... আমরা আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলটিকে 'ছোটনাগপুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাঙ্‌লা' নামে অভিহিত করতে গিয়ে দ্বিধান্বিত না হয়ে পারি না"।[২৭]

উগ্র আঞ্চলিকতাবোধ স্বতন্ত্রতার নামে আনে সংকীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতা। এ প্রসঙ্গে "রাজতরঙ্গিণী"-র সেই বিখ্যাত শ্লোক যেন আমরা মনে রাখি—

শ্লাঘ্য স ইভ গুণবান
রাগদ্বেষ বহিষ্কৃত
ভূতর্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী।[২৮]

[তিনিই একমাত্র যোগ্য এবং শ্লাঘ্য (প্রশংসনীয়) ঐতিহাসিক— যিনি আবেগ-সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব বাদ দিয়ে বিচারকের মতো অতীত উদ্‌ঘাটন করেন।]

সুধীরকুমার করণ দেশজ গভীর ভালোবাসাকে যুক্তি দিয়ে সংহত ক'রে নতুন কালের সঙ্গে ভাবসাযুজ্য রেখে বলেছেন, 'পশ্চিম বাঙ্‌লার পশ্চিম সীমান্ত। ভূমি রাজ্য। ভূমি থেকে ভূম আর ভুঁই। এই 'ভূম'-গুলির কয়েকটি আজো পড়ে আছে বাঙ্‌লা দেশের বাইরে, বিহার-ভূমিতে।

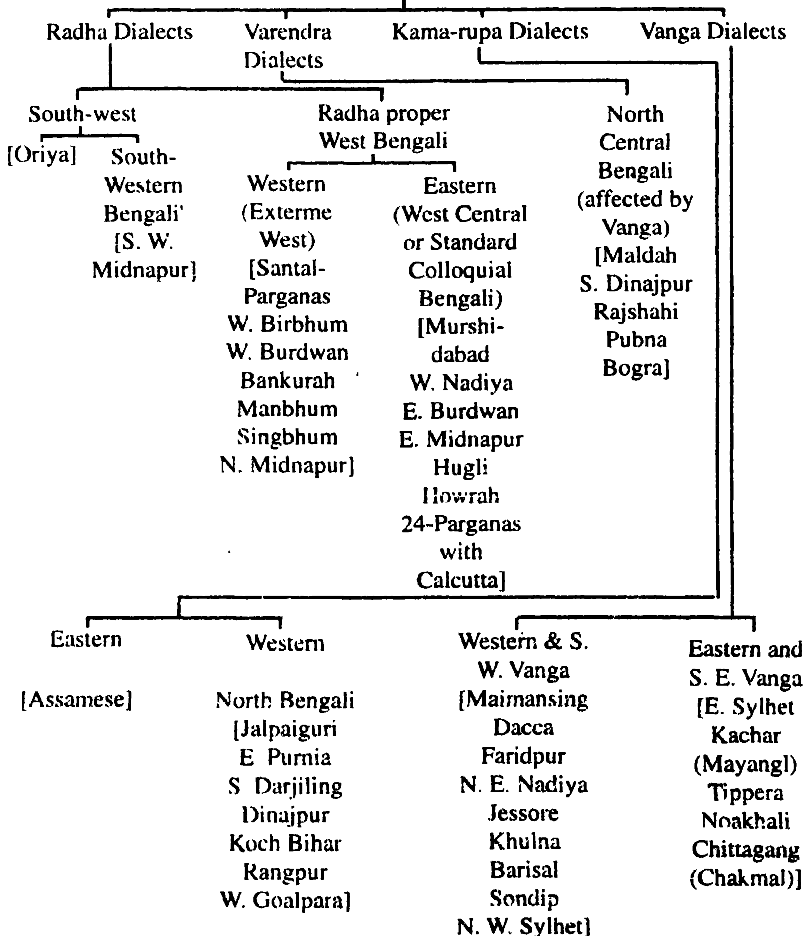
"সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে এই 'ভূম'- রাজ্যগুলি ছড়িয়ে আছে। একেবারে উত্তর পশ্চিম সীমানায় বীরভূম; আরো দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে এলে মানভূম। রাষ্ট্রনীতির মারণ যন্ত্র মানভূমকে বিলুপ্ত করেছে মানচিত্র থেকে, কিন্তু মন-চিত্র থেকে নয়। এরই আশেপাশে ভাষা-সংস্কৃতি-জনগোষ্ঠীর আচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের গা-ছুঁয়ে আছে ধলভূম, তুঙ্গভূম, মল্লভূম, সামন্তভূম; এরই অংশরূপে বেঁচে আছে শিখরভূম, বরাহভূম; প্রাকৃতভাষায় ধলভূঁই, মলভূঁই, সাঁৎভূঁই, শিখরভূঁই, বরাহভূঁই। পশ্চিম বাঙ্‌লার প্রাচীনতম অঞ্চল এই সব পুরাভূমি।....

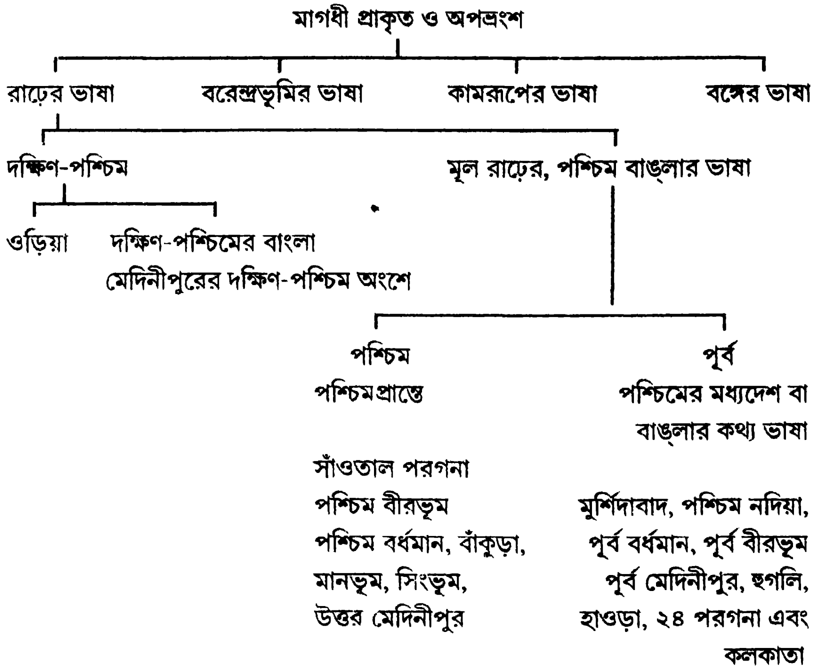
"বস্তুত উত্তর বিহারের দক্ষিণ সীমায় গঙ্গানদী অতিক্রম করে, বাঙ্‌লা-বিহার সীমান্ত ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ আরম্ভ হোক্; বন-পাহাড়-নদী-নালা- মাঠ-ঘাট, শাল-মহুয়া-পলাশ-কুটির স্পর্শ নিয়ে চলে আসুন, দেখতে পাবেন রাজনৈতিক সীমারেখার এপারেও বাঙ্‌লাদেশ, ও পারেও বাঙ্‌লাদেশ। এপাশে বীরভূমের পশ্চিম সীমানা, ওপাশে সাঁওতাল পরগনা; এপাশে পশ্চিম বর্ধমান, ওপাশে ধানবাদের খনি অঞ্চল; এপাশে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-

মেদিনীপুর, ওপাশে চাষ-চান্ডিল-ধলভূম। বলাবাহুল্য, কৃত্রিম এই সীমারেখা। এ রেখা দু'পাশের মানুষকে ভাগ করতে পারে নি। ভূ-প্রকৃতি, সামাজবিন্যাস, ভাষা-সংস্কৃতির আত্মিক বন্ধনে এই দুটি পাশ এক এবং অভিন্ন।"[২২]

ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়েও যদি বিচার করা যায়, তবে দেখা যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্লা এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুরের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলেও মূলত রাঢ়ের ভাষা। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় The Origin and Development of the Bengali language (Part I) গ্রন্থে মাগধী প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের যে বিন্যাস তালিকা দিয়েছেন,[২৩] সেটি নিচে উল্লিখিত হল, এবং সেই সঙ্গে তার বাংলা অনুবাদও দেওয়া হল ঃ

Forms of Magadhi Prakrit and Apabharnsa as brought to Bengal, Assam and Orissa





একদাখ্যাত 'সুহ্ম' বা 'রাঢ়দেশ' এবং সান্নিহিত পশ্চিম সীমান্তের বিস্তীর্ণ ছোটনাগপুর অঞ্চল কালের বিবর্তনে এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ইতিহাসের পাতায় ঘন ঘন নাম পরিবর্তন মেনে নিয়েছে, কিন্তু এই বিশাল অঞ্চলের লোকায়ত জীবনে বহমান সাংস্কৃতিক চেতনা যুগ-যুগান্তরে মূলত একই ছন্দে বাঁধা। সেই সার্বিক লোক-সংস্কৃতি ভাবনায় যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত কারণে খণ্ড ভৌগোলিক চেতনা, কিংবা উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ আরোপিত হয়, তবে তা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। আলোচ্য বিষয়ের শেষে নীহাররঞ্জন রায়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ স্মর্তব্য ঃ "বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই; সেই সীমা মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই প্রাচীন বাঙ্‌লার প্রান্তসীমা। ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সমাজ ও কৌম বিন্যাসে সাঁওতাল পরগনায় সঙ্গে যেমন উত্তর বীরভূমের, তেমনি মানভূমের সঙ্গে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ট যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্গত এবং সিংভূম বিহারের। এই দুই জেলারও কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত। উৎকল দেশও সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতনের) অন্তর্গত ছিল। মনে হয়, রাজমহল হইতে যে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হইয়া ময়ূরভঞ্জ-কেওঞ্ঝর-বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই বাঙ্‌লার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা।"[৩২]

অন্ত্যটীকা

১। ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/৩

২। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা-৯,
৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৩), ১ম পরিচ্ছেদ।

৩। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪০ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।

৪। মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪/৫০

৫। ঐ সভাপর্ব, ৩৩/২৪ নীলকণ্ঠ টীকা।

৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস; আদিপর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ,
পুনর্মুদ্রণ (১৩৮২), লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা-১২, ২৭ পাতা।

৭। অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম।।
কালিদাস, রঘুবংশম্, ৪/৩৫ শ্লোক।

৮। কৃষ্ণ মিশ্র, 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক, ২য় অঙ্কঃ
নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বল কুলা সচ্ছোত্রিয়ানাং পুনর্
বূঢ়্যা কাচন কন্যকা খলুময়া তেনাস্মি ততোধিকঃ
অস্মাচ্ছ্যালক ভাগিনেয় দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যতম্
তৎ সম্পর্কবশান্ময়া প্রেয়স্যপি প্রোজিঝতা।

৯। গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো।
যাস্যত্যুচ্চৈঃ ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি।
— ধোয়ী, পবনদূতম্, ২৭ শ্লোক।

১০। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব,
ঐ, ৫৪ পাতা।

১১। তদেব, ৬৮ পাতা।

১২। মানিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা, ১৩৮৪, ১৬ পাতা।

১৩। জাভা-সুমাত্রার চাষীরাও মনে করেন, ধান্য-মাতার আত্মা আছে ; নাম 'সানিং সারি' (Saning Sari)। চারা-বসানোর সময় এদের প্রার্থনা—সারিং সারি, এক একটা চারা বড় হয়ে যেন এক এক ঝুড়ি ধান দেয়। সূর্য-কিরণে তুমি খুশির আলোতে ঝলমলিয়ে ওঠো, ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও তুমি নিরুদ্বিগ্ন থেকো, বর্ষার জলধারা তোমার মুখখানাকে উজ্জ্বল করে ধুইয়ে দিক।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার, 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় [১৮বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৬০৭ পাতা] প্রকাশিত 'নবান্ন ও নতুন ফসলের লোকায়ত উৎসব' প্রবন্ধ।

১৪। সুহৃদকুমার ভৌমিক, 'বিহারের টুসুপরব' প্রবন্ধ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত— 'টুসু ঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে' গ্রন্থ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা (১৯৮২), ৪২ পাতা।

১৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সুহ্মক বাঙ্গালা' প্রবন্ধ,

[মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে ১৩/৪/১৯৭৩-এ প্রদত্ত ভাষণ], 'বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে' গ্রন্থ, জিজ্ঞাসা (কলকাতা), ২৮৫ পাতা।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, বিনয় মাহাত, পশুপতি প্রসাদ মাহাত প্রমুখের যথাক্রমে 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য', 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ড', 'ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও সমাজজীবন' প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৭। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকা। ডি.এম. লাইব্রেরি কলকাতা (১৯৭৮)

১৮। তদেব, ১৩-১৪ পাতা।

১৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ (১৯৬২), ৪২০ পাতা।

২০। বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৫৯), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৪১৯ পাতা।

২২। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা (১৯৬৪), ১৬৫ পাতা।

২৩। তদেব, ১৬৫ পাতা।

২৪। ৬ লাইনের লিপি, বাংলা অক্ষরে লেখা।

২৫। অতুল সুর, বাঙ্লার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯, (১৯৭৬) ৩৯ পাতা।

২৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (১৯৭৪), ১ পাতা।

২৭। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ১৯ পাতা।

২৮। কল্হন, রাজতরঙ্গিণী, ১/৭ শ্লোক।

২৯। সুধীরকুমার করণ, সীমান্ত বাঙ্লার লোকযান, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১ম সংস্করণ (১৩৭১), ২৪-২৫ পাতা।

৩০। Suniti Kumar Chatterjee, The Origin and Development of the Bengali Language (Vol. I), RUPA, Calcutta, 1975, P. 140.

৩১। নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩৮-৩৯ পাতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোক-উৎসবের রূপরেখা ঃ রাঢ়-বঙ্গের মিশ্র সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ আবহমান গ্রাম-বাঙলার নরনারীর বিচিত্র জীবনধারা সম্পর্কে বলেছেন, "... প্রকান্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দ চরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে— নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সেই পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হোক—না-কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।"[১] দেশের এই যে "প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায়"—যারা 'প্রাকৃত' বা লোকায়ত জীবনে নিজেদের ঐতিহ্য-সংস্কার, পূজাপার্বণ, ধাঁধা-হেঁয়ালি-গল্পকথা, সঙ্গীত প্রভৃতি নিয়ে 'অলক্ষ্য গতিতে' অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধনপ্রয়াসী, তারাই লোক-উৎসবের 'লোক' (Folk); তাই "Folk in ethnology the common people who share a basic store of old tradition."[২]

লোক-সংস্কৃতির স্বরূপ স্বল্পকথায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্চার টেলর বলেছেন, "Folklore is the material that is handed on by tradition, either by word of mouth or by custom and practice. It may be folksongs, folktales, riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or easter eggs ; traditional ornamentation like the walls of Troy or traditional symbols like the Swastika. It may be traditional procedures like the throwing salt over ones shoulder or knocking on woods. It may be traditional beliefs like the notion that elder good for ailments of the eye. All these are folklore."[৩]

প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা মানুষকে সংকুচিত, নিরানন্দ করে; "কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।"[৪]

বঙ্গদেশ তথা রাঢ় এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোক-উৎসবকে (Folk Festival) প্রধানত দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ (১) আচার-অনুষ্ঠানমূলক (Ritual); (২) ঋতুমূলক (Seasonal)। শিব, ধর্মরাজ, মনসা প্রভৃতির পূজা প্রথম পর্যায়ে পড়ে। করম, জাওয়া, ভাদু, বাঁধনা, টুসু প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত।

বাঙ্‌লার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australiod) ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী প্রাগার্য-জনসংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তীকালে হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ বা সমন্বয় দেখা যায়। নৃতাত্ত্বিক বিচারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এবং সাঁওতাল পরগনা তথা ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রাগার্য আদি-অস্ত্রালদের বাসভূমি। আদি প্রস্তর যুগে তাদের ব্যবহৃত ফলকাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, ত্রিকোণাকৃতি, চতুষ্কোণযুক্ত কিংবা বৃত্তাকার নানাবিধ আয়ুধ ঐ সব অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেছে। প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষাভাষী বেশ কিছু জনগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে আর্যদের প্রবল অভিযানের চাপে পিছু হটে ছোটনাগপুর ও সন্নিহিত রাঢ়ভূমির দুর্গম আরণ্যক পরিবেশে আশ্রয় নেয়। প্রাগার্য-অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। তারা ধানচাষে দক্ষ ছিল। 'লাঙল' সব্দটি তাদেব কাছ থেকে পাওয়া। 'লাঙল' শব্দের মূল অর্থ 'চাষ-করা' ও 'চাষ-করার যন্ত্র'। অস্ট্রিক ভাষা থেকে এই 'লাঙল' কথাটি আর্যভাষায় সংগৃহীত। 'কর্পাস' (কার্পাস) এবং 'কপট' (পাটের কাপড়) শব্দ-দুটিও অস্ট্রিক ভাষা থেকে আর্যরা নিয়েছে। আবার দীর্ঘমুণ্ড দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা নব্যপ্রস্তরযুগে নগর সভ্যতার সূত্রপাত করে। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু ও পোড়ামাটির ব্যবহার তারা জানত। বর্শা, কুঠাব, তরবারি প্রভৃতি উন্নত ধরনের লোহার অস্ত্র-ব্যবহার তাদেব অজানা ছিল না। 'কর্মাব' (কামার) শব্দ দ্রাবিড ভাষাজাত। কৃষিকার্য সম্পর্কিত 'ব্রীহি' এবং 'তণ্ডুল' শব্দ দুটি যেমন দ্রাবিড় ভাষাজাত, তেমনি চারু-কারুশিল্পেব 'রূপ' ও 'কলা' শব্দদু'টিও দ্রাবিড়ভাষী মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া। ফলত অস্ট্রিক ভাষাভাষী ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরবর্তীকালে আগত আর্যদের কোন কোন গোষ্ঠীর দীর্ঘকাল মিশ্রণে রাঢ়-বঙ্গে এক মিশ্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"আরণ্যক আব উপনিষদের সময়ে বাঙ্‌লাদেশে আর্যদের আগমন হয় নি, আব বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে যে-সমস্ত আর্য প্রথমে এসে বসবাস করে তারা ঘববাসী কৃষাণজাতীয় ছিল না, তাবা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে, তারা তাদের ঘোড়া-গোরু-ছাগল-ভেড়া নিয়ে ঘুবে ঘুরে বেড়াত; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্যেরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তারা অবশ্য আর্যভাষা বলত, কিন্তু তাদের আর্যভাষা উদীচ্য আর কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলের আর্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, আর তাদের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা—খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা করত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ, হোম, অগ্নিপূজা ইত্যাদি কবত না; আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও মানত না। বেদমার্গী পশ্চিমা আর্যেরা এই সব কারণে তাদের অবজ্ঞা করত; এই জন্য ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান নিন্দার কথা লিখে গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্য ছিল, আর আর্যভাষা বলত, (যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না), ব্রাহ্মণ গ্রন্থে একথাও স্বীকার করা হয়েছে; আর বৈদিক আযরা এদের শুদ্ধি করে বেদমার্গী করে নিত খুব; যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় লোকেদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল। যে যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্যেরা

মধ্যদেশীয় আর্যদের দ্বারা স্বীকৃত বর্ণভেদ মানতই না। এই ব্রাত্য আর্যেরা বেদমার্গী আর্যদের আগে মগধ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আর এটা খুবই সম্ভব যে তারা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করলেও সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হতে পারে নি। তাই বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে দুটি বড়ো ধর্মমত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছিল,—বৌদ্ধমত আর জৈনমত — সেই দুটি মত এই মগধ অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসারলাভ করে।"[৭]

লোক-উৎসব (Folk Festival) আচার-অনুষ্ঠানমূলক (Ritual) বা ঋতুমূলক (Seasonal) যা-ই হোক-না-কেন, তাদের মধ্যে দৃশ্যত বা অন্তর্লীনভাবে কৃষিভাবনা তথা উর্বরতাবাদ বা প্রজননভাবনা (Fertility Cult) ক্রিয়াশীল। লৌকিক দেবতাদের মধ্যে শিব সর্বপ্রাচীন। প্রাক্-বৈদিক সমাজে শিবপূজার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদরো থেকে পাওয়া শীলমোহরের মধ্যে প্রাগার্য (Pre- Aryan) শিবের পরিচয় পাওয়া যায়। মগধ বা উত্তর বিহার থেকে আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে প্রসারিত হয়। আর উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে শিব একজন কৃষক। আর্যসভ্যতা বিস্তারের আগে উত্তরবঙ্গে কোচ নামে এক জাতির কথা জানা যায়। তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষিকার্য। দিনাজপুর অঞ্চলে 'মহারাজা' নামে এক কৃষিদেবতার কথা জানা যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "... এই অঞ্চলে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির পর স্থানীয় কৃষকদিগের এই উর্বরতা-বৃদ্ধির দেবতা (Fertility God) কোন-কোন স্থানে মহারাজা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ব্যাপকভাবে শিব বলিয়াই পরিচিত হইতে থাকেন।"[৮] আর এ প্রসঙ্গে ধান ভানতে শিবের গীত — প্রবচনটি মনে আসে। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'-এ কৃষকবধূর মতো পার্বতী তাঁর স্বামী শিবকে কৃষিকর্মের দ্বারা পারিবারিক দুঃখ দূর করার অনুরোধ জানিয়েছেন—

আহ্মার বচনে গোসাঞিঃ তুহ্মি চষ চাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞিঃ কখন উপবাস।।

কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোসাঞিঃ কেওদা বাঘের ছড়।।

তিল সরিষা চাষ কর গোসাঞিঃ বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞিঃ বিভূতিগুল গাএ।।[৯]

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যে দেখি ত্রিশূলেশ্বরের ত্রিশূল ভেঙে বিশ্বকর্মা চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন—

বিশাই বুঝিয়া কার্য কৈল সমাধান।
লাঙ্গল জোয়াল ফাল করিল নির্মাণ।।

কুবেরের দেওয়া বীজধান নিয়ে শিব দেবীচক দ্বীপে চাষ করলেন। প্রচুর ধানের ফলনে কৃষক শিব আনন্দে বিভোর—

হর্ষ হৈয়া ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নব ঘনশ্যাম।
হাপুড়ের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রহিল পাসর্যা পরিজন।।

শিব ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্রেশ নামেও পরিচিত। ডঃ ভান্ডারকরের মতে, শিব ক্ষেত্রপাল হওয়ায় জন্যই পশুপতি নামে খ্যাত— "Being the lord of the open fields or plains, he is the lord of cattle, which roam in them."

ধ্যানগম্ভীর কৈলাসপতি বঙ্গভূমিতে তাঁর সর্বপ্রকার গাম্ভীর্য সরিয়ে বাঙালি জীবনের সহজ ঢিলেঢালা ছন্দে নিজেকে অভিযোজন করেছেন, অর্থাৎ বাঙালি-কবি সে রকম ভাবেই যোগিরাজ শিবকে দেখতে চেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্লার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।"[৮]

পুরাণে কথিত 'প্রাচ্যদেশ' বলতে রাঢ় অঞ্চলসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় গোটা এলাকা বোঝায়। আর এ অঞ্চলে জৈনধর্মের দ্বারা আর্যীকরণ ঘটেছিল। হাজারিবাগের পরেশনাথ পাহাড়কে জৈন ধর্মগ্রন্থে 'সমেত শিখর' বলা হয়েছে। চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে কুড়িজন (মতান্তরে উনিশজন)[৯] এই পাহাড়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নামে পাহাড়টির নাম হয়েছে পার্শ্বনাথ/পরেশনাথ পাহাড়। পার্শ্বনাথের আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক। তাঁর আবির্ভাবের প্রায় আড়াইশ' বছর পরে মহাবীর বর্ধমানের জন্ম। ঐতিহাসিক মতে মহাবীরের কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮ অব্দ। (মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭ অব্দ)। 'আচারাঙ্গ সূত্ত' থেকে জানা যায়—মহাবীর বজ্জভূমি, সুব্ভভূমি ('লাঢ়' অঞ্চলে) পরিভ্রমণ করেছিলেন। ঐ অঞ্চলের নিষাদজাতির রূঢ় স্বভাবের মানুষ তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তার থেকে ধারণা হয়, মহাবীরের জীবিতকালে আর্য-সংস্কৃতির তরঙ্গ রাঢ় অঞ্চলে পৌঁছায় নি। তাঁর তিরোধানের প্রায় তিনশ' বছর পরে ঐসব অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রভাব পড়ে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন, "বঙ্গদেশে জৈনধর্ম অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আর উত্তরবঙ্গে যে যে সম্প্রদায়ের প্রভাব খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবল ছিল তার প্রমাণ হিউয়ান সাং-এর বিবরণী হতেই পাওয়া যায়। তাঁর সময় পুন্ড্রবর্ধন নগরে নির্গ্রন্থদের সংখ্যা ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।"[১০]

পরেশনাথ পাহাড় থেকে জৈনধর্মের তরঙ্গ দামোদর, সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, কুমারী, দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী বহু স্থানে মন্দির আকারে রূপ পেয়েছিল। পুরুলিয়ার

চেলিয়ামার কাছে দামোদর-সংলগ্ন তেলকূপী, মৌতড়; কিংবা কাঁসাই নদীর তীরবর্তী বা কাছাকাছি দেউলঘাটা, পাক্‌বিড়র‍্যা, আনাই, রালিবেড়্যা; অথবা সুবর্ণরেখার তীরে দুল্‌মি অঞ্চলে বহু জৈনমন্দির ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায়রূপে আজও দেখা যায়। বাঁকুড়ার পশ্চিমে, দামোদর-তীরবর্তী বিহারীনাথ পাহাড়ে কিংবা আরও পূর্বদিকে প্রায় বর্ধমান-সংলগ্ন ছান্দার পরিমণ্ডলে অথবা বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদতীরবর্তী বাহুলাড়া, ধরাপাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন পুরাকীর্তির ভগ্নাবশেষের মাঝে জৈন-সংস্কৃতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে বাঙ্‌লার পালরাজারা বৌদ্ধধর্মানুরাগী এবং সেনরাজার ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় জৈনধর্মস্রোতে ভাটা পড়ে। কিন্তু সেনরাজগণ উদার ধর্মমতের অনুসারী থাকায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাঝে জৈনধর্মের আশ্চর্য একাত্মীকরণ ঘটে। তাই নাগছত্রযুক্ত পার্শ্বনাথ কোথাও হয়েছেন বিষ্ণু, কোথাও শিব! আবার আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে তাঁরা হয়েছেন ছাগরক্তপ্রিয় কালভৈরব, এমনকি লিঙ্গান্তরে মনসাদেবীও! বাঁকুড়ার বহুলাড়ার পার্শ্বনাথ-শোভিত জৈনমন্দিরটি পরবর্তীকালে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরে, ধরাপাটের সপ্তমুখী নাগছত্রশোভিত পার্শ্বনাথ সর্পলাঞ্ছনের লাঞ্ছনায় মনসাদেবীতে রূপান্তরিত! পুরুষাঙ্গ-শোভিত এই মূর্তির কাছে অনেক কুলবধূ সন্তান-কামনায় মানত করে, পূজা দেয়। তাছাড়া বাঁকুড়ার চুয়ামসিনার কপিলেশ্বর, পাঁচালের রত্নেশ্বর, ছান্দারের রামেশ্বর, জগন্নাথপুরের রত্নেশ্বর শিবরূপে পূজিত হলেও পার্শ্বনাথচিহ্নযুক্ত জৈনভাবনা সেখানেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পুরুলিয়ার পাক্‌বিড়র‍্যায় পদ্মপ্রভ ও ঋষভনাথ স্থানীয় গ্রামবাসীর কাছে কালভৈরবরূপে পূজিত। এমন কি, বাবার প্রসন্নতার জন্য সেখানে মানত-করা পশুপাখিও বলি হয়!

বস্তুত, রাঢ়-বঙ্গে জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যেতর উপাসনা ধারার আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছে। পুরুলিয়ায় কাঁসাই নদীর তীরে দেউলঘাটায় একাধিক মন্দির প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসাবে আজও ভগ্নপ্রায়রূপে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে জৈনভাবনার পাশে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের অষ্টভুজা দেবীদুর্গা এবং শিব-পার্বতী-গণেশ প্রভৃতি প্রস্তরমূর্তি আজও দেখা যায়। সংস্কৃতি-সমন্বয়জাত মিশ্র সংস্কৃতির ফলে প্রত্যন্ত বাঙ্‌লার বহু মন্দিরসংলগ্ন বৃক্ষতলে কালভৈরব, বড়াম, কুদরাসিনি, সিঙ্‌বোঙা, মারাঙ্‌বুরু প্রভৃতি অপৌরাণিক তথা আর্যেতর জনগোষ্ঠীর দেবদেবীরও পূজা করা হয়।

দক্ষিণরাঢ় এবং ছোটনাগপুর অঞ্চল ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুরের পূজা-অর্চনার দেশ। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ময়নানগর অজয়তীরের ত্রিষষ্ঠীগড় দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত। 'শূন্যপুরাণ'-রচয়িতা রামাই পণ্ডিত ছিলেন বাঁকুড়ার সলদা-ময়নাপুরের মানুষ। (মতান্তরে বর্ধমান জেলার বল্লুকা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের)। ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক। 'ধর্মপূজাবিধান'-এ আছে" শূন্যদেবং দিবাকরম্।"[১১] শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতেও সূর্য ও ধর্মপূজা অভিন্ন।[১২] সূর্য উর্বরতাবৃদ্ধির দেবতা (Fertility God)। এই উর্বরতা-বৃদ্ধিভাবনা পৃথিবীতে শস্যোৎপাদন এবং নারীর মধ্যে সন্তানবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সংগুপ্ত। ধর্মপূজায় 'মুক্তা-আনয়ন' একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। মুক্তাহার বা মুক্তামালা ধানকে ধর্মঠাকুরের স্ত্রী কল্পনা করা হয়। ঐ অনুষ্ঠান তাঁদের বিবাহপর্ব। মুক্তাহার ধানের আতপ চালের ওপর দেবীর

প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মাঙ্গলিক পূজা-পর্ব সম্পন্ন হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি কৃষিব্রতের আচার ব্যতীত আর কিছুই নহে।"[১৩] অনাবৃষ্টি রোধে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টির আবাহনকল্পে সূর্যপূজা আদিমকাল থেকে নানাদেশে প্রচলিত। ধর্মপূজায় 'গৃহভরণ' বা 'ঘর-ভরা' এবং 'কামিন্যা-আনয়ন' অনুষ্ঠানে বৃষ্টি-আবাহনের ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গত বর্ধমান জেলার খুদকুড়ি গ্রামের ধর্মঠাকুরের কথা আসে। একটানা খরা চললে ঐ ধর্মঠাকুরকে দেবালয়ের বাইরে রোদে রাখা হয়। স্থানীয় নরনারীর বিশ্বাস—রৌদ্রক্লিষ্ট দেবতার আন্তরিক ইচ্ছায় বৃষ্টি হবেই। বাঁকুড়া জেলায় বেলেতোড় গ্রামের ধর্মরাজের গাজন বিখ্যাত। তাঁর স্নানযাত্রার কালে বৃহদাকার কাঠের ঘোড়ার ব্যবহার হয়। অশ্বারূঢ় ধর্মরাজ ভাবনায় সূর্যদেবতার ইঙ্গিত দেয়। ঋগ্বেদের বহুস্থানে ঘোড়া সূর্যদেবতার প্রতীক।[১৪] দ্রুতগামী ঘোটক সূর্যদেবের প্রতীক হিসাবে পৃথিবীর বহুস্থানে পূজিত—"through its swiftness, strength and activity, it was itself a symbol of the sun."[১৫] ছোটনাগপুর মালভূমির ওঁরাওগণ 'ধর্মেশ' নামে এক দেবতার পূজা করে। তিনি সূর্যদেবতা। 'বিরিবেলাস' নামেও তিনি পূজ্য।[১৬] বর্ষশেষে শিবের চড়ক-গাজন হয়। সেদিন বিষুব-সংক্রান্তি। পণ্ডিতদের মতে সূর্যপূজার দিন। "চড়ক গাছ ও চড়কের চক্র স্পষ্টতই সূর্যের আবর্তন ও চক্রাকারে ভ্রমণ বুঝায়।"[১৭]

বাঁকুড়ায় অসংখ্য ধর্মঠাকুরের নামের পিছনে সৌরভাবনা ক্রিয়াশীল। মকর-সংক্রান্তিতে সূর্য চরম বক্রগতিপ্রাপ্ত হয়। সে ভাবনা থেকেই ধর্মঠাকুরের 'বাঁকুড়া রায়' বা 'বুড়ো রায়' নামকরণ। রাশি-অনুযায়ী সূর্যের অবস্থান-অনুসারে বাল্যকাল ও যৌবন নিরূপিত হয়। রাশির শেষ ডিগ্রি বার্ধক্য; তাই 'বাঁকুড়া রায়' বা 'বুড়ো রায়' নামকরণের সার্থকতা। বৃশ্চিক রাশিস্থ সূর্য থেকে ধর্মঠাকুরের নাম 'কাঁকড়াবিছা'। মেঘলা দিনের সূর্য থেকে 'মেঘ রায়'। বিজয়া দশমী যাত্রাসিদ্ধির দিন। তাই ধর্মঠাকুরের যেমন নাম 'যাত্রাসিদ্ধি', তেমনই দোলপূর্ণিমার তিথি অনুযায়ী তাঁর নাম 'দোলু রায়'। এমন কি বিষ্ণুপুরের একদা জাগ্রত দেবতা মদনমোহন দুরন্ত বর্গীদের বিশাল কামান হস্তে মর্দন করেছিলেন, তাই এখনও দৃষ্ট ঐতিহাসিক কামানটির 'দলমর্দন' থেকে 'দলমাদল' নামকরণও কিংবদন্তীপ্রসূত। বিষ্ণুপুরের শাঁখারিবাজারের বুড়ো ধর্মঠাকুরের পূজারী বিয়ালই শ্রেণীভুক্ত কর্মকার পরিবারের পূর্বপুরুষ দলমাদল কামান নির্মাণ করেন। দলমাদল ধর্মঠাকুরের নামানুসারে 'দলমাদল' কামানের নাম হয়। 'কমঠ আকার' দলমাদল শিলার কথা 'শূণ্যপুরাণ' রচয়িতা রামাই পণ্ডিত-ও উল্লেখ করেছেন।[১৮]

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব তার মাতৃত্বে। প্রতিটি নারীরই চেতনার অন্তঃস্তলে সন্তানবতী হওয়ার সুপ্রবল একটি আকাঙ্ক্ষা থাকে। স্বাভাবিকভাবে তা ব্যাহত হলে ধর্মভীরু বহু নারী ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হয়। ধর্মঠাকুরের মন্দিরে পুরোহিতের সহকারীকে বলা হয় 'ধামাৎকন্নি'; আর মন্দিরের প্রধান সেবাইতকে বলা হয় 'দেয়াসী'। ধামাৎকন্নি আর দেয়াসী যখন ঝুড়ি-মাথায় শোভাযাত্রাসহকারে ধর্মঠাকুরকে স্নানযাত্রার নিমিত্ত নিকটবর্তী পুকুরঘাটে নিয়ে যান, তখন বহু মাতৃত্ব-কাঙালিনী নারী দেবতার স্নানসিঞ্চিত পবিত্র জলবিন্দু মাথায়

নিয়ে সন্তানবতী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। প্রসঙ্গত বর্ধমান জেলার আসানসোলের কাছে দামোদর তীরবর্তী ডেমরা গ্রামের ধর্মঠাকুরের স্নান-পর্বটি মনে আসে। ধর্মমঙ্গলের বৃদ্ধ কর্ণসেনের যুবতী স্ত্রী রঞ্জাবতীর সন্তান-কামনায় 'শালে ভর' এবং পুত্রসন্তানলাভের কাহিনী আমাদের অজানা নয়। এই উর্বরতাবাদ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য, "ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার প্রতীক—আদিম সমাজে সূর্যই উৎপাদন-শক্তির মূল উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়—এই উৎপাদন অর্থে পৃথিবীর শস্যোৎপাদন-ও যেমন বুঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদন-ও তেমনই বুঝায়। পৃথিবী এবং নারী উভয়েই সূর্যের শক্তি দ্বারাই একজন শস্যোৎপাদন ও আর একজন সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস। বাঙলাদেশে, বিশেষত ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে হিন্দুপ্রভাববশত আদিম সমাজের এই সূর্যদেবতাই শিবরূপে পরিণতিলাভ করিয়াছেন; সেইজন্য এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা শিবপূজা করিয়া নারীজীবনে সার্থকতার উপায় সন্ধান করিয়া থাকে।"[১৯]

আর্যসমাজ সৃষ্টিশক্তির রহস্যলীলায় সদর্থক দিকের ওপর জোর দিয়েছে, অপরদিকে অনার্য-ভাবনায় শক্তি-দেবতার ধ্বংসাত্মক দিক থেকে ভয়-ভক্তি গড়ে উঠেছে। তার পিছনে আধিভৌতিক কারণই বড়। আর্য-পূর্ব প্রাচীন ভারতে গ্রীষ্মপরিমণ্ডলের অরণ্যসংকুল ভয়ংকর জীবনে সর্পভীতি নরনারীদের অসহায় করেছে। পণ্ডিতদের মতে, সর্পপূজা দ্রাবিড়-সংস্কৃতির অবদান। আর্যগণ পরবর্তীকালে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক জাতি সর্পফণাকে জীবক (Totem) হিসাবে ব্যবহার করত। তাই তাদের নাগ বলা হত। মহাভারতে আর্য-বিরোধী নাগজাতির কথা আছে। প্রাগ্‌বৈদিক হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর যুগে মাতৃকা-পূজার (Cult of Mother Goddess) প্রচলন ছিল। 'গৃহ্যসূত্র'-এ নাগপঞ্চমীর পূজা জীবিত সর্পের পূজা। ক্রমে মনসা গাছের (Cactus Indianis) সঙ্গে জীবিত সর্পভাবনা এক হয়ে গেছে। এখানেও উর্বরতাবাদ (Fertility Cult) কাজ করেছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায় জাঙ্গুলীদেবীর পূজা করতেন। মহাযানী বৌদ্ধরা এ ব্যাপারে বৈদিক ভাবনায় প্রভাবিত। অথর্ববেদে সর্পবিদ্যাপটীয়সী এক কিরাতিনীর উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে বিষনাশিনী এক নারীচরিত্র আছে। তাঁর নাম ঘৃতাচী। অথর্ববেদে দেবী সরস্বতীকেও বিষনাশিনী বলা হয়েছে। বাঙ্‌লায় যখন বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান ও হিন্দুযুগের প্রতিষ্ঠা, তখন মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সর্পদেবী জাঙ্গুলী রূপান্তরিতা হন দেবী মনসায়।[২০] ছোটনাগপুরের ওঁরাওদের মধ্যে মনসাপূজার প্রচলন আছে। তারা সাপের ওঝাকে বলে 'নাগমতি' রাঢ়-বঙ্গের বহুস্থানে তাকে বলে 'গুণিন' বা 'গুনী'। জ্যৈষ্ঠমাসের তেরো তারিখ 'রোহিণ্'। সেদিন থেকে মনসাপূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা। লোক-ভাবনায় আছে—সেদিন বৃষ্টি হলে সাপের বিষ ঝরে যায়। শুধু ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব নয়, এ দেশের সর্পভাবনার মধ্যেও প্রজনন ভাবনা কতখানি ক্রিয়াশীল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আশ্বিন-সংক্রান্তি; যার আঞ্চলিক নাম—ডাক-সংক্রান্তি। ঐদিন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লায় ঝাঁপান-পরব হয়। ডাক-সংক্রান্তি উপলক্ষে লোক-ভাবনা অনুসারে গর্ভবতী ধানের চারাকে 'সাধভক্ষণ' করানো হয়। সাধভক্ষণের প্রথা হল—ঐদিন সকালে ধানক্ষেতে এবং বাড়ির

পিছনে গোবরগাদায় শরকাঠি পুঁতে দিতে হয়। তাতে হলুদ, ওল, শালুক-ডাঁটা ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য দেওয়া হয়। ছড়া কেটে গাঁয়ের লোকজন বলেন—

এতে আছে শুকুতা
ধান হবে গজ-মুকুতা।
এতে আছে পুরানো 'বড়্'
মবাই করবে কড়্কড়্।
(ইত্যাদি)

দক্ষিণ রাঢ় এবং সন্নিহিত পশ্চিমাঞ্চলে জ্যৈষ্ঠমাসে 'দশহরা'-র দিন মনসাপূজা হয়। ঐদিন বৃষ্টি হয়ে থাকে—এরকম লোক-ধারণা। রাঢ়ের মনসাপূজা শুধুমাত্র আদিবাসী জীবনের উৎসব নয়, বর্ণহিন্দুদের অনেকে ঐ পরবে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদতীরবর্তী ব্রাহ্মণপ্রধান অযোধ্যা গ্রামে দশহরার দিন 'কালীবুড়ি' মনসার পূজা এবং সেই উপলক্ষে বিরাট মেলা হয়। বিষ্ণুপুরের জয়পুর থানার রাউতখণ্ড গ্রামের 'জগৎগৌরী', লাপ্‌ড় গ্রামের 'লাপুড়সিনি', বিষড্যার 'বিষহরি', বারপেট্যার 'মাদানী' বিখ্যাত সর্পদেবী। মজার ব্যাপার সপ্তমুখ সর্পলাঞ্ছনযুক্ত জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ-ও ধরাপাট গ্রামে সর্পদেবীরূপে পূজা পাচ্ছেন।

নাগপঞ্চমীর মধ্যে আমন ধান-লাগানো-পর্ব শেষ হয়। এ সময় 'খইধারা' পালন করা হয়। সেদিন অন্ন নিষিদ্ধ। মুড়ি-চিঁড়ে ইত্যাদি খেতে হয়। মনসাদেবীর ঐ 'পালন' করলে গৃহস্থের বংশবৃদ্ধি ও ধনলাভ হয়। প্রজনন-ভাবনাযুক্ত ঐ 'পালন'-কে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে 'খইঢেরা' বলে।

শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে বড় আকারের মনসা পূজা হয়। সীমান্ত বাঙ্‌লার আদিবাসী মানুষ মনসাথানে হাঁস-মুরগী বলি দেয়। তখন মনসা-পূজারীর ওপর মাঝেমধ্যে 'ভর' হয়। সেই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ঐ পূজারী অনেক কিছু ভবিষ্যৎ-বাণী করে, দুরারোগ্য রোগের ওষুধও বলে দেয়। সীমান্ত বাঙ্‌লার মানুষ ঐ 'ভর' পাওয়া অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, পূজারীর ঢাকের তালে তালে নাচাকোঁদাকে বলে 'ঝুপাইল্'।

মনসাপূজা উপলক্ষে 'ঝাঁপান' অর্থাৎ সাপ-খেলানোর আনন্দ-উৎকণ্ঠাপূর্ণ মহড়া হয়। 'ঝাঁপান' কথাটি সংস্কৃত 'যাপ্যযান' থেকে এসেছে। তার অর্থ—নরবাহিত যান, ডুলিবিশেষ। আগেকার দিনে সর্পবিশারদ 'গুণী'-দের ঝাঁপানে ক'রে সমুৎসুক দর্শকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত করা হত। বর্তমানকালে সাধারণত কোন উঁচু মঞ্চ থেকে ঝাঁপান-খেলা প্রদর্শিত হয়। ঐ সময় যুযুধান গুণীরা ঝাড়ফুঁক, হেঁয়ালি প্রভৃতি নানা কৌশলে কিংবা মন্ত্রোচ্চারণে মারণ, চালন্, কাটান্, উড়ান্ প্রভৃতি নাটকীয় কৌশল মুহূর্তমালা রচনা করে। দ্রিমিদ্রিমি বাজে বিষম ঢাকী। তার চারপাশে অগণিত উৎসুক নরনারী ও শিশু। বাঁকুড়ায় কোনও তীব্র প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বমুখর 'টেনশন'-এ একটি প্রবাদ আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে—'বাজুক বিষম ঢাকী, চলুক ঝাঁপান!'

ঝাঁপান গানে ঝিঁঝিট, জয়জয়ন্তী, পাহাড়ী প্রভৃতি রাগগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল-লয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। মনসার থানে পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, মনসার ঘট, 'মনসার চালি' পূজার উপক[illegible] হিসাবে দেওয়া হয়। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া, সেন্দ্রা, রাজগ্রামের মৃৎশিল্পীদের হাতের কাজ আজ মন্দির বা নির্জন বৃক্ষচ্ছায়ার ধর্মীয় বাতাবরণ ছাড়িয়ে দেশবিদেশের রুচিমান্ উচ্চশিক্ষিত, শৌখিন মানুষের ড্রইংরুমের শোভাবর্ধন করছে!

আগেই বলা হয়েছে, লোক-উৎসব (Folk Festival) আচার অনুষ্ঠানমূলক (Ritual) অথবা ঋতুমূলক (Seasonal) যা-ই হোক না কেন তাদের মধ্যে কৃষিভাবনা তথা উর্বরতাবাদ (Fertility cult) প্রবলমাত্রায় ক্রিয়াশীল। তার কারণ, অস্ট্রিকভাষাভাষী আদি-অস্ত্রাল (Proto Australiod) লোকদের জীবনধারা ছিল কৃষিভিত্তিক। কৃষিকাজে লাঙল ব্যবহার এবং ধানচাষ প্রণালী তাদের আয়ত্তে ছিল। তারা ভারতের যে অঞ্চলে গেছে, সেখানেই ধানচাষ করেছে। তাই বাঙলা ছাড়াও আসাম, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রকূলবর্তী বহুস্থানে ধানচাষের প্রচলন। আদি-অস্ত্রালরা শুধু ধান নয়, লাউ-বেগুন-লেবু-পান-ডুমুর-হলুদ-সুপারি-ডালিম-নারকেল প্রভৃতিরও চাষ জানত। ফলত বাংলাভাষায় এই নামগুলি অস্ট্রিকভাষা থেকে এসেছে।

তাদের মনোলোকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—জীবন তথা সৃষ্টিরহস্য ব্যাপারে কল্পনা প্রবণতার সঙ্গে নানাবিধ কৌতূহলেব অনিবার্য গভীর পবিণতিতে গড়ে উঠেছিল দার্শনিক চেতনা। ঋতুরঙ্গশালায় বেড়ে-ওঠা গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখির জীবনবৃত্তান্তে তারা এক অভাবনীয় শক্তির কথা ভেবেছিল। মানুষের একাধিক জীবন তারা বিশ্বাস করত। মৃত ব্যক্তির আত্মা গাছ, পাহাড় কিংবা কোন বিশেষ জীবজন্তুকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে—এরকম ধারণা তাদের স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। তা থেকে জীবক বা Totem ভাবনার সৃষ্টি। সেইসঙ্গে কিছু অন্ধ বিশ্বাস তাদের মনে তথাকথিত শুদ্ধচেতনানিষিক্ত এক আশ্চর্য নিষিদ্ধবোধ বা Taboo এনে দিয়েছিল। পণ্ডিতদের অনুমান, আদি-অস্ত্রালদের একাধিক জীবন-সংক্রান্ত ধারণাই পরবর্তীকালে হিন্দু পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদ গড়ে তুলেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অন্যব্রতদেব মধ্যে খুঁজে পাবো। নানা ঋতুর মধ্য দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করছে এবং সেই সকল ঘটনার মূলে দেবতা-অপদেবতা নানা রকম কল্পনা ক'রে নিয়ে তারা শস্যকামনায় সৌভাগ্য কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করেছে, কি আর্য কি অন্যব্রত সব দলেই।"[২১]

হিন্দু সমাজে ধান, ধানের গুচ্ছ, দূর্বা, হলুদ, পান, সুপারি, কলা, কলাগাছ, কর্পাস (কাপাস), পট্টবস্ত্র, সিঁদুর ইত্যাদি যেকোন শুভকাজের মাঙ্গলিক উপকরণ। সৌভাগ্য কামনাকারী এসব মাঙ্গলিক উপচার কিংবা লিঙ্গপূজা (Phallic Worship) আদি-অস্ত্রাল ভাবনাজাত।

রাঢ়-বঙ্গে ঋতুমূলক লোক-উৎসবগুলি শস্যোৎসব এবং তা প্রধান শস্য ধানকে নিয়েই। তাই ক্ষেতে লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, ধান রোয়া, ধানগাছের পরিচর্যা, ধান

কাটা এবং ফসল তোলা প্রভৃতি প্রতিটি পর্যায় কৃষিজীবী মানুষ আনন্দের সঙ্গে আন্তরিক নিষ্ঠায় করে থাকে। 'কৃষি' ও 'কর্ষণ' শব্দ দু'টি 'কৃষ্'-ধাতুর সঙ্গে যথাক্রমে 'ই' এবং 'অন' প্রত্যয়যোগে গঠিত। 'কৃষ্' ধাতুর অর্থ 'চাষ করা'। 'সংস্কৃতি' কথাটি Culture বা Civilization অর্থে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে পান। দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনার পর 'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি গ্রহণযোগ্য বলে তিনি অভিমত দেন।[২২] তার আগে 'কৃষ্টি' শব্দটি 'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় চলত। কৃষ্+তি=কৃষ্টি। যার অর্থ ঃ হলচালনা, অনুশীলন, সংস্কৃতি। ল্যাটিনের 'Cultura' (কুলতূরা) শব্দ থেকে ইংরেজি 'Culture' শব্দটির উৎপত্তি। 'Cultura' শব্দটি Col (কোল্) ধাতু নিষ্পন্ন। 'Col'-এর অর্থ ও 'কৃষ্'-ধাতুর অর্থ একই; অর্থাৎ 'চাষ করা'। 'যত্ন করা', 'পূজা করা' অর্থে তার প্রয়োগ আছে।

ফলত, প্রতিটি দেশের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সঙ্গে সেই দেশের মাটি ও মানুষের, বিশেষত কৃষিভাবনার গভীর যোগ থাকে। দেশজ ভাবনাজাত কামনাবাসনা, অনুরাগ-বিরাগ, সুখদুঃখ নবনারীর শুধু প্রাণে নয়, গানেও জাগে। তাই রুক্ষ রাঢ়ভূমি এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলেও দেখা যায়—ধান-রোওয়ার ঠিক পরেই করম-জাওয়া পরব, ভাদ্রমাসে ভাদুই ধান ঘরে উঠলে ভাদু পরব, কার্তিক মাসে আমন ধান যখন মাঠে মাঠে ফুলছে, কৃষিলক্ষ্মীর আগাম আগমনবার্তা তখন ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার আনে; গৃহস্থ কৃতজ্ঞচিত্তে চাষের প্রধান তথা জীবন্ত হাতিয়ার হেলে (বলদ) ও কাড়াদের (পুরুষ মহিষদের) বন্দনা জানায়, সেইসঙ্গে অমৃততুল্য দুগ্ধদাত্রী গোমাতার-ও বন্দনা গান গায়—তাই নিয়ে বাঁধ্না পরব। আর, ফসল কাটা, সোনার ধান ঘরে তোলার লোক-উৎসব তো টুসু পরব! ডঃ সুধীরকুমার করণ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "সীমান্ত বাঙ্লার প্রায় প্রত্যেকটি উৎসবেই কৃষি-সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য। করম, ইঁদ, বাঁধ্না, টুসু প্রভৃতি প্রাচীন কৃষি-উৎসবেরই বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ঋতুগত অনুষ্ঠান। নাচে এবং গানেও এই ঋতুগত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।"[২৩]

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর (বিশেষত ঝাড়গ্রাম ও শালবনী অঞ্চল), সিংভূম, ধলভূম, ধানবাদ প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্লা ও সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের কূর্মী-সাহাত, ভূমিজ অধ্যুষিত আদিবাসী জনজীবনে করম উৎসবের প্রচলন। করম ভাদ্রের পরব। কিশোরী-কুমারী মেয়েরাই প্রধানত এ পরবে অংশ নেয়। ভাদ্রের শুক্লা একাদশী তিথিতে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও এর প্রস্তুতি ভাদ্রের প্রথম থেকে দেখা যায়। অনেক জায়গায় শ্রাবণমাস থেকে শুরু হয়। ভাদ্রের শুক্লা একাদশী তিথি পার্শ্বৈকাদশী তিনি। শাস্ত্রে আছে ঐদিন অনন্তনাগশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণু পাশ ফিরে শয়ন করেন। পরদিন ইন্দ্র দ্বাদশী। শক্রোত্থান দিবস। ছাতাপরব। সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বাঙ্লায় সামন্তরাজগণ করম-উৎসবের ওপর হিন্দুগরিমা আনয়নের জন্য ইঁদপরব বা ছাতা পরবের আগের দিন 'করম রাজা'-র পূজার ওপর আনুষ্ঠানিক বিধি আরোপ করেন। জমিদার

বাড়িতে আগে করম-পূজা হওয়ার বিধি। তারপর প্রজারা তা পালন করত। ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে করম-রাজা এবং শক্রোত্থান দিবস যথারীতি একদিন আগে-পিছে পালিত হয়।

করম-পরবে করমগাছের দুটি ডাল মাটিতে প্রোথিত করে পূজা করা হয়। একটি করম রাজা। তিনি সূর্যের প্রতীক। স্পষ্টতই উর্বরতাবাদের (Fertility Cult) ইঙ্গিত আছে। সূর্যের তাপে অর্থাৎ (যেন) ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে শস্যোৎপাদন হবে। আর পূজারিনীরাও তো কিশোরী কুমারী—অহল্যা ধরিত্রীর প্রতীক। করম পূজার প্রাঙ্গণে অনেক জায়গায় মুখবন্ধকরা সাপ ছেড়ে দেওয়া হয়। সাপ তো প্রজনন ভাবনার ইঙ্গিত দেয়; কিশোরীদের মাতৃত্ববোধে উন্নীত হওয়ার শুদ্ধ বাসনা জাগায়। ভাদ্রের সন্ধ্যা হলুদ রঙের বন্যায় ভরিয়ে দেয় যে ফুল, সেই তাজা ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল—প্রিয়জনের কাছ থেকে খোঁপায় পরতে চায় পল্লী কিশোরী। করম গানে ফোটে তার সুর—

ঝিঙা ফুল গাঁথি দে ন ম'কে।
হাথে ধরি চুমা খাব ত'কে।।

এথেন্স স্পার্টায় যেমন বীরপুরুষদের কদর ছিল, তেমনি এই বিস্তীর্ণ সীমান্ত বাঙলায় কিশোরীরা সুঠাম দেহের অধিকারী শিকারী-পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তার জন্য মানতও করে। প্রচলিত গানে আছে—

তুঁই মানসিক কর জড়া ভেঁড়া ল।
তবে ন পাবি শিকারা মরদ।।

এই শিকার অরণ্যচারী আদি-অস্ট্রালদের প্রাণের প্রিয় উৎসব ছিল। তাই ধনুক, বাণ, দা প্রভৃতি শব্দগুলি অস্ট্রিকভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। বিস্তীর্ণ ছোটনাগপুরের আদিবাসী জীবনে 'অযোধিয়া বুরু' অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড় যৌবনের হাতছানি দেয়। বৈশাখী-পূর্ণিমা বুদ্ধজয়ন্তী শুধু নয়, শিকার-পরবও! তার যৌবন-রাগসংরক্ত দৃপ্ত ছবি ঃ "দূরে গ্রামের আখড়ায় আর মাঝি থানে বেজে চলেছে রেগড়া টামাক। শালপাতার মাধ্যমে এসেছে খবর। দিহরীর নিমন্ত্রণ 'শারজম ঢারওয়া' দিয়ে, রেগড়া টামাক দিয়ে বোল উঠেছে টর্‌র-টাট্-টারেটা ডুবুং ডুবুং ডুম্বু। শিকারীদের দল তৈরী হচ্ছে টাঙ্গী, তাবলা, ফার্‌সা, টেঁটা, বল্লম, তলোয়ার, কুঠার, তীর-ধনুক, ছুরি, লাঠি যার যা যা আছে বাঁধের ঘাটে পাথরে শান দিয়ে তা তারা নিয়ে আসছে। নেতৃত্ব দেবার জন্য গ্রামবুড়োদের অন্যতম মাঝি ওলায়া বেছে নিচ্ছেন সেইরকম একজন জোয়ানকে যাঁর গত দু-তিন বৎসর শিকার করতে যাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা আছে। বাজনদার ও গায়কেরা বানাম ও তিরিয়ো (বাঁশী) নিয়ে দু-তিন দিনের চাল, ডাল, মশলা, হাঁড়ি, কড়াই, আলু, পেঁয়াজ, তেল, নুন, লংকা সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত। বয়স্ক অথচ মনেপ্রাণে তরুণ ব্যক্তিরা চলেছেন নতুন যুবশক্তিকে প্রেরণা, যৌবনের মাদকতা ও আদিমতা বোঝাবার জন্য। তাদের হাতে চামর ও খাদ্যদ্রব্যের পোঁটলা, নাচের সাজপোশাক। দূর থেকে দেখছে গ্রামের কিশোরী-যুবতীরা। তারা কেউ বা শিকারী দলের কোন সদস্যের প্রেমিকা, কেউ-বা বোন, কেউ-বা বৌদি,

কেউ-বা মা অথবা কাকীমা। রেগড়া টামাকের বাজনা, চেড়াপেটি আর ধামসার আওয়াজে সেই কিশোরের মন উদ্বেলিত। দোমনা হয়ে মা তাকে বলে আজ শিকার-পূর্ণিমা। আজ দিসুম সেন্দরা অযোধিয়া বুরুতে —অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড়ে আজ দেশ-শিকার। তারই জন্য রেগড়া টানাক বাজছে। শিকার পূর্ণিমার কথা শুনতে শুনতে কিশোরের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে।"[২৪] শিকারের সাফল্য এনে দেন পারগানা বোঙ্গা। তবু শিকারীকে পারগানা বোঙ্গার বোন রঙ্বুজি বোঙ্গারও প্রসন্নতা কুড়াতে হয়। আর রঙ্বুজি হলেন যৌবন ও যৌনতার মূর্তিমতী প্রতীক। করমগানেও নবোদ্ভিন্না কিশোরীর মুখে সেই যৌবনদীক্ষার পীঠস্থান অযোধ্যা পাহাড়ের কথা নব অনুরাগে ধ্বনিত হয়—

উঠিল পুন্নিমার চাঁদ দেশ হইল আল' রে
রাজা, এই চাঁদে অযধ্যা-শিকার!

স্বর্ণচাঁপা-কাঁঠালিচাঁপা-বেল-রজনীগন্ধা-ক্যামেলিয়া নয়, সরস ভাদ্রের মায়াবী সন্ধ্যায় সীমান্ত বাঙ্লার কিশোরীবা ঝিঙে ফুলের হলুদ হাতছানির ব্যাকুল। তাই বার বার 'ফিরোজিয়া ঝিঙেফুল' করম গানে ধরা পড়ে —

ঝিঙা ফুল সারি সারি
বঁধু বিনা রইতে লারি।
আইজ্ বঁধু রইল কন্ খানে
সখি ল, আইজ্ আমি রইব কন্খানে।।

অথবা,

নারীর জনম ঝিঙা ফুলের কলি গ
সাঁঝে ফুটি সকালে যায় ঝরি
নারীর জইবন্ ঝিঙাফুলের কলি।

করম কুমারী মেয়েদেরই পরব। তবে অনেক জায়গায় বিবাহিতা কিশোরী বিয়ের পর এবং সন্তানবতী হওয়ার আগে এ পরবে অংশ গ্রহণ করে। তাই প্রবাসী কান্তের বিরহে বিরহিণী পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্লার যৌবনবতী-ও করম গান গেয়ে ওঠে নিজেদের ঘরানায়—

পখইর্ কুঁড়ালে বঁধু না বাঁধাইলে ঘাট।
ডালিম লাগায়েঁ বঁধু গেলে পরবাস।।
পাকিল ফাটিল ডালিম পরে ভাঁইঙে খায়।
ইদেশে পণ্ডিত নাই সঁয়াকে বুঝায়।।
পাকিল ফাটিল ডালিম চোরে ভাঁইঙে খায়।
আমার বঁধু ঘরে নাই জইবন্ বইয়ে যায়।।

এই যৌবনবেদনার সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধার বর্ষাবিরহের তুলনা স্বতঃই মনে আসে। সেখানেও দেখা যায়, ভাদ্রের অতলান্ত বিরহবেদনকাতরা যৌবনবতী রাধা বলেন—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর- -জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া।।

জাওয়া-পরব ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে করমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। জাওয়া-ডালিতে থাকে 'পঞ্চশস্য'। 'জাত' শব্দজাত 'জাওয়া' শস্যোৎসব। তাই জাওয়া-গানে শোনা যায়—

উপর ক্ষেতে হাল দাদা নাম ক্ষেতে কামিন রে।
কন্ ক্ষেতে লাগাব দাদা কামিন-কাজল ধান রে।।

দুঃসহ খরার কথাও জাওয়া-গানে ধরা পড়ে --

পাঁচ পঞ্চম মাসে জল হইল নাই শরাবনে।
হালের গোরু পালে চইরে খায়।।
যার বঠে হিড়্ চাষ তার বা কিছু আশ-বাস।
বাইদে ধানে চাষার অ গ পরান উইড়ে যায়।।

ভাদ্রে ভাদু পূজা। পুরুলিয়ার কাশীপুররাজ নীলমণি সিংহ-দেওয়ের রূপবতী, গুণবতী কিশোরী মেয়ে ভদ্রেশ্বরী বা ভদ্রাবতীর অকাল মৃত্যু ঘটে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশের প্রজাগণ ভাদু পূজার প্রচলন করে; এবং ক্রমে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়— এ রকম লোকশ্রুতি দীর্ঘকাল প্রচলিত। অথচ ইতিহাসের বিচারে এ কাহিনীর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সিপাহী বিদ্রোহে যোগদানকারী নীলমণি সিংহ-দেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। Buckland- এর মতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট যে প্রজাবিক্ষোভ তথা বিদ্রোহ হয়, তাতে পুরুলিয়া ট্রেজারি থেকে এক লক্ষেরও বেশি টাকা লুঠ, জেলখানা ভেঙে কয়েক শ' কয়েদীর মুক্তি এবং মানভূমের আদিবাসীদের ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে উত্তেজিত করার ব্যাপারে মহারাজ নীলমণি সিংহ-দেওয়ের নেতৃত্ব কাজ করেছিল।[১৫] সেই ঐতিহাসিক রাজ চরিত্রের বংশতালিকায় দেখা যায়—গরুড়নারায়ণ সিং-দেওয়ের পুত্র নীলমণি সিংহ-দেওয়ের চার রাণী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভে পুত্র সন্তান হয়েছে, কিন্তু কোন কন্যাসন্তান হয় নি।[১৬] ফলত, নীলমণি সিংহ দেওয়ের মেয়ে যে ভদ্রাবতী বা ভাদু— তা অনৈতিহাসিক কিংবদন্তী মাত্র।

আসলে ভাদু কৃষিভাবনাজাত লোক-উৎসব। ভাদ্রে ভাদুই বা আউশ ধান হয়। সেই ভাদুই ধান ঘরে তোলার আনন্দ থেকেই ভাদু-পরব : "In reality, the festivals of Bhadu and Tusu are to be judged as festivals bearing the characteristics

of an agricultural society. As per current opinion Bhadu is the worship of a memory, but it is not so. The Bhadu is an agricultural festival of the Bhadui crop (in the month of Bhadra) of the western boder regions of Bengal."[২৭]

ভাদুর কথা প্রাচীন বাঙ্‌লার সেখ শুভোদয়ার গানেও পাওয়া যায়।[২৮] ফলত, এই পরবে কৃষিলক্ষ্মী মূর্তিমতী নারীরূপা বন্দিতা—

ভাদুর আগমনে
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে।
ভাদু আজ এলো ঘরে গো
এলো গো শুভদিনে।

সারা ভাদ্রমাস ব্যাপী ভাদু গান গায় অবিবাহিতা কিশোরী ও বিবাহিতা নারীরা। ভাদ্র-সংক্রান্তির আগের রাত 'জাগরণ'। ঐ রাতে ভাদু-করা কিশোরীদের সঙ্গে পাড়ার অনেক বিবাহিতা নারীও প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিতে যোগ দিয়ে ভাদু গান গায়। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর শহরের নিষিদ্ধ পল্লীতেও ভাদুর নাচগান প্রবল উদ্দামতায় হয়ে থাকে। ভাদু সেখানে যৌবন লীলা ও রূপ মদিরতার প্রতিমূর্তি। কোথাও কোথাও ভাদুর অনুরূপ পুরুষমূর্তি 'ভাদা' কে নিয়েও স্থূল নৃত্যগীত চলে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ধলভূম এবং ছোটনাগপুরে বহুস্থানে কার্তিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বাঁধ্‌না পরব হয়। শস্যোৎপাদনের জীবন্ত হাতিয়ার বলদ, পুরুষ মহিষের (কাড়া) সঙ্গে গোরুরও অনুষ্ঠানিক বন্দনা করা হয়। 'বন্দনা' থেকে 'বাঁধ্‌না' কথাটি এসেছে। এই গবাদি পশুর সহায়তায় কৃষিজীবী মানুষ কৃষিকাজ করে থাকে। আউশ বা ভাদুই ধান ঘরে উঠেছে, মাঠে মাঠে আমনের আনম্র শিষের গুচ্ছে হেমন্তের বাতাস কৃষিবর্ষের শুভ ইঙ্গিত বহন করে আনছে, তখনই সীমান্ত বাঙ্‌লার কৃষিজীবী মানুষ গোজাতির প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতায় বাঁধ্‌না পরব করে। গোরু-কাড়ার শিঙে কুজ্‌রি তেল মাখিয়ে, গায়ে গেরু মাটির রঙিন গোল ছাপ দেওয়া হয়। তাদের দেওয়া হয় ঘাস, খইল ইত্যাদি খাবার। ক্ষীরজমা ধান শিষের গোছায় নানাবিধ বুনোলতা বেঁধে বানানো হয় 'মোড়' (মুকুট)। সেই বন্যলতা শোভিত ধান শিষগুচ্ছ গোরু বলদের শিঙে পরিয়ে, 'উখন থালা'-য় নানা গন্ধ উপচারসহ প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের বন্দনা করেন কৃষিজীবী পরিবারের প্রবীণ পুরুষ। গো-মহিষের বিশেষ বন্দনা বা আপ্যায়নের মধ্যে আদিম সমাজের জাদুভাবনা ও উর্বরতাবাদের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সীমান্ত বাঙ্‌লার শুধু আদিবাসী সমাজে নয়, বহু বর্ণহিন্দু সমাজেও বাঁধ্‌না-পরবে 'জামাই-বাঁধ্‌না'-র অনুষ্ঠান হয়। এ যেন সীমান্ত বাঙ্‌লার কৃষিজীবী পরিবারে জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠান! জ্যৈষ্ঠের জামাই ষষ্ঠীর প্রচলন প্রধানত গঙ্গা ও পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লায় তার প্রচলন তেমন নেই। তবে বাঁধ্‌না পরবের দিন জামাতৃকুল বিশেষ সমাদৃত হন। এখানেও উর্বরতাবাদের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন।

কার্তিকী অমাবস্যা কালীপূজার রাত। ঐ রাতে বাঁধ্না পরবের 'জাগরণ'। ঐ রাতে যদি গৃহস্থ জেগে থাকে, তবে লক্ষ্মীলাভ হয় এবং গো-মহিষের বংশবৃদ্ধি ঘটে—এরকম লোকধারণা। পরদিন শুক্লা প্রতিপদের পূর্বাহ্নে 'গোরৈয়া পূজা'। দ্বিতীয় দিন 'বুঢ়ী বাঁধ্না।' তৃতীয় দিন 'দেশ বাঁধ্না'। অমাবস্যা ও প্রতিপদের দিনে গো-বন্দনা। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার দিনে গোরু-খুঁটা, কাড়া-খুঁটা। গ্রামের রাস্তায় অথবা ফাঁকা মাঠে শক্ত খুঁটিতে গোরু এবং কাড়াদের বেঁধে আনন্দ-উৎসব পালন। 'কাড়া-খুঁটা'র মধ্যে এক আদিম উল্লাস কাজ করে। 'ধাঁগড়িয়া' [যে লোক গোরু-কাড়া 'জাগায়' অর্থাৎ খেলায়] পানমত্ত রক্তচক্ষু নিয়ে চিৎকৃত ভাঙা গলায় 'অহীরা' গান গেয়ে মোটা খুঁটির দড়িতে বাঁধা কাড়াকে 'জাগায়'। তার হাতে থাকে শুকনো চামড়ার ছড়্ কিংবা বিশাল গোলাকৃতি পাকানো খড়ের 'বড়্'। কৌতূহলী জনতার সামনে বাজে ঢাক-ঢোল আর ধাম্সা। উল্লাস মদির জনতার মাঝে ধাঁগড়িয়া হাতের ছড়্ বা 'বড়্' নিয়ে কাড়াকে ক্ষেপায়, ভয় দেখায়। রোষে ক্ষিপ্ত কাড়াটি শিঙ্ উঁচিয়ে, পুরুষাঙ্গ উত্থিত করে মহিষাসুরের মতো ক্ষুরে মাটি খোঁড়ে, লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায় চতুর্দিক।

কিন্তু সে বাঁধা থাকে খুঁটিতে! তার অসহায় রোষক্ষিপ্ত জান্তব রূপ সমুৎসুক নরনারীর অন্তরে আদিম চেতনার শিহরণ জাগায়! মাতাল ধাঁগড়িয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গ করে চিৎকৃত বিলম্বিত লয়ে 'অহীরা গান' গায়--

কিয়া বরন কাড়া তরই আট অঙ্গ রে, কিয়া বরন দুই শিঙ্
কিয়া বরন কাড়া তরই দুই আঁখি রে, কিয়া বরন চারি পা যে
তামাল বরন কাড়া তরই আট অঙ্গরে কাদা বরন দুই শিঙ্।

অন্ত্যটীকা

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (৩য় খণ্ড), বিশ্বভারতী (১৯৫৭) ৫৮৬-৮৭ পাতা।
'আত্মশক্তি'-র 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ।

২। Copenhegen International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore vol. I (1960), P. 126.

৩। Archer Taylor Folklore and the student of literature, The pacific spectator, vol. II (1948) P. 216.

৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী (১২শ খণ্ড) জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৩৬৮) ৫৩ পাতা। 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধ।

৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ম সংস্করণ (১৯৭৪) ৩৬-৩৭ পাতা।

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৪), ১০৪ পাতা।

৭। রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়ন কাব্য, বঙ্গবাসী (১৩১০)।

৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) বিশ্বভারতী (১৩৬৩), ৬৪৮ পাতা।

৯। অজিতনাথ, শম্ভুনাথ, সুমতি, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভ, পুষ্পদণ্ড বা সুবিদ্ধি, শীতলনাথ, শ্রেয়াংশ, বিমল, অনন্ত, ধর্মনাথ, শান্তিনাথ, কুন্থু, অরনাথ, মল্লি, সুবর্ত, নমিনাথ এবং পার্শ্বনাথ।

১০। প্রবোধচন্দ্র বাগচী 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা (১৩৪৬)।

১১। ধর্মপূজা-বিধান ৮৯ পাতা

১২। Sashibhusan Dasgupta, Obscure Religious cults, Calcutta P. 337-39.

১৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৫৬২ পাতা।

১৪। A. A. Macdonell, Vedic Mythology, Strassburg (1897) P. 150.

১৫। N. M. Penzer, The Ocean of Story, London (1925) vol. IV, P. 14

১৬। S.C. Ray, Oraon Religion and Custom (Ranchi, 1928), P 19.

১৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৫৯১ পাতা।

১৮। মানিকলাল সিংহ পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (বিষ্ণুপুর শাখা) ১৩৮৪, ১৬৬ পাতা।

১৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রাগুক্ত গ্রন্থ ৫৪৭ পাতা।

২০। তদেব ১৭৫-১৭৯ পাতা।

২১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী (১৩৫১)

২২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি-শিল্প-ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা (১৯৭৬), ৮ পাতা।

সংস্কৃতি শব্দটি ঋগ্বেদে না থাকলেও ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ আছে—"আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি।

ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"

[বাংলা অর্থ; এই শিল্পসমূহই হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি। এগুলিব দ্বারা যজমান সাধারণ গৃহস্থ । নিজেকে ছন্দোময় করে।]

২৩। সুধীরকুমার করণ সীমান্ত বাঙ্‌লার লোকযান, এ. মুখার্জী অ্যান্‌ড কোং, কলকাতা (১৩৭১), ৩১ পাতা।

২৪। পশুপতিপ্রসাদ মাহাত ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন, সুজন পাবলিকেশন্‌স, কলকাতা-২৯ (১৯৮২), ৯৭ পাতা।

২৫। C.E. Buckland Bengal under the Lieutenant Governor Vol. I P.100

২৬। প্রথমা পত্নীর গর্ভে হরিনারায়ণ সিং-দেও, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে সাজিলাল সিং-দেও, তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে যুগলকিশোর সিং-দেও এবং চতুর্থা পত্নীর গর্ভে দেবীলাল, তারালাল ও রামকিশোর সিং-দেওয়ের জন্ম।

২৭। T. Chattopadhyay All India Oriental Conference XXIV Session, October (1968), P. 210-211

২৮। সুকুমার সেন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৩) ৮৯ পাতা।

তৃতীয় অধ্যায়

টুসু ঃ নাম-সমস্যা ও পূজাপদ্ধতি

পৌষ মাসের সূর্য পুষ্য বা বিষ্ণু। পুষ্যা বা তিষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পৌষমাসে অনুষ্ঠিত টুসু-উৎসবের বড় উপকরণ কমলা-সোনালি রঙের ধানের খোসা বা তুষ। সেই সঙ্গে উর্বরতাবাদের প্রতীক 'কাড়ুলি-বাছুর'-এর পাঁচটি বা সাতটি কিংবা নয়টি ছোট গোবরগুলি, আলো-চাল, সর্ষে-মুলোফুল, গাঁদা-আকন্দফুল, দূর্বা, কড়ি, সিঁদুর প্রভৃতি নানা মাঙ্গলিক উপকরণ। অঞ্চলবিশেষে এসব উপকরণ একশো ভাগ মান্য না-হতে পারে, কিন্তু পোড়া মাটির শূন্যগর্ভ পাত্রে সীমান্ত বাঙলার সব অঞ্চলে যাবতীয় পূজা-উপকরণ রাখে। ঐ শূন্যগর্ভ মৃৎপাত্রকে বলা হয় 'টুসুখলা'। টুসুখলার কানার চারদিকে বসানো থাকে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ। কুমোররা টুসুখলা গড়ার সঙ্গেই ঐ মাটির প্রদীপ প্রথম থেকে টুসুখলার চারপাশে বসিয়ে থাকে। তাই টুসুখলার আরেকনাম 'আলোখলা'। ধানেব খোসা বা তুষ মৃতের প্রতীক হলেও চেতনার পুনর্জীবনের ইঙ্গিত সর্ষে-মুলোফুল, গোবরগুলি ইত্যাদি মাঙ্গলিক উপকরণের সঙ্গে টুসুখলার কানার চারদিকে বসানো মাটির প্রদীপের মধ্যে ফুটে উঠে। এই চেতনার উজ্জীবনের কথা J. E. Harrison তাঁর 'The Ancient Art and Ritual' গ্রন্থে বলেছেন, "When the death and burial are once accomplished the hope of resurrection and new birth begins and with the hope the magical ceremonies that may help to fulfil that hope."[১]

অঘ্রানের সংক্রান্তিতে 'টুসু-পাতা' বা টুসুর প্রতিষ্ঠা। সারা পৌষ মাস তার সান্ধ্য বন্দনা-গীতি। যার নাম টুসুগান। তখন আমন ধান-কাটার ও ক্ষেতের ফসল ঘরে-তোলার কাল। তাই সে সময় মাঠে প্রান্তরে খেটে-খাওয়া কৃষিজীবী নরনারীরা দিনমানে-ও টুসুগান গায়। তাতে কাজের রশি প্রাত্যহিক জীবনে শ্বাসরোধী বিবর্ণতা আনে না, পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবেগ কর্মধারায় আনে ছন্দ ও গতি। তাই ফসল-কাটার ও ফসল ঘরে-তোলার উৎসব (Harvest Festival) হল টুসুগান। এই শস্যোৎসব ভাবনার সঙ্গে প্রাণের আনন্দ কতখানি যুক্ত তা রবীন্দ্রনাথের জবানীতে বলা যায়—"পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়ায়, মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল ক্ষেতে, তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেইরূপ দেখে মানুষ কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না; সে উৎসবের আয়োজন করে; সে দেখতে পায় লক্ষ্মীকে, যে একই কালে সুন্দরী এবং কল্যাণী।"[২]

টুসু-পূজার উপকরণের মধ্যে অনুকৃত জাদু ভাবনার (Imitative Magic) সঙ্গে উর্বরতাবাদের (Fertility Cult) মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই শস্যোৎসবে ধানের খোসা তুষ একটা বড় উপকরণ।[৩] তাই 'তুষ'-এর সঙ্গে আদরার্থক উ-প্রত্যয়যোগে 'তুষু' নামটি

এসেছে। 'তুষ'-এর সঙ্গে 'লা'-প্রত্যয় যোগে 'তুষলা' কথার সৃষ্টি। 'তুষলা'-র উ-ধ্বনি ধ্বনিবিজ্ঞানের নিয়মে 'গুণ' হয়ে 'তোষলা' হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রীতিমাখা উচ্চারণে 'তুষু' হয়েছে 'তুষুলি'। এ সবই ধ্বনিবিজ্ঞানের রীতি সমর্থিত উচ্চারণের প্রকারভেদ।

পুরুলিয়ার 'ছো' বা 'ছৌ'--এই নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতি-বিতর্কের সমাধান হয়েছে 'ছো' উচ্চারণে। 'তুষু' বা 'টুসু' কোন্ নামটি ঠিক ---এ নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু বিস্তীর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙলায় 'তুষু'-র চেয়ে 'টুসু' নামের চল্ বেশি। বাঁকুড়া-বীরভূমের কিছু কিছু গ্রামে 'তুষু' উচ্চারণ আছে ঠিকই, কিন্তু সীমান্ত বাঙলার ছোটনাগপুর সন্নিহিত অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামে 'টুসু' শব্দটির ব্যবহার-ই হয়ে থাকে। তাই সমগ্র পুরুলিয়া, চাস-চন্দনকিয়ারি, ঝরিয়া, ধানবাদ, রাঁচি, ধলভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম এলাকায় 'টুসু'-উচ্চারণ অবিসংবাদিত। 'তুষু' থেকে 'টুসু'—দন্ত্যবর্ণের এই মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হওয়া নিয়ে প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নেই ; "ভাষাতত্ত্বের আইনে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হওয়ার নজির আছে। এই আইন অনুসারে তুষু নিশ্চয়ই টুসু হতে পারে, অন্তত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নেই।"[৪] 'ভারতকোষ'-এ ও 'টুসু' কথাটি আছে। এ প্রসঙ্গে 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মন্তব্য স্মরণীয়—"চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় পৌষমাসে যে 'তুষ-তুষুলি'-র পূজা হয়, তার সঙ্গে টুসুর কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। 'টুসু' ও 'তুষু' অভিন্ন হতে পারে, হয়ত স্থানবিশেষে উচ্চারণ পার্থক্যে একই শব্দ ভিন্নরূপ ধরেছে।"[৫]

'টুসু' নামকরণের পিছনে কোল (Autro Asiatic) গোষ্ঠীর 'টুসা' (টুসাউ) শব্দটির প্রভাব থাকতে পারে। কোল-ভাষায় এর অর্থ হল—ফুলের গুচ্ছ। এই অভিমতের অন্যতম প্রবক্তা ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক। তিনি Bulletin of the Cultural Research Institute-এর 'Tusu Songs'-এ বলেছেন, "Perhaps 'tusu' is a non-Aryan word coming from Austro-Asiatic Kol origin, to mean flower, bunch of flowers, bud etc. In Santali 'baha tusu' means a bunch of flowers, 'tusa' means simply bud a leaf of bud–a symbol of youth and beauty."[৬]

আদিবাসী জীবনে 'টুসু' শব্দের আরেক অর্থ 'পুতুল'। ধলভূম, রাঁচি প্রভৃতি জায়গায় পুতুল করে 'টুসু' হয়। মুণ্ডারি ভাষায় পুতুলবাচক 'টুসু' শব্দ থেকে 'টুসু' কথাটি এসেছে, এমত পোষণ করেন ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক।[৭] ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক-ও বলেন, 'বিহারের বহুস্থানে 'টুসু' অর্থাৎ পুতুল যে টুসু-বিষয়ক পুতুল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৮] লোকায়ত আদিবাসী জীবনে টুসু নামকরণের পিছনে অর্থবৈচিত্র ও অর্থবিস্তার ঘটতে পারে। তাই এ সব মত যুক্তিহীন বলা যায় না।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার 'টুসুব্রতের উৎসচিন্তা' নামক প্রবন্ধে মিশরের 'টেষুব' বা 'টেষুবু' দেবতার মধ্যে টুসুর উৎস-সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে বৃষভবাহন, ত্রিশূলধারী শিবমূর্তির আদিরূপ হল মিশরের 'টেষুব' বা 'টেষুবু' দেবতা। প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য

করেছেন, টুসু-উৎসবের নামকরণ 'টেষুব' থেকেই হয়েছে (টেষুব > টেসু > টুসু, তুষু, তিষু) এমন চিন্তা করার পিছনে যুক্তিই প্রবল বলে মনে হয় টেষুব বা টেসুই টুসু হয়েছেন। .... টুসু মধ্য প্রাচ্যের প্রজননদেবতা টেষুব এই শব্দটির অপভ্রংশ। বর্তমানে টুসুতে নারী প্রধান রূপের প্রকাশ ঘটলেও মূলে এটি ছিল পুরুষ দেবতা টেষুবু বা শিবোপাসনা। এটি কৃষি-উৎসব নয়—সন্তান-কামনায় কুমারী উৎসব।"[৯]

দীনেন্দ্রবাবুর মননশীল ভাবনা যে বহুলাংশেই কষ্টকল্পিত এবং নিছক পণ্ডিতি জটিলতামাত্র, টুসু-উৎসব সম্পর্কে যাঁদের কিছুটা পরিচয় আছে, তাঁদের কাছে অর্থাৎ টুসু -পূজার দেশের নরনারীর কাছে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উড়িষ্যার 'উষা' বা 'ওষা' ব্রত থেকে টুসু নামের উৎপত্তি—নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায়ের এ মতটি সম্পর্কেও অনুরূপ কষ্টকল্পিত ভাবনার কথা উঠতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের লোক-উৎসব 'টেসু'। তাতেও টুসুর আলোখলার মতো দীপাধার ব্যবহৃত হয়।[১০] তার থেকে কেউ যদি মনে করেন 'টেসু' থেকে 'টুসু' নামটি এসেছে, তা-ও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, 'টেসু' পৌষালি শস্যোৎসব নয়, নবরাত্রি এবং দশেরা-উৎসবের সঙ্গে তার প্রধান যোগ।

রাঢ়-সাংস্কৃতি বিশারদ মানিকলাল সিংহের মতে, টুসু কৃষিলক্ষ্মীর বাণিজ্য যাত্রা। "তুষুর ভেলায় ধানেব তুষ রাখা হয়। তুষ + লা (ভেলা) মিশিয়া দাঁড়াইয়াছে তুষলা। ভেলার মধ্যে এবং চারিপার্শ্বে মাটির নির্মিত তুষুর 'আলোখলা' প্রজ্বলিত করিয়া ভেলা ভাসাইয়া দেওয়া হয়। আলোখলায় অনেকগুলি প্রদীপ বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকে। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের কুম্ভকারগণ এই জাতীয় তুষুর আলোখলা প্রতি বৎসর গড়িয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া গ্রামের পাথুরিয়ারা (বাউরি, খয়রা ইত্যাদি জাতির অন্তর্গত লোক) পাথর কুঁদিয়া ⁻ শকার আলোখলা তৈয়ারী করে। বৃত্তের পরিধিকে বেষ্টন করিয়া চৌদ্দটি এবং কেন্দ্রে একটি দীপাধার থাকে।"[১১]

টুসু পূজাকে ব্রতপর্যায়ে ফেলা যায় কিনা, এ নিয়ে কেউ কেউ নঞর্থক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।[১২] অথচ পল্লব সেনগুপ্ত 'পূজা-পার্বণের উৎসকথা' গ্রন্থে ব্রত-সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্টতই বলেছেন, "ব্রত শব্দের প্রধান অর্থটি ইংরেজি করে বললে হয় 'ভাউ'। আকাঙ্ক্ষার পূরণ করতে গিয়ে বিশেষ কিছু আচার-বিধি বিশেষ কিছু সময় ধরে পালন করার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ব্রতের মূল কথাটি। জাদু-শক্তিতে বিশ্বাসের ও এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।"[১৩] টুসু গানেও কুমারী মনের কামনাবাসনা তথা আকাঙ্ক্ষা-পূরণের প্রার্থনা আছে।—

টুসালু গো রাই
তুমায় পূজে কী বর চাই?
রাজোশ্বর স্বামী চাই
সভাপণ্ডিত ভাই চাই
দরবার-শোভা ব্যাটা চাই সভা-আলো জামাই চাই

সিথায় সিঁদুর দপ্‌দপ্‌ করে
হাতের লুয়া ঝকমক করে
আল্‌নার কাপড় ঝলমল করে
গুয়ালে গরু মরাইয়ে ধান
এই যুবতী এ বর চান।

সুধীর কুমার করণের মতে, 'বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তোষ-তোষলা, তোষলা বা তুষু নামক ব্রতের প্রচলন আছে। পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে—দু' জায়গাতেই কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে।... তোষলা ব্রত উদ্‌যাপনের রীতি-পদ্ধতি মূলত মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রামের টুসু পূজারই অনুরূপ। বাঁকুড়া অঞ্চলে এই ব্রতেরই নাম তুষু।''[১৪]

টুসু পরবে 'বাঁউড়ি-বাঁধা-র সময় দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত বাঙলা এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী, মূলত কৃষিজীবী পরিবারের কিশোরী মেয়েরা কামনামিশ্রিত সুরে গায়—

টুসালু মায়ের কাছে চাইয়ে লিব বর।
ধনে পুতে ভরুক আমার ঘব।।
ভইর্‌ল রে ভইর্‌ল ই পোষ মাস।
আর ভইর্‌বেক গো উ পোষ মাস।।
পোষ মাসে পোষালু মাঘমাসে পিঠা।
দামুদর সিনাইতে মাথা হইল চিটা।।
বত্তিশ গাইয়ের ঘী-কলসী সরুচালের ভাত।
খুঁইজে খুঁইজে খাও টুসু সেই পোষ মাস।।

টুসুব্রতকারিণী কুমারী মেয়েরা মানসশুদ্ধির সঙ্গে ধানের তুষ দিয়ে অঘ্রান-সংক্রান্তিতে টুসুর 'আলোখলা' পাতে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে। কোন কোন জায়গায় ইতু-সংক্রান্তিতে ইতু-পূজার জল ও ফুল দিয়ে 'টুসু-পাতা' অর্থাৎ টুসুর প্রতিষ্ঠা হয়। টুসুখলায় থাকে কাড়ুলি বাছুরের পাঁচটি বা সাতটি কিংবা নয়টি বিজোড় সংখ্যার ছোট গোবরগুলি, দূর্বা, কড়ি, আলোচাল, সর্ষে-মূলো ফুল, গাঁদা-আকন্দ ফুল, সিঁদুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক উপচার। টুসুখলা ঘরের যে-কুলুঙ্গিতে বা উঠানের তুলসীতলায় পাতা হয়, সেই স্থানটিতে খড়িমাটির আলপনা দেওয়া হয়। আলপনায় লক্ষ্মীর পা, ধানের মরাই ইত্যাদি এঁকে মাঙ্গলিক অলংকরণ করা হয়। এ সমস্ত আচারবিধির মধ্যে জাদুশক্তির বিশ্বাস সংগুপ্ত।

তুঁষু বা তোষলা ব্রত সকালবেলায় মেয়েরা সুস্নান হয়ে করে—একথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অথচ টুসু সকালবেলার নয়, সন্ধ্যাবেলার ব্রত এবং সেখানে মেয়েদের পূজার অব্যবহিত পূর্বে স্নান-করার ব্যাপারও নেই। তা দেখে অনেকে টুসুপূজাকে তোষলা ব্রত থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত করেন। অনেকে আবার 'ব্রত' কথাটি টুসু-পূজার সঙ্গে সংযুক্ত করতে নারাজ। কিন্তু শস্যোৎসব টুসুদেবীর পূজার সকালবেলায় না হয়ে সন্ধ্যায়

অনুষ্ঠিত হলেই তা ব্রতের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত অর্থাৎ 'ব্রাত্য' হবে এমন ভাবা সঙ্গত নয়। কারণ, 'ত্রিসন্ধ্যা'-র যেকোন সময় ব্রত পালন করলেই হল। তাছাড়া টুসুব্রতকারিণী কুমারীরা সন্ধ্যায় স্নান না-করলেও 'মানসশুদ্ধি' ব্যাপারটি তাদের আচরণে ও গানে ফুটে ওঠে। হাত-পা ধুয়ে, সাধারণত কাচা কাপড়-জামা পরে, শুদ্ধ চিত্তে সন্ধ্যাদীপ দেয় গ্রামীণ জীবনে ধর্মশীলা কুলবধূ বা কিশোরী মেয়ে। সন্ধ্যাদীপ দেওয়ার পর ধান ঘরে লক্ষ্মী ঠাকুরের কাছে কুলুঙ্গিতে-রাখা টুসুখলাকে ভক্তিভরে নিকোনো উঠানে বা গৃহমধ্যস্থ পরিচ্ছন্ন জায়গায় শুদ্ধচিত্তে তারা রাখে। টুসুখলাব চারপাশে গোল হয়ে বসে টুসু-জাগানোর গান সমবেত কণ্ঠে গায়—

টুসু পূজার ক্ষণে।
সন্ধ্যাদেবী বন্দি গো মনে মনে।
লক্ষ্মীদেবী বন্দি গো শ্রীচরণে।।

পৌষের প্রতি সন্ধ্যায় টুসুখলার সামনে শুধু বন্দনা গান নয়, টুসুর 'শীতল' অর্থাৎ ভোগ নিবেদন করা হয়; এবং তা হল লৌকিক উপচার—হল্‌দে মুড়ি (বাঁকুড়ায় যাব নাম 'হলুদ কইড়্‌কইড়া') তিলপুর, চাঁছিপুব, নারকেলপুব। ফলত, টুসুকে 'ব্রত' না বলাব কোন কারণ নেই এবং টুসু ব্রতের উদ্‌যাপন হয় 'টুসু-জাগরণ'-এর পরদিন স্থানীয় নদী বা জলাশয়ে টুসু-ভাসানের মধ্য দিয়ে।

বাঁকুড়ার পোবকুল টুসুমেলায়, পুরুলিয়ার কাসাইব্রিজের নিচে টুসুমেলায়, দীগড়ি (গালুডি), জযদা (চাণ্ডিল), সতীঘাট (তোড়াং-মুরী) বা ধলভূমেব কোন কোন জাযগায় টুসু-ভাসানের সময় বা 'টুসু-জাগরণ'-এর রাতে কোন কোন যূথবদ্ধা নাবী যৌনচেতনা উদ্রেককারী অঙ্গভঙ্গী সহকারে যে-সব তথাকথিত অশ্লীল গান গায়, সে-সব গান শুনে অনেকেই টুসুগানকে 'টুসু-ব্রত' বলতে দ্বিধাবোধ করেন। কিন্তু টুসুগানে তীব্র যৌবন-মাদকতার চল্‌ সর্বত্র নেই। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সমাজের টুসু-করা মেয়েরা শুদ্ধাচারে এ ব্রত করে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকেই আরও বলছি—টুসুগান যতই পশ্চিমে অর্থাৎ পুরুলিয়া সংলগ্ন-ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছড়িয়েছে, আদিবাসী জীবনে ততই তার যৌবন উচ্ছলতা, কামমদির বিহ্বলতা বেড়েছে। তবে তার মধ্যেও যুক্তি আছে। এ প্রসঙ্গে বিনয় মাহাত বলেছেন, 'টুসু-বিসর্জনের প্রাক্কালে নাবীদেহ দৃশ্যমান করে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে অনেকেই অশ্লীল বলে ব্যাখা করে থাকেন। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। এই ধরনের নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে যৌনাচবণের অনুকবণ করে শস্যেব নবজন্মকে ত্বরান্বিত করাই মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সবদেশের আদিম মানুষের মধ্যেই শস্যের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যৌনক্রিয়ার অনুকৃতির একটি বিশেষ ভূমিকা আজও বিদ্যমান।'[১৬]

আসলে আমরা সব ব্রতকেই শাস্ত্রীয় বিধিনির্দিষ্ট রূপের বাঁধনে দেখতে চাই, এবং তার সামান্য ব্যত্যয় ঘটলে মনে সংশয় জাগে। এই সংশয়দীর্ণচেতনায় কোন লোক-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞও বলেন, "Some folk-lorists think the origin of tusu to be

a Hindu Brata originated from the Tus-Tusali of harvesting time, to celebrate the goddess of wealth. According to them a riligious observation of the Brahminical society entered this tribal zone when cultivation of soil become the main occupation replacing the hunting way of life. But, to-day, specially in West Bengal, Tus Tusli brata is not so much popular and many of the brata books enlist this name."[১৬] কিন্তু আমাদের খেয়াল থাকে না, "ব্রতের আদিধারা—যা উত্তরকালে শাস্ত্রবহির্ভূত ব্রতরূপে পরিচিত হয়েছে, তার মূল কথাই হল—চাই, দাও। অর্থাৎ পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হবার প্রত্যাশাই সেখানে নিয়ামক-মানসিকতা; পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় ব্রত বলে কথিত যেগুলি, অর্থাৎ পরবর্তীকালের সৃষ্টি, সেগুলির অভীপ্সিত হল পার্থিব বন্ধনসমূহ থেকে মুক্তি।"[১৭]

অঘ্রান সংক্রান্তিতে বাঁকুড়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু কৃষিজীবী পরিবারের মেয়েরা ইতু-ভাসানের জল ও ফুল নিয়ে টুসু-পাতে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে। 'ইতু' কথাটি এসেছে সূর্যের প্রতিশব্দ 'মিত্র' থেকে।[১৮] পয়লা মাঘ সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু। এ দিনটি পশ্চিম রাঢ় এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'এখ্য়ান যাত্রা'-র শুভদিনরূপে পালিত হয়। 'এখ্য়ান' শব্দটি সূর্যের 'অক্ষ অয়ন' কথা থেকে এসেছে। কৃষিভিত্তিক লোকায়ত জীবনে পয়লা মাঘ কৃষি-নববর্ষের প্রথম দিন হিসাবে এখনও এ অঞ্চলের বহু জায়গায় বিবেচিত হয়। কৃষি-নববর্ষসূচক ঐ দিনটিকে কৃষিজীবী মানুষ 'হালপুণ্যা' দিবস হিসাবে পালন করে। নতুন কৃষি বছরের সূচনার দিনে মাঠে হালচালনা করা হয়। বাঁধ্না-পরবের সময় যেসব লাঙল-জোয়াল ইত্যাদি কৃষিকার্যের উপকরণাদি ঘরের 'আড়াচে' বা মাচায় তুলে রাখা হয়েছিল, সেগুলি আবার কৃষিকর্ষণের কাজে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্র গুপ্তের সমকালীন পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া পাহাড়ে-উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের টুসুর আলোখলায় বৃত্তাকারে বসানো থাকে মাটিরই প্রদীপমালা। বিষ্ণুচক্রের মতই সূর্যের অক্ষ অয়ন—উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ন এবং দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণ পরিক্রমা। সূর্য শক্তির প্রতীক। তাঁর বরদাত্রী তথা কল্যাণময়ী শক্তি হলেন লক্ষ্মী-কৃষিলক্ষ্মী; কারণ, সূর্যতেজে ধরিত্রীর বুকে জন্মলাভ করে শস্যরাজি!

টুসুখলায় তুষ, দূর্বা, কড়ি, গোবরগুলি, আলোচাল, সর্ষে-মুলো ফুল ইত্যাদি ফুল দেওয়া হলেও গাঁদাফুল, বিশেষত চাপ-গাঁদাফুল দিয়ে আলোখলাটি সুচারুভাবে সাজানো হয়। প্রতিদিন না-হলেও এক-দু'দিন অন্তর ঐ ফুল পাল্টানো হয়। বাঁকুড়ায় ভাদু পূজায় দোপাটি ফুলের প্রাধান্য। তাই তার আঞ্চলিক নাম—ভাদু ফুল! টুসুপূজায় তেমনি চাপ-গাঁদাফুল। উজ্জ্বল কমলা-হলুদ রঙের সঙ্গে লক্ষ্মী দেবীপ্রতিমার রঙের মিল অনেকে খুঁজে পান। গ্রামে প্রতি ঘরে টুসু-পাতা হয় না, প্রতি পাড়ায় কোন নির্দিষ্ট ঘরে হয়। প্রতি সন্ধ্যায় কিশোরী মেয়েরা টুসুখলার কাছে গোল হয়ে বসে, শুদ্ধচিত্তে সমবেত কণ্ঠে প্রলম্বিত সুরে 'টুসু-জাগায়' অর্থাৎ টুসুর বন্দনাগীত গায়—

উঠ উঠ উঠ টুসু
তুমায় উঠ্ করাইতে আইসেছি।

আমরা যে-সব সঙ্গীসাথী
তুমাব পূজায় বইসেছি।।

টুসু মূলত কুমারী-কিশোরীদের উপস্যা দেবী। তবে তাদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে বিবাহিতা তরুণীরাও যোগ দেয়; কিন্তু বিধবা বা বৃদ্ধা নারীর এ উৎসবে যোগ দেওয়ার রীতি নেই। টুসু লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক হলেও তাঁর পূজার 'শীতল' বা 'ভোগ' হল 'কলাই-কইড়্কইড়া মুড়ি' অর্থাৎ ছোলাভাজা-কুসুমবীজ ভাজার সঙ্গে হলুদ মাখানো মুড়ি, তিলপুর, নারকেলপুর, চাঁছিপুর। কোন পরিবারে কেউ মারা গেলে সেই পরিবারে এমনকি আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তিলপুর সেই বছর টুসুপূজায় নিষিদ্ধ। তবে টুসু-পাতার সময় নারকেল-চাঁছি ইত্যাদি 'পুর' অধিকাংশ পবিবারে তৈরী হয় না। তবে পৌষ-সংক্রান্তির বেশ কয়েকদিন আগে তা করলেই চলে। কিন্তু মুড়ি-প্রিয় রাঢ় অঞ্চলের মূলত কৃষিজীবী পরিবারে সাধারণ মুড়িভাজার মতো 'কইড়্কইড়া-মুড়ি' ভাজার কোন অসুবিধা থাকে না।

বাঁকুড়ার জয়বেলিয়া ও বাইশগাঁর (বাইশ গ্রাম) ব্যাপ্ত পটভূমিকায় কৃষিভিত্তিক বর্ণহিন্দু অসংখ্য ক্ষত্রিয় পরিবারে টুসুর সজ্জিত আলোখলার মধ্যেই টুসুপূজা হয়; সেখানে মূর্তিপূজা বা টুসুর চৌডলের কোন চল্ নেই। অথচ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের টুসুর নবরত্ন-চৌদল বাদ্যগীত সহকারে পোকা বাঁধে বা লাল বাঁধে বিসর্জন করার রেওয়াজ আছে। বাঁকুড়ার একপ্রান্তে কাঁসাই তীরবর্তী পোরকুলের টুসুমেলা খুবই বিখ্যাত। সেখানে টুসুর আলোখলাব সঙ্গে চৌদলের ব্যবহার ছাড়াও টুসুমূর্তি নিয়ে আদিবাসী জীবনের রভস-উল্লাস তীব্রমাত্রায় ফুটে ওঠে। পুরুলিয়ার টুসুমেলায় চৌদল বা চৌডল ('চতুর্দোলা' শব্দজাত) রীতিমত আকর্ষণীয় ব্যাপার। তবে এখানে টুসু-মূর্তির তেমন চল্ নেই। অথচ হুগলির কানা নদীর তীরে টুসুমেলায় কিংবা দক্ষিণ বাঁকুড়ায় টুসুমূর্তি দেখা যায়। আবার ধলভূম এবং সুবর্ণরেখার তীরে পম্পুঘাট বা বাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে টুসুমূর্তির ছড়াছড়ি শুধু নয়, মূর্তিনির্মাণের রূপবৈচিত্র্যও দর্শনীয় ব্যাপার। সেখানে টুসু কোথাও লক্ষ্মীরূপা, আবাব কোথাও টুসু গঙ্গারূপিণী। মকরবাহনা গঙ্গাদেবীমূর্তির চালচিত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। জামশেদপুর, ঘাটশিলা অঞ্চলেও টুসুমূর্তির চল্। মূর্তি কিছুটা হলুদ রঙের। পদতলে পদ্মফুল বা ময়ূর কিংবা মকর। দেবীর অলংকার হার, চুড়ি, কানের দুল, তাবিজ। পরনে মাটির পাড়-দেওয়া বঙিন শাড়ি। হাতে ধানের শিষ কিংবা ফুল অথবা পাখি। বাঁকুড়ায় পোরকুলের মেলাতেও এরকম টুসুমূর্তি দেখা যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "কোনও কোনও অঞ্চলে (টুসুর) প্রতিমা-নির্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। মূর্তিটি বাহনহীনা, সাভরণা, গভীর হলুদ রং, উচ্চতা অনধিক একহাত। ইহার উপর ভাদুপ্রতিমার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।"[১১] ধলভূম-ঘাটশিলা, বিহারের জামশেদপুর, পম্পুঘাট প্রভৃতি বহু স্থানে সবাহনা টুসুমূর্তি দেখা যায় এবং প্রতিমার উচ্চতা অধিকাংশ জায়গায় চারফুট, পাঁচ ফুট এমনকি ছ' ফুটের মত। কিন্তু ভাদুমূর্তিব প্রভাব টুসুর ওপর আরোপিত হলে ভাদুর কিংবদন্তী দেশ কাশীপুর বা পুরুলিয়ায় আগে টুসুমূর্তির প্রচলন

হ্ত। অথচ বাস্তবে তা হয়নি। পুরুলিয়ায় টুসুমূর্তির চল্ এখনও লক্ষণীয়ভাবে চোখে পড়ে না। তাছাড়া ভাদুপূজা টুসুপূজার তুলনায় অর্বাচীনকালের। তাই টুসুর ওপর ভাদুর প্রভাব পড়েছে, এরকম মন্তব্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে টুসুর ওপর ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে; সেকারণে লক্ষ্মীদেবীর অনুরূপা হয়েছেন টুসুদেবী এবং কখনও তিনি ময়ূরবাহনা, কখনও তিনি মকরবাহনা গঙ্গাদেবীর অনুরূপা। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির বুঝি উগ্র ধারণায় ঘাটশিলার কৃষ্ণচন্দ্র রাউল টুসুদেবীর ধ্যানমন্ত্রও রচনা করেছেন—

(১) গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালংকারশোভিতাং।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং।।
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং শঙ্খ-পদ্ম-ধরাং শুভাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং ধ্যায়েৎ তুষলাং সর্বসিদ্ধিদাং।।

(২) আগচ্ছ দেবী তুষলে শুভদে সুরসুন্দরী।
পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য প্রতিষ্ঠস্ব সমাঙ্গনে।।
নমামি তুষলে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
তুষলে ত্বং জগন্মাতঃ ইষ্টসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে।।
অবশ্যি লোকজীবনে এই সংস্কৃত শ্লোকাদির চল্ নেই।

মকর-সংক্রান্তির প্রধানত তিনদিন আগে থেকে শুরু হয় টুসুপরব বা মকরপরব। 'আঁউড়ি'-দিনে লক্ষ্মীদেবীকে আবাহন করা হয়। 'চাঁউড়ি'-দিনে তিনি চাহেন অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি করেন; আর 'বাঁউড়ি'-দিনে তিনি গৃহবন্দিনী হন। সেদিন কারো অভাব থাকে না।

মকর-সংক্রান্তির আগের দিন 'বাঁউড়ি'। সম্ভবত সংস্কৃত 'বন্ধনী' শব্দ থেকে 'বাওনি' বা 'বাঁউড়ি' কথা এসেছে। এখানেও সূক্ষ্মভাবে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির অনুশাসন। 'বাউড়ি' কৃষিকর্মের হাল-হাতিয়ার ঠিক করা, 'বাঁউড়ি-বাঁধা'-র দিন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থাদিতে 'বাউড়ি-বাঁধা' বলেছেন! তা উচ্চারণে এবং লিখিত বানানে প্রমাদদোষ দুষ্ট। কারণ, 'বাউরি' আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষ—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বাঁউড়ি'-র আগের দিন 'চাঁউড়ি'। চাল-কুটা বা গুঁড়ি-কুটার দিন। বাঁউড়ি-দিনে পিঠেপুলি তৈরী হয়। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরবর্তী ভূতেশ্বর গ্রামের ব্রাহ্মণরা বাঁউড়ির ভোরে পিঠে-পায়েস করেন। তা সবই লক্ষ্মীদেবীর 'ভোগ' বা 'শীতল'। চট্টোপাধ্যায়-বন্দ্যোপাধ্যায়-চক্রবর্তী-গোস্বামী উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ ঐদিন বিশেষ প্রীতির সম্পর্কযুক্ত গ্রামের সিংহ উপাধিধারী ক্ষত্রিয়দের নিমন্ত্রণ করে লক্ষ্মীদেবীর 'ভোগ' খাওয়ান। সেই 'ভোগ'-এর সঙ্গে অবশ্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদিও থাকে।

'বাঁউড়ি'-র দিন উক্ত ভূতেশ্বর গ্রাম বা পাশাপাশি আরও ক্ষত্রিয় প্রধান গ্রাম—যা সমষ্টিগতভাবে 'জয়বেলিয়া' বা 'জয়বেইলা' নামে খ্যাত, সে-সব গ্রামেও পিঠে হয় না। সেদিন তাঁদের 'গুঁড়িকুটা'-র দিন। ঢেঁকিতে চাল-গুঁড়ি কুটে অর্থাৎ তৈরী করে, বাঁশের

তৈবী বড় ডালায় ন'টি খড়টুকরো দিয়ে প্রতি পরিবারের গৃহকর্ত্রী 'বাঁউড়ি-বাঁধা' সমাধা করেন। বাঁউড়ির রাতে শয্যাগ্রহণেব পূর্বে কৃষিজীবী পরিবারের বহু গৃহিণী আড়াইটি খড় দিয়ে চালেব হাঁড়ি, জলের কলসী, পানের ডাবর, এমনকি ধানের মরাইকেও মাঙ্গলিব ভাবনায় 'বাঁধেন'!

অথচ বাঁকুড়া জেলার 'বাইশ গ্রামের' (বাইশটি ক্ষত্রিয়প্রধান গ্রামযুক্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। গঙ্গাজলঘাটি থানা-সংলগ্ন চারপাশের অঞ্চল।) রণবহাল বা তার পাশাপাশি বহু গ্রামের ক্ষত্রিয় পবিবারে সেদিন পিঠে-গড়া হয়। 'বাঁউড়ি'-র সন্ধ্যায় বিষ্ণুপুর ও দ্বারকেশ্বর তীর সংলগ্ন গ্রামগুলিতেও পিঠে-গড়া হয়। প্রতিটি বর্ণহিন্দুপরিবার বাড়িব পিছন দিকে বাঘ রায়কে বারোটি পিঠে উৎসর্গ করে। ঐদিন সন্ধ্যায় বাগদী, মাঝি, খয়রা সম্প্রদায়ের মানুষ সর্ষেগাছেব নিচে ঘটস্থাপন করে এবং প্রদীপ জ্বেলে 'আঁধারা'-ব পূজা করে।

'বাঁউড়ি' র দিন ভূতেশ্বর গ্রামের ক্ষত্রিযবা যে-সব ব্রাহ্মণ-পরিবারে পিঠে পায়েস ইত্যাদি খাওয়ার আমন্ত্রণ পান, সেই আমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিদানে সেইসব পরিবারকে মকর-সংক্রান্তিব ভোরে 'মকর-চান' করার কিছুক্ষণ পর, শ্রদ্ধার্ঘাস্বরূপ 'সিদে' হিসেবে সেদ্ধ চাল, ডাল, নুন, নানাবিধ সব্জি ইত্যাদি দেন।

বাঁউড়ির রাতে বিছানায় শোবার আগে প্রান্তিক বাঙলার গ্রামীণ পরিবারের নরনারীশিশুরা পায়ের তলায় সর্ষের তেল মাখে। এই তেল-মাখার পিছনে একটি লোকবিশ্বাস ক্রিয়াশীল। লোকবিশ্বাস—তাতে কোন ভূতপ্রেত বা 'সাতবহনী' ছুঁতে পারে না; গায়ে ডাইনিদের কু-নজরও লাগে না। প্রসঙ্গত 'সাতবহনী'-র কাহিনীটি মজার। অপশক্তি সম্পন্ন সাতটি যূথবদ্ধ আত্মা; লোকবিশ্বাসে তারা সাতবোন। সেই 'সাত বহনী' নির্জন প্রান্তরে, গৃহস্থবাড়ির আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই তারা পুরুষ মানুষের ক্ষতি করে, প্রাণ শুঁষে নেয়। তাদের বিশেষ লক্ষ্য অবিবাহিত যুবক। নিজেদের এক্তিয়ারে পেলেই তারা একসঙ্গে সেই যুবককে ধরে নিয়ে যায় এবং মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে তাকে বিয়েব প্রস্তাব দেয়। মায়ায় ধৃত সেই যুবক তবু যদি তাদের কাউকে বিয়ে করতে অবাজি হয়, তবে তারা তাকে আটকে রাখে। আর যদি সেই যুবক সব থেকে ছোট বোনকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে প্রাণে মরে না। কারণ, সেই ছোট বোনের ওপরের ছয় বোন তাকে জামাই হিসেবে আদর করে। কিন্তু সেই উগ্র আদরের চোটে সেই যুবকের তখন ভিরমি-খাওয়া দুঃসহ অবস্থা! আবার যদি সেই যুবকটি ছোটবোন বাদে অন্য ছয় জনের মধ্যে যে-কোন একজনের মোহিনী মায়ায় প্রণয়-পক্ষপাত-দুষ্ট হয়, তবেও তার প্রাণঘাতী যোগ!

'বাঁউড়ি'-ব রাতে হয় 'টুসু-জাগরণ'। শীতের সন্ধ্যা থেকে সারা রাত ধরে চলে টুসুগান। কিশোরীরা সেই রাতে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে টুসু সাজায়। ফুলে ফুলময় পরিবেশ। মাঝে টুসুর আলোখলা। অনেক জায়গায় চৌডল শোভা পায়। সামনে হলুদ কইড়্কইড়া মুড়ি, নারকেল-তিল-চাঁছিপুর। অন্য কোন বাজারি মিষ্টির চল্ নেই।

এখন বহু গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে। তাই গ্রামীণ সান্ধ্য পরিবেশের আঁধারি-রহস্যময়তা উবে যাচ্ছে। অথচ বিশতিরিশ বছর আগেও সান্ধ্য অন্ধকারে লম্ফ বা হারিকেনের ক্ষীণ আলোয়, হাড়কাঁপানো কনকনে শীতে, বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া-রাজগ্রাম গোপীনাথপুরের তাঁতীদের বোনা সস্তা সুতি চাদর গায়ে দিয়ে, বালিকা-কিশোরীরা ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বসে, সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনার সুরে টুসুগান সাইত —

টুসু পূজার দিনে
যত দেবী সন্ধ্যা লাও তুষ্ট মনে।
শুভ্রকান্তি সরস্বতী গো প্রণমি মা চরণে
পদ্মাবতী সীতাদেবী বন্দি গো মনে মনে।।

টুসু-জাগবণের রাত বাড়তে থাকে। প্রতি পাড়ায় মেয়েরা নিজেদের টুসুর রূপবর্ণনা করে গান গায়—

আদাড়ে বাদাড়ে পদ্ম
পদ্ম বই আর ফুটে না।
আমাদের টুসুর পায়ে পদ্ম
ভমর বই আর বসে না।।

শুধু বন্দনা গান নয়, কামনা বাসনা-ঈর্ষা-অভিমান প্রভৃতি সাধারণ নারীসুলভ মনোভাবেরও প্রকাশ ঘটে টুসুগানে। শীতার্ত রাত্রির নিঝুম নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়ার মেয়েদের বেড়ে-ওঠা চিৎকৃত টুসুগানের চাপান-উতোরে। তবে এ দৃশ্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজেও নারী শিক্ষার বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বাড়ির অভিভাবকরা তাই পৌষের ফি সন্ধ্যায় মেয়েদের টুসুগান গাওয়ার চেয়ে পড়াশুনার দিকে জোর দেন। তবে এখনো শিক্ষার-পর্যাপ্ত-আলোকহীন কৃষিজীবী পরিবারে অথবা দিন-এনে-দিন-খাওয়া রিক্সাঅলা, বিড়িবাঁধা বা মাটি-কাটা-মজুর সমাজে কিংবা নিষিদ্ধ পল্লীতে অকৃত্রিমভাবে বেঁচে আছে এগান। তাই বাউরি, বাগদি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে কুঁদুলেপনা ও আদিরসের ছড়াছড়ি হয় জাগরণ-রাতে। বাঁকুড়ার পোরকুল, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল কিংবা বৃহত্তর পুরুলিয়ায় অর্থাৎ চাষ-চন্দনকিয়ারি, এমন কি ধানবাদের ঝরিয়া-কাতরাস, অন্যদিকে তোড়াং-মুরী, চান্ডিল বা ধলভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কূর্মী মাহাত বা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের নরনারীর কাছে টুসুগানের আবেদন সর্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন, 'টুসুগীত ঝাড়খণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক-উৎসব.... বাঙলার শারদোৎসবের প্রাণচাঞ্চল্যও এর কাছে ম্লান মনে হয়।''[২০] টুসু জাগরণের রাতে এইসব অঞ্চলের কৃষিজীবী তথা খেটে-খাওয়া দিনমজুর বাগাল-কামিন প্রভৃতি প্রাকৃত তরুণতরুণীর জীবনে সামাজিক অনুশাসন যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়; যৌবনের উদ্দাম রভস লীলায় তারা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—''বস্তুত, ঝাড়খণ্ডের প্রেম-ভাবনা মোটেই মানস-লোকের ব্যাপার নয়, বরং বুভুক্ষু শরীরের তৃপ্তি-সাধনের মধ্য দিয়েই প্রেম এখানে পূর্ণতা এবং পরিণতি লাভ করে। দেহকে বিশ্লিষ্ট করে বিদেহী প্রেমের কথা ঝাড়খণ্ডী সমাজজীবনে

কল্পনা করা যায় না। দেহকে আশ্রয় করেই এখানে যুবকযুবতীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে; দেহকে আশ্রয় করেই তাদের চিত্তলোকে গভীর প্রেমবোধ জন্মলাভ করে। শারীর প্রেমের তপ্ত বাসনামথিত প্রকাশ টুসুগীতের রঙে সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়।''[২১]

টুসু-জাগরণের রাতে বাঁকুড়ার বহু গ্রামের কিশোররা 'মকর-কুঁইড়ার জাগরণ' করে। তারা নিজেদের চাঁদা-দেওয়া পয়সায় নিজেদেরই বানানো চা-তেলেভাজা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাতের অন্ধকারে ধারালো কাটারি দিয়ে বাঁশচুরি, বড় বড় গাছের ডাল চুরির দুঃসাহসিক অভিযান চালায়। সেই নৈশ অভিযানে তাদের ক্ষিপ্র হাতে শাণিত কাটারির দুর্দান্ত প্রয়োগ যেন পেশাদার ডোমদেরও হার মানায়! শুধুমাত্র ঐ রাত্রির জন্য এ জাতীয় চৌর্যবৃত্তি যেন সমাজ-সমর্থিত আনন্দময় ব্যাপার! শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের নৈশ অভিযানের মতো তারুণ্যের এক দুর্ময় উল্লাস যেন সেই রাতে জেগে ওঠে সীমান্ত বাঙ্লার বহু স্থানে। চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত বাঁশ ও গাছের ডাল পরদিন নিলামে বিক্রি করে, তার টাকায় সময় সুযোগ মতো হয় তরুণদের বনভোজন!

মকর-সংক্রান্তির ভোরে টুসু-জাগরণ-ক্লান্ত তরুণীরা ভাঙা গলায় টুসু গাইতে গাইতে টুসু-খলাকে স্থানীয় নদী বা জলাশয়ের দিকে নিয়ে যায়। অনেকে টুসু-সরাকে 'চৌদল'-এ বসিয়ে শোভা সহকারে গান গাইতে গাইতে যায়। 'চতুর্দোলা' শব্দজাত 'চৌদল' বা 'চৌডল'-এর ব্যবহার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পোরকুল, বৃহত্তর পুরুলিয়া, টাটা, ঘাটশিলা, রাঁচি, হাজারিবাগের পম্পুঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে যে-রকম ব্যাপকতা লাভ করেছে, সদর বাঁকুড়ার জয়বেলিয়া কিংবা গঙ্গাজলঘাটি সংলগ্ন বাইশগাঁ অথবা পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে সে তুলনায় কমই মনে হয়। রঙিন, নয়নরম্য চৌডল দু-আড়াইফুট থেকে ছ' আটফুট উঁচু হয়। বাঁশের ফ্রেমের ওপর রঙিন কাগজের অলংকরণযুক্ত ক্ষুদ্র রথাকৃতি এই চৌডলে টুসু-বিসর্জনের দৃশ্য দেখে কারো কারো মনে মুসলমানদের পরবে তাজিয়ার ছবি অনুষঙ্গভাবনায় জেগে উঠতে পারে। তাই টুসুকে 'শস্যের মরণোৎসব'' বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন।[২২] অবশ্যি এ মৃত্যুচেতনা নঞর্থক নয়, এর মধ্য দিয়ে উর্বরতাবাদ তথা জায়মান চেতনার ইঙ্গিত-ও স্পষ্ট!

বঙ্গের সজলমায়া রুক্ষ বন্ধুর রাঢ় অঞ্চলে না-থাকলেও রাঢ় এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলও নদীমাতৃক। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়—'নদীজপমালাধৃত-প্রান্তর''! তাই গন্ধেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, কুমারী, কাঁসাই, শালী, শিলাই, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীতীর মকর-সংক্রান্তির ভোরে অসংখ্য নরনারীর প্রাণস্পন্দনে মহামিলনমেলা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়।''[২৩] মকর-সংক্রান্তির দিন বাঁকুড়ার পোরকুলের টুসুমেলা, পুরুলিয়া শহর-সংলগ্ন কাঁসাইয়ের টুসুমেলা, জয়দা (চাণ্ডিল), সতীঘাট (তোড়াং), দীগড়ির (গালুডি) টুসুমেলা, পম্পুঘাট, কানাস, রাজরাপ্পার টুসুমেলা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশ

থেকে বিচিত্র মানসিকতার নরনারী টুসুমেলার আকর্ষণে একত্রে মিলিত হয়—তার মূল্যায়ন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে বহু বছর আগে এ-সম্পর্কে বলেছেন, "বাঙলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানাস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না-হইয়া থাকে — প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।"[২৪] প্রতিটি মেলায় অসংখ্য কিশোরী তরুণের সঙ্গে শিশুবৃদ্ধবৃদ্ধার বিরোধাভাসে গুঞ্জরিত হয় অশ্রুসজল একটি সুর—

মনের এই বাসনা—
টুসুধনকে জলে লেইগ্‌ব না।

টুসুভাসানের পর মকর-স্নান। স্থানীয় ভাষায়—'মকর-চান'। তাতে নাকি গঙ্গাস্নানের মতো পুণ্য হয়। 'মকর-চান'-এর পর নতুন জামাকাপড় পরার নিয়ম। এই রীতি বা সংস্কার টুকু মান্য করার জন্যই, আর্থিক অসঙ্গতি থাকলেও অনেকে ঋণ করেও নতুন জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করে। স্থানীয় কথায় আছে—মানুষ ঢেঁকি বন্ধক দিয়েও 'লইতন' কাপড় পরে। বাঙলার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। আর পৌষমাসে প্রত্যেকের ঘরে ধান অর্থাৎ 'মা লক্ষ্মী' আসেন। মুনিস-কামিন-বাগাল—ভাতুয়ারা তখন ধান পায় 'বেরুন' হিসেবে। তাই টুসুপরবে সকলেই 'লইতন টেনা' অঙ্গে দেয়—এই লোক-সংস্কার।

মকর-চানের পর নতুন জামা কাপড় পরে, নদীর বালিতে বা তীরে বসে বহু আদিবাসী নরনারী ঘর থেকে আনা পৌষপিঠে খায়—যায় আঞ্চলিক নাম 'গড়্‌গইড়া' পিঠা। সেইসঙ্গে থাকে স্থানীয় টুসুমেলায় কেনা জিলিপি, মিঠাই, চপ, সিঙাড়া ইত্যাদি খাবার।

বাঁকুড়া বা অন্যত্র বর্ণহিন্দু সমাজে টুসুমেলায় বসে পিঠে-খাওয়া দৃশ্য বড় একটা চোখে পড়ে না। বাঁকুড়ায় গন্ধেশ্বরী নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে বা অন্যত্র অনেক জায়গায় দেখা যায় 'মকর-চান'-এর পরই গোল আকৃতি বিশিষ্ট 'খড় পালই'-এর আদলে বাঁশ, গাছের কাটা ডাল, শুকনো তাল-খেজুরপাতা দিয়ে বানানো 'মকর-কুঁইড়া'-য় অগ্নি সংযোগ করে পরম উৎসাহে আগুন পোহানো। পাহাড়সমান, দাবানলের মতো সেই বহ্ন্যুৎসবে মকর-চান-করা নরনারীশিশুরা শীতার্ত শরীরে উত্তাপ নেয়। তবে পুরুলিয়া বা বিহারে এর তেমন প্রচলন নেই। এই সব জায়গায় সেদিন ভোর থেকে দুপুর অবধি তরুণ-তরুণীদের বিলোল, উদ্দাম যৌনগন্ধী নৃত্যগীত হয়। বহু যুবক ভাড়া-করা মাইক রিক্সায় বেঁধে টুসুগান বা ঝুমুর গান গায়। রুচিমান্, বিশেষত রাবীন্দ্রিক চেতনা-নিষ্ণাত নরনারীর কাছে এই সব প্রাকৃত নৃত্য গীত স্থূল-কদর্য মনে হতে পারে; কিন্তু "সবচেয়ে বড়ো কথা, এগানের মধ্যে পল্লী-হৃদয়ের কাব্য আছে। পশ্চিম প্রান্তিক রাঢ়ভূমির মতো এই গান। ঝর্ণাধারার মতো সহজ, স্বচ্ছ এর সুর। ঝর্ণার মতো চঞ্চল আর অনাবৃত এর গতি। এর ভাষায় পাহাড় বনের আদিমতা; পলাশ ফুলের মাধুর্য এর প্রকাশে; শালবনের

ঘন জমাট নিবিড় ভাব এর কথায়। আর আছে পাথরের কুচির মতো, লাল রঙের কাঁকরের মতো প্রকাশভঙ্গী—যা আঘাত দেয় রুচিমান্দের। এ গান সম্পূর্ণ-রূপে প্রান্তভূমির মাটির গান: মাটির একান্ত কাছাকাছি আছে যে মানুষগুলি, তাদের গান।"[২৭]

বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে কংসাবতী তীরে পোরকুলের টুসুমেলায় আরেক প্রাণবন্ত যৌবন চাঞ্চল্য ফুটে ওঠে। পুরুষরা ধামসা, মাদল, ফ্লুট বাঁশি, ঢোল-করতাল নিয়ে উদ্দাম নৃত্যগীত করে। মহুয়া পান ক'রে অনেকেই আদিম হয়ে ওঠে। শহুরে বাবুদের অনেকের কাছেই যৌবন লীলার পীঠস্থান পোরকুল রীতিমতো আকর্ষণীয়। দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ডিহরের টুসুমেলাতেও যৌবন উদ্দামতা চোখে পড়ে।

বাঁকুড়ায় ওন্দা অঞ্চলের তাম্বুলী সম্প্রদায় 'মকর চান'-এর পর নতুন জামা কাপড় পরে 'মকর-বাঁধা'-পর্ব সমাধা করেন। বাড়ির গৃহকর্তা বা উপযুক্ত বড় ছেলে ঘরের ভেতর চালগুঁড়ি দিয়ে 'কুবের' এঁকে, তার ওপর নতুন ধানের খড় টুকরো ছড়িয়ে দেয়। তখন গাওয়া হয়—

এস মকর, যেওনা—
জনম জনম ছেড়ো না।

মকরের আরেকটি প্রিয় অনুষ্ঠান হল—'মকর-পাতানো' বা 'ফুল-পাতানো' বা 'সই-পাতানো'। একজন তরুণ আরেকজন তরুণের সঙ্গে, কিংবা একজন তরুণী আরেকজন তরুণীর সঙ্গে 'ফুল-পাতায়'। এই 'ফুল-পাতানো' অনুষ্ঠানটির মধ্যে এই জাতপাতের দেশে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে। কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ছেলে বা মেয়ে সদ্গোপ, মাহাত, তেলী, তাম্বুলি, ডোম, বাউরি সম্প্রদায়ের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে 'ফুল-পাতায়' এবং সেই সহজ গভীর সখ্য আজীবন রক্ষা করে। সমাজ জীবনের দুর্গমতায়, নানা সম্পদে বা বিপদের দিনে 'ফুল' নামক নারী বা পুরুষ একে অপরের কাছে আত্মীয় স্বজনের মতই কিংবা তারও বেশি আত্মীয়তর হয়ে থাকে। পুরুলিয়ার বাউরি সম্প্রদায়ের কিশোররা মাহাত-রাজোয়াড়, এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ের কিশোরের সঙ্গে এবং কিশোরীরা তেমনি ভিন্‌জাতের কিশোরীদের সঙ্গে 'ফুল-পাতায়'। বর্ণবৈষম্যের অবসানে ও জাতীয়সংহতি আনয়নে এই 'ফুল-পাতানো' নামক লৌকিক অনুষ্ঠান আশার আলো সঞ্চার করে। টুসু গানেও 'ফুল-পাতানো'-র কথা ধরা পড়ে—

ওমা আমি ফুল-পাতাব
ফুলকে আমি কী দুব।
বাজার যাব পয়সা পাব
ফুলকে ফুলং তেল দুব।

কিংবা,

আমার টুসু ফুল কইরেছে
ঝাড়গাঁ গড়ের রানীকে।

মনে মনে চিঠি ছাড়ে
গলাপ ফুলের ভিতরে।।

'ফুল-পাতানো' অনুষ্ঠানটি মকর-সংক্রান্তির দিনে সর্বত্র হয় না। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে—পুরুলিয়া ২নং ব্লকের অন্তর্গত বোঙাবাড়ি, পোদলাড়া, দুমদুমি, চুনারডি, বাগড়া, বাঁধগড়, জাল্‌কা, গোলামারা, ছড়বা, দক্ষিণ-বহাল প্রভৃতি গ্রামের বহু মাহাত বা বাউরি সম্প্রদায়ের তরুণতরুণী মকর-সংক্রান্তির দু'দিন পর তিন দিনের বিকেলে দক্ষিণবহাল গ্রাম প্রান্তে এক অভিনব টুসুমেলায় মিলিত হয়। তাদের হাতে থাকে টুসুর চৌডল, মুখে টুসুগান। মকর-সংক্রান্তির দিন তারা অনেকেই কাঁসাইয়ের মেলায় তাদের চৌডলগুলি না-ভাসিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিল, সেইসব চৌডল দক্ষিণবহালের মেলা-ফেরত হয়ে আবার তাদের অনেকের বাড়িতেই ফিরে যায়। তারা সেগুলি যত্ন সহকারে সারা বছর ঘরে রাখে। পরের বছর সেই চৌডলের বাঁশের ফ্রেমে নতুন রঙিন কাগজ লাগিয়ে চৌডলের নব কলেবব সৃষ্টি করে।

দক্ষিণবহালের টুসুমেলায় বাউরি তরুণ-তরুণীবা 'ফুল-পাতায়' মাহাত-রাজোয়াড় এমন কি মুসলমান সম্প্রদাযের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে। স্বজাতিতে যেমন সচরাচব 'ফুল-পাতানো' হয় না, তেমনি কোন তরুণের সঙ্গে তরুণীর কিংবা তরুণীর সঙ্গে তরুণেব 'ফুল-পাতানো'-ও চলে না।

মকর-সংক্রান্তির দুপুরে বাঁকুড়ার বহু ক্ষত্রিয় পরিবারে ভাতের পরিবর্তে খিচুড়ি খাওয়ার নিয়ম। গরম খিচুড়ির সঙ্গে থাকে নানা রকম সব্‌জি, ফুলবড়ি ভাজা এবং গাওয়া অথবা মইষা ঘি। তার সঙ্গে মাছ-মাংস-ডিম প্রভৃতি আমিষ খাওয়ার চল্ নেই। প্রতিটি ক্ষত্রিয় পরিবারের গৃহকর্ত্রী স্বামী-পুত্র কন্যাদের সযত্নে খাবার পরিবেশন করার পর নিজে খেতে বসেন। খাওয়া দাওযাব পর শুদ্ধাচারে অর্থাৎ পরিধেয় কাপড় ছেড়ে, কাচা কাপড় পরে বেলা আড়াইটা-তিনটা নাগাদ উনুনশালে যান।

পোড়ামাটির, বড় ভাতের হাঁড়ির মতো একটি নতুন মাটির হাঁড়ি উনুনে তিনি চাপান। তাতে থাকে প্রায় অর্ধেক-হাঁড়ি জল। সেই বড় হাঁড়ির মুখে চাপান থাকে—কেজি দুই-তিন জল ধরবে এমন একটি ছোট আকারের পোড়া মাটির ভাঁড়। তার নাম 'পুনি হাঁড়ি' বা 'পুনি ভাঁড।' সেই পুনি হাঁড়ির তলায় পাঁচটি বা সাতটি কিংবা ন'টি গোলাকৃতি ছোট্ট ফুটো করা হয়। শুদ্ধাচারে সেই হাঁড়িতে দুটি ইঞ্চি দেড়েক লম্বা শালকাঠি (দাঁতন কাঠির মতো সরু) যুক্তচিহ্ন (ক্রস চিহ্ন) করে সুতোয় বেঁধে দেওয়া হয়। তারপব সেই পুনি হাঁড়িতে দেওয়া হয় হাতে-গড়া কাঁচা পিঠে — যার আঞ্চলিক নাম 'গড়্গইড়া পিঠা'। পুনি হাঁড়ির মুখ উপযুক্ত মাটির সরা দিয়ে খাপে খাপে ঢেকে দেওয়া হয়। আর বড় হাঁড়ির সঙ্গে ছিদ্রযুক্ত পুনি হাঁড়িটি যেন ঠিকমত খাপে খাপে বসে, তার জন্য দুটি হাঁড়ির সংযোগ স্থলের চারপাশ চাল গুঁড়ির আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয। এরূপ করার উদ্দেশ্য হল, বড় হাঁড়ির ফুটন্ত জল থেকে উদগত গরম বাষ্প মুখের হাঁড়িব ফাঁক দিয়ে যেন কোনক্রমেই বেরুতে না পারে। সেই বড় হাঁড়ির গরম বাষ্পে

'পুনি হাঁড়ি' বা 'পুনি ভাঁড়'-এর ভেতর দেওয়া হাতে-গড়া কাঁচা পিঠে ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ হয়। অভিজ্ঞ গৃহিণী ঠিক সময় 'পুনি হাঁড়ি' থেকে সুসিদ্ধ পিঠে পাত্রে ঢেলে রাখেন। কিস্তিতে কিস্তিতে রাশি রাশি পিঠে হয়। বড় হাঁড়ির জল কমে গেছে বোধ হলে, গৃহকর্ত্রী ঠাণ্ডা জল ঘটি থেকে ঢেলে দেন। ঘটি থেকে জল ঢালার সময় সুরেলা ভঙ্গিতে শুদ্ধচিত্তে বলেন—'খল্ খল্ পিঠা, তেল তেল পিঠা।' এরকম বললে পিঠে খুব ভালো হবে—এ তাঁদের লোকবিশ্বাস।

মকর-সংক্রান্তির দিনে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া এবং সীমান্ত বাঙলার আরও অনেক অঞ্চলে ধর্মঠাকুর, মাদানসিনি, বড়ামসিনি, কুদ্রাসিনি প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয়। বাঁকুড়ার ইন্দাসে বাঁকুড়া রায় নামে ধর্মঠাকুর আছেন। সূত্রধর বংশীয় গ্রাম্য পুরোহিত তাঁর শিলা গাত্রে অস্পষ্ট রেখার মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতারের রূপব্যাখ্যা করেন। ইন্দাস থানার মঙ্গলপুর গ্রামের কূর্মাকৃতি ধর্মরাজ 'রূপনারায়ণ' নামে পূজিত। তাঁতী সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক পুরোহিতের বাড়িতে তাঁব অবস্থান। গাবপুর গ্রামের 'স্বরূপ নারায়ণ'- ও কূর্মাকৃতি। কোতুলপুরের কাছে সিয়াস গ্রামে নাপিত বাড়িতে পূজা পাচ্ছেন 'বংশী ধর' ও 'কালাচাঁদ' ঠাকুর। আবার শলদা গ্রামের ডোমদীঘির পাড়ে ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ ও গন্ধেশ্বর শিবলিঙ্গের সন্নিকটে ডোমপাড়ায় 'শঙ্খাসুর' নামে ধর্মশিলা আছেন। এই সব ধর্মঠাকুরের পূজা মকর-সংক্রান্তির দিন ঘটা করে হয়ে থাকে।

বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ডিহর গ্রামের ষাঁড়েশ্বর শিব বিখ্যাত। ঐ গ্রামের দক্ষিণে বহু পুরাতন এক বটগাছের তলায় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী আছেন। মকর-সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে যথোচিত মর্যাদায় তাঁর পূজা হয়।

পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে একদা বৌদ্ধতান্ত্রিক মতবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। বৌদ্ধ 'মহাযান' শব্দটির অপভ্রংশে 'মাদান' হয়েছে। বাঁকুড়ায় 'মাদান ঠাকুর' নামে অনেক দেবতা গ্রামে গঞ্জে আজও পূজা পাচ্ছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধারমণীগণ পরবর্তীকালে 'সিনিঠাকুর' হয়েছেন।[১৬] শলদা-ময়নাপুর অঞ্চলের বহু গ্রামে খাঁদাইসিনি, নেকড়াসিনি, চুয়াসিনি, সিমুলাসিনি প্রভৃতি গ্রাম দেবীর পূজা মকর-সংক্রান্তি কিংবা পয়লা মাঘ 'এখ্য়ান যাত্রা'-র দিনে হয়। এইসব গ্রামদেবীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 'জাতাল' বা খিচুড়িভোগ নিবেদন করা হয়।

বাঁকুড়ার ওন্দা থানার বহুগ্রামে মাদানসিনি, কুদ্রাসিনি, ঝাঁটবনসিনি, বড়ামসিনি, বড়পুকুরসিনি, কুচিলসিনি প্রভৃতি গ্রামদেবীর পূজা এ সময় হয়। বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের দশাভুজা দেবী সর্বমঙ্গলা আছেন। এখ্য়ান যাত্রার দিন এই দেবীর পূজা হয়।

মকর সংক্রান্তির দিন রাঢ়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হাতে পূজা পান বড়াম, ক্ষেত্রপাল, কুদ্রা প্রভৃতি 'গেরাম দেবতা' অর্থাৎ গ্রাম দেবতা। তাঁদের 'থানে' নিবেদন করা হয় পোড়ামাটির হাতিঘোড়া এবং 'মনুইভোগ'। বড়ামের হাতি ঘোড়ার সামনে অনেক সময় পাঁঠা ছাগল, এমনকি শূওর বলি দেওয়া হয়।

সাঁওতালগণ আমন ধান ঘরে তোলার কালে 'সোহ্‌রাই' পরব করে। মকর-সংক্রান্তির দিন তারা করে 'সংক্রান্ত' বা 'সাঁক্‌রাত' পূজা। বোঙা ও কুদ্রার সঙ্গে তারা পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পূজা দেয়।

বাঁকুড়ার খাতড়া-রাণীবাঁধ অঞ্চলের আরণ্যক পরিবেশে বন্য উপজাতি খেড়িয়া-সম্প্রদায়ের বাস। একদা তাদের 'born criminal' হিসাবে গণ্য করা হত, সেই বন্য উপজাতির সরলপ্রাণ নরনারীরাও মকর-সংক্রান্তির ভোরে স্থানীয় জলাশয়ে 'মকর-চান' করে।

অন্তটীকা

১। J.E. Harrison : The Ancient Art and Ritual, P-55.

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩দশ (পঃ বঙ্গ সরকার), ৭৭১ পাতা।

৩। বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার বহু গ্রামে হেমন্তের কোন এক বিশেষ সকালে, শুদ্ধাচারে, কাচা কাপড় (কিংবা পাটের কাপড়) পরে, গৃহকর্তা নিজের নির্দিষ্ট ধানক্ষেত থেকে আড়াই মুঠি শিষযুক্ত ধানগাছ, গোড়ার একটু উপরে কেটে, হলুদ কাপড়ে বেঁধে, পবিত্রতার গাম্ভীর্যে মাথায় তুলে বাড়ি নিয়ে আসেন। তাকে বলে 'মুঠ-আনা'। গৃহস্থ বাড়ির সদর দরজায় মেয়েরা শঙ্খধ্বনি ও জল ধারা সহকারে মা লক্ষ্মীকে বরণ করে নেয়। সেই ধানের চাল থেকে 'নবান্ন' হয়। সেই ধান থেকে চাল করার সময় ধানের তুষগুলি ফেলে দেওয়া হয় না। সেই তুষ দিয়ে অঘ্রান-সংক্রান্তিতে হয় টুসু-পাতা। টুসু-গানেও আছে—

লবান্নের ধান ভানি দিনক্ষ্যাণ কইরে।
তারই কুঁড়া রাইখ্‌লম্‌ টুসু মায়ের তরে।।

৪। সুধীরকুমার করণ ঃ সীমান্ত বাঙলার লোকযান ১৮৮ পাতা।

৫। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ঃ বাংলার লৌকিক দেবতা দে'জ ২য় সংস্করণ ১৯৮৭, ১৫৩ পাতা।

৬। Suhrid Kumar Bhowmik : Tusu Songs Bulletin of the Cultural Research Institute vol. X VI, P. 137.

৭। P. K Bhowmik : Tusu Festival in Midnapore Folk-Lore, 1965.

৮। সুহৃদকুমার ভৌমিক 'বিহারের টুসু উৎসব' প্রবন্ধ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত 'টুসুঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে' গ্রন্থ, পাতা-৩৭।

৯। দীনেন্দ্রকুমার সরকার ঃ প্রাগুক্ত সংকলন গ্রন্থ, ২৮-২৯ পাতা।

১০। Shyam Paramar : Folklore of Madhya Pradesh New Delhi, P 60.

১১। মানিকলাল সিংহ ঃ 'দক্ষিণ রাঢ়ের তুষুপর্বের ঐতিহাসিক ভূমিকা' প্রবন্ধ ২৬ জুন, ১৯৬৫ 'দেশ' পত্রিকা।

১২। রামশঙ্কর চৌধুরী ঃ ভাদু ও টুসু কথাশিল্প ২য় প্রকাশ (১৯৮১), ৪৩-৪৬ পাতা।

১৩। পল্লব সেনগুপ্ত ঃ পূজাপার্বণের উৎসকথা। পুস্তকবিপণি (১৯৮৪), ৪০ পাতা।

১৪। সুধীর কুমার করণ ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ১৮৭-১৮৮ পাতা।

তুষুব্রত প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন, 'প্রতিদিন পৌষমাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতেরবিধি এই ঃ অঘ্রানের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে, স্নান করে গোবরের ছ-বুড়ি ছ-গন্ডা অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশটি গুলি পাকিয়ে, কালো দাগশূন্য নতুন সরাতে আলোচালের তুষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে সর্ষে, শিম, মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সার মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বর করে তোলাব ব্রত।'

—বাংলার ব্রত।

১৫। বিনয় মাহাত ঃ লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ২৪৭-২৪৮ পাতা।

১৬। Suhrid Kr. Bhowmik · Tusu Songs. Bulletin of the Cultural Research Institute vol XVI, P 136-137

১৭। পল্লব সেনগুপ্ত ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৪০ পাতা।

১৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, ..(ইতু) 'শব্দটিকে অনেকেই 'মিত্র', অর্থাৎ সূর্য শব্দ হইতে জাত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা 'আদিত্য' শব্দ হইতে জাত। আদিত্য > আইত্ত > ইত্ত, ইত, ইতু'।

—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৪), ৫৮৩ পাতা।

১৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোক-সাহিত্য (৩য় খণ্ড) ক্যালকাটা বুক হাউস প্রথম সংস্করণ (১৯৬৫), ৮৯ পাতা।

২০। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত ঃ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ১৪৪ পাতা।

২১। তদেব ১৬৯ পাতা।

২২। তদেব ১৪৮ পাতা।

২৩। রবীন্দ্র- রচনাবলী (৩য় খণ্ড) বিশ্বভারতী ৫৩২ পাতা।
'আত্মশক্তি'-র 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ।

২৪। তদেব ৫৩৩ পাতা।

২৫। সুধীর কুমার করণ ঃ প্রাগুক্ত গ্রন্থ ১৯৭ পাতা।

২৬। মানিকলাল সিংহ ঃ রাঢ়ের মন্ত্রযান বিষ্ণুপুর (১৩৮৫), ১০৪ পাতা।

চতুর্থ অধ্যায়

টুসুর ঐতিহাসিক উৎসভূমি ঃ বাঁকুড়া

টুসু-উৎসবের ব্যাপ্তি দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত বাঙলার মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলীর কিছু অংশ, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের ধানবাদ, সাঁওতাল পরগনা, রাঁচি, হাজারিবাগ, সিংভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল; কিন্তু তার ক্রম-বিস্তারিত তরঙ্গের উৎসভূমি সম্পর্কে আমাদের এ যাবৎ সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি। অথচ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা যুক্ত হলে টুসুগানের উৎসভূমি প্রসঙ্গে প্রাচীন বাঁকুড়ার নাম অনিবার্যভাবে আসে; এবং তার সূত্র বাঁকুড়ার প্রচলিত একটি বিশিষ্ট টুসুগানে নিহিত। গানটি হল—

টুসালু গো রাই।
তুমার দৌলতে আমরা ছব্‌ড়ি পিঠা খাই।।
ছব্‌ড়ি লো লব্‌ড়ি গাঙ্‌ সিনানে যাই।
গাঙের জল রাঁধিবাড়ি মকরের জল খাই।।
চার মাস বর্ষা পোখন্না যাই।
পোখন্নাতে দেইখে আইলম্‌ দুয়ারে মরাই।।

উল্লিখিত টুসুগানটি শৈশব-কৈশোরের একাধিক টুসুপরবের সময় বাঁকুড়া জেলার ভূতেশ্বর, বিকনা, কাটনাড়, তিলাবেদ্যা প্রভৃতি জয়বেলিয়া এলাকার গ্রামগুলিতে কিংবা রণবহাল, গঙ্গাজলঘাটি, কাপিষ্টা প্রভৃতি বাইশগাঁ এলাকার গ্রামগুলিতে শুনেছি। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে লোক-সংস্কৃতি গবেষণার কাজে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে উক্ত টুসুগানের প্রচলন দেখেছি। পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা, মানবাজার, আড়শা, বাগমুণ্ডি অঞ্চলে প্রাগুক্ত টুসুগানটি প্রচলিত।[১] এ প্রসঙ্গে পুঞ্চার পাঁড়ই গ্রামের তৎকালীন প্রায় ষাট বছরের প্রবীণ বাসিন্দা অসিতবরণ সিংহের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার ১১.১১.৮৭ তারিখে গ্রহণ করি। অসিতবাবু সাহিত্যমনস্ক, সমাজসচেতন মানুষ। তিনি জানান—তাঁর স্ত্রী পুষ্পরানী সিংহও টুসুগানের ব্যাপারে আগ্রহী। তাঁরা দুজনেই উল্লিখিত টুসুগানটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্রসঙ্গত তিনি জানান—পুঞ্চার পাক্‌বিড়র‍্যা-বুধপুর-বারমেস্যা-বাঁধ্‌বহাল-বড়গাঁ-ন'পাড়া প্রভৃতি গ্রামে, মানবাজারের মধুপুর-ঝাড়্‌বাগদা-জবালা-বারী প্রভৃতি গ্রামে, বাগমুণ্ডির তুন্‌তুড়ি-সারেংডি-সুইসা প্রভৃতি গ্রামে এবং আড়শা থানার পল্‌পল্‌-চিটিডি-জীবনডি প্রভৃতি গ্রামে টুসুপরবের সময় ঐ বিশেষ গানটি তাঁরা অনেকেই শুনেছেন।

'পুরুলিয়া প্রভাকর' পত্রিকার বর্ষীয়ান সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দত্ত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে (২৩.৮.৮৭) জানান—তাঁদের তাম্বুলি সমাজেও উল্লিখিত টুসুগানটি প্রচলিত।

তিনি বাল্যকালে তাঁর ঠাকুমা ঁকিশোরী দত্ত এবং দিদিমা ঁরামেশ্বরী সেনের মুখে উক্ত টুসুগানটি শুনেছেন।

বাঁকুড়ায় বিশেষভাবে প্রচলিত উক্ত টুসুগানটিতে টুসুকে 'রাই' অর্থাৎ 'লক্ষ্মী' বলা হয়েছে। এই 'রাই' কথাটি 'রাধিকা' থেকে। [রাধিকা > রাহী > রাই।] 'রাধিকা' লক্ষ্মীদেবীরই ভিন্নরূপ। কৃষিলক্ষ্মীর কৃপায় 'ছবড়ি' [ছয় বুড়ি = ২০ x ৬ = ১২০] এবং 'লবড়ি' [নয় বুড়ি = ২০ x ৯ = ১৮০] — যার অর্থ প্রচুর সংখ্যায় পিঠে (গড়্‌গইড়া পিঠা) খাওয়ার সুযোগ হয়। সেকালে বুড়ি, পণ, কাহন ইত্যাদি ছিল পরিমাপের অঙ্ক। লোকায়ত জীবনে কৃষিকাজে তার চল্ এখনও আছে। তাছাড়া তিন, পাঁচ, সাত, ছয়, নয় ইত্যাদি সংখ্যাগুলি মানুষ হিসাব করার সময় সাবলীলভাবে ব্যবহার করে। তার মধ্যেও লোক-ভাবনা ক্রিয়াশীল।

বস্তুতপক্ষে, দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত বাঙলার মানুষ একদা রীতিমতো ভোজনরসিক ছিলেন। তাই 'অয়ঃপাতে পয়ঃপানম্' (লৌহপাত্রে জলপান) কথাটি এখনও মল্লভূম-মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত। শীতঋতুর দীর্ঘনিশাকালে সেকালের অনেক ভোজনরসিক 'পণ' হিসাবে (৮০টিতে এক পণ) পিঠে (গড়্‌গইড়া পিঠা) খেতে পারতেন। এখনও বহু গ্রামবৃদ্ধের মুখে 'পণদরুনে' (পণ হিসাবে) পিঠে-খাওয়ার সুখস্মৃতি বিস্ময় জাগায়। উক্ত টুসুগানটিতে পৌষালি দিনে পিঠে-খাওয়ার প্রাচুর্য সুখ এবং কৃষিকর্মে পর্জন্যদেবের কৃপাবর্ষণের কাল—বর্ষার স্মৃতিচিত্রের সঙ্গে মিশে যায় ধানের মরাইশোভিত পোখন্নার ঋদ্ধরূপ।

প্রাগুক্ত টুসুগানের শেষ দু'লাইনে 'পোখন্না' হল—উত্তর বাঁকুড়ার দামোদর নদ-সংলগ্ন একটি ঐতিহাসিক গ্রাম। মহারাজ চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুষ্কর্ণা > পোখন্না আজ ভ্রষ্টকীর্তি হয়েও সমৃদ্ধ অতীতের মৌনমুখর সাক্ষী। সেখানে খননকার্যে প্রাপ্ত পুরাকীর্তির কিছু নিদর্শনের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সূত্রটিও স্পষ্টতর হয়ে আছে শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে—

পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিঙ্ঘবর্মনঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ
চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।

লিপির হরফ খ্রিষ্টিয় চতুর্থশতকের ব্রাহ্মী, কিন্তু তার ভাষা সংস্কৃত। রাঢ়বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি। সেদিক থেকে বিচার করলে এই লিপির গুরুত্ব সমধিক। সুকুমার সেন বলেছেন, "পণ্ডিতেরা 'দোসগ্রেণ' ভুল পাঠ মনে করিয়া সংশোধন করিয়াছেন 'দাসাগ্রেণ'। সেই অনুসারে অর্থ করা হয়, 'পুষ্করণার রাজা মহারাজ সিংহবর্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি, চক্রস্বামীর অর্থাৎ বিষ্ণুর দাসমুখ্যের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।"[২]

শুশুনিয়া পাহাড় থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে বর্তমানে যে পখন্না গ্রাম [পুষ্কর্ণা > পোখর্ণা > পোখন্না > পখন্না], সে-সম্পর্কে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতার নাম সিংহবর্মা এবং তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।....... মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মালবদেশে, প্রাচীন দশপুরের (বর্তমান মন্দশোর) ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রবর্মার ভ্রাতার নাম নরবর্মা এবং তিনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, শুশুনিয়া পর্বতলিপির চন্দ্রবর্মা ও দিল্লীর লৌহস্তম্ভলিপির চন্দ্র একই ব্যক্তি; এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্মা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীকদেশ পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা নামক জনৈক আর্যাবর্ত-রাজকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিব ও শুশুনিয়া শিলালিপিব চন্দ্রবর্মা এবং দিল্লী স্তম্ভলিপির চন্দ্র যে অভিন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"[৩]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার "বাংলা দেশের ইতিহাস" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন, "বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুসুনিয়া নামক পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে পুষ্করণের অধিপতি সিংহবর্মা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। সুসুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে দামোদর নদের দক্ষিণতটে পোখর্না নামে একটি গ্রাম আছে। ... ইহাই সিংহবমা ও চন্দ্রবর্মার প্রাচীন রাজধানী পুষ্করণের ধ্বংসাবশেষ। ..... ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চন্দ্রবর্মকোট নামক একটি দুর্গ ছিল। যষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উল্লিখিত চন্দ্রবর্মার নাম অনুসারে এই দুর্গের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এই মত অনুসারে চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে সমুদয় রাজাকে পরাজিত করিয়া আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রবর্মা। খুব সম্ভব ইনিই পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মা এবং ইঁহাকে পরাজিত করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন।"[৪]

পুষ্কর্ণাধিপতি চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন—"The Susunia inscription also furnishes the earliest record of Vishnu worship in Bengal Chakraswamin (the wielder of the discus) is a well-known name of Vishnu and it is more than apparent that king Chandravarmana, who has been mentioned as the chief of the servants of Chakraswami, who a worshiper of Vishnu."[৫] তাঁর সময় থেকে বাঁকুড়া অঞ্চলে বিষ্ণুপূজার চল্ হয়েছিল। চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুষ্কর্ণার ভ্রষ্টকীর্তি অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে পাওয়া গেছে "প্রাক্-মৌর্য, মৌর্য ও শুঙ্গ-কুষাণকালের পোড়ামাটির মূর্তি ও উত্তর দেশীয় কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল (Northern Black Polished work)। এখানে সংগৃহীত মৌর্যযুগের একটি অনন্য

নারীমূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। অপরাপর কয়েকটি মূল্যবান পুরাবস্তু রক্ষিত আছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারীতে।”[৬]

বিষ্ণুপুর থানার দ্বারিকা গ্রামে ও দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী জয়পুর থানার বেশ কয়েকটি গ্রামে বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে গোকুলনগরের গোকুলচাঁদ মন্দিরের সুঠাম অনন্ত বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। বহুলাড়া, ডিহর, জয়কৃষ্ণপুর, শলদা কিংবা ছান্দার পরিমণ্ডলের পাঁচাল, ময়নামুনি প্রভৃতি গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত বিষ্ণু বাসুদেবমূর্তি প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাঁকুড়ার মন্দির’ নামক গ্রন্থে বলেছেন, “চন্দ্রবর্মার সময় থেকেই বিষ্ণুপূজার ক্ষেত্র বাঁকুড়া-অঞ্চলে তৈরী হয়েই ছিল। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মী সেন-রাজাদের কালেও বিষ্ণুবন্দনা কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। সেজন্য, সেন রাজত্বকালে বা কাছাকাছি সময়ে ধরাপাট যে বিষ্ণু (বাসুদেব) উপাসনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল এরকম অনুমান করাই সঙ্গত।”[৭]

প্রাচীন যুগের কৃষিভিত্তিক জীবনে পালনকর্তা বিষ্ণুর শক্তি হলেন লক্ষ্মী—তিনি শ্রীরূপা কৃষিলক্ষ্মী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, “শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ বা তাঁহার পূজার উল্লেখ প্রাচীনতর গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও মনে হয়, দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজার প্রচলন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইয়াছিল। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রী বা লক্ষ্মী এবং তাঁহার পূজার প্রাচীন যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, যদিও শক্তিরূপে বা পত্নীরূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত যুক্ত তবু এই বিষ্ণু-শক্তিরূপ বা বিষ্ণু-পত্নীরূপই তাঁহার মুখ্য পরিচয় নহে; তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিতা।”[৮]

চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন, ফলত তিনি গুপ্তযুগের সমকালীন নরপতি। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি ও দিল্লীর কুতবমিনারের কাছে মেহরৌলি লৌহস্তম্ভে তাঁর নাম পাওয়া যায়। সে-সময় বা তারও আগে কৃষিপ্রিয় মানুষ তাদের প্রধান ফসল ধান মাঠ থেকে তোলার কালে টুসু অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীরই বন্দনাগান গাইতেন। মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষিলক্ষ্মী টুসু-পূজার প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত বহন করে শুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্মা-শিলালিপির উর্ধ্বে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রটি। বিষ্ণুচক্রের কেন্দ্রে একটি দীপশিখার ব্যঞ্জনা; সেখান থেকে চক্রের পরিধি বিস্তৃত আটচল্লিশ রেখা (Spoke), বিষ্ণুচক্রের গায়ে শোভনভাবে অলংকৃত চোদ্দটি ফুলের পাপড়ি এবং চোদ্দটি দীপশিখা। এ প্রসঙ্গে রাঢ়-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মানিকলাল সিংহ বলেন, “চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুর উপাসক। চক্র বিষ্ণুর প্রতীক. .... এই বিষ্ণু পুষ্য—পৌষের রবি। এই পুষ্য বা বিষ্ণু চক্রাকার—চক্রাকারে তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পৃথিবীপালক অগ্নি-তাপ-শিখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দেবতার কল্যাণময়ী বরদাত্রী শক্তি হইলেন লক্ষ্মী বা রাই। কৃষিজাত রবিশস্য ধান্য, সরিষা, গুঞ্জা, তিল, রমাকলাই। পৌষমাসে ক্ষেতে সরিষা জন্মে—সরিষার নাম রাই। লক্ষ্মীর অপর নাম রাই। রমাকলাই এই মাসের উৎকৃষ্ট ফসল। পিঠে পার্বণে রমার পুর অপরিহার্য। কলাইয়ের নাম রমা—লক্ষ্মীর একটি নাম রমা। সমস্ত ঘিরিয়া পুষ্য বা বিষ্ণুর পূজা।

তাঁহারই শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীকে লইয়াই দক্ষিণরাঢ়ের তুষুপার্বণ। তুষুর আলোখলা চন্দ্রবর্মার বিষ্ণুচক্র অনুযায়ী গঠিত। বৃত্তাকারে চৌদ্দটি দীপশিখা চতুর্দশ তিথির প্রতীক এবং কেন্দ্রের বৃহৎ দীপশিখাটি পূর্ণিমার দ্যোতক। যেদিন পুষ্যার আদিতে মকর-সংক্রান্তি হইয়াছিল সেদিন পূর্ণিমা। চক্রে তাহাই উৎকীর্ণ হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের নিকট আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজগণের মতই চন্দ্রবর্মাও পরাজিত হইয়াছিলেন। শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত লিপি এবং দক্ষিণ রাঢ়ের তুষু আজিও চন্দ্রবর্মার স্মৃতি বহন করিতেছে।"[৯]

এখনও শুশুনিয়া অঞ্চলে পাথর-কাটা 'পাথুরিয়া' নামে পরিচিত বাউরি, বাগদি, খয়রা প্রভৃতি সম্প্রদায় পাথর-কুঁদে বৃত্তাকার টুসুর আলোখলা তৈরী করে এবং সেই আলোখলার চতুর্দিকে চোদ্দটি দীপশিখা উৎকীর্ণ থাকে।

পৌষমাসে টুসু পূজা ও পিঠে পরব সম্পর্কে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি বলেন, "পৌষ-সংক্রান্তিতে পৌষালি পার্বণ বা পিঠা পরব। কত কষ্টের, কত যত্নের ধান্য গৃহাগত হইয়াছে। যে ধান্য গৃহস্থকে সপরিবারে জীবিত রাখিবে, সে ধান্য আসিলে তাহার আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। লক্ষ্মীর আর্বিভাব হইয়াছে। তাঁহার পূজা চাই, তাঁহাকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। গৃহিণী ধানের মরাই, গোলা প্রভৃতি খড় দিয়া বাঁধেন, পেঁটরাও বাঁধেন। আর ছেলেরা বলিতে থাকে, 'আওনি, বাওনি, চাওনি। তিন দিন পিঠা খাও নি।।' লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন হইয়াছে; তিনি গৃহে চিরদিন থাকুন, এখন এই প্রার্থনা (চাহনি)। যে-সে পিঠা নয়, পুলি-পিঠা।। ..... এইরূপ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে আশ্‌কে (আশুকিয়া) পিঠা, আশু ধানের পিঠা। পূর্ববঙ্গে ইহার নাম চিতই পিঠা (সং চিতি=রাশি, স্তূপ)।"[১০]

শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্র সূর্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 'হিন্দু দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন, "বিষ্ণু যে সূর্য, সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। সূর্যই কালবিভাগ করেন, বর্ষ পূর্ণ করেন। ঋগ্বেদে সে কথা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে ঃ

চতুর্ভিঃ শাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্।।

[বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চতুর্ণবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্যতরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।]"[১১]—রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত।

'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থেও 'চতুর্ণবতি' কালচক্রের কথা আছে—"কালচক্র ৯০+৯০+৯০+৯০ দিবসে বিভক্ত। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই অয়ন ও দুই বিষুব দ্বারা কালচক্র বিভক্ত।"[১২]

এ দেশীয় মতে, সূর্যের উত্তর-দিক সম্বন্ধীয় গতি উত্তরায়ণ শুরু ৭ই পৌষ, ইংরেজি ২৩শে ডিসেম্বর। কিন্তু রাজা চন্দ্রবর্মার আমলে একটি বিশেষ বছরে পৌষ সংক্রান্তির

দিন মকরসংক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ ঘটেছিল। মানিকলাল সিংহ বলেন, "পৌষ সংক্রান্তি পৌষ মাসের শেষ দিন। মকর বা মকর সংক্রান্তি মকরক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ দিন। দুইটি পৃথক দিন একই দিনকে অবলম্বন করিয়াছে। মকরক্রান্তিতে সূর্যের সংক্রমণ হয় ২৩শে ডিসেম্বর—তাহার পরদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ—বড়দিন আরম্ভ। পৌষ সংক্রান্তি জানুয়ারি মাসের ১৪ই হইয়াছে। দুই ক্রান্তির ব্যবধান ২৩ দিন। তুষুর ভেলা যেদিন দক্ষিণরাঢ়ে প্রথম ভাসিয়াছিল সেদিন পৌষসংক্রান্তিতে মকরসংক্রান্তি হইয়াছিল। .... সেই বৎসর ২৪১ শক ৩১৯ খ্রিঃ অব্দ। খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতকের প্রথম পাদ। দক্ষিণ রাঢ়ে তখন সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার রাজত্বকাল।"[১৩]

মানিকবাবুর এরূপ সৌর ভাবনার উৎসে আছেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি বলেছেন, "ষোলশত বৎসর পূর্বে পৌষ-সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ...... সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। সূর্যের প্রকাশকালে নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। . . নক্ষত্র স্থির। যেটা যেখানে আছে, সেটা সেখানেই আছে। এই কারণে মাস ও বর্ষচক্রের এক-এক নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু অয়নাদি বিন্দু স্থির নাই, অল্পে অল্পে পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যাইতেছে। ফলে মনে হয়, মাস অগ্রগত হইতেছে। অয়নের সহিত ঋতু পিছাইতেছে, কিঞ্চিদাধিক দুই সহস্র বৎসরে একমাস পিছাইতেছে। ইয়োরোপের মাস অয়নের সহিত বাঁধা, ঋতুও বাঁধা। ২২শে ডিসেম্বর উত্তরায়ণ আরম্ভ চিরদিন হইতেছে। কিন্তু আমাদের পাঁজিতে ৩১৯ খ্রিষ্টাব্দে পৌষ সংক্রান্তি হইত, এখন ৭ই পৌষ হইতেছে।"[১৪]

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষ কৃষিকর্ম করছে। তাই শস্যোৎপাদনের সঙ্গে ব্রতভাবনা জড়িত—"ঋতু বিপর্যয়ের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত— সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরানো, বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও—পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"[১৫] কৃষিকর্মের সঙ্গে তাই উৎসবও জড়িত থাকে। রাজর্ষি অশোকের আমলেও (খ্রি. পূ. ২৭৩-২৩৬) পৌষালি উৎসব হতো। ডঃ সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "তোসলা বা পোসলা পরব এ দেশের খুব প্রাচীন প্রথা, অশোকের কলিঙ্গ অনুশাসনে ইহার ইঙ্গিত আছে। অশোক বলিয়াছেন, 'আমার এই নীতি-অনুশাসন যেন প্রজারা তিষ্য নক্ষত্রে (অর্থাৎ পৌষালি উৎসবের সময়) শোনে এবং অন্য সময়েও ইচ্ছামত শুনিতে পারে।"[১৬] কিন্তু সেই শস্যোৎসব কোথায় কিভাবে পালিত হতো, তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখা পাওয়া যায় না। অথচ শুশুনিয়া শিলালিপি ও বিষ্ণুচক্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় টুসুগানের দেশ হিসাবে বাঁকুড়া চিহ্নিত। প্রচলিত বিশিষ্ট টুসুগানেও দামোদর নদ-তীরবর্তী পোখন্নার উল্লেখ আছে; তা থেকে চতুর্থ শতাব্দীর ধনৈশ্বর্যময়ী বাঁকুড়ার কথা ('পোখন্নাতে দেখে আইলম্ দুয়ারে মরাই') জানা যায়। এই টুসুগানটি লোকমুখ পরম্পরায় ক্রমবলয়িত তরঙ্গে বাঁকুড়া থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার বহু এলাকা ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমানের সীমানা পেরিয়ে বীরভূমের গ্রাম ছুঁয়ে সাঁওতাল পরগনা অবধি প্রসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "বাংলা দেশের ছড়ায় এই পোখন্না নামটির উল্লেখ দেখা যায়, যেমন—

পুযালু গো রাই।
আমরা ছোপড়ি পিঠা খাই।।
ছোপড়ি লোপড়ি গাঙ্গ সিনানে যাই।
গাঙ্গের জল রাঁধি বাড়ি, ঝারির জল খাই।
চারমাস বরষা আমরা পোখন্না যাই।।

ছড়াটি সাঁওতাল পরগণা জিলা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপিতে চন্দ্রবর্মাকে যে পুষ্কর্ণার রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই পোখন্না ব্যতীত আর কিছুই নয়, রাজপুতনার অন্তর্গত পশ্চিম যোধপুরের পোখরণ নামক স্থানটির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদি তাই হয়, অর্থাৎ চন্দ্রবর্মা যদি বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বর্তমান পোখন্নারই রাজা হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত শুশুনিয়া পর্বতগাত্রের এই লিপি দেখে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, খ্রিস্টিয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতেই বাঁকুড়া পোখন্না অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল এবং সেই রাজ্যে সংস্কৃত চর্চা হতো; সাধারণ লোকেও সংস্কৃত জানত, তা নইলে সংস্কৃতে এই অঞ্চলে লিপি খোদিত করবার কোন সার্থকতা ছিল না।"[১১]

কেউ কেউ 'পোখন্না' কথাটিতে অসতর্কভাবে 'পইখর্ না' উচ্চারণে, অর্থাৎ 'পুকুর না' অর্থে মনে করেন। তাঁদের কাছে উক্ত টুসুগানের 'চারমাস বর্ষা আমরা পইখর্ না যাই' পংক্তিটির অর্থ হয়—'চারমাস বর্ষার সময় আমরা পুকুর যাই না'। কিন্তু উক্ত গানের ঐ পংক্তিটির এ জাতীয় অর্থনিরূপণ করা যে যথার্থ নয়, তার প্রমাণ ঐ টুসুগানের অব্যবহিত পরবর্তী পংক্তিটি; যেখানে আছে—'পোখন্নাতে দেখে আইলম্ দুয়ারে মরাই।' স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে—'পোখন্না' কথাটিকে 'পইখর্ না' করলে—পুকুরে 'মরাই' অর্থাৎ ধানের গোলা দেখার মতো ভোজবাজির কল্পনা করতে হয়—যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

আমরা জানি, খড় দিয়ে 'বড়্' পাকানো হয়; এবং যে-কোন কৃষিজীবী তথা সম্পন্ন গৃহস্থ সেই 'বড়্' দিয়ে বৃহৎ গোলাকৃতি বেদীর ওপর লোকায়ত বিশেষ আঙ্গিক প্রকরণে 'মরাই' অর্থাৎ ধানের গোলা নির্মাণ করে। ধানের গোলার (মরাই) মাথা খড় দিয়ে চালা-ঘরের মতো ছেয়ে দেওয়া হয়। মরাইয়ের গায়ে যৎসামান্য কাঁচা গোবর চতুষ্কোণাকৃতি করে সেঁটে দেওয়া হয়। সেই কাঁচা গোবরের গায়ে পাঁচটি বা সাতটি কিংবা নয়টি ঘিচি কড়ি, সিঁদুরের বিজোড় ফোঁটা এবং বিজোড় সংখ্যক দূর্বা মাঙ্গলিক উপকরণ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়। বর্তমান শহুরে জীবনে যেমন টি.ভি., ফ্রিজ 'স্টেটাস সিম্বল'; তেমনই আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাঙ্‌লার কৃষিভিত্তিক জীবনে, গৃহস্থের সদর-দরজা-সংলগ্ন উঠানে ধানের মরাই সচ্ছলতা তথা সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। ফলত, উক্ত টুসুগানটিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রাচীন বাঁকুড়ার পোখন্না গ্রামের সমৃদ্ধির কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, উক্ত টুসুগানটি পুরুলিয়া বা সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল থেকেই ক্রমপ্রসারিত হয়ে বাঁকুড়ায় বহুল প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু সে-রকম বিতর্কের পিছনে কোন জোরালো যুক্তি তাঁদের পক্ষে দাঁড়াবে না। কারণ, বাঁকুড়া ব্যতীত অন্যত্র

শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ চন্দ্রবর্মার শিলালিপি এবং বিষ্ণুচক্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনার অনুরূপ কোন 'পাথুরে প্রমাণ' সুদুর্লভ; এমন কি 'পোখন্না' নামক কোন গ্রামের নামও ঐ সব অঞ্চলে জানা যায় না। আর, ঐ প্রাচীন টুসুগানটিতে উল্লিখিত 'পোখন্না' নামটি স্থানিক পরিচিতিহীন, ভৌগোলিক ভাবনাবর্জিত শুধুমাত্র কাল্পনিক ব্যাপার—এরূপ অনুমান করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়। অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এসব নানা দিক গভীর মনস্কতায় বিবেচনা না করে, কিছুটা আঞ্চলিকতাবাদের অভিমানবশত বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত আবেগপ্রসূত মন্তব্য করেছেন, "বাংলার তোষলা ব্রত ঝাড়খণ্ডে টুসুতে পরিণত হয়েছে, এমন কথা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে হয়। বরং এখানকার টুসু ঝাড়খণ্ডের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উঁচুবর্ণের লোকেদের মধ্যে প্রচারলাভ করে উন্নত পর্যায়ের তোষলা ব্রতে পরিণত হয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক।"[১৮]

এ প্রসঙ্গেও মনে রাখা দরকার, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক আদি-অধিবাসী—যাঁরা বাংলাভাষায় কথা বলেন না, যাঁরা হিন্দীভাষী, তাঁদের মধ্যে টুসু-পরবের চল্ নেই। মুণ্ডারের লোক ঐতিহ্যেও টুসুপরব পাওয়া যায় না।[১৯] সাঁওতালদের ইতিকথায় টুসু-পরব পাওয়া যায় না।[২০] অন্যদিকে রাঁচি, বুণ্ডু, তামাড়, জন্হা প্রভৃতি অঞ্চলে অ-বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে কয়েকটি উপভাষা প্রচলিত থাকলেও, সেখানকার প্রাকৃতজন টুসুগানে মূলত বাংলাভাষাই ব্যবহার করেন। এসব নানা দিক বিবেচনা করে ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক যথার্থই অভিমত দিয়েছেন, 'টুসু ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজ থেকেই সীমান্ত বাঙলায় প্রবেশ করেছে।"[২১]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, টুসুগানের কেন্দ্রভূমি বাঁকুড়া থেকে টুসুগানের বলয়িত তরঙ্গ কিভাবে চতুর্দিকে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাঁকুড়ার সঙ্গে রাঢ়বঙ্গের তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। "বর্তমান বাঁকুড়া শহরের রানীগঞ্জের মোড়টি মৌর্যপূর্ব যুগ হইতেই তিনটি প্রাচীন রাজপথের সংযোগস্থল ছিল।"[২২]

বাঁকুডার পোখন্না থেকে বড়জোড়া, মালিয়াড়া, শালতোড়া, রঘুনাথপুর হয়ে একটি রাস্তা পুরুলিয়া শহরের ওপর দিয়ে জয়পুর, রাঁচি, হাজারিবাগের দিকে প্রসারিত ছিল। পুরুলিযার রঘুনাথপুর থেকে চেলিয়ামা, তেলকূপী, ঝরিয়া, ধানবাদ হয়ে রাজগীর ছুঁয়ে আরেকটি রাস্তা পাটলিপুত্র অবধি প্রসারিত ছিল। পুরুলিয়া থেকে অন্য একটি রাস্তা বলরামপুর ছুঁয়ে সিংভূমের দিকে প্রসারিত ছিল।

বাঁকুড়া থেকে দ্বারকেশ্বর নদতীরবর্তী এক্তেশ্বর ছুঁয়ে ধলডাঙ্গা, ইঁদপুর, দেউলভিড়া, পাক্‌বিড়র‍্যা, বুধপুর, মানবাজার, বরাবাজার, দুলমী হয়ে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে বুদ্ধগয়া যাওয়াব পথ ছিল।

বাঁকুড়ার রানীগঞ্জের মোড় থেকে সানবাঁধা, ভূতেশ্বর ছুঁয়ে দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে নিকুঞ্জপুর দিয়ে তমলুক (তাম্রলিপ্ত) যাওয়ার একটি সরাসরি পথ ছিল। এছাড়া বিষ্ণুপুর দিয়ে মেদিনীপুর যাওয়ার রাস্তা ছিল।

বাঁকুড়া শহর থেকে গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া ছুঁয়ে দামোদর নদ পেরিয়ে বর্ধমান, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা যাওয়ার রাস্তা ছিল।

পোখন্নার (পুষ্করণা) প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড় আর্কিয়ান যুগের শিলা দিয়ে গঠিত। উচ্চতা ১৪৪২ ফুট। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে শুশুনিয়ার গুরুত্ব গবেষকদের বিস্ময় জাগায়। ক্ষেত্রকর্ম জাত (Field Work) অভিজ্ঞতা নিয়ে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, "শুশুনিয়া অঞ্চলে আবিষ্কৃত Palaeoloxodon namadicus গোষ্ঠীর হাতীর জীবাশ্মগুলি স্বভাবতই স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতের ম্যামথ-অধ্যুষিত ইয়োরোপের শেষ-প্রত্নাশ্মর কালের গ্রাভেট্টীয় (Gravettion) সংস্কৃতিকে এবং শিবাথেরিয়াম ও এলিফাস আটলান্টিকাস গোষ্ঠীর বন্য কুঞ্জর অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকা ও নীল উপত্যকার বিভিন্ন প্রত্নশ্মীয় পর্বকে। ..... ভারতবর্ষে মধ্যাশ্মর অস্ত্রাদিকে সাধারণত খ্রি. পূ. ৫০,০০০ থেকে খ্রি. পূ. ২৫,০০০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের সানুদেশে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলি অবশ্য আরও বহু পূর্বকালের সাক্ষ্য দিতে পারে।"[২৩]

শুশুনিয়ার প্রাচীনত্বের সঙ্গে বহু ইতিকথাও জড়ানো। পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ অতুল সুর বলেন, "বংকগিরি ও শুশুনিয়া পাহাড় অভিন্ন। পূর্বকালে শুশুনিয়া পাহাড়ই বংকগিরি নামে অভিহিত হত। মনে হয়, এই বংকগিরি থেকেই বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই বংকগিরিতে শিবিরাজ বেস্‌সান্তর একটি আশ্রম স্থাপন করেন ও শিবি ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এই আশ্রমের নাম হয় 'বেস্‌সান্তর আশ্রম' পরবর্তীকালে এই আশ্রমে অরাধমুনি বাস করতেন। গৌতম সিদ্ধার্থ মহানিষ্ক্রমণের পর বেস্‌সান্তর আশ্রমে এসে অরাধমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও পাঁচ বৎসর থেকে শিবি ধর্ম আয়ত্ত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম এই শিবিধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ কথা গৌতম বুদ্ধ নিজ মুখেই বলে গেছেন। কপিলাবস্তুর শাক্যদের কাছে তিনি ঘোষণা করেন যে, পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্বরূপে তিনি শিবিরাজপুত্র বেস্‌সান্তর নামে জন্মগ্রহণ করে তাঁর অতিদানের দ্বারা দানপারমিতা পূর্ণ করেছিলেন।"[২৪]

আবার, "ধোনশাখ জাতকের (ফাউসবল অনূদিত জাতক নং ৩৫৩) কাহিনীর উপর নির্ভর করে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অনুমান করেছেন যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে শুংশুমার গিরি একদা কৌশাম্বীর (বর্তমান এলাহবাদের অদূরে অবস্থিত) বৎসগণের অধীনস্থ ছিল। এই জাতকে বর্ণিত আছে যে উদয়নের পুত্র বোধি শুংশুমার গিরিতে নির্মিত কোকনদ প্রাসাদে বাস করতেন।"[২৫]

রাঢ় তথা পুষ্করণা-বলয়ের মধ্যে শিংশুমার (শুশুক) কিংবা শিশুনাগ (শিশু হাতি) মহিমায় সমুন্নত শুশুনিয়া। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বলেছেন, "ছোটনাগপুর মালভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শুশুনিয়া একদিকে যেমন প্রাচ্য-ভারতে সুপ্রাচীন গোন্ডোয়ানা সংগঠনের সাক্ষ্যস্বরূপ, অপরপক্ষে

তেমন এই পাহাড়টি সহসা বিস্তৃত এক শৈলগর্ভ পাললিক প্রান্তরের প্রত্যন্তে দাঁড়ানো এক অভ্রভেদী প্রাচীরের মতো প্রতীয়মান হয়।"[২২]

শুশুনিয়ার পর্বতগাত্রে রাঢ়ের চন্দ্রবর্মার শিলালিপি এবং উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্র রাজকীয় মর্যাদার শুধু নয়, ঐতিহাসিক বিষয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার রাঢ়-নরপতি চন্দ্রবর্মা সম্পর্কে বলেছেন, 'Chandra Varman may thus be regarded as the king of Radha or the region immediately to its South whom Samudra Gupta paved the way for the conquest of Bengal."[২৭]

পরিশেষে তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি— টুসুগানের উৎসভূমি নির্ণয়ে বাঁকুড়া ব্যতীত অন্য জেলার স্বপক্ষে কোন লিপিসংক্রান্ত 'পাথুরে প্রমাণ' বা প্রচলিত সুপ্রাচীন টুসুগান আমাদের জানা নেই; অথচ টুসুর ক্রম-বিস্তারিত রূপের উৎসভূমি প্রাচীন বাঁকুড়া—এ মতের স্বপক্ষে শুশুনিয়া শিলালিপি, বিষ্ণুচক্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনা ব্যতীত প্রাচীন টুসুগানে বাঁকুড়া প্রসঙ্গত আছে—যা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে ক্রমশ প্রচারিত। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অধিকতর প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতিরেখে টুসুগানের উৎসভূমি হিসাবে প্রাচীন বাঁকুড়ার ঐতিহাসিক মর্যাদাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

অন্ত্যটীকা

১। পুরুলিয়ায় উক্ত টুসুগানটির একাধিক ভিন্নরূপও দেখা যায়। পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে পোদলাড়া গ্রাম। সেই গ্রামের বাউরিপাড়ার কিশোরীদের কাছ থেকে নিম্নরূপ গানটি সংগৃহীত ঃ

টুসালি গো টুসালি
গাঙে সিনানে যাই।
গাঙের জল রাঁধিবাড়ি
মকরের জল খাই।।
মায়ে দিল তেল-হইল্দা বাপে দিল শাড়ি।
সেই শাড়িটা লিয়ে যাব বঁধুয়ার বাড়ি।।
বঁধুয়ার বাড়িতে পাকা পাকা আম।
মা-বাপকে বইলে দিব বলুক রাম রাম।

পুরুলিয়ার খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সমাজসেবী ঁঅশোক চৌধুরী ১৮/১/৫৪-র 'মুক্তি' পত্রিকায় [তৎকালীন সম্পাদক ঃ বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত] মানভূমের টুসু পরব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে আলোচ্য টুসুগানটির ভিন্নতর দুটি রূপ পাওয়া যায়। যথা—

তোষলা গো রাই তোমার দৌলতে
আমরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই—
ছ-বুড়ি, ন-বুড়ি গাঙ্ সিনানে যাই
গাঙের বালিগুলি দু'হাতে মোড়াই।
গাঙের ভিতর লাড়ুকলা ডব্‌ডবাতে খাই।।

আরেকটি টুসুগান ঃ

টুসালু গো রাই মোরা গাঙ সিনানে যাই
গাঙের জলে বাঁধিবাড়ি
মকরের জল খাই।
হাতে পো কাঁখে পো
পৃথিবী জুড়িয়ে টুসু
না পড়িল রো, গো
না পড়িল রো।

অশোক চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত দ্বিতীয় গানটির সঙ্গে তারও পরবর্তীকালে সংগৃহীত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' ৩য় খণ্ডের (প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫) ১২০ পাতায় উদ্ধৃত টুসুগানের অনেকখানি মিল আছে। উক্ত গ্রন্থে ডঃ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "গানের পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে দুই একটি টুসুর ছড়াও শুনিতে পাওয়া যায়—

টুসালু গো রাই, টুসালু গো ভাই,
তোমার দৌলতে আমরা ছবড়ি পিঠা খাই লো।
ছবড়ি লো লবড়ি গাঙ্‌সিনানে যাই
গাঙের জল বাঁধিবাড়ি মকরের জল খাই।
চার মাস বর্ষা পোখার না যাই
হাতে পো কাঁখে পো
পৃথিবী জুড়ালো, চোখে পড়ল রো রো
চোখে পড়ল রো।।

প্রসঙ্গত বলা যায়, একই টুসুগান অনেক সময় অঞ্চলভেদে বিভিন্ন লোকমুখে কিঞ্চিৎ বা অধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে; কিন্তু মূল গানের সঙ্গে পরিবর্তিতরূপের আন্তর মিল ও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

এ বিষয়টি 'টুসু ঃ লোক-কাহিনী ও সাঙ্গীতিক রূপবৈচিত্র' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

২। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ) ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৩), ২৩ পাতা।

৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, সংশোধিত ২য় সংস্করণ (১৯৭৪), ৩৮-৩৯ পাতা।

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (১৯৭৪), ২২-২৩ পাতা।

৫। West Bengal District Gazetteers, BANKURA Ed. Amiya Kumar Banerji (1968), P.68

৬। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৬৮), ৩৬ পাতা।

৭। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা (১৯৬৪), ৭৭ পাতা।

৮। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ৩য় সংস্করণ (১৩৭০), ২১-২২ পাতা।

৯। মানিকলাল সিংহ, 'দক্ষিণরাঢ়ের তুষু পর্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকা' প্রবন্ধ, ২৬শে জুন, ১৯৬৫ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

১০। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি, পূজাপার্বণ, বিশ্বভারতী (১৩৫৮), ৫২-৫৩ পাতা।

১১। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় পর্ব), ফার্মা কে. এল. এম. লি. কলকাতা (১৯৭৮), ২২৫ পাতা।

১২। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি, বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ (১৩৬১), ৯৪-৯৫ পাতা।

১৩। মানিকলাল সিংহ, 'দেশ'-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

১৪। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি, পূজাপার্বণ, বিশ্বভারতী (১৩৫৮), ৩ পাতা।

১৫। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী (১৩৫১), ৯ পাতা।

১৬। সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ১৭ পাতা।

১৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাঁকুড়া-পরিক্রমা' গ্রন্থের [লেখক অনুকূলচন্দ্র সেন, বুক সিন্ডিকেট প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৭৬] ভূমিকা [IV.–IIV] ১৩৭৬

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা (১৯৭৮), ১৫১ পাতা।

১৯। S.C. Roy, The Mundas and their Country. 2nd. ed. (1970) & Oraon Religion and Customs, Ranchi (1928).

২০। দ্রষ্টব্য ঃ 'হড়্কোরেন্ মারে হাবড়াম কো রেয়া ঃ ক কাথা' (পুরাতন সাঁওতালদের ইতিকথা), সাঁওতাল পরগনার বেনাগড়িয়া মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত।

২১। সুহৃদকুমার ভৌমিক, 'বিহারের টুসুপরব' প্রবন্ধ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত টুসু ঃ ইতিহাসে ও সংগীতে' গ্রন্থ, পুস্তকবিপণি, কলকাতা (১৯৮২), ৩৫ পাতা।

২২। মানিকলাল সিংহ, রাঢ়ের মন্ত্রযান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা (বাঁকুড়া) ১৩৮৫, ৪২ পাতা।

২৩। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া, ২৫ পাতা।

২৪। অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা (১৯৭৬), ৩১-৩২ পাতা।

২৫। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩৫ পাতা।

২৬। প্রাগুক্তগ্রন্থ, ১৮-১৯ পাতা

২৭। R. C. Mazumdar, History of Ancient Bengal, Vol.I (1943), P.40

পঞ্চম অধ্যায়

টুসু-পরবের অনুসূত্র

পয়লা মাঘ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লায় এখ্‌য়ান বা আইখান্ যাত্রার দিন। অক্ষ পথে পরিক্রমণরত সূর্যের গতি নিরূপক 'অক্ষ অয়ন' কথা থেকে 'এখ্‌খান' শব্দের উৎপত্তি। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন, "ষোলশত বৎসর পূর্বে পৌষ-সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ দিন আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন।"[১] তাঁর মতে—"ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভে নূতন বৎসর আবম্ভ করিতেন।"[২] পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লায় এখনও পয়লা মাঘ ভাবগত দিক দিয়ে কৃষি-বর্ষেব শুরু। নতুন কৃষি-বছবে মুনিষ-মাইন্দার যদি নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তবে কৃষিজীবী পরিবারের গৃহকর্তা এদিনটিতেই কৃষিকর্মের সহযোগী লোক নিয়োগ করেন। মুনিষ-মাইন্দারগণ-ও ব্যক্তিগত কারণে, স্বেচ্ছায় এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে এই দিন কাজে যোগ দিতে পারে। নিয়োগকর্তাকে তারা অঞ্চলিক ভাষায় 'গলা' বলে এবং যে-কৃষিজীবী পরিবারে কাজে যুক্ত হয়, তাকে তারা বলে—'গলা-ঘর'।

পয়লা মাঘকে কেউ কেউ 'হালপুণ্যা'-র দিনও বলে। বাঁধ্‌না-পরবের সময় চাষের হাল-হাতিয়ার চালাঘরের 'আড়াচে' অর্থাৎ মাচায় তুলে রাখা হয। তখন কৃষিকর্মের বিরতি। লাঙলের কাজ হয় না। তাই কৃষিকর্মেব শুভ সূচনাপর্বে পয়লা মাঘ অনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত একবার মাঠে লাঙল নামান হয়। হলকর্ষণের পুণ্যদিবস হিসাবে এ দিনের নাম 'হালপুণ্যা'।

'যাত্রা' কথার অর্থ 'গমন'। "জগদম্বার পালনী শক্তির নাম বিষ্ণু। সূর্যে সে শক্তি নিহিত আছে। সূর্য তাপ-আলোক বিকিরণ করিতেছেন। বর্ষ চক্রে ভ্রমণ করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু পর্যায় আনিতেছেন, যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবিত আছে। সূর্য-রূপ বিষ্ণু বৎসরে দুইবার দোলেন, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি।"[৩] অক্ষ-অয়নের দুটি পর্যায়-উত্তরাযণ ও দক্ষিণায়ন। তাই পয়লা মাঘ 'এখ্‌য়ান যাত্রা'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'জঙ্গম, উৎসবকে বলিত 'যাত্রা'।[৪] রথযাত্রা, বিজয়া-যাত্রা, দোলযাত্রার মতো এখ্‌য়ান যাত্রা পবিত্র দিন। পশ্চিম রাঢ়েব মানুষ ওই দিনটি আনন্দ-উৎসবের মধ্যে অতিবাহিত করে।

এ দিন শিকার-পরব। উত্তর বাঁকুড়ার বাইশগাঁ অঞ্চলের ক্ষত্রিয়-প্রধান-গ্রামগুলিতে এখনও যথারীতি শিকার-পবব হয়। গঙ্গাজলঘাটি থানার ঘাটোয়াল-সর্দার-জমিদার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষত্রিযরা লোকলস্করসহ মহাসমারোহে কাছাকাছি জঙ্গলে 'শিকার'-এ বের হন। একদা শিকার-যাত্রায় রাজকীয় রূপ ফুটে উঠত। এখনও ঢাকঢোল পিটিয়ে যূথবদ্ধ মানুষের চিৎকৃত উল্লাস শোনা যায়। চোরা কাঠ ব্যবসায়ীদের উৎপাতে ও বহু গৃহস্থের জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ অভিযানে বন ক্রমশ উবে যাচ্ছে ; তাই ফিকে জঙ্গলে এখন বাঘ, হরিণতো

দূরের কথা, নেকড়ে বাঘ, বন্য বরাহ-ও (স্থানীয় উচ্চারণে 'বনবরা') সুদুর্লভ। ফলে বনে যে ফাঁদ-পাতা হয়, তাতে এখন নিরীহ খরগোসরা ধরা পড়ে। বাঁকুড়ায় খরগোসের আরেক নাম 'শিকার'। বনের ভেতর পাতা মাড়িয়ে দ্রুত ছন্দে সরসর (বা সড়সড়) ধ্বনি তুলে খরগোস দৌড়ায়। তাই বাঁক্‌ড়ি উপভাষায় তার আরেক নাম—'সড়্‌সইড়া'। এখ্যান যাত্রার দিনে রাতে 'শিকার-মাংস' দিয়ে গরমভাত খাওয়া সম্মানের ব্যাপার। এখনও ঐ অঞ্চলের জমিদারগণ নিজ পরিবারে শুধু 'শিকার-মাংস' খান না, কুটুম্ববাড়িতেও লোক মারফত তা পাঠিয়ে থাকেন; এবং তার পরিমাণ স্বল্প হলেও তা বিশেষ মর্যাদার ব্যাপার।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ একদা শোভাযাত্রা সহকারে এখ্যান যাত্রার দিন শিকার-উৎসবে যোগ দিতেন। বীর হাম্বীর, রঘুনাথ সিংহ প্রভৃতি মল্লরাজদের সময় মল্লভূমে বিশাল অরণ্য ছিল। শাল-সেগুন-গাম্‌হার-অর্জুন-ক্যাঁদ্‌-পিয়াশাল প্রভৃতি বৃক্ষসংকুল গভীর অরণ্যে চলত হিংস্র বাঘ, বন্যবরাহ ইত্যাদির সঙ্গে হরিণ শিকার। কালের নির্মম স্থূল-হস্তাবলেপে বিষ্ণুপুর রাজগণের শৌর্যগাথা ইতিহাসের পাতায় ম্রিয়মাণ কাহিনী; অথচ মদনমোহন মন্দির, জোড়-বাংলা প্রভৃতি পুরাকীর্তি গাত্রে টেরাকোটা চিত্রে তা আজও উজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর। মন্দিরের টেরাকোটার বিভিন্ন প্যানেল দেখা যায়—ছুটন্ত দলবদ্ধ হরিণের উল্লম্ফন ভঙ্গিমার পিছনে শরসন্ধানপ্রিয় শিকারী; বাঘের সঙ্গে শিকারীর মল্ল যুদ্ধ কিংবা শিকারীর বর্শায় আহত মরণোন্মুখ-বাঘের শেষ কামড় দেওয়ার নিষ্ফল আক্রোশ; করিযূথের গভীর আশ্লেষে শুণ্ডকেলি; শিকারীর বীরবিক্রমে গৃহযাত্রা—স্কন্ধে শোভমান ব্যাঘ্র বা বরাহের ক্ষতবিক্ষত গতায়ু শরীর। পোড়ামাটির এই চিত্রমালা সৃষ্টির পিছনে শিল্পীর কল্পনাকে একদা উদ্দীপিত করেছে শিকার-উৎসবের রাজকীয় সমারোহ এবং আরণ্যক জীবনের শক্তিনির্ভর শিকার প্রণালী।

রাজত্ব গেলেও রাজকীয় মহিমা বা মেজাজ ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা রাজারা করেন। মল্লভূমের শেষ স্বাধীন নরপতি চৈতন্য সিংহের আমলেও তার ব্যতিক্রম হয় না। ইংরেজের চক্রান্তে তখন বর্ধমানরাজ ও দেশীয় অন্যান্য নৃপতি মল্লরাজের জমিদারী ক্রমশ গ্রাস করেছেন। চৈতন্য সিংহের পৌত্র বুড়ো গোপাল সিংহ হৃতগৌরব জীবনে মাসিক মাত্র চারশো টাকা সরকারি অনুদান পেতেন। তবু চিরাচরিত প্রথামত শিকার -উৎসব পালনে তিনি অনেক খানি যত্নবান্ ছিলেন। এ তথ্যের প্রমাণ স্বরূপ উর্ধ্বতন রাজ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি গ্রহণের লেখা তাঁর একখানি চিঠির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা যায়ঃ—

"বিষ্ণুপুর কিল্যা নিবাসী—

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহদেবের নিবেদন এই যে খানদানের দস্তুর মতো প্রতিসন মাহ মাসের ১লা তারিখে এখান্দ শিকার হয় এই শিকারে থাকি দস্তুর মতে যোগাযোগ ও জেলা বাকুন্ডা ম্যাজেস্টারী আদালাইতে থাকা বিষয়ের দারগার নামে ঘাট আগলান মদদ দিবার বিষএ আজ্ঞাপত্রী প্রতিসন প্রচার হয় অতএব আগসনে উপরক্তি

নিঅমত দিবসে ঘাট আগল মদদ দিবার বিষএ থানা দারগার নামে আজ্ঞাপত্র প্রথার মতে পরআনের ঘাটার নামে পরাবাধিতে মঞ্জুরী হয়।

নিবেদন ইতি।
সন ১১৫৯ সাল
বাং সন ১২৬০/২৩ পৌষ"

রাজকীয় পূর্ণ মর্যাদায় মল্লভূমে শিকার-উৎসব পালিত হতো। রাজকোষ থেকে বরাদ্দ অর্থে সেনাপতি ফৌজদার, দিক্‌পতি, ঘাটোয়াল, পাইক বরকন্দাজ প্রমুখ রাজকর্মচারিবৃন্দ রাজার শিকারযাত্রার অনুগামী হতেন। সুচারু হাওদা শোভিত গজারোহণে যেতেন রাজা, তাঁর দু'পাশে অশ্বারোহণে সঙ্গী হতেন সেনাপতি; ফৌজদার, দিকপতিগণ; ঘাটোয়াল, পাইক-বরকন্দাজ পদব্রজে রাজাকে অনুসরণ করতেন। ডোম-বাগদী প্রভৃতি পদাতিক সৈন্যদল ঢাক-ঢোল-কাড়া নাগড়া কাঁসরঘন্টা বাজিয়ে বনভূমি মুখরিত করে তুলত—সচকিত হতো চতুর্দিক। বাংলা ছড়ায় ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তার রূপ বিধৃত হয়ে আছে—

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়া ডোম সাজে।
ডান সিগ্‌ড়ি ঘুঁগুর বাজে।।

ইত্যাদি

[কুঞ্জলাল রায় সংগৃহীত ১৪নং ছড়া,
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩ বৈশাখ সংখ্যা]

গোপাল সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর দুইপুত্র রামকৃষ্ণ ও রামকিশোর সিংহ ইংরেজ সরকারের যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তিভোগী হয়েছিলেন। নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতায় তাঁদের আমল থেকে এখ্যান যাত্রার রাজকীয় মহিমা ম্লান হয়। তবু ঐ ঐতিহ্যবাহী পুণ্য দিবসে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে অধুনা মল্লভূমবাসী বাজার থেকে খাসী ছাগল মাংস কিনেও মাংসভাত খান।

এই শিকার-পরবের সঙ্গে অনেকে প্রাগার্য-আদি অস্ত্রালদের (Proto-Australiod) শিকার জীবনের ক্ষীণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। শিকারপ্রিয় নিষাদ জাতীয় সুহ্মভূমির আদি-আদিবাসীগণ কালের বিবর্তনে কৃষিকার্যে দক্ষ হলেও তাদের স্মৃতিপ্রিয়-বৃত্তিকে মন থেকে তারা যে মুচে ফেলেনি, তারই উজ্জ্বল প্রমাণ মল্লভূমের শিকার-উৎসব। কিন্তু এরূপ অনুমানের একটা বিপ্রতীপ ভাবনা-ও মনে উঁকি দেয়। কারণ, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার-পরব (দিশুম সেঁন্দরা) ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আদি-অধিবাসীদের প্রাণের প্রিয় উৎসব; অথচ তা পয়লা মাঘ না-হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় (বুদ্ধ পূর্ণিমায় দিন, এখনও বিশাল সমারোহে এবং আদিম উল্লাস নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ শিকারপরবে বৃহত্তর পুরুলিয়ার (একদা খ্যাত মানভূম) আদিবাসীদের সঙ্গে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল, শবর, হো প্রমুখ আদি-আধিবাসীরা সানন্দে যোগ দেয়।

বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে জয়বেলিয়া অঞ্চলের ক্ষত্রিয়দের এখ্য়ান যাত্রার দিন বিশেষ লক্ষ্মীপূজা। সেদিন ভূতেশ্বর, বিকনা প্রভৃতি গ্রামের ক্ষত্রিয় পরিবারে দিনের বেলায় অন্ন নিষিদ্ধ। পরিবর্তে চিঁড়ে, লুচি-তরকারি খাওয়া চলে। পরিবারের গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী সারাদিন লক্ষ্মীদেবীর উপবাস করেন। সন্ধ্যাবেলায় খড়িমাটির আলপনা দেওয়া এজমালি উঠানে প্রত্যেক গৃহকর্তার নামে একটি করে 'লক্ষ্মীর আড়ি' অর্থাৎ লক্ষ্মীপূজার ধানপূর্ণ ঝুড়ি থাকে। বাঁশ বা বেতের তৈরি ঝুড়ির গায়ে বেশ কয়েকদিন আগে গোবর লেপা হয়। তারপর সেই গোবর-লেপা ঝুড়ির গায়ে খড়িমাটি দিয়ে মাঙ্গলিক নক্সা আঁকা হয়। ঐ ঝুড়িটি বছরে এখ্য়ান যাত্রার দিনে গৃহস্থের ভাঁড়ার ঘর বা লক্ষ্মীব ঘব থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বের করা হয়। ধানপূর্ণ ঝুড়ির ওপর থাকে নানারকম ঢোক্‌রা শিল্পের নিদর্শন। যথা ঃ ঢোক্‌রা শিল্পীদের ধাতুমূর্তি -গড়া লক্ষ্মী-নারায়ণ, পেঁচা, গরুড়, মাছ, হাতি বা অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবী। এ সবই লক্ষ্মীদেবীর সাজ হিসাবে মান্য।

শীতের সন্ধ্যায় ছ'টা-সাড়ে ছ'টাব মধ্যে স্থানীয় ব্রাহ্মণ পূজা করে চলে যান; কিন্তু লক্ষ্মীর আড়ি যথারীতি এজমালি উঠানে থাকে; শেয়াল না-ডাকা অবধি তা তোলা হয় না। পরিবারের বৌ-ঝি-শিশুরা উঠানে জটলা করে । পুরুষরা শেয়াল-ডাকের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। অনেক সময় অল্পবয়সী বালকরা সারাদিন অন্নহীন থেকে সন্ধ্যায় গরম মাংস-ভাত খাওয়ার লোভে কিংবা মজা কবে কৃত্রিম শেয়াল-ধ্বনি করে। অবশেষে সত্যিকারেব শেয়াল-ডাকার পর 'লক্ষ্মী-তোলা' হয়। ভক্তি নম্র চিত্তে 'লক্ষ্মীর আড়ি' মাথায় করে প্রতি পরিবারের গৃহকর্তা ভাঁড়ার ঘরে লক্ষ্মী তোলেন। ভাড়ার ঘরে সাধারণত থাকে লক্ষ্মীদেবীর জন্য বড় কুলুঙ্গি বা তাক। সেখানে থাকে লক্ষ্মীর হাঁড়ি! সেই হাঁড়িতে পূজা-করা 'লক্ষ্মী আড়ি'-র ধান ও ঢোকরা সাজ সযত্নে সারা বছর রাখা হয়। উঠানের অর্থাৎ বাইরের লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মী করে 'লক্ষ্মী-তোলা'-র পর আনন্দ সহকারে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী বাদে সবাই মাংস-ভাত তৃপ্তি সহকারে খান।

পয়লা মাঘ বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার কোন কোন গ্রামে কেন্দুলি মেলা বসে। অজয় তীরবর্তী বিখ্যাত কেঁদুলি (কেন্দুবিল্ব) গ্রামে যে মেলা বসে, তারই পবিত্র পুণ্য স্মৃতি নিয়ে এই বৈষ্ণব মেলা। বাঁকুড়া শহর থেকে মাইল চারেক পূর্বে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বাঁকী গ্রামের জেলেপাড়ায় এখনো বড় আকাবের এই মেলা বসে। পুরুলিয়ার মোহনপুরের কেন্দুলি মেলা বিখ্যাত।

এখ্য়ান যাত্রার দিন পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে বসে খেলাইচন্ডী মেলা। ওঁরাওদের চান্ডীদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক লোক-ভাবনা মিশে এই লৌকিক দেবী। গ্রাম প্রান্তে নির্জন বৃক্ষমূলে একখণ্ড পাথরকে যেমন বহু জায়গায় সিনিঠাকুর (কুদ্রাসিনি, বড়াম সিনি ইত্যাদি) রূপে পূজা করা হয়, খেলাইচন্ডীদেবীও অনুরূপ লৌকিক গ্রামদেবী।

পুরুলিয়ার রুঘুনাথপুর শালতোড়া রাস্তার ধারে পড়ে বেড়ো গ্রাম। পাহাড়ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক যুক্ত বোড়ো বা গদিবেড়ো গ্রাম। এখানকার মানুষদের সঙ্গে বহু দক্ষিণভারতীয় পরিবার বাস করেন। কাশীপুর রাজার কুল-পুরোহিত হিসেবে তাঁদের

পূর্বপুরুষ এবং অন্যান্য সঙ্গীরা এসেছিলেন। পয়লা মাঘ থেকে তিন দিন বেড়োর গ্রাম প্রান্তে খেলাইচণ্ডীর বিরাট মেলা বসে। স্থানীয় লোকেরা ছড়া কেটে বলে—

কেশব চাঁদ
বেড়োর বাঁধ
চণ্ডীর থান।

পুরুলিয়া শহরের প্রান্তে, অলঙ্গিডাঙার রেনি রোড ধরে এগিয়ে গেলে, সরকারি বড় জল ট্যাঙ্কের কাছেই খোলামেলা বিরাট প্রান্তরে পয়লা মাঘ খেলাই চণ্ডীর মেলা হয়। এই মেলার বড়ো আকর্ষণ খুব সস্তায় কাঠের তৈজস পত্রাদির বেচাকেনা। চেয়ার-টেবিল-আলমারি-আলনা থেকে চাকি-বেলনা-জলচৌকি সব জিনিস জলের দরে কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য সাধারণ গ্রাম্য মেলার মতই নাগরদোলা, ফিতে-চুড়ি-মালা এবং মিষ্টির দোকান-ও বসে।

মফঃস্বল পুরুলিয়ার গোলামারা, নদীয়াড়া গ্রামে, সাতুড়ির দন্ডহিত এবং বন্দোয়ানের চিল্লাগ্রামেও খেলাইচন্ডী মেলা বিখ্যাত।

খেলাইচণ্ডীর সঙ্গে টুসু দেবীর ভাব সমন্বয়ে পুরুলিয়ার হুটমুড়া-জয়নগরের কাছে চাঁচ্ড়া গ্রামে এখ্য়ান যাত্রার দিন থেকে বিরাট মেলা বসে। নয় দিন ব্যাপী এই মেলায় আনাই জামবাদ, লুধুড়কা, কেশবগড়, হুড়া, হুটমুড়া, নডিহা, চেপড়ি, ভাঙড়া, কড়চা, সিঁদুরপুর, ছড়রা, পোদলাড়া, বাধগড়, বোঙাবাড়ি, বাঘবপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে অসংখ্য নরনারী শিশু আসে। এর নাম টুসুমেলা, কিন্তু নবনারীরা পয়লা মাঘ বিকেল দিকে চাঁচ্ড়ার মেলা সন্নিকটের পুকুরে স্নান করে নিকটস্থ খেলাইচণ্ডীর পূজা দেয়। মনিহারী দোকান, নাগরদোলা, চা-তেলেভাজা-মিষ্টির দোকান বসে। নয়দিন ব্যাপী মেলায় ষাট-সত্তর হাজার নরনারী আসে। মাহাতবাজোয়াড় বাউরি বর্ণহিন্দুর সঙ্গে মুসলমান নারী পুরুষও চাঁচ্ড়ার মেলায় যায়। তাদের অনেকের মুখে টুসুগান, হাতে শোভা পায় টুসুর চৌডল। ঢোল-বাঁশী-ধাম্সার সঙ্গে ঘোড়া নাচ, সাওতাল নাচ হয়।

পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলের পাশ দিয়ে বেশ কয়েক মাইল গ্রাম্য পথে এগিয়ে গেলে পাওয়া যায় ঘাঁঙা গ্রাম। সেখানের টুসুমেলা বিখ্যাত। এখ্য়ান যাত্রার দিন থেকে মেলার প্রস্তুতি। নদিয়াড়া, কলবাঁধ, বুঢ়িড়ি, ছলাডি, ঘঁড়াগাড়া, হুল্কা, চবগালি প্রভৃতি গ্রামের বহু নরনারী ঘাঁঙার টুসুমেলায় যায়।

বাঁকুড়া জেলার ওন্দার কাছে আগড়দা গ্রাম। ঐ গ্রামের কাছে বিড়াই নদীর তীরে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির। বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের এই দেবীর বিশেষ পূজা হয় এখ্য়ান যাত্রার দিন।

লৌকিক দেবতা ভান সিংয়ের পূজা মাঘ মাসে। পৌষ-সংক্রান্তি থেকে পূজারম্ভ; চলে গোটা মাঘ মাস। এখ্যান যাত্রার দিন ভান সিং পরব আড়শা, জয়পুর, হুড়া, পুঞ্চা,

মানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বহু গ্রামে হয়। সাধারণত খোলা মাঠে 'লায়া' পূজা করেন। লৌকিক বিশ্বাস ভান সিং দেবতা কৃপা করলে গবাদি পশুর কোন রোগ, মহামারী বা মৃত্যু ঘটবে না।

মকর-সংক্রান্তি এবং এখ্‌য়ান যাত্রার দিন বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বহু গ্রামে মোরগ লড়াই হয়। যুযুধান দুই পক্ষের দুইজন গ্রামীণ মানুষ আপন আপন মোরগের পায় বেঁধে দেয় ছোট্ট ধারালো ছুরি। তার আঞ্চলিক নাম 'কাইত্‌'। (প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার মোরগ-লড়াইয়ে মুরগীর স্থান নেই।) চতুর্দিকে উৎসুক জনতার মাঝে মুহূর্তের মধ্যে যুযুধান দুই মোরগের ক্ষিপ্র-তীব্র লড়াই শুরু হয়। দুটি মোরগই যুগপৎ ছুরি-বাঁধা-পা তুলে, অতর্কিতে ডানা নাচিয়ে উড়ে, ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চায়। কোপবশত মোরগ ঝুঁটি দুলিয়ে, ঝটিতি উল্লম্ফন ভঙ্গিতে একে অপরকে আক্রমণ করার রণকৌশল উপস্থিত দর্শকদের মনে জাগায় রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল। শারীরিক বিক্রমের সঙ্গে যে মোরগের রণচাতুর্য তীব্র মাত্রায় যুক্ত হয় -- সে-ই দ্রুততগতিতে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে। যদি প্রতিপক্ষ ভয় পেয়ে, উড়ে পালিয়ে যেতে চায়, তবে সেই মোরগ হেরে গেছে ধরে নেওয়া হয়। বিজয়ী মোরগের মালিক মৃতপ্রায় কিংবা ভীত-পলায়নোদ্যত পরাজিত মোরগের দাবিদার হয়। সেই পরাজিত মোরগের শুধু একটি স-মাংস ঠ্যাঙের দাবিদার থাকে 'কাইত্‌কার' অর্থাৎ যে 'কাইত্‌' বেঁধে দেয়। অনেকে মোরগ-লড়াইয়ের জন্য হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিরাট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।'

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার এখ্‌য়ান যাত্রার দিনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রিয় অনুষ্ঠান 'ভেজা বিধা'। গ্রামপ্রান্তে খোলামাঠে যুবকরা হাতে তীর ধনুক নিয়ে সমবেত হয়। সেখানে আগে থেকে পোঁতা থাকে সজনে (আঞ্চলিক উচ্চারণ 'সঁইল্লা') অথবা ভেরেন্ডার ডাল। তার মাথায় থাকে গোবরের ডেলা। কোন-কোন-জায়গায় গোবরের মাথায় গুঁজে দেওয়া হয় একটি ফুল। গোবরের ডেলা বা তার মাথায়-গোঁজা ফুলটি হয় তীর-ছোঁড়ার লক্ষ্য (Turget) বা 'ভেজা'। দেড়শো বা দুশো গজ দূর লক্ষ্যভেদ করতে হয়। প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে তীর নিক্ষেপ করেন মাঝি, গোড়েৎ মাঝি এবং নায়কে। নায়কের আনুষ্ঠানিক তীর নিক্ষেপের পর প্রতিযোগিতা শুরু। প্রত্যেক প্রতিযোগী তিনবার তীর নিক্ষেপ করেন। প্রথম তীর বোঙ্গার নামে, দ্বিতীয় তীর পূর্বপুরুষদের নামে আর তৃতীয় তীর নিক্ষিপ্ত হয় পুরুষকারের নামে। প্রতিযোগিতায় যে যুবক লক্ষ্যভেদ বা 'ভেজা'-কে বিঁধতে পারে, তাঁকে বীরের সম্মান দিয়ে কাঁধে চাপিয়ে 'লায়া'-র (পুরোহিত) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কৃতী যুবককে একটি খাসী ছাগলের সঙ্গে ধুতি-জামা এবং নগদ কিছু টাকা অথবা এক হাঁড়ি-হাঁড়িয়া দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এখ্‌য়ান যাত্রার দিন বহু ভূমিজ, সাঁওতাল বাঁদর নাচের খেলা দেখায়। খড় ও কাপড় দিয়ে বানানো নকল বানর দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। সাঁওতালি ভাষায় সে-অনুষ্ঠানের নাম 'গাঁড়ি আশেন'। সাঁওতালি ভাষায় একটি বাঁদর নাচের গান—

রসু পুসু হাসু তাজিং
চিয়াম মেনয়া
জিলু হঁরেঞ্চ কাএঃ মাড়ি হঁরেএঃ কাএঃ
বেঙ্গাড় জাগুরে দো মাড়িএঃ জমেয়া।

মকর-সংক্রান্তি এবং এখ্য়ান যাত্রা একই উৎসবের দুইপ্রান্ত—রূপে-রসে-আমেজে শীতের জড়তায় নির্মোক সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উৎসার। তার আনন্দের ব্যাপ্তি কাল দু'দিকে আরো প্রসারিত, তাই বাঁকুড়ার আঞ্চলিক প্রবাদে আছে—'চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর, এখ্য়ান, সেখান, ঘেঘান, সাঁই. সুঁই ; তার পরের দিন আসবি তুই।' কার্যত অষ্টপ্রহরব্যাপী আনন্দ নয়, অষ্টদিনব্যাপী পৌষালি আনন্দ-উৎসব; যার সূচনা মকর-সংক্রান্তির দু'দিন আগে এবং পরিসমাপ্তি এখ্য়ান যাত্রার চার দিন পর। এই পরিব্যাপ্ত আট দিন পশ্চিম রাঢ়ের খেটে-খাওয়া মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের ক্লেশকর কর্মের নিগড় থেকে নিজেদের মুক্ত করে আমোদপ্রমোদে গা ঢেলে দেয়; কর্মের আহ্বান যেন আসে ঐ আটদিনের পর; উক্ত লৌকিক প্রবাদে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট!

অন্ত্যটীকা

১। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি পূজা-পার্বণ
বিশ্বভারতী (১৩৫৮) ৩ পাতা।

২। তদেব ১ পাতা।

৩। তদেব ২ পাতা।

৪। সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ ১৮ পাতা।

৫। একটি হ্যান্ডবিলের নমুনা ঃ

হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কান্ড
বিরাট মোরগ লড়াই
১২ই মাঘ, ১৩৯২

বন্ধুগণ,

আপনাদিগকে জানান যাইতেছে যে, উঁচালী গ্রামের পলাশ বাগানে ১২ই মাঘ, রবিবার (২৬/১/৮৬) তারিখে প্রায় প্রতি বৎসরেই প্রাইজের মোরগ লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়। আপনারা দলে দলে আসিয়া এই মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করিবেন। দুপুর ১২টা হইতে মোরগ লড়াই হইবে।

প্রাইজগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল—

১) সর্বশ্রী হরেকৃষ্ণ মাহাত ১টি ভেড়া ২) বিশ্বনাথ মাহাত ১ টি ভেড়া ৩) তরুণ সংঘ কর্তৃক ১টি ভেড়া ৪) বলাই মাহাত নগদ ১০ টাকা ৫) গোলাম মাহাত ১৯ টাকা ৬) হলধর মাহাত ২১টাকা ৭) জিতেন্দ্রনাথ মাহাত ২১টাকা ৮) শিবরাম মাহাত ১৫ টাকা ৯) অরুণ কর্মকার ২৩ টাকা ১০) যুধিষ্ঠির মাহাত ১০ টাকা ১১) মনোহর মাহাত ১১ টাকা ১২) জ্যোতি মাহাত ২১ টাকা ১৩) বীরেন মাহাত ১৫ টাকা ১৪) সন্তোষ মাহাত ১৫ টাকা ১৫) দেবুলাল মাহাত ২১ টাকা ১৬) শত্রুঘ্ন মাহাত ১৫ টাকা ১৭) ভখু মাহাত ১টি লুঙ্গি ১৮) ছুটু মাহাত ১টি গামছা ১৯) সীতারাম মাহাত ১টি গেঞ্জি ২০) ঠাকুরদাস মাহাত ১টি লুঙ্গি ২১) গোপাল মাহাত ২ জোড়া পায়রা বাচ্চা ২২) বলাই মাহাত ১টি বালতি ২৩) উত্তম মাহাত ১টি লুঙ্গি ২৪) অজিত মাহাত ১ কেজি জিলাপী ২৫) অশোক মাহাত ১কেজি জিলাপী ২৬) নিতাই রাজোয়াড় নগদ ২৯ টাকা ২৭) পবন রাজোয়াড় নগদ ১০ টাকা।

বি.দ্র. সর্বশ্রী বিশ্বনাথ মাহাতর ১টি কাড়া-ই ১টি ভেড়া। সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত কাড়া-লড়াই হইবে।

পরিচালনায় উঁচালী তরুণ সংঘ, পুরুলিয়া। ১৯৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

টুসুর লোক-কাহিনী ও ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্য

বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতিবিশেষজ্ঞের মতে, "সংক্রান্তিনির্ভর ব্রতোৎসব গুলি সম্পূর্ণরূপে যে সৌরপঞ্জিকাভিত্তিক সে কথা বলাই বাহুল্য। .. সংক্রান্তির দিন সূর্য একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে সম্পূর্ণরূপে সরে যায় বলে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে সংক্রান্তিকে বিশেষ দিনরূপে ধার্য করা হয়েছে।

"বৈশাখ থেকে চৈত্র—-এই বারো মাসে যথাক্রমে মেষ-বৃষ-মিথুন-কর্কট-সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিক-ধনু-মকব-কুম্ভ এবং মীন রাশিতে সূর্য বিচরণ করে বলে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান মনে করেছে। প্রত্যহ ১° করে সরতে সরতে ৩০ ডিগ্রীর একটি একক (Unit) সূর্য পার হয় ৩০ দিনে; সূর্যের এই 'সংক্রমণের' নাম সংক্রান্তি।

"ব্রতের ক্ষেত্রে সংক্রান্তি দিনগুলির তাৎপর্য তাই বেশ খানিকটা পরিমাণে রাশিচক্রের আবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। পূর্বতন চান্দ্রপঞ্জী—যা আদিম অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং পরবর্তী সৌরপঞ্জী ---যা উন্নততর বিজ্ঞান বোধ সঞ্জাত — এই দুই সংমিশ্রিত হয়েছে ব্রতপালনের সময়, ক্ষণ, তিথি, বার, দিন ইত্যাদি নিরূপণের ক্ষেত্রে। এত হিসেব ব্রতিনীরা হযত করেন না; কিন্তু লৌকিক ধর্মধারার ওপরে পরিশীলিত জ্ঞানচর্যার প্রতিভাস পড়ে এই ব্যাপারটা সম্ভব করে তুলেছে। ব্রতকথার প্রসঙ্গে এই লৌকিক-নাগরিক অনুভাবনার বহমানতার কথাটি মনে রাখতেই হবে।"

টুসু শস্যদেবী। শস্যভাবনায় উর্বরতাবাদ (Fertility Cult) ক্রিয়াশীল। শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রে সৌরভাবনার ইঙ্গিত দেয়। তা পূর্বেই (চতুর্থ অধ্যায়ে) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। টুসুর উৎসভূমি বাঁকুড়ায় টুসর 'আলোখলা'-য় শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্রের ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। সেই 'আলোখলা'-য় থাকে ধানের তুষ, কড়ি, গোবরগুলি, সর্ষে-মূলো প্রভৃতি উর্বরতাসূচক উপচার। টুসুব্রতিনীরা 'টুসুখলা' বা 'আলোখলা' প্রতিষ্ঠা করে সারা পৌষ মাস টুসুগান গায়। বাঁকুড়া শহরের প্রত্যন্ত সীমানায় পোবকুলের টুসুমেলায় প্রচলিত কিংবদন্তী লোক কথা ব্যতীত সারা বাঁকুড়ায় টুসুর কোন লোক-কাহিনীর প্রচলন নেই। অথচ বাঁকুড়ার পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা—সেই একদাখ্যাত মানভূম অঞ্চলে টুসু কাহিনীর একাধিক রূপ প্রচলিত। সেই সব লোক-কাহিনীর মধ্যে ওই অঞ্চলের প্রাকৃত জীবনের বিচিত্র কল্পনার স্বপ্নাভিসার-চিত্র ফুটে ওঠে; এবং তার মধ্যে মানভূমে একদা বহুল প্রচলিত 'কহানী' বা রূপকথার ধারাটিও বিদ্যমান।

এ যাবৎ টুসু-সম্পর্কিত দুটি লোক-কাহিনী পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। প্রথমটি নিম্নরূপ ঃ

মাহাত-সম্প্রদায়ের এক সুন্দরী মেয়ে, নাম তার রুক্মিণী হলেও ডাকনাম ছিল টুসু। চন্দ্রকলার মতো দিনে দিনে তার রূপ বৃদ্ধি ঘটেছিল। ফুল ফুটলে যেমন আসে ভ্রমর,

তেমনই তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল এক সুঠাম কূর্মী যুবক। তাদের ভালো-লাগা থেকে ভালোবাসার পর্ব যখন পরিণতির দিকে, তখনই ঘটে এক অঘটন। একদল মুসলমান হঠাৎ কূর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়, লুঠ করে তাদের ধনসম্পদ; সেইসঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায় টুসু আর তার প্রণয়ীকে। ভাগ্যক্রমে প্রণয়ীযুগল বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলেও তাদের গ্রহণ করে না কূর্মীসমাজ। কারণ, তারা বিধর্মীর স্পর্শদোষে লাঞ্ছিত। টুসুকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাওয়ার পথে তীব্রতর বাধায় অভিমানক্ষুব্ধ প্রেমিক গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়। টুসুও গভীর দুঃখে ও হতাশায় কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে টুসুর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার খবর দ্রুত ছড়ায়। কিশোরী-কুমারীরা টুসুর বিরহবেদনায় সমব্যথী হয়। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে খবর ছড়ায়—টুসু তার প্রেমাস্পদের সন্ধান পেয়েছে সুবর্ণরেখার তীরে। সকলে মিলন দৃশ্য দেখার জন্য ছুটে যায় ইচাগড়ে। সবাই দেখে এক অভিনব সন্ন্যাসীকে – তিনিই নাকি টুসুর প্রেমিক, দীর্ঘবিরহে তাঁর বিরহখিন্ন সন্ন্যাসরূপ!

টুসুর সঙ্গে তার প্রেমিক সন্ন্যাসীর মিলন হলেও তাদের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ, দীর্ঘদিন অনিদ্রায় অনাহারে বিরহক্লিষ্টা টুসু বাঞ্ছিত প্রণয়ীকে কাছে পেয়েও অসহ্য তীব্র আনন্দানুভূতিতে পৌষ-সংক্রান্তির দিনে প্রাণ হারায়। ইচাগড়ের সতীঘাটায় এই চিরন্তন প্রেমের নাটকীয় দৃশ্য দেখে উপস্থিত নরনারীরা স্তম্ভিত হয়। তখন থেকেই নাকি সিংভূমের সুবর্ণরেখার তীরবর্তী সতীঘাট টুসুর প্রেমকরুণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

টুসু-সম্পর্কিত দ্বিতীয় লোক-কাহিনীটিও মাহাত-সম্প্রদায়ভুক্ত। সেখানে কল্পনার সুদূরপ্রসারিতা চিত্তচমৎকারিত্বের কারণ হয়। কাহিনীটি নিচে বিবৃত হল।

জঙ্গলমহলের নিবিড় অরণ্যছায়ায় ছোট বড় অনেক জমিদারের মতো এক কূর্মী জমিদার পরম সুখে কালাতিপাত করতেন। কথায় বলে—মাহাত আরজে চিনি, খায় পানি। অর্থাৎ তারা খুবই পরিশ্রমী এবং কৃষিপ্রিয়-অচঞ্চল সঞ্চয়ী সম্প্রদায়। রূপকথাধর্মী 'এক যে ছিল রাজা'-র মতো সেই নাম-না-জানা জমিদারের ছিল পরমাসুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মতো এক মেয়ে; নাম তার টুসু। সবাই টুসুর রূপেগুণে মুগ্ধ, প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জমিদার-নন্দিনী টুসু তো কৃষিজীবী পরিবারেরই মেয়ে। তাই তরুলতায় সঙ্গে তার প্রাণের নিবিড় যোগ; বাগান-করা তার সবচেয়ে প্রিয় শখ। জমিদার তাঁর সাতমহলা বাড়ির ভেতর খোলামেলা এক সুন্দর জায়গায় মেয়ের জন্য বাগান গড়েছিলেন। টাইড় বাইদের দেশের মাঝে সেই বিরল সুরম্য উদ্যানে টুসু তার সখীদের নিয়ে বনদেবীর মতো বেড়াতেন। সবুজ গাছপালার সতেজ প্রাণের উচ্ছ্বাসে তার মনোবীণায় বেজে উঠত অচিন দেশের রাগিণী। বেশ আনন্দে বর্ষার সতেজ লতার মতো বেড়ে উঠছিল টুসু।

তখন এক প্রবল প্রতাপযুক্ত নবাব গৌড়েশ্বর। শাসনসংক্রান্ত নানা ব্যস্ততার মাঝেও নবাব একমাত্র পুত্রের দুরারোগ্য অসুখের জন্য গভীর মনোবেদনা অনুভব করতেন। রাজ্যের হাকিম-বৈদ্যরা চিকিৎসায় হতাশ হলেও অবশেষে একদিন হঠাৎ এক ফকিরের আবির্ভাব ঘটল নবাবের দরবারে। তিনি নবাবকে বিশিষ্ট এক জ্যোতিষীর কাছে গণনার

জন্য যেতে অনুরোধ করলেন। ফকিরের পরামর্শ অনুযায়ী নবাব সেই জ্যোতিষীর কাছে যান, তখন জ্যোতিষী গণনায জানান, নবাব পুত্রের কঠিন অসুখের নিরাময় ঘটবে. নবাব যদি পুকুরে-ফোটে-না এমন পদ্মফুল আর গাছে-ফলে-না এমন আম সংগ্রহ ক'রে, সেই দুর্লভ দুটি [illegible] একত্রে শিলে বেঁটে রোগগ্রস্ত পুত্রকে খাওয়ান!

জ্যোতিষীব ওরূপ অভিনব নিদানে বেগমসাহেবা এবং অন্যান্য পাত্র-মিত্র-অমাত্যবা শুধু আশ্চর্যবোধ করলেন না, রীতিমতো ক্ষুব্ধও হলেন। অথচ জ্যোতিষীর ওপর গভীর বিশ্বাস নিয়ে শুধু নবাব হাল ছাড়লেন না। অভীষ্ট সাধনেব আশায় দেশে দেশান্তরে তিনি দূত বা চর পাঠালেন। দেশজুড়ে ঘোষণা করা হল—সেই দুর্লভ পদ্মফুল ও আম যে ব্যক্তি সংগ্রহ করে দিতে পারবে, তাকে ইনাম দেওয়া হবে হাজার হাজাব স্বর্ণমুদ্রা। দিনের পর দিন যায়, অথচ নবাব কোন আশার আলো দেখতে পান না!

গৌড়ের নবাবের মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের কথা এবং জ্যোতিষীপ্রদত্ত অভিনব চিকিৎসাপদ্ধতির কথা দেশদেশান্তবে ক্রমশ ছড়ায এবং টুসুর কানেও যায়। হঠাৎ একদিন সকালে টুসু অবাক হয়ে যায়। তার নজরে আসে—শখের বাগানে লোহার জলপাত্রে ফুটেছে একটিমাত্র অপরূপ পদ্মফুল, আর ফুলদানির পুষ্পস্তবকের সঙ্গে রাখা আম্রপল্লবে ফলেছে একটি চিকনসবুজ আম! আনন্দে অধীর হয়ে টুসু সকলকে সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখায। তখন টুসুর বাবা ঐ ঘটনার কথা যাতে বাইরে না-ছড়ায, সে মত নির্দেশ দেন। কাবণ, ওই আশ্চর্য ঘটনার কথা নবাবের কানে পৌঁছালে তিনি অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য বা তারপরও টুসুকে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা করতে পারেন। অথচ কিশোরী টুসু যেন দয়া ও করুণার মূর্তিমতী রূপ। তার প্রিয় বাগানের ফুল ও ফলে একজন মৃতপ্রায় যুবক প্রাণ ফিরে পাবে—এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? এরকম ভেবে টুসু পদ্মফুল ও আমটি নবাবের কাছে উপহার পাঠিয়ে দেওয়ার জেদ ধরে। তাই দেখে টুসুর বাবা মেয়ের পরোপকার বাসনাকে চরিতার্থ কবার জন্য দূত মারফত পদ্মফুল ও আমটি গৌড়েব নবাবের কাছে প্রেরণ করেন।

টুসুর বাগানের পদ্মফুল ও আম একত্রে বেঁটে খাওয়ানোর পর নবাবপুত্রের ঘটে বোগমুক্তি। তখন কৃতজ্ঞতায অভিভূত নবাব টুসুকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করতে চান। কিন্তু নির্লোভমনা টুসু কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না-করে জানায়, তার বাগানের ফুল ও ফলে একজনেব জীবনরক্ষা হয়েছে, তাতেই তার আনন্দ।

দূত মুখে টুসুর উদারতায় নবাব মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁর পাত্রমিত্রঅমাত্যরা পরামর্শ দেন—টুসু যদি নবাবপুত্রের জীবনসঙ্গিনী হয়, তবে ভবিষ্যতে কঠিন অসুখ থেকে নবাবপুত্র নিরাময় হতে পারবে। তাছাড়া কিশোরী টুসু প্রকৃত সুন্দরী ও সুলক্ষণা, তাই নবাবপুত্রের সঙ্গে তার যদি সাদী হয়, তবে উভয়ের জীবন আনন্দময় হবে।

নবাবের বিশেষ দূত জঙ্গলমহলের কূর্মী জমিদারের কাছে নবাবপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্তু টুসুর বাবা মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অনাগ্রহী হয়। ঐ বিবাহে টুসুরও ঘোরতর আপত্তি ছিল।

নবাবের দূত গৌড়ে ফিরে যায়। নবাব সামান্য কূর্মী জমিদারের ঔদ্ধত্যে অপমানিতবোধ করেন। তাই সৈন্যসামন্তসহ টুসুকে বলপূর্বক হরণ করে নিজের ছেলের সঙ্গে সাদী দেওয়ার ফন্দী আঁটেন।

মুসলমান নবাব বিশাল সৈন্যদল নিয়ে জঙ্গলমহলের দিকে এগিয়ে আসছেন, দূত মুখে এ খবর পেয়ে টুসুর বাবা জমিদারী মহল ছেড়ে সপরিবারে গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। গভীর বনপথে চলতে-চলতে তিনি সপরিবারে এক সাঁওতাল রাজার আতিথ্যলাভ করেন। সেদিন সাঁওতাল রাজ্যে ছিল 'পাতা-পরব'। খানাপিনা ও আদিবাসী নৃত্যেগীতে সকলে মতোয়ারা। তারই মাঝে সাঁওতালরাজ শপথ করলেন, ভাগ্যবিড়ম্বিত কূর্মীজমিদার ও তাঁর মেয়ের ইজ্জত রক্ষায় তিনি সদলবলে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। উৎসবের অঙিনায় সাঁওতাল মেয়েরা টুসুকে প্রাণের প্রিয় সঙ্গী হিসেবে বরণ করে নিল। টুসু আর তার মা-বাবা মনের দুঃখ কষ্ট ভুলে সাঁওতালদের সঙ্গে আনন্দ উৎসবে বিভোর হল। নাচগানের শেষে সাঁওতালরাজ কন্যাসমা টুসুকে অনুরোধ জানালেন, বিশিষ্ট সাঁওতাল প্রতিনিধিদের অন্ন পরিবেশন করার জন্য। পিতৃতুল্য সাঁওতালরাজের অনুরোধ টুসু সানন্দেচিত্তে রক্ষা করে।

টুসু যখন সাঁওতালরাজের অভ্যাগতদের অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করছিল, তখনই নাটকীয় ভাবে দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঘটে মুসলমান নবাবের সৈন্যদলের অতর্কিত আক্রমণ। সাঁওতালরা খাবার ছেড়ে ধরল তীর-ধনুক। বেজে উঠল মাদল, কাড়ানাক্ড়া। শনশনিয়ে ছুটল তীর—শ্রাবণের জল ধারার মতো। কিন্তু বিশাল নবাব সৈন্যের তীব্র আক্রমণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা সাঁওতালদের ছিল না। তাই সাঁওতালরাজ উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ে সকল যোদ্ধাকে নির্দেশ দিলেন, তীরের ফলায় রান্না-কবা শূকর মাংসের টুকরো গেঁথে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করতে। সেই 'হারামী' কাজে মুসলমান সৈন্যরা বিচলিত হয়ে ধর্মরক্ষায় ছত্রভঙ্গ হল। সাঁওতালরা কূর্মী জমিদার ও তার মেয়ের সম্মান রক্ষা করতে পারায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল।

অথচ কূর্মী জমিদার এবং তার মেয়ে টুসুর মনে শান্তি নেই। মুসলমান নবাবের সৈন্যদল আক্রমণ চালাতে এসে পরাহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আবার যে তারা আক্রমণ চালাবে না, একথা কে বলবে? তাই সুন্দরী টুসুর বিয়েব সম্বন্ধের কথা ভাবলেই কূর্মী জমিদারের মনে দানা বাঁধে উদ্বেগ আর আশঙ্কা। টুসুও মনে মনে অনুভব করছে, সে কুমারী বা বিবাহিতা যে রূপেই থাকুক না কেন, মুসলমান নবাবের লুব্ধ আক্রমণ থেকে তার নিষ্কৃতি মিলবে না। তাই উদ্বেগ ও অশান্তি নিয়ে ক্রমশ স্বজন-হারানোর নির্মম পরিণতির মানসিক প্রস্তুতি অপেক্ষা মৃত্যু টুসুর কাছে শ্রেয় মনে হয়। অবশেষে দুশ্চিন্তার তুষের আগুন থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্য টুসু সকলের অলক্ষ্যে পৌষ সংক্রান্তির দিন কাঁসাই নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

টুসুর নিরুপায় প্রাণ বিসর্জনের দুঃসংবাদে প্রিয়জনদের কাছে নেমে আসে বিষাদ ও গভীর শোক। গৌড়ের নবাবের কাছেও ক্রমে পৌঁছায় সেই দুঃসংবাদ। হীন স্বার্থপরের মতো যুক্তিহীন, ক্রোধান্ধ হয়েছিলেন—একথা মনে মনে ভেবে নবাব-ও অনুতপ্ত হন।

আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে মানবী টুসু দেবীত্বের মহিমায় উন্নীত হন। তাই পৌষ সংক্রান্তির দিন কাঁসাই নদীর বিভিন্ন ঘাটে টুসু-বিসর্জনের দৃশ্য যেন সুদূর অতীতের অশ্রুসজল বিষাদান্ত অধ্যায়ের স্মরণপর্ব বিশেষ। আজও তাই পৌষ-সংক্রান্তির দিন দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার বাউরি, বাগদি, কূর্মী মাহাত, কামার-কুমার এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের কিশোরী যুবতীরা চৌডল হাতে স্থানীয় নদী বা জলাশয়ে টুসু ভাসানে যায়।

বৃহত্তর পুরুলিয়া—যা একদা মানভূম নামে খ্যাত ছিল, সেখানে প্রভাবশালী কূর্মী মাহাত সম্প্রদায়, কৃষি যাদের প্রধান জীবিকা, তারা টুসুকাহিনীকে নিজেদের ভাবনা ও কল্পনায় একান্ত আপন করতে চেয়েছে। কারণ, প্রাকৃত নরনারী দেবদেবীর তাত্ত্বিক বা অতিপ্রাকৃত রূপকে প্রচলিত জীবনধারার রসে সঙ্গীকরণ করার মধ্যে পেয়েছে মনের তৃপ্তি। তাই দেবাদিদেব মহাদেব এবং জগন্মাতা পার্বতীকে আমরা একান্তভাবে ঘরোয়া করে নিতে দ্বিধা করি নি। এ প্রসঙ্গে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ "এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাস-জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্য্যা পার্বতী ঠাকুরানীর জীবন-কাহিনী।"[৩] রাধাকৃষ্ণের কাহিনীও বাঙালির জীবনরসে রঞ্জিত হয়ে বাঙ্‌লারই যেন কাহিনী।

উপরিউক্ত দুটি লোক-কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—মিলন নয়, অতলান্ত বিরহ; ভোগপূর্ণ নিরুপদ্রব জীবনচর্যা নয়, নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রণয়ের শোকাবহ পরিণতি জনজীবনের কাছে, বিশেষত নারীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও পূজ্য বিষয় হয়। তাই শোকাবহ অনিবার্য পরিণতির জন্যই বুঝি তথাকথিত বিধর্মী মুসলমান প্রসঙ্গ সহজ নাটকীয়তায় এসেছে। তবে দ্বিতীয় কাহিনীটিতে কূর্মী জমিদারের সঙ্গে সাঁওতালরাজের তথা সাঁওতাল সমাজের সহজ বন্ধুতার মধ্যে একটি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইঙ্গিত করে। ই. টি. ডালটন কূর্মীদের আর্যবংশসম্ভূত[৪] বললেও এইচ. এইচ. রিজলি মন্তব্য করেছেন, "The Kurmis may be Hinduised branch of Santals."[৫] বিনয় মাহাত রিজলির মন্তব্য সম্পর্কে সংশয় দেখিয়েছেন,[৬] অথচ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত স্বীকার করেছেন, "কূর্মিদের সঙ্গে সাঁওতালদেরও অনেক বিষয়ে মিল আছে। সাঁওতালরা কূর্মিদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে থাকে। সাঁওতালরা অন্য উপজাতির রান্না-করা খাবার গ্রহণ করে না, কিন্তু মাহাতদের রান্না অন্ন গ্রহণ করে। মাহাতদের বিয়ের 'শিরি বারি ডালা' একদা সাঁওতালে বহন করত অনিবার্যভাবে। সাঁওতালদের মতোই কূর্মিরা ব্রাহ্মণদের অন্নও একদা গ্রহণ করত না। এখনো অনেকেই গ্রহণ করে না, নারী সমাজ তো কোনদিনই ব্রাহ্মণের রান্না খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করেনি। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষের সময়েও বাঙালি ব্রাহ্মণদের রান্না-করা লঙ্গরখানার খাবার কূর্মি এবং সাঁওতালরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কূর্মিদের এই খাদ্য-অভ্যাসও তাদের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থা বহির্ভূত আদিম উপজাতিত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করে।

"ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কূর্মিরা আদিম উপজাতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই সম্প্রদায় কূর্মক্ষত্রিয় নামে চিহ্নিত এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। .... ইংরেজ সরকার কূর্মিদের লোকগণনায় কূর্মক্ষত্রিয় নাম ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রচারপত্রে সরকারী দুটি পত্রের বাংলা অনুবাদও ছিল। . দ্বিতীয় পত্রটি অখিল ভারতীয় কূর্মিমহাসভার প্রধান সম্পাদককে ভারতের জনগণনা কমিশনার মিঃ জে এইচ. ইটন. লিখেছিলেন। তাঁর চিঠির সংখ্যা ছিল ঃ নং ৫ ই. এন. এম. এন তারিখ দিল্লী ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩০। তিনি লিখেছিলেন, 'মহাশয়, আপনার ৬/১১/৩০ তারিখের ১৯৪৪নং পত্রের উত্তর দিয়া অবগত করিতেছি যে সেনসাসের জেনারেল সিডিউলে অর্থাৎ রেকর্ডে কূর্মীজাতিকে কূর্মিক্ষত্রিয় লিখাইবার আমার আপত্য নাই, কূর্মক্ষত্রিয় শব্দের অতিরিক্ত অর্থাৎ স্থানীয় জাতির নাম বা উপজাতির নাম দিয়া যথা রাজবংশীয়, কুন্বি বা রেড্ডি ইত্যাদি। কেন না (তাহা না হইলে) পূর্ব মনুষ্যগণনায় আপনাদের জাতি সংখ্যার সহিত আগামী মনুষ্যগণনার জাতিসংখ্যা মিলানো সম্ভব হইবে না।"[৬]

আবাল্যশোনা সাঁওতালী লোক-সংগীতেও কূর্মীমাহাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাঁওতাল জীবনের সহজ সখ্যের ইঙ্গিত আছে। গানটি এ রকম ঃ

তিল বাড়ি তিরি জন
বিরি বাড়ি বার জন
কী কুরি হইল কুড়িজন?

কম্বেড়খুটু কুড়মি' কুড়ি মঁড়ে হড়
সে হ মেশা হইল কুড়ি জন।।

[অর্থাৎ ঃ তিল ক্ষেতে আছে তিনজন মেয়ে, আর বিরিক্ষেতে (বিউলি কলাইয়ের ক্ষেতে) বার জন; তা সত্ত্বেও কুড়িজন হল কেন?

—সেইসঙ্গে আছে কম্বেড় খুটু গাঁয়ের পাঁচজন কূর্মী (কুড়মি) মেয়ে। সবাই মিলে কুড়িজন।]

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় কাঁসাই তীরবর্তী পোরকুলের টুসুমেলায় প্রচলিত লোক-কাহিনীতে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ কাল্পনিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ এক রাজা গঙ্গাস্নানে গিয়ে তাঁর সোনার লাঠি হারান। সোনার লাঠির শোকে যখন তিনি কাতর, তখন একরাতে দৈবী স্বপ্নাদেশ পান। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি পোরকুলের কাঁসাই নদীর ঘাটে স্নান করেন এবং ফিরে পান তাঁর হারানো প্রিয় লাঠিটি। চৈতন্য পার্ষদ অভিরাম গোস্বামীকে নিয়ে অনুরূপ একটি কাহিনী বাঁকুড়ায় ক্ষীণভাবে প্রচলিত আছে।

বাঁকুড়ায় প্রচলিত টুসুর লোক-কথায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির, বিশেষত বৈষ্ণবভাবনার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তার কারণ, প্রাচীন বাঁকুড়ার তথা পরবর্তীকালে মল্লভূমের ক্রম-বলয়িত

বৈষ্ণবতরঙ্গ। তাই মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গ টুসুগানে বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। যথা —

বিষ্ণুপুরে গেছলে টুসু কী কী সন্দেশ উঠেছে।
অ্যাড়াব্যাড়া ঝিল্‌পি-খাজা ফুলংতেলে ভাইজেছে।।

টুসুর উদ্দেশে ভোজনপ্রিয় লোক-কবি যে কথা প্রকাশ করেছেন, সে কথা তাঁর মনেরই বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসা এবং যুগপৎ উত্তর ও! অর্থাৎ জিলিপি-খাজা অ্যাতো সুস্বাদু, যেন তা ফুলেল তেলে ভাজা হয়েছে।

ইতিহাস বিশ্রুত দলমাদল ও মদনমোহন কাহিনীও টুসুগানে ধরা পড়ে—

বিষ্ণুপুরের দলমাদলকে কেউ দাগিতে লাইরেছে।
সাবাস সাবাস মদনমোহন দলমাদলকে দাইগেছে।।

কিন্তু তারপরই চলমান জীবনের আশা-নিরাশার অভাব-দৈন্যসঞ্জাত ক্ষোভ—

যখন ছিল মদনমোহন তখন ছিল বৃন্দাবন।
মদনমোহন চইলে যাইয়ে হইয়েছে চাকুন্দার বন।।

তবু, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিলন-রাজধানী বিষ্ণুপুর! তাই সেখানে সোনার হরিণের মতো সোনার টুসুও রক্তমাংসের নারী হয়ে হেঁটে যায়। লোক-কবি গেয়ে ওঠেন—

বিষ্ণুপুরে দেখে আইলম্‌ সনার টুসু যায় চইলে।
হাথে আমার পয়সা নাই গো লিতম টুসু দর কইরে।।৭৭

রূঢ় বাস্তবের আঘাতে লোক-কবির মায়াবী কল্পনা ভেঙে যায়; তখন চোখের সামনে সাধারণ শরীরী নায়িকাকে দেখে আত্ম সান্ত্বনার সুরে বলেন—

কে বলে রে, কে বলে বে, আমার টুসু কাল বে।
বিষ্ণুপুরী হলুদ আইনে গা করিব আল্‌অ রে।।

বাঁকুড়ার জয়বেলিয়া ও বাইশগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষিজীবী বহু ক্ষত্রিয় পরিবারের কিশোরীরা এখনও টুসুগানে কিশোরী টুসুর বিয়ের প্রস্তুতির জন্য 'টাকার মুথুলি' নিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় ভ্রমণ করার কথা গেয়ে থাকে। সেখানে তাদের নিজস্ব মানসিকতা বা কল্পনার প্রক্ষেপণ (Self Projection) ঘটে। যথা—

পদ্দারভাই পদ্দার ভাই ঘরে আছ হে।
আমার টুসুর বিহা হবেক মল চাই হে!।

কল্পিত স্বর্ণকার টুসুর মল তৈরী করে দেয়। তারপর গান—

মল ত দিলেক হে অনেক যতনে।
পাঁয়ে পঞ্জব না দিলে মল সাইজ্‌বেক ক্যামনে।।

তারপর কল্পিত কামার, কুমার, তাঁতী, ময়রা, নাপিত প্রভৃতিদের ঘরে যাওয়া এবং টুসুগানের মাধ্যমে কিশোরীমনের রূপাভিসার ব্যক্ত ঃ—

ক) কামার ভাই কামার ভাই ঘরে আছ হে।
আমার টুসুর বিয়া হবেক গইরা চাই হে।।

খ) কুমার ভাই কুমার ভাই ঘরে আছ হে।
আমার টুসুর বিয়া হবেক হাঁড়ি চাই হে।।

গ) তাঁতী ভাই তাঁতী ভাই ঘরে আছ হে।
আমার টুসুর বিয়া হবেক শাড়ী চাই হে।।

ঘ) ময়রা ভাই ময়রা ভাই ঘরে আছ হে।
আমাব টুসুর বিয়া হবেক লাড়ু চাই হে।।

ঙ) লাপিত ভাই লাপিত ভাই ঘরে আছ হে।
আমার টুসুর বিয়া হবেক ফুল চাই হে।।

ফুল ত জগালে ভাই পরম যতনে।
আলতা না পরাইলে কইন্যা সাইজ্‌বেক ক্যামনে।।

তারপর টুসুর অঙ্গসজ্জা—

টুসু সিনাচ্ছেন গা দুলাচ্ছেন হাতে তেলের বাটি।
নুয়ে-মুয়ে চুল ঝাইড়ছেন পাঁইয়ে জিঁজির কাঁঠি।।
হাথে দুব দুইধা শঙ্খ পরনে নীল শাড়ি।
গলায় দুব গজমতি—টুসু যাবেক শ্বশুর বাড়ি।।

টুসুর বিয়ের প্রস্তুতিসূচক খণ্ডখণ্ড চিত্র সম্বন্বিত টুসুগানগুলি বাঁকুড়ার শালতোড়া-তিলুড়ী থেকে বাঁকুড়া-সংলগ্ন পুরুলিয়ার লেদাসন, বেড়ো প্রভৃতি গ্রামেও শোনা যায়।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং আরও বহু অঞ্চলে টুসুপূজা হয়। স্বাভাবিকভাবে টুসুগানে মেদিনীপুরের কথা ফুটে ওঠে—

ক) মেদ্‌নীপুরে দেইখে আইলম্ ডালায় ডালায় দুধবালা।
আমার টুসুর নাইখ ছেইলা কাকে দুব দুধবালা।।

খ) মেদ্‌নীপুরে দেইখে আইলম্ কাড়া লড়াই লাইগেছে।
দু'ধারে দুই শিং পইড়েছে রক্তে বান বইহেছে।।

গ) আমার টুসু ফুল কইরেছে ঝাড়গাঁ গড়ের রানীকে।
মনে মনে চিঠি ছাড়ে গলাপ ফুলের ভিতরে।।

মেদিনীপুরের প্রান্তবর্তী হাউর কিংবা হাওড়ার অন্তর্গত বাগনানের কথাও টুসুগানে শোনা যায়—

যা রে পাখি যা রে উড়ি বাগনান কি হাউরে।
টাকা পয়সা কী হবে মোর দেইখ্‌ব তাকে এ ঘরে।।

টুসুগানে কয়লাখনি অঞ্চলযুক্ত পশ্চিম বর্ধমান এবং দামোদর নদীর বাঁধের কথাও শোনা যায়। যথা—

ক) চল্‌ টুসু চল্‌ দেইখ্‌তে যাব রানীগঞ্জের বটতলা।
আসার সময় দেইখে আইস্‌ব কয়লা খাদের জলতুলা।।

খ) ডি ভি.সি. র লোক কত সিয়ান পাথর কাইটে ক্ষয় করে।
ধারে ধারে বিজলিবাতি ফুকরে জল পাস্‌ করে।।

পুরুলিয়ার প্রসঙ্গও টুসুগানে বারবার এসেছে। যথা—

ক) পুরুল্যার পত্নী পকা উইরে গেলে ধইর্‌ব না।
যার সগে যাব ভালবাসা মইরে গেলেও ছাইড্‌ব না।।

খ) পুরুল্যাতে দেইখে আইলম সনার ডানায় দুধবালা।
আমার টুসুর নাইক ছেইলা কাকে দুব দুধবালা।।

গ) বেড়ো যাব পদ্ম আইন্‌ব সেনাই দুব সিংহাসন।
তার ভিতরে খেলা কইর্‌বেক রাজকুমারী টুসুধন।।

ঘ) হামার টুসুর একটি ছেইলা মানবাজারে শ্বশুরঘর।
কলসীর উপর কলসী রাইখে পালাই আইল বাপের ঘর।।

ঙ) পুরুল্যা দেইখে আইলম্‌ দালানে ধান পইরেছে।
এমনি চাষায় চাস কইরেছে শিয়ালে ধান মাইড়েছে।।

চ) কাশীপুরের বাসী কাপড় বাগধি মা পেড়ায় ভইরে।
আমরা সবাই মইরে গেলে কাঁদবি মা পেড়া লইরে।।

ছ) মাঠাবুরুয় কী পাবি?
সতীমেলায় পতিফল পাবি।
সতীমেলায় কী আছে লো?
কানভরা কানদুল আছে লো।।

জ) সিলিক্‌ শাড়ি ধূলায় পইড়্‌কিছে।
যেন মাঠাবুরু ঝইল্‌কিছে।।

শিল্পনগরী টাটা এবং দল্‌মার নীল পাহাড়ের সারিও টুসুগানে ফুটে উঠেছে—

ক) ধইন্য মা টুসুরানী।
বন কাইটে বানাইলে বসত
টাটা আইরন কম্পানি।।

খ) মনের এই বাসনা—
টুসু মাকে জলে দুব না।
দেইখতে লেইগ্‌ব টাটার কারখানা।।

গ) তুই ভাইবছ কিগ ফুলমণি।
কাজ খুইলেছে টাটা কম্পানি।।

ঘ) টাটার বিজলি বাতি।
মিনা তেলে জ্বইল্‌ছে গ সারারাতি।।

ঙ) এ পারেতে ডিব্‌রী বাতি
ও পারেতে বিজলী বাতি।
ছল কইরেছে টাটা নগরী।।
টাটা যাব আইনব আটা
বেনাই দুব পরটা
টুসু পরবে।।

চ) ও তর টাটা যাওয়া ছাড়াব।
ডাকগাড়িতে কুলুপ লাগাব।।

ছ) আমার টুসু রাঁচি যাবেক সঙ্গে চাকর ছয়জনা।
কালীমাটি হইয়ে ফিইর্‌বেক দেইখে টাটার কারখানা।।

জ) দল্‌মা পাহাড়ের উপর হাঁসা পাথর লড়ে গ।
আমার টুসুর গউর বরন হেইলে দুইলে চলে গ।।

মুসাবনী-ঘাটশিলা-চাইবাসা-গৌতমধারা (রাঁচি) প্রভৃতি অঞ্চলের কথাও টুসুগানে বিবৃত—

ক) অ বিলাতি তখেই টক করি।
আমরা মুসাবনীর হাট করি।।

খ) ভাদর-আশ্বিন মাসে।
ঘাটশিলাতে শখের বিঁধা হাট বসে।।

গ) অ ভালবাসা।
তুমি চইলে গেলে চাইবাসা।।

ঘ) গৌতমধারায় দুজনায় যাব।
একটি মিঠাই দুজনায় খাব।।

একদা বিস্তীর্ণ ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে অভাবগ্রস্ত, সরল আদিবাসীদের রঙিন সুখের জীবনের আশায় প্রলুব্ধ করে, ধুরন্ধর আড়কাঠিরা দার্জিলিং-আসামের বিভিন্ন চা-বাগানে কুলি-কামিন হিসেবে চালান দিত। এখনও ঐ অঞ্চলের বহু স্বদেশীয় কুলিকামিনের

স্মৃতিতে রাঁচী-হাজারিবাগ-মানভূমের কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে—১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে আড়কাঠি মারফত চা-বাগানে ১৮০৮৩১ জন শ্রমিক চালান দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে পুরুষ ১০২৫৫৭ এবং নারী ৭৮২৭৪ জন। 'দিল্লীকা লাড্ডু'-র মতো যারা আসাম যাওয়ার প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে যেত, তারা সেখানে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ হতো এবং দেশে ফেরার পথ না দেখে করুণ সুরে মনোবেদনা প্রকাশ করত। লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ গায়ক কালী দাশগুপ্তের তথ্য সংগৃহীত একটি গানের করুণ মূর্ছনা আমাদের ব্যথিত করে। গান এরকম—

চল মিনি আসাম যাব
দেশে বড় দুখরে।
আসাম দেশে রে মিনি
চা-বাগান হরিয়াল।।

কোড়া মারা যেমন তেমন
পাতা-তুলা কাম গো।
হায় যদুরাম ফাঁকি দিয়ে
পাঠালি আসাম।।

এক পয়সার পুঁটি মাছ
কয়া গলার তেল গো।
মিনির বাপে মাগে যদি
আরও দিব ঝোল গো।।

ছেইলা কাঁদে টিহির্ টিহির্
গাগরিয়ে জল নাই।
বাপ-দাদা রে বাঞ্ছা
মুরলী বাজায়।।

সর্দার বলে—কাম কাম
বাবু বলে—ধরি আন।
সাহেব বলে—লিব পিঠের চাম।
রে যদুরাম ফাঁকি দিয়ে
পাঠালি আসাম।।

অন্যদিকে যাদের কপালে আসাম যাওয়ার দুর্ভাগ্য ঘটত না, তাদের চোখে চা-বাগানের সুখস্বপ্ন আঁকা থাকত। তাই টাঁইড় বাইদের দেশে টুসুগানে শোনা যায়—

চল্ সজনী আসাম পালাব।
ক্ষেতে ধান মরিছে কী খাব?
চল্ সজনী আসাম পালাব।।

টুসুগান লোক-কবির সৃষ্টি; অথচ ব্যক্তিনামে অর্থাৎ নামভণিতায় টুসুগান সাধারণত প্রচারিত হয় না। (যদিও বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণে পুরুলিয়া বা পার্শ্ববর্তী এলাকার সাম্প্রতিক কালে কোন কোন লোককবি ভণিতাযুক্ত টুসুগান রচনা করেছেন।) কারণ, লোক-সংগীতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : কবির ব্যক্তিসত্তা নেপথ্যচারী ক'রে গোষ্ঠীচেতনা বা সমাজভাবনার প্রকাশ। ফলে একই টুসুগান অঞ্চলভেদে বিভিন্ন লোক-কবির মুখে মুখে ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। তবে অধিকাংশ এ জাতীয় গানের উৎসভূমি যে বাঁকুড়া তার প্রমাণ কয়েকটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। যথা—

১) মনের এই বাসনা
টুসুধনকে জলে দিইব না—
মনের এই বাসনা। (বাঁকুড়া)

মনের এই বেদনা।
টুসুমাকে জলে লেইগ্‌ব না—
দেইখ্‌তে লেইগ্‌ব টাটার কারখানা। (পুরুলিয়া)

টুসুধনকে জলে দিব না।
আমার বড়ই মনের বাসনা।। (ধলভূম)

২) লইতন্ পইখরের পাড়ে
পায়রা গুমুরে গো।
পায়রা লয় মা পাখি লয় মা
তুষু খেলা কইরে গো।।
খেইল্অ না খেইল্অ না তুষু
শাঁখা ভাঁইঙেঁ যাবেক গো।
তুমার মা যে অভাগিনী
কুথায় শাঁখা পাবেক গো।। (বাঁকুড়া)

বাড়ির নাম্‌হয় শিমল্ গাছে
পায়রা কুহরে গ।
পাখি লয় মা পাখুড়া লয় মা
টুসু খেলা করে গ।।
খেইল্অ না খেইল্অ না টুসু
কাপড় মলিন হবেক গ।
তুমার মা ত অভাগিনী
সাবান কুথায় পাবেক গ।। (পুরুলিয়া ও সিংভূম)

৩) আমার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝন্‌ঝন্‌ করে গো।
উয়ার টুসু হ্যাংলা মাগী
আঁচল পাইতে মাগে গো।। (বাঁকুড়া)

আমার টুসু মুড়ি ভাজে
শাঁখা ঝন্‌ঝন্‌ করে।
তোদেব টুসু লোভী টুসু
হাত বাড়ায়ে মাগে লো।।
ছি ছি লাজ লাগে না—
ছোট মুখে বড় কথা সাজে না।। (বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর)

হামার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝন্‌ঝন্‌ করে গ।
উহার টুসু ছঁচ্‌রা মাগী
আঁচল পাইতে মাগে গ।।
ছি ছি লাজে মরি
হাম্‌রা হইলে লিতম্‌ গলায় দড়ি।। (পুরুলিয়া)

৪) আমার মন ক্যামন্‌ করে।
যেন পস্তু কাঁদে গোল-আলুর তরে।। (বাঁকুড়া)

আমার মন ক্যামন্‌ করে।
যেন শোল মাছে উফাল মারে।। (পুরুলিয়া)

৫) আমার ননদ অতি সুন্দরী।
যেন কাতলা মাছে ফুলবড়ি।। (বাঁকুড়া)

কিংবা

আমার ননদ অতি সুন্দরী।
যেন কাতলা মাছের তরকারি।। (বাঁকুড়া)

আমার ননদ অতি সুন্দরী।
যেন ইঁচলি মাছে ফুলবড়ি।। (পুরুলিয়া)

আমাব ননদ অতি সুন্দরী।
যেন ইলিশ মাছের ফুলবড়ি।। (মেদিনীপুব)

৬) বাঁকুড়ার সরু চাদর উইরে গেইলে ধইর্‌ব না।
যার সংগে বিচ্ছেদের কথা প্রাণ গেলেও রা কাইড়্‌ব না।

(বাঁকুড়া)

চাকুলিয়ার সরু চাদর উইড়ে গেইলে ধইর্‌ব না।
যার সংগে বিচ্ছেদের কথা প্রাণ গেলেও বা কাইড়্‌ব না।

(পুরুলিয়া)

খড়গ্‌পুরের সরু চাদর উইড়ে গেইলে কেউ ধইর্‌অ না।
যার সঙে যার ভাব থাকে সে ছাড়া কেউ ধইব্‌অ না।

(মেদিনীপুর)

৭) বাঁকুড়াতে দেইখে আইলম্‌ সনার পিঁড়ায় বাঘ বইসে।
সে বাঘে কি মানুষ খায় মা, বইসে বইসে রঙ দ্যাখে।।

(বাঁকুড়া)

কাশীপুরে দেইখে আইলম্‌ সনার থালায় বাঘ বইসে।
সে বাঘে ত মানুষ খায় না রূপ দ্যাখাইতে আইসেছে।।

(পুরুলিয়া)

৮) মেদ্‌নিপুরে দেখে আইলম্‌ ডালায় ডালায় দুধবালা।
আমার টুসুর নাইক ছেইলা কাকে দিব দুধবালা।।

(মেদিনীপুর)

৯) আমার টুসুর একটি ছেইলা নাম রাইখেছি বিমলা।
বিমলাকে কিইনে দিইব হাজার টাকার দুধবালা।।

(বাঁকুড়া)

হামার টুসুর একটি ছেইলা নাম রাইখেছি যামিনী।
জামাই আইলে খাঁতে দুব পান্তাভাতের আমানি।।

(পুরুলিয়া)

৯নং গানে লক্ষনীয়, বাঁকুড়ায় টুসুর ছেলের নাম বিমলা এবং পুরুলিয়ায় তার নাম হয়েছে যামিনী। দুটিই মেয়েদের নাম বলে মনে হয়। আসলে নাম দুটি হবে সম্ভবত বিমলাপ্রসাদ এবং যামিনীকান্ত বা যামিনীরঞ্জন; কিন্তু গ্রামীণ মানুষ সংক্ষেপে 'বিমলা' এবং 'যামিনী' করে নিয়েছে। কিন্তু ধন্দ পরিষ্কার হয় না—পুরুলিয়ার উক্ত টুসুগানটি সম্পূর্ণ শুনে। কারণ, গানটির দ্বিতীয় লাইনে জামাই আসার কথা আছে। টুসুর মেয়ের নাম 'যামিনী' হলে তবেই জামাই আসার সম্ভাবনা; ছেলের নাম 'যামিনী' হলে তার বৌ আসার কথা! কিন্তু লোক-সংগীত অনেক সময়ই ব্যাকরণের পথে চলে না। তাই পুরুলিয়ার আরেকটি টুসুগানে দেখা যায় টুসুর মেয়ের পরিবর্তে ছেলের নামোল্লেখ থাকলেও প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ মেয়েরই। গানটি নিম্নরূপ—

আমার টুসুব একটি ছেইলা
মানবাজারে শ্বশুর ঘর।
পাল্‌খাব উপর কলসী রাইখে
পালাই আইল বাপের ঘর।।
পালাই আইল ভাল কইর্‌ল
আর ত পাঠাই দিইব না।
কম্‌হব বাঁইধে ঝগড়া লাইগ্‌ব
জামাই নইলে মাইন্‌ব না।।

অন্ত্যটীকা

১। পল্লব সেনগুপ্ত, পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা (১৯৮৪), ৫৪-৫৫ পাতা।

২। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, (১৯৪০) ২৬-২৭ পাতা।

৩। E. T. Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta (1872) P-317-20

৪। H. H. Risley, Tribes and castes of Bengal, (Vol.-I) Calcutta (1891) P-528.

৫। বিনয় মাহাত, লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা (১৩৯১), ৩১ পাতা।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ডি এম. লাইব্রেরি, কলকাতা (১৩৮৪), ২৬-২৭ পাতা।

৭। 'কূর্ম' কুলকেতু (Totem) জাত শব্দ 'কূর্মী' থেকে কুড়্‌মী বা কুড়্‌মি। আবার ডঃ বিনয় মাহাত বা আরো কেউ কেউ মনে করেন ঃ কুটুম্বিন্ > কুন্‌বি > কুড়ুম্বি > কুড়্‌মি কূর্মী। জর্জ গ্রিয়ার্সন কূর্মীদের দলপতি বা মোড়লকে 'মাহাত' বলেছেন— "There is a kind of head tenant who acts as a intermediary between the proprietor and the cultivator He collects the rents and receives in return some petty privilages and immunities. He is known generally as Mahaton."

– G. A. Grierson, Bihar, Peasant Life, Calcutta (1885), P–530.

সপ্তম অধ্যায়

টুসুগান ও ভাদুগান

ভাদ্রে ভাদুগান ও পৌষে টুসুগান গাওয়া হলেও এই দুই লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ভাব-সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। দুটি গানই কৃষিভাবনার অন্তর্লীনসূত্রে দক্ষিণ পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লা এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের অনেক জায়গায় কিশোরী-যুবতীরা, এমনকি তরুণরাও গেয়ে থাকে।

যারা ভাদু এবং টুসু করে, তাদের চোখে ভাদু ও টুসু অপরূপা সুন্দরী কিশোরী; তাঁরা একাধারে দেবী ও মানবী। তাই ভাদ্রে গাওয়া হয়—

ভাদুর আগমনে।
কি আনন্দ হয় গো মোদেব প্রাণে
ভাদুর আগমনে।।

সেই একই গান দেবীর নাম পাল্টে এভাবে শোনা যায় পৌষ মাসে—

টুসুব আগমনে।
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে
টুসুর আগমনে।।

গ্রামীণ কিশোরীরা বা লোক-কবিরা ভাদুর সঙ্গে টুসুর গান অনুষঙ্গভাবনায় (Association of ideas) মিশিয়ে সহজভাবে গেয়েছেন—

ভাদর মাসে ভাদু পূজা
সবাই পরে লীল (নীল) শাড়ি।
আমার টুসু অবুঝ অতি
বুঝাও হে বংশীধারী।।

কিশোরীদের চোখে ভাদু বা টুসু—দুজনই দেবী মহিমায় বিরাজিতা। তাই ভক্তি-ভালোবাসায় মেয়েরা গায়—

এ বছরকে য্যামন-ত্যামন
আইস্‌ছে বছর 'মেড়' দিব।
হাজার টাকার গয়না আইনে
ভাদুধনকে সাজাব।।

এই গানটি টুসুগানেও চলে। তখন শুধু 'ভাদুধনকে সাজাব' কথাটির পরিবর্তে 'টুসুধনকে সাজাব' কথাটি যোগ করা হয়।

কিশোরীরা মানবিক দৃষ্টিতে কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ চিত্তে অন্য পাড়ার ভাদুর চেয়ে নিজেদের পাড়ার ভাদুকে সর্বশ্রীসম্পন্না মনে করে—

তিনটি ভাদু জলকে গেছে কন্ ভাদুটি আমাদের?
কাঁখাল বাঁকা, উল্‌খি-পরা ওই ভাদুটি আমাদের।

'ভাদু'-র পরিবর্তে 'টুসু' কথাটি বসিয়ে এ গানটি টুসুগানেও চলে।

পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পুরুলিয়ার নেতুরিয়া এলাকায় অনেকগুলি কয়লাখনি আছে। কয়লাখাদ থেকে জল-তোলা দৃশ্য গ্রামীণ কিশোরীচিত্তে ভাব-চমৎকারিত্বের সঞ্চার করে। তাই তারা প্রাণের প্রাণ, সমবয়সী ভাদু বা টুসুকে রানীগঞ্জ যাওয়ার প্রস্তাব দেয়—

চল্ ভাদু চল্ খেইল্‌তে যাব
রানীগঞ্জের বটতলা।
আসার পথে দেখাই আইন্‌ব
কয়লাখাদের জল-তুলা।।

টুসুগানেও 'ভাদু' কথাটির পরিবর্তে 'টুসু' পদটি বসিয়ে গানটি মেয়েরা প্রলম্বিত সুরে পৌষালি শীতার্ত সন্ধ্যায় গেয়ে থাকে।

এক সময় বাঁকুড়ার সঙ্গে রানীগঞ্জের যোগাযোগ খুব বেশি ছিল। গোরুর গাড়ি, উটের গাড়িতে মালপত্র বা সওযারি নিয়ে যাওয়া-আসার চল্ ছিল। বাঁকুড়ায় 'রানীগঞ্জের মোড়' বলে একটি তেমাথা রাস্তা আজও আছে। (বর্তমান পুরুলিয়া একদা 'মানভূম' নামে খ্যাত ছিল। শহর পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুরগামী রাস্তার নাম আজও 'বরাকর রোড'। এখনও এ রাস্তা দিয়ে সুদূর আসানসোল বরাকরের দিকে বাস চলে।)

পৌষের টুসুগান যেমন শস্যোৎসবের (Harvest festival) গান, ভাদ্রে ভাদুগানও তেমনই শস্য-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। ভাদ্রে ভাদুই বা ভাদো নামে একপ্রকার আউশ ধান হয়; দুঃসহ অভাবের দিনে সেই নতুন ধান-ওঠার আনন্দের পটভূমিতে ভাদুগান, ভাদুপূজা। ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেছেন, "ভাদ্রমাস দু'দিক দিয়ে প্রখ্যাত। ঠিক এই মাসেই কোন কোন অঞ্চলে আউশ ধান ঘরে তোলা হয়,- -আর একদিকে সবুজ ধানের চারা আগামী অঘ্রানের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। রোয়া-পোঁতার কাজ শেষ হয়েছে, আউশ ধান তোলা হয়েছে, অতএব উৎসব কিছু একটা চাই-ই। উৎসব ছাড়া আর কী নিয়ে থাকবে সাধারণ মানুষ! নদীপুকুর টলমল করছে জলে, লাল মাটি আর শালবনে বৃষ্টি ধোয়া শালীনতা; কাশ ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে; আকাশের মেঘ আর তেমন করে দিগ্‌ভ্রান্ত করছে না; মাঝে মাঝে ভরা ভাদরের জলোচ্ছ্বাস মেঘ আর মাটিতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে; ধানের ক্ষেত সবুজ চারায় দিশেহারা হয়ে গেছে; এসে গেছে শরৎকাল।

"ভাদ্রের প্রত্যেকটি সন্ধ্যায় পাড়ায় পাড়ায় ভাদুমূর্তির সামনে পল্লীগীতির জলসা। পরিবেশ আর প্রতিবেশ নিয়েই সঙ্গীত।"[১]

অথচ জনমানসে পুরুলিয়ার কাশীপুরে পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিং-দেওয়ের রূপবতী কিশোরী রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর কিংবদন্তী কাহিনী ভাদুপূজার উৎস হিসাবে প্রচলিত। রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী বা ভদ্রাবতীর নাকি অকালমৃত্যু দেশবাসীর অন্তরে গভীর শোক জাগায়। তারা শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় রাজকন্যা স্মৃতি চির জাগরূক রাখতে নাকি ভাদুপূজার প্রচলন করে। এই কিংবদন্তী কাহিনীর মধ্যে Hero Worship-জাতীয় ভাবনা আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে কাশীপুর রাজপরিবারের বংশতালিকায় দেখা যায়—মহারাজ গরুড়নারায়ণ সিং-দেওয়ের পুত্র নীলমণি সিং-দেও; তাঁর চারজন রাজমহিষী। প্রথমা রাজমহিষীর গর্ভে হরিনারায়ণ সিং-দেও, দ্বিতীয়া রাজমহিষীর গর্ভে সাজিলাল সিং-দেও, তৃতীয়া রাজমহিষীর গর্ভে যুগলকিশোর সিং-দেও এবং কনিষ্ঠা রাজমহিষীর গর্ভে দেবীলাল, তারালাল ও রামকিশোর সিং-দেওয়ের জন্ম হয়। ফলত, নীলমণি সিং-দেওয়ের কোন কন্যা ছিল না।

১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ—যাকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মহাবিদ্রোহ বলা হয়, সেই মহাবিদ্রোহে নীলমণি সিং-দেও প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট পুরুলিয়া ট্রেজারি লুঠ ও জেলখানার কয়েকশ' বন্দীদের মুক্ত করা হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে পঞ্চকোটরাজ নীলমণি সিং-দেওকে ঐ বছর নভেম্বরে কর্নেল ফস্টার অতর্কিত আক্রমণে বন্দী করেন। বন্দীদশায়, প্রথমে তাঁকে শান্তিপুরে, পরে কলকাতায় আনা হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চমাস পর্যন্ত তিনি কলকাতায় বন্দী ছিলেন।

ফলত, ঐতিহাসিক চরিত্র নীলমণি সিং-দেওয়ের কল্পিত কন্যা ভদ্রেশ্বরীর কিংবদন্তী কাহিনী নিয়ে ভাদুপূজার উৎস-খোঁজা নিরর্থক।

আরেকটি বিশেষ দিক এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। মহারাজ নীলমণি সিং-দেও নিজেও ভাদুগান গাইতেন। কাশীপুর অঞ্চল নিয়ে গভীর ক্ষেত্রকর্মানুসন্ধান (Field work) করে যুধিষ্ঠির মাজী তাঁর 'ভাদুগীতির ইতিকথা' গ্রন্থে বলেছেন, "রাজা নীলমণি সিং-দেও নাকি নিজেও হারমোনিয়াম সহযোগে ভাদুগান গাইতেন। কাশীপুরে তখন ভাদু উৎসব হতো রাজকীয় রীতিতে। ..... এখানে ভাদুমূর্তির গায়ে থাকত বেনারসী শাড়ি ও নানা ধরনের মূল্যবান অলঙ্কার। বেনারস, লক্ষ্ণৌ, পাটনা প্রভৃতি স্থান থেকে বাঈজীদের আনা হতো। তাঁরা ভাদুগানের আসরে ঠুংরী গাইতেন—গাইতেন গজল।

"রাজবাটিতে বেশ কয়েকজন গীতিকার ছিলেন। তাঁরা অনেকেই উচ্চাঙ্গরীতিতে ভাদুগান রচনা করে গিয়েছেন। .....

"রাজবাড়িতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুসরণে ভাদুগান গাওয়া হত। এই সব ভাদুগানের উপর কাফি, বৃন্দাবনী সারঙ্গ প্রভৃতি রাগের সুরারোপ করা হত। আর এই সব গান গাইতেন বিখ্যাত শিল্পীরা। সেকালের এই ধরনের একটি বিখ্যাত গানের অংশবিশেষ আমি তুলে দিচ্ছি। গানটির রাগ বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তেতালা।

"দেখ ভাদু কি মুরত ক্যায়সে ভঙ্গ ...... রে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠে ছয় কি তরঙ্গ,
দেখ মোহে কোটি অনঙ্গ,
ক্যায় সে মুখর সে ক্যায়সে বেণী বাঁধে
পিঠে ঝুলে বেণী ভুজঙ্গ ..... রে ....।

"ভাদুর রূপবর্ণনা ছাড়া সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়েও উচ্চাঙ্গ রীতিতে ভাদুগান-গাওয়ার রীতি রাজবাড়িতে ছিল। রাজাদের বিরাগভাজন কোন এক রাজকর্মচারী একজন রাজপুরুষকে নিয়ে ভাদুগান রচনা করেছিলেন। গানটি কাফি রাগিণীতে সুরারোপ করা হয়েছিল।

"এই গানের কিছু অংশ—

রাজন অকারণে আগুনে দিলে হাত!
তুমি জাইনে শুনে ক্যান করিলে উৎপাত?
নিজের মাথা নিজেই খাইলে
ধর্মের ঢাক নিজেই বাজাইলে
ঘরেব কুম্‌হির তুমিই বঠ
তুমি অজগর সাপ।
অকারণে আগুনে দিলে হাত!"[২]

স্পষ্টতই বোঝা যায়, কাশীপুর রাজবাড়িতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুকরণে ভাদুগানের চল্ ছিল। তা হঠাৎ-ই নীলমণি সিং-দেওয়ের জীবন-মধ্যাহ্নে শুরু হয়নি। তাছাড়া নিজের মেয়ের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে নীলমণি সিং-দেও বেনারস, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি জায়গা থেকে বিখ্যাত বাঈজীদের এনে ভাদুগানের আসরে ঠুংরী, গজল গাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, কিংবা নিজে হারমোনিয়াম নিয়ে ভাদুগান গাইতেন—এরূপ ধারণা করা অমানবিক হৃদয়হীন এবং অবাস্তব।

ভাদ্রের ভাদুই বা ভাদো ধানকে নিয়ে ভাদু পরবের সূত্রপাত। এই শস্যোৎসবের সঙ্গে করম বা জাওয়া পরবের ভাবগত মিল থাকলেও প্রকৃত অর্থে দুটি স্বতন্ত্র উৎসব। যব-জনার প্রভৃতি পঞ্চশস্য জাওয়া ডালিতে রেখে, করমগাছের ডাল পুঁতে করম রাজার পূজা হয়। আর ভাদুপূজায় ভাদু কন্যা বা জননী; সেখানে পঞ্চশস্য, জাওয়া ডালি বা অনুরূপ কোন মাঙ্গলিক উপচার লাগে না। মৃৎশিল্পীর গড়া মাথায় মুকুটপরা, কাঁচা সোনা বা চাঁপা রঙের দেবী মূর্তি—তাঁর হাতে থাকে মাটির গড়া টিয়াপাখি, কখনও কোলে কৃষ্ণঠাকুর। খাটো-হলদে-শাড়িপরা মাহাত-ভূমিজ প্রভৃতি পরিবারের কিশোরীরা উঠানে জাওয়াডালি পেতে, হাতধরাধরিভঙ্গিতে, নেচে-নেচে করমগান গায়। ভাদুপূজায় কিশোরী-যুবতীদের কেবলই গান। সীমান্ত বাঙ্‌লার বর্ণহিন্দু পরিবারের কোন কিশোরীরা করম পূজায় যোগ দেয় না, কিন্তু ভাদুপূজায় আন্তরিকভাবে তারা অনেকেই অংশগ্রহণ করে।

আর মজার ব্যাপার হল, ভাদুপূজায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের বাগদি, বাউরি, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নারীদের সঙ্গে ঐ জাতীয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু পুরুষও নিজেদের মধ্যে ভাদুর জাগরণ এবং আনন্দ স্ফূর্তি করে; অথচ ভূমিজ মাহাতদের এটি প্রাণের পরব নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন, "ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট আদিবাসী-অর্ধ আদিবাসী ঝাড়খণ্ডী উপভাষী লোকেদের মধ্যে প্রধানতম হল মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা।... বলা বাহুল্য ঝড়খণ্ডের এই সব আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভাদু পূজার প্রচলন নেই।" অথচ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম প্রভৃতি সীমান্ত বাঙ্লার কোন কোন অঞ্চলের বারবণিতারা ঘটা করে যৌবন ও সৌন্দর্যের দেবী হিসাবে ভাদুর পূজা করে। ঐ সব অঞ্চলে কিছু তথাকথিত বিকৃতরুচির যুবকও দেবী ভাদুর অনুরূপ 'ভাদা' নামক পুরুষ মূর্তি গড়ে ভাদ্র সংক্রান্তিতে হৈ হুল্লোড় করে।

কৃষিভাবনাযুক্ত ভাদু উৎসব সম্পর্কে রামশঙ্কর চৌধুরী তাঁর 'ভাদু ও টুসু' গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করছেন, "তাই ভাদু রাজকন্যা নন, ভাদু করমের হিন্দু সংস্করণ নন, ভাদু একান্তভাবেই ফসল-ফলানোর উৎসব।"[৪]

ভাদ্রমাসে 'ভজো' (বা ভাদো/ভাঁজো) ব্রতের গানের সঙ্গে ভাদুগানের মিল খুঁজেছেন সুকুমার সেন। তিনি সেখ শুভোদয়ার একটি গান প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গানটিকে ভাদুগানের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।"[৫]

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' গ্রন্থে শস্যোৎসব প্রসঙ্গে 'ভাঁজো' সম্পর্কে বলেছেন, "ভাদ্র মাসে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে কৃষি-দেবতা 'ভাঁজো'-র পূজো হয়। বোধ হয় 'ভাঁজো' কথাটি ভাদ্র যেকে জাত।"[৬] ফলত, ভাদু যে শস্যোৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোক-উৎসব তাতে সন্দেহ থাকে না।

পয়লা ভাদ্র থেকে ভাদু পূজার সূচনা। ভাদ্র-সংক্রান্তির আগের রাতে 'জাগরণ'। টুসুর-ও সারা পৌষমাস পূজা; পৌষ-সংক্রান্তির আগের রাত 'জাগরণ'। 'জাগরণের' রাত উৎসবেরই রাত! ভাদু বা টুসুর 'জাগরণ'-রাত কিশোরী কণ্ঠের সাঙ্গীতিক মদিরতায় বিহ্বল হয়ে ওঠে।

ভাদ্রের শস্য ভাবনায় সঙ্গে যুক্ত ভাদুপরব পঞ্চকোট রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। কাশীপুর রাজবাড়িতে ঘটা করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুসরণে ভাদুগান গাওয়া হত। সেইসব ভাদুগানে কাফি, বৃন্দাবনী সারঙ্গ প্রভৃতি রাগের সুরারোপ থাকতো। স্থানীয় জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তাই লোকায়ত ভাদু গানে শোনা যায়—

কাশীপুরের মহারাজা সে করে ভাদু পূজা।
সন্ধ্যা হইলে ঝাঁঝর বাজে, থালায় ঝিলপি খাজা।।

ভাদুপূজা ও গান কাশীপুররাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কৌলীন্য অর্জন করে। সম্ভবত তাই লোকায়ত ভাবনায় ভাদু হলেন কাশীপুর রাজার মেয়ে— সকলের আদরের ভাদুরানী। তাঁর জীবন যাত্রাও রাজকীয়। ভাদু গানে তাই শোনা যায়—

কাশীপুরের রাজার বিটি সোনার খাটে বসেন।
রূপার খাটে চরণ দিয়া হীরায় দাঁত ঘষেন।।

তবু ভাদুগান রাজবাড়ির শোভন মার্জিত পরিবেশে আবদ্ধ থাকে না; দক্ষিণ পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লার ঘাটে মাঠে প্রান্তরে প্রাকৃতজনের মুখে মুখে ক্রমে ছড়িয়ে যায়। বাউরি বাগদি ঘরের মেয়েরাও গায় ভাদুগান। তার ইঙ্গিত ভাদুগানে ধরা পড়ে—

কাশীপুরের রাজার বিটি বাগ্‌দি ঘরে কী কর?
হাতে জালি কাঁখে লইয়ে সুখ সায়রে মাছ ধর।।
মাছ ধইর্‌তে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভাইঙো না।
একগুছি ধান ভাইঙ্‌লে পরে পাঁচ সিকা জরিমানা।।

রামায়ণ কাহিনীর বহু খণ্ড চিত্র টুসুগানের মতো ভাদু গানেও পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটি গান হুবহু একই রূপে ভাদু ও টুসু উভয় গানেই চলে। যথা—

(১) অশোকবনে পাতার কুঁইড়ায় সীতা পাশা খেলিছে।
যগীর বেশে রাবণ আইসে সীতা হরণ কইরেছে।।

(২) সীতাহরণ করল রাবণ, রাখবি সীতা যতনে।
নইরে তো সনার (সোনার) লঙ্কা দিবরে ডাহন (দহন) কইরে।।

(৩) ও রামের মা, ও রামের মা, তোর রামের কী দুর্দশা।
বস্তর (বস্ত্র) বিনা গাছের বাকল, তেল বিনা মাথায় জঁটা।।

(৪) অশোকবনে কাঁইদ্‌ছে সীতা অশোকেরি ডাল ধইরে।
আর কাঁইদ্‌অ না ওমা সীতা গাছের পাতা যায় ঝইরে।।

(৫) বাঁদর বুইলে ডালে ডালে বাঁদরের কি পা দলে (দোলে)।
রাম, সীতাকে হারাই বনে, কাঁদে বইসে গাছতলে।।

(৬) রাম ছাইড়েছেন যইগ্‌গের ঘঁড়া তপুবনের কাননে।
লবকুশ ধইরেছে ঘঁড়া, সীতা বলে দাও ছাইড়ে।
ছাইড়্‌ব না ছাইড়্‌ব না কন মতে।
আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ দিবেক দেইখ্‌ব বীর ক্যামন বঠে।

(৭) একলক্ষ ব্যাটা রাবণের সুয়া (সওয়া) লক্ষ লাতি (নাতি)।
একটিও রাম রাইখে দেন নাই বংশে দিতে বাতি।। (ইত্যাদি)

অর্বাচীনকালের ভাদুগানে রামায়ণ কাহিনীর খণ্ডচিত্র টুসু গানের থেকে বেশি। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রামচন্দ্র বনবাসী হলে জননী কৌশল্যার হৃদয়বিদারী ক্রন্দন ধ্বনি।—

হা রাম, হা রাম পুত্র, ওরে আমার নীলরতন।
তোর অদর্শনে বাবা বাঁচে না আমার জীবন।।

আর কি পাব আমি নবদূর্বাদল শ্যাম।
আর কি চন্দ্রবদনে মা বইলে ডাকবে রাম।

মৃত শ্বশুর দশরথের প্রেতাত্মা-মুক্তির জন্য সীতাদেবীর বালির পিন্ডদান—

সাক্ষী থাক ফল্গুনদী, সাক্ষী থাক তুলসী।
রামকে আমার বইল্‌বে তুমরা পিণ্ড দিতে দেইখেছি।।
সাক্ষী থাক শিমুল বৃক্ষ সাক্ষী থাক তরুবর।
সত্যকথা বইল্‌বে তুম্‌রা, জিজ্ঞাসিলে রঘুবর।

সীতা দেবীর পিণ্ডদানের কথা সত্য কিনা, সে সম্পর্কে রামচন্দ্র ফল্গুনদীকে জিজ্ঞাসা করেন—

দেখেছ কি ফল্গুনদী পিণ্ড দিতে সীতাকে।
সীতা নাকি বালির পিণ্ড দিয়েছে মোর পিতাকে।

রামচন্দ্রের উত্তর ফল্গুনদী জানায়—

ফল্গুনদী বলে প্রভু কহি আমি তব ঠাঁই।
জানকীকে পিণ্ড দিতে কভু আমি দেখি নাই।।

তখন অসহায় অভিমানে ক্রন্দনশীলা সীতাদেবী বলেন—

ওরে নদী মিথ্যাবাদী তোর মতো কেবা আছে।
দেখেশুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলি রে রামের কাছে।।
রঘুপতি কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলি ফল্গু নদী।
মম শাপে অন্তর সলিলা হবি অদ্যাবধি।।

শিমুল আব তুলসীগাছ সীতাদেবীর পিণ্ডদানের সাক্ষ্য দিল না। কেবলমাত্র বটগাছ প্রকৃত সাক্ষ্য দিল। তখন সীতাদেবী তাকে বরদান করলেন—

মম বরে অক্ষয় হয়ে থাক ওরে তরুবর।
চন্দ্র যাবে তারা যাবে, আর যাবে দিবাকর।।
যদি কেহ আসি শ্রাদ্ধ করে এই গয়াতে
ব্রাহ্মণ দক্ষিণা দান দিব তুমার তলাতে।।

ভাদুগানে সীতাহরণ-কাহিনীর সূচনা বনপথে পরিশ্রান্তা সীতার বর্ণনায়—

সীতা সঙ্গে রামলক্ষ্মণ ভ্রমিছেন বনে বনে।
কুশাঙ্কুর ফুটে পায়, বেদনা কত প্রাণে।।
অবশ অঙ্গ মা জানকী বসিলেন বৃক্ষতলে।
বাবণ ভগ্নী শূর্পণখা আসিল যে হেনকালে।।

রাম-লক্ষ্মণের কাছে প্রেমভিখারিণী শূর্পনখা উপস্থিত —

রাবণ ভগ্নী শূর্পণখা অতুলনীয় রূপ যার।
রাম সন্নিধানে এসে দিল নিজ সমাচার।।
লঙ্কেশ্বর রাবণ ভাই, দেবগণে আভাকারী।
তব রূপে পাগলিনী শূর্পণখা নাম ধরি।।

শুনি কথা রঘুমণি বলেন মধুর বচন।
যাও রূপসী তব আশা পুরাবেন শ্রীলক্ষ্মণ।।
দ্রুতগতি শূর্পণখা আসি লক্ষ্মণের পাশে।
বলে—হও হে মম স্বামী, এসো পাশে হেসে হেসে।।
কামিনীর মনোচোরা, যোগীর যোগ্য নও তুমি।
এসো আমার প্রাণের সখা, আমার প্রেমে হও প্রেমী।।

কিন্তু রূপসী শূর্পনখা প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা হল তাই নয়, লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বাণে তার নাক-কান কাটা গেল। তখন—

নাসাকর্ণ কাটা গেল জানায় বার্তা রাবণে।
অপমান করিল দাদা, কাজ কী এ জীবনে।।
পঞ্চবটী বনে আছে, সঙ্গে তাদের এক নারী।
কী তুলনা দিব দাদা— অপরূপ সে সুন্দরী।।

লঙ্কেশ্বর তখন—

মারীচে ডাকিয়া রাবণ বলিল সব বিবরণ।
চল পঞ্চবটী বনে করিব সীতাহরণ।।

তারপর যোগীর বেশে সীতাহরণ -

শূন্যপথে সীতালয়ে পুষ্পক রথে যায় রাবণ।
কাঁদেন সীতা উচ্চস্বরে—ধরায় ফেলে আভরণ।।
আর বুঝি পাব না দেখা নবদূর্বাদল শ্যাম।
দশ মুণ্ড ভণ্ড যোগী— তোমায় সীতা হরে রাম।

ভাদু গানে রামায়ণের এ জাতীয় বহু খণ্ড চিত্র কাহিনী অর্বাচীনকালের লোক-কবির সৃষ্টি। এ জাতীয় কাহিনী ·· ·ার পিছনে ছো-নাচের দৃপ্তভঙ্গির দৃশ্যময় (Visual) মূকাভিনয় লোক-কবিদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে।

টুসুগানে মহাভারত-কাহিনীর খণ্ডচিত্র তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু ভাদুগানে মহাভারতের বেশ কয়েকটি খণ্ড কাহিনীচিত্র পাওয়া যায়—

কুন্তী বলে, ও গান্ধারী কোথা যাবে তুমি।
শিবপূজা করিবারে যাব যে গো আমি।।

কুন্তী বলে, ও গান্ধারী কী দিয়ে পূজ তুমি।
আমি বঠি রাজরাণী, আমার যে শূলপাণি।।
শিব বলেন— কিসের দ্বন্দ্ব শুন দুই রাণী।
যে পূজিবে স্বর্ণচাঁপায় তারই হব আমি।।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য—

দুর্যোধন বলে, শুন ওরে ওরে দুঃশাসন।
কাড়িয়া লাও গায়ের বস্ত্র উলঙ্গ কর এখন।
তা শুনি দ্রৌপদী দেবী ভয়ে কাঁপে ঘন ঘন
কোথা সখা আছ তুমি, বাঁচাও নারীর জীবন।।
দ্রৌপদীর রোদন শুনি আসেন প্রভু নারায়ণ।
কখন কি বস্ত্রদান করিয়াছ বল এখন।।

দ্রৌপদী এক সাধুকে বস্ত্রদান করে সে পুণ্যের অধিকারিণী। তাই—

নীল কমলের শাড়ি পড়িল দ্রৌপদী গায়।
যতই টানে ততই বাড়ে দুঃশাসন লজ্জা পায়।।

পরিশ্রান্ত দুঃশাসন অবশেষে হীন পাপকর্মে হতাশ হয়। তখন লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর রোষদৃপ্তারূপ—যার মধ্যে চিরন্তনী নারীসত্তার অমর্যাদার প্রতিবাদ—

বাঁইধ্‌ব না বাঁইধ্‌ব না চুল—এই কথা রাখ শুনে।
খুলা চুল থাইক্‌বে আমার দুঃশাসনের রক্ত বিনে।।

ভাদুগানে পৌরাণিক কাহিনীর কোন কোন রূপ অর্বাচীনকালের লোক-কবির হাতে ছন্দোবদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী উল্লেখ করা যায়—

এক ছিল কুলীনের মেয়ে সাবিত্রী তার নাম।
ষোল বছর বয়স কন্যার কোথায় পাবে ধাম।।
কন্যা বলে ভাবছ কি মা, যা আছে কপালে।
সাবিত্রী আর সত্যবান দুজন যায় পাঠশালে।।

বিবাহিতা জীবনে সতী সাবিত্রী স্বামীহারা হয়েও কিভাবে যমরাজার সঙ্গে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পান, তার বর্ণনা—

যে বর লিবে লাও মা সাবিত্রী ঘরে যাও মা ফিরে।
না ফিরিল সাবিত্রী, জানায়—ঘরকে যাব কী করে।।
স্বামী সত্তার অংশভাগী আমি অর্ধাঙ্গিনী।
যম বলেন—শতপুত্রের হও মা জননী।।
শতপুত্রের মা কিভাবে হব, বলুন আমায়।
পতিহারা সতীর কোলে কিভাবে পুত্র জন্মায়।

অবশেষে যমরাজ করিলেন বরদান।
সতী সাবিত্রী হও তুমি—ফিরে নাও স্বামীর প্রাণ।।

টুসুগানে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যেমন আছে, ভাদুগানেও তেমনই বৈষ্ণবীয় প্রণয়গাথার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের বৈষ্ণব ভাবনা যেমন ঝুমুরগান, টুসুগানে বিধৃত, তেমনই ভাদুগানেও ফুটে ওঠে। যথা—

(১) বল্ দেখি শুকসারী তুই ত কুঞ্জের দ্বারে ছিলি।
কন্ পথে লুকাইল আমার ননীচরা বনমালী।।

(২) মাঝকুলিতে ঢাক বাইজ্‌ছে আইস্‌ছে আমার ভাদু ধন।
দ্যাখ্ ভাইলে ব্রজের বালা কতদূর আর বিন্দাবন।।
বিন্দাবনের বঁধু তুমি বিন্দাবনে বাস কর।
হাতে বাঁশুরি তুমার, কার সঙেতে ভাব কর।

(৩) যত্ন কইরে গাঁথেছি মালা দেইখ্‌বি যদি আয়।
ভাদুর গলায় দুলে মালা, কিবা শোভা তার।।
আমার মানকুমারী রাধাবিনোদিনী দেইখ্‌বি যদি আয়।
দেইখ্‌বি যদি আয় গো তরা শুনবি যদি আয়।।
আমার মানকুমারী রাধাবিনোদিনী দেইখ্‌বি যদি আয়।।

(৪) কেয়াফুলের আশা।
আমার ভাদু সংসারের ভালবাসা।।
রথের উপর কিষ্ণ ছিল কখন আমরা ভাইলেছি।
হাত বাড়াইয়ে পান দিয়ে হায় কলঙ্কিনী হইয়েছি।।
আমরা ত অবলা জাতি গাঁয়েগঞ্জে বসতি।
সকল দধি লিলেন কিষ্ণ শূন্য হইল কলসী।।

(৫) কিষ্ণ আমার উড়নপাড়ন, কিষ্ণ আমাব গলার হার।
হইতম্ যদি মাথার বেণী খুইলে দিতম্ বারে বার।।

টুসুগানে আগমনী-বিজয়ার মতো ভাদুগানেও আগমনী-বিজয়া আছে। যথা।

(১) ভাদুর আগমনে
কী আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে ।।
ভাদুর আগমনে—
ভাদু আজ আইল গো
আইল গো শুভদিনে।
মোরা সারা রাতি কইর্‌ব পূজা
ফুল দিব গো চরণে।।

(২) ওগো ভাদুমণি।
আগে বইস আসনে মা
কুশল তুমার বল শুনি।।
ক্যামন কইরে আইলে পথে
সে সব কথা বল শুনি।।

(৩) ভাদু আমার গরবিণী, নাকে সনার নথখানি।
মাথায় দিইব সনার মুটুক শাড়ি দিইব জামদানি।।

সারা ভাদ্রমাস আগমনীর গান হয়। 'জাগরণ'-এর রাত যতই গভীর হয়, ততই বিদায়ের অশ্রুসজল বেদনা জাগে; আসন্ন বিরহে ধ্বনিত হয় ভাদুর জন্য স্নেহবিহ্বলতা—

প্রাণে কি ধইয ধরে।
প্রাণের টুসু বিদায় দিই ক্যামন কইরে।।
সারা বছর কাঁইদে কাঁইদে গো পাইয়েছি বছর পরে।
সুখের হাট ডুবাই ক্যামন বিপদেরি সাগরে।।
সুখের বাদী হইয়ে সদা গো দুখ দেই অন্তরে।
জুড়াইব দুখজ্বালা কার চাঁদবদন হেইরে।।

তখন বিদায়ী গৃহকন্যাসমা ভাদুর মনোবাঞ্ছা পূরণের কথাও প্রশ্নোত্তর ভঙ্গিতে ভাদুগানে শোনা যায়—

কী কী গয়না লিবে ভাদু বল না গো মা আমারে।
—পায়ে লিব নেপুর-তড়া সাইজ্ব গো বাহারে।।
আব কী কী গয়না লিবে বল না ভাদু আমারে।
—নাকে লিব নথটানা মা, সাইজ্ব গো বাহারে।।
কী কী শাড়ি লিবে ভাদু বল না গো মা আমারে।
—কদম ফুইলা শাড়ি লিব, শায়া লিব বাহারে।।

বিদায়-প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ময়রা ডাকা হয়। ভাদুর সঙ্গে 'বিদায়' হিসাবে দেওয়া হবে 'লাড়ুর হাঁড়ি'—

ওরে ময়রা ধর্ রে ঝাঁঝরা
দে রে চিনির পাগ্ কইরে।
ভাদু যাবেক শ্বশুর বাড়ি
সাজাব ভারে ভারে।।

ভাদুর প্রতিমা বিসর্জন নয়, যেন ঘরের মেয়ে সকলকে কাঁদিয়ে, এবং বুঝি নিজেও অশ্রুপাত করে, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শ্বশুর ঘরে যাওয়া! তাই গ্রামীণ কিশোরীরা অশ্রুভরা বেদনায় জানায় ভাদুকে প্রবোধ—

জলে হেলা, জলে খেলা
জলে তুমাব কে আছে।
মনকে বুঝে দেখ ভাদু
জলে শ্বশুর ঘর আছে।।

টুসুগানের মতো ভাদুগানেও সমাজচেতনাব প্রকাশ ঘটেছে। চিবাচরিত কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে জমিদারের অধীনে চাষীরা চাষ করে এসেছে। অথচ একালেব হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তেদের অসহায়তা ঘোচাতে বামফ্রন্ট সরকার নতুন আইন করে কৃষকজীবনে নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। ভাদুগানেও তার প্রকাশ—

আর ভাইব না ভাদুমণি, ওগো মা জননী।
জনে জনে জমি পাবেক ঘুচে যাবেক হয়রানি।

গ্রামেগঞ্জের কৃষিজীবী জীবনেও চায়ের অমোঘ প্রভাবের সুব—

ভাদু বইল্‌ব কারে।
চায়ের পয়সা না থাইক্‌লে
মন ক্যামন করে।।

দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত বাঙলার খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে যে বছর ভালো ধান হয়, সে বছব কৃষিজীবী পরিবারে আনন্দ ধরে না। তখন জাগে প্রাণ, আসে গান—

ভাদু ভাবিস ক্যানে।
পাঁচ বিঘা ধান চাষ কইরেছি এই সনে।।
তিন বিঘাতে ঝুলুর ধান গো
দু বিঘাতে বাসমতি।
ফসল হইলে ভাবনা কিসের
আইন্‌ব কিনে তোর পতি।।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজাব দর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভাদুগানেও তার প্রতিফলন—

কেরাচিন তেল মিলে না
ডিব্‌রিবাতি জ্বাইল্‌ব কিসে।
সব জিনিসের দর বাইড়েছে
শরমভরম ঢাইক্‌ব কিসে।।
ভাদু দ্যাখ্‌ দেখি মা—
ছাঁচি তেল তাও মিলে না
তেল য্যান খাঁটি সনা।।

ভাদুগানে সেটেলমেন্টের কথাও ধরা পড়ে —

ভাদু বল্ ভাদু রে।
'সেটেলমেনে' যাইতে হবেক কাইল্ ভোবে।।
কানুনবাবুর আইন কড়া
পাছে জমি লেই কাইড়ে।
'রেকড়্'- পড়্চা ঠিকঠাক চাই
ভয়ে প্রাণে হাঁফ ধরে।।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সমকালীন সমাজ ভাবনার ছবি ভাদুগানে বিধৃত। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মসূত্রে বাঁকুড়া শহরের মানুষ। একদা তাঁরই উদ্যোগে একটি কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। তিনি সেই কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সে ঘটনা ভাদুগানে ধরা পড়ে —

মনের এই বাসনা।
দেইখ্‌ব কবে কটন মিলের কারখানা।।
উকিল মুইক্তার (মোক্তার) হাকিম আদি গো
সমবেত সর্বজনা।।
দেখি সহযোগী দেশবাসিগণ
আনন্দেতে আটখানা।।
মান্যবর রামনন্দ গো
করি শুভ কামনা।
শুভক্ষণে রথের দিনে
কইর্‌লেন ভিত্তিস্থাপনা।।

নারীপ্রগতির নামে উগ্র আধুনিকতা গ্রামীণ মেয়েদের কাছে সমর্থন পায় নি। তাই ভাদুগানে শোনা যায়—

এই স্বাধীন দেশে।
মেয়েরা চইল্‌বেনা আর স্বামীর বশে।।
স্বামীর কোলে ছেলে দিয়ে গো
চুল বাঁইধ্‌তে গিন্নি বসে।।
আবার কাজে গেলে স্বামীধন গো
গিন্নি সিনেমায় যায় হেসেহেসে।।

বর্তমান আইনে পিতার সম্পত্তিতে ছেলে এবং মেয়ের সমান অধিকার। এই সমানাধিকার ভাদুগানে নন্দিত নয়, নিন্দিত। তার কারণ, ভাদু-করা মেয়েরা রক্ষণশীলা ও আধুনিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতা—

একি কলিকালে—
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।
ছিঃ ছিঃ কলিকালে।।
দেশে হইল নতুন আইন
লতুন লতুন কথা বলে।
ভাইয়ের ভাগ বুনেও (বোন) পায় গো
আদালতে মামলা চলে।।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বারমাস্যা-বর্ণনে মুকুন্দরাম প্রমুখ কবিরা দক্ষতা দেখিয়েছেন। টুসুগানে বারমাস্যার চিত্র পাওয়া না গেলেও ভাদুগানে তার খণ্ডিতরূপ পাওয়া যায়—

ভাদরে পাঠাব না মা
অমাবস্যা প্রতিপদ।
আশ্বিনে পাঠাব মা'কে
সঙ্গে দিব জড়া (জোড়া) রথ।।
আশ্বিনে পাঠাব না মা
আসিবেন অম্বিকা।
কার্তিকে পাঠাব মাকে
সঙ্গে যাবেন রাম-সীতা।।
কার্তিকে পাঠাব না মা
কার্তিকে শূন্য ঘর।
আঘণে (অঘ্রানে) পাঠাব মা'কে
লবান্নের পর।।

ভাদুগানে সীতার বারমাস্যায় কৃষ্ণকথার ছাপ পড়েছে। শ্রীরাধিকার বারমাস্যা-বর্ণনের ভাবভাষা এখানে পরিলক্ষিত —

চৈত্রেতে চাতকী ওড়ে
শ্রীমন্দির উপরে।
ডাকিতেছে চাতকিনী
পিউ পিউ স্বরে।।
বৈশাখে খরতাপ
মাটি ফাটে চারিধার।
বৃক্ষতলে ব'সে সীতা
চলিতে না পারে আর।।

(ইত্যাদি)

ভাদুগানে শ্রীরাধিকার বারমাস্যার কিছু কিছু নমুনার চিত্র ফুটে ওঠে—

মাঘেতে মাধব কৈল
মথুরা গমন।
দশ দিক শূন্য হেরি
নব বৃন্দাবন।।
ফাগুনে দ্বিগুণ দুখ
যৌবনবতীর।
ফুলে ফলে ভরা বুক
সারা ধরণীব।
(ইত্যাদি)

অন্ত্যটীকা

১। সুধীরকুমার করণ—সীমান্ত বাঙ্‌লার লোকযান, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা (১ম সংস্করণ, ১৩৭১) ১৪৩-১৪৪ পাতা।

২। যুধিষ্ঠির মাজী—ভাদুগীতির ইতিকথ (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ (১৯৮৫), ৩৯-৪০ পাতা।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত—ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ৯৯-১০০ পাতা।

৪। রামশঙ্কর চৌধুরী—ভাদু ও টুসু, কথাশিল্প, কলকাতা (২য় প্রকাশ, ১৯৮১) ১৩ পাতা।

৫। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ, ৪র্থ সংস্করণ (১৯৬৩) ৮৫ পাতা।

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি (১৯৮২), ৭৩ পাতা।

অষ্টম অধ্যায়

টুসুগানে বৈষ্ণবচেতনা

।। এক ।।

রাঢ় বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার প্রাচীনতম শিলালিপি শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ। দুর্গম স্থানে, খাড়াই পাহাড়ের প্রস্তরগাত্রে আজও দৃশ্যমান বিষ্ণুচক্র এবং খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের ব্রাহ্মীলিপি। সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ফলত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসনা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে প্রাচীন বাঁকুড়ায় প্রচলিত ছিল। ''উত্তরকালে, পাল-রাজত্বেও যে বিষ্ণু (বাসুদেব) পূজা অতি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ পাল-সাম্রাজ্যের এলাকার ভিতরে প্রাপ্ত অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পাল-সাম্রাজ্যের সর্বত্র, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে আধুনিক কালের বঙ্গ দেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে, বিষ্ণুর চব্বিশটি শাস্ত্রীয় মূর্তির সব ক'টিরই নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি বলেন, পাল আমলের বিষ্ণুবিগ্রহ অন্য যে-কোনো দেববিগ্রহের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তিনি একথাও বলেছেন যে বাঙলাদেশ ও বিহারে প্রাপ্ত পালযুগের অধিকাংশ বিষ্ণুমূর্তিই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব মূর্তি।''[১]

বাঁকুড়ার বহুলাড়া, ধরাপাট, ডিহর গ্রামগুলি থেকে লাল পাথরে গড়া কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি পুরাতত্ত্ববিদরা সংগ্রহ করেছেন। জয়পুর থানার সলদা, পাত্রসায়ের থানার কুশদ্বীপ এবং চন্দ্রবর্মার রাজধানীখ্যাত পখন্না থেকেও কিছু বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ঐসব মূর্তিগুলি পাল আমলের। বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে রাধানগর গ্রামের পুকুরপাড়ের এক ভগ্নদেবালয়ে কষ্টিপাথরে গড়া বামনাকৃতি বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তি এবং অনুরূপ একটি মূর্তি পাওয়া গেছে নিকটবর্তী বাসুদেবপুর গ্রামে। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত থুমকড় এবং তলঝিট্‌কা গ্রাম; ছান্দার এলাকার ময়নামুনি, পাঁচাল প্রভৃতি গ্রাম থেকেও বিষ্ণুবাসুদেব মূর্তি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা— ঐসব মূর্তি একাদশ-দ্বাদশ শতকের শিল্প নিদর্শন। রাঢ়-বিশেষজ্ঞ মানিকলাল সিংহ বলেন, ''... অনেকেই বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে জৈনধর্মের মধ্য দিয়া আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন, এবং বাঁকুড়ায় উক্ত খ্রিস্টপূর্বাব্দ হইতে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত জৈনধর্মের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু জৈন দেউল, দেউলের প্রতিকৃতি, জৈন দেবদেবীর প্রতিমা গঠন বা আচার আচরণে উক্ত আমলের জৈন ধর্মের অনুশীলনের বিন্দুমাত্র নিদর্শন মিলে না। বরং বলা যায় উড়িষ্যার চোড়গঙ্গ রাজাদের আগমনের পর হইতে অদ্যাবধি তাহা নানারূপে চলিয়াছে।

''অনন্ত চোড়গঙ্গের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শতক বৎসর ধরিয়া বাঁকুড়া জেলার কাঁসাই কুমারী, শিলাই, দ্বারকেশ্বর, দামোদর ইত্যাদি নদনদীকূলে অসংখ্য রেখ, পীঢ়া, ভদ্রদেউল গঠিত হইয়াছিল এবং জৈন তীর্থঙ্করগণের শাসন যক্ষিণী অম্বিকা—

সূর্য, গণেশ, কার্তিকেয়, নন্দী, মহিষমর্দিনী ইত্যাদি বহু প্রস্তর প্রতিমা নির্মিত হইয়াছিল। রেখ দেউল, পীঢ়া দেউল, ভদ্র দেউলের অভিনব গঠনশৈলী সম্পূর্ণভাবে উড়িষ্যার স্থাপত্যের প্রভাবপ্রসূত এবং উপরিউক্ত প্রস্তর প্রতিমাগুলির গঠনের মধ্যেও উড়িষ্যাশৈলী সমধিক পরিস্ফুট।"

'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য মহাপ্রভুর মথুরা গমনকালে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার কিয়দংশ পরিক্রমার কথা উল্লেখ করেছেন—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।।

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।

ফলত, মহাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবীয় ভাবনা সীমান্ত বাঙ্‌লার জনমানসে গভীরভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মল্লভূমরাজ বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ একটি নাটকীয় ঘটনা। শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্যগণ রাঢ়-বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য বহু বৈষ্ণব পুঁথিসহ শ্রীনিবাস আচার্যকে প্রেরণ করেন। দুর্গম অরণ্যপ্রান্তর পেরিয়ে, বিষ্ণুপুরের কাছে পুঁথিপত্রে বোঝাই গোরুরগাড়িটি এলে, বীর হাম্বিরের অনুচররা ধনরত্নের পেটিকা ভ্রমে সেই গাড়ির জিনিসপত্র লুঠ করে। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর দুই সঙ্গী নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দকে নরোত্তমের জন্মভূমি সন্তোষগ্রামে পাঠিয়ে, নিজে অপহৃত পুথিপত্র উদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে এক স্থানীয় ব্রাহ্মণের সহায়তায় শ্রীনিবাস আচার্য বীর হাম্বিরের রাজসভায় যান। তিনি যখন রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন রাজপণ্ডিত শ্রীবাস চক্রবর্তী রাজার কাছে 'রাস পঞ্চাধ্যায়ী'-র পাঠ ব্যাখ্যা করছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীনিবাসের অনেক আগে শ্রীজীব গোস্বামীর আত্মীয় মথুরেশ সার্বভৌম মল্লভূমে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হন। তবু শ্রীনিবাস আচার্যের অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে রাজপণ্ডিত সপরিবারে তাঁর শিষ্য হন। তখন তাঁর নামকরণ হয় ব্যাসাচার্য। রাজা বীর হাম্বির-ও শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তাঁর দীক্ষান্ত নাম শ্রীচৈতন্য দাস এবং 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থ অনুযায়ী তাঁর দীক্ষান্ত নাম হরিচরণ দাস। তখন থেকে মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর 'দ্বিতীয় বৃন্দাবন'-এ পরিণত হয়। জয়ানন্দ দাস বনবিষ্ণুপুরকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলেছেন। বিষ্ণুপুর সন্নিহিত গ্রাম ও বাঁধ বা জলাশয়গুলির নামকরণেও বৈষ্ণবীয় ভাবনার আরোপ লক্ষনীয়। যথা, গ্রাম নাম—দ্বারকা, মথুরা, অযোধ্যা, অবন্তী ইত্যাদি। দীঘিগুলির নাম—কৃষ্ণ বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ প্রভৃতি।

চৈতন্যদাস বীর হাম্বির বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে তাঁর দুটি বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়। সেগুলির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

(১) প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মনের আশ
তোয়া বিনু গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিঠ
ঘুচাইলে রাজ-অহঙ্কার।

(২) শুনগো মরম সখী কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব যে গো উচাটন
প্রেম করি খোয়াইনু পরানি।।
শাশুড়ি ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বির চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেল কালাচাঁদের পায়।।

বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ। উড়িষ্যার আফগান-শাসক কতলু খাঁর সঙ্গে মোগল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহের যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে আক্রান্ত কুমার জগৎ সিংহকে উদ্ধার করার জন্য মল্লভূমরাজ বীর হাম্বির মানসিংহের সুনজরে আসেন। তাঁর আনুকূল্যে বীর হাম্বিরের রাজ্যসীমা উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কো, অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ; পূর্বে বর্ধমানের কিয়দংশ এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পঞ্চকোট রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চকোট গড়ের খড়িবাড়ি তোরণেও দুয়ারবন্ধে বীর হাম্বিরের নাম উৎকীর্ণ হয়। সময়কাল ১৬৫৭ বা ১৬৫৯ সংবৎ, অর্থাৎ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ।

বীর হাম্বিরের কাল থেকে বিষ্ণুপুরসহ চারপাশের বহু এলাকায় বৈষ্ণবধর্ম দ্রুত প্রসারলাভ করে। বিষ্ণুপুরে নির্মিত হয় মদনমোহন-শ্যামরায়-কালাচাঁদ প্রমুখ দেবতার মন্দির ও রাসমঞ্চ। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটি বা টেরাকোটা শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন আজও বিস্ময় জাগায়। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের আমলে (রাজত্বকাল ১৭৩০-১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ) বৈষ্ণবভক্তির প্লাবন ঘটে। ধর্মোন্মত্ত রাজা আইন জারি করে প্রজাদের হরিনাম জপ করতে বাধ্য করেন; যা বাঁকুড়ার প্রবচনে 'গোপাল সিং-এর বেগার' নামে খ্যাত। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গলে গোপাল সিংহের আমলের উৎকট বৈষ্ণব-ধর্মের চিত্র এঁকেছেন—

রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী।
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী।।
চাবা মানা হাথীকে ঘোড়াকে মানা ঘাস।
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস।।

ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তীও 'নিরাকার নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর'-কে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন—

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিয়ম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা কব গুণ কথা হরিহর চন্দ্রধাতা
যত কিছু আপনি গোসাঞি।।
কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্মা সনাতন বেদ
পান্ডব বংশের যদুমণি।
তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বাহুবল
যোগ-রূপে জন্মিলা আপনি।।

বাঁকুড়ার ইন্দাসের ধর্মমঙ্গলের কবি সীতারাম দাস, বিষ্ণুপুরের পানুয়া গ্রামের কবিচন্দ্র শঙ্করের রচনাতেও বৈষ্ণবীয় ভাবনার ইঙ্গিত আছে।

প্রসঙ্গত পুরুলিয়ার চেলিয়ামা গ্রামের টেরাকোটায় অলংকরণযুক্ত রাধাবিনোদের মন্দির কথা মনে পড়ে। মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠাফলকে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল ১৬১৯ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ। পুরুলিয়ার বরাবাজারে আছে অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ। পুরুলিয়ার চাকলতোড় গ্রাম ছাতা পরবের জন্য বিখ্যাত। ঐ গ্রামে শ্যাম রায়ের একটি জোড়বাংলা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। মন্দির-নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এ সমস্তই মল্লভূমরাজাদের বৈষ্ণবীয় চেতনার প্রভাবে গড়ে ওঠা।

বৈষ্ণবীয় ভাবতরঙ্গ বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার লোকায়ত ঝুমুরগানে শুধুমাত্র নয়, টুসুগানেও ঢেউ জাগিয়েছে। তাই রঙের টুসুগানে আছে—

(১) কাল ভমর পিরীত জানে না।
রাধার কুঞ্জে যাইতে দিব না।।
যাও ফিরে যাও কালসনা।
রাধার কুঞ্জে যাইতে দিইব না।।

(২) আর ত যাব না জলে।
কালা থাকে গ কদমতলে।।

(৩) চল্ সজনী যাব যমুনা।
দেইখে আইস্‌ব গো কালসনা।।
ছল কইরে জল আইন্‌তে যাব
দেইখ্‌ব গো কালসনা।
কালশশী দিবানিশি আছে গো কদমতলায়
আড় নয়নে মুচকি হাঁসি দেইখলে কিগো প্রাণ জুড়ায়।
যে দ্যাখে কালবদন
তার ঘরে রহা বড় দায়।।

(৪) বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে।
ভাঙে না চুরে না বাঁশী ফেইলে দিক মা নিরলে।।
কৃষ্ণের বাঁশী দিবানিশি শুনি মাগো কানেতে।
বাঁশী শুনে হয় না শান্তি হয় না গো জীবনেতে।।
যখন কৃষ্ণ বাজায়, তখন আমি কাঁদি হাসি।
বাঁশী শুনে হয় গো মনে আমি হই কৃষ্ণের দাসী।।
ব্রজপুরে ব্রজগোপী কৃষ্ণ নামে হয় সুখী।
ওই কৃষ্ণের থাকে নাকি থাকে গো অষ্টগোপী।।
নিধুবনে কৃষ্ণ সখা বাজায় গো মোহন বাঁশী।
বাঁশীর স্বরে যত দাসী আসে গো হাসি হাসি।।

(৫) কাশী যাব পইরাগ্ যাব
আর যাব বিন্দাবন।
ঘুরার পথে দেইখে আইস্‌ব
তমালেরি তরুবন।।

এইসব টুসুগানে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। এখানে রাধাকৃষ্ণ চিরন্তন প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ভাবমূর্তি। রাধাকৃষ্ণের জবানীতে গ্রামীণ নরনারীর প্রণয়াবেগ তথা হৃদয়ার্তি ফুটে উঠেছে। প্রাসঙ্গিক আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যথা—

(১) বাঁশী বাজে ললিত সুরে
মন বিপিনে সাঁঝ দুপুরে।।
যে রাগেতে বাঁশী বাজে রাধা নামে সুস্বরে।
আমার বিরহবীণা বেজে ওঠে সেই সুরে।।
বাঁশী বাজে সুতানে মোর অন্তরে।
আমি ধনি বিরহিনী মরি সদা গুমরে।।

(২) কুঞ্জে ক্যান আইল না কালা।
বাসি রইল হে ফুলের মালা।।
কুঞ্জে কালা আইস্‌ব বইলে গাঁথিনু বনমালা।
যতনে রাইখেছি জ্বালে সুন্দর যৌবন-আলা।।
চাইয়ে কালার পথপানে কাইট্‌ল রে অনেক ব্যালা।
বিরহ-মারুত আসি মরমে দিচ্ছে দলা (দোলা)।।

(৩) একলা ধনি যাইস্ না বিকালে।
জল আনিতে নদীর কূলে।।
সরোবরে প্রস্ফুটিত হেরিলে কমল ফুলে।
অনায়াসে পাইলে মধু ত্যজে না অলিকুলে।।

তেমনি কালা পাইলে একা ছাইড়্‌বে না জীবন গ্যালে।
পান করিবে প্রেমমধু বসিয়া যৌবন-ফুলে।।

(৪) ওলো ধনি বাঁকা আড় নয়ন।
তকে দেইখ্‌লে লো জুড়ায় জীবন।।
সাঁঝ সকালে জল্‌কে যাবি কাঁখে কলসী নিলি ধন।
রাস্তার মাঝে দেখা হইলে লিব লিব করে মন।।

(৫) বিনয় করি কহেন শ্রীমতী।
বঁধু, শুন মন মিনতি।।
তুমি হে ভমরা জাতি নানা ফুলে বসতি।
এ-কুসুমে, ও-কুসুমে মধু খাও নিতি নিতি।।
বিকশিত সরোবরে হেরি নলিনী ভাতি।
মধুকর পিয়ে মধু হইয়া হৃষ্টমতি।।

(৬) কবে শ্যামকে পাব হে দ্যাখা।
একা মন করে ফাঁকা ফাঁকা।।
শ্যাম বিনা রইতে লারি, পাই না হে তাকে দ্যাখা।
দ্যাখা পাইলে ধইব্‌ব গলে, যদি পাই তার দ্যাখা।।
কার কুঞ্জেতে রইলে ভুইলে তুমি হে বাঁকা সখা।
শিশুকালে পিরীত কইরে আজ ক্যান দিলে দাগা।।

(৭) প্রেম কইরে শ্যাম দিলে ডিগবাজি।
এমন বুঝি নাই আর কারসাজি।।
হাঁইসে হাঁইসে পাশে বইসে কলগেটেতে দাঁত মাজি।
মিষ্টি মিষ্টি কথা বইলে মন মজাই দাগাবাজি।।

(পুং রঙ) লুলুক দুঁলাই মুলুক ভুলালি।
এখন ক্যানে গো মুখ ফ্‌লালি।।
আদর কইরে হাতে ধইরে আঁচল বিছাই বসালি।
মুচকি মুচকি হাঁইসে হাঁইসে মোর কপালে হাত বুলালি।।

(স্ত্রী রঙ) পিরীত কইরে দায় হইল হে শ্যাম।
বঁধু দিলে না ত নাহ্য দাম।।
কলঙ্কিনী, কুলমজানি সংসারেতে হইল নাম।
ভাব কইরে আর ভাইবে ভাইবে জীবনের কপালে ঘাম।।

উপরিউক্ত (৭নং গান) গানটি এক মুসলমান লোক কবির। তার নাম—সেখ জীবন রোস্তম আনসারি। পুরুলিয়া জেলায় বলরামপুরের কাছে পড়্যাশা গ্রামে বাড়ি। এই মুসলমান লোককবির মতো পুরুলিয়ার কেন্দা গ্রামের সেখ নিজামউদ্দিন আনসারি-ও

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতির ধাঁচে টুসুগান রচনা করেছেন—

মরি মরি তোর জ্বালায় মরি।
ও শ্যাম বাজাইস্ না আর বাঁশুরি।।
ঘরে-পরে সবাই শুনে ক্যান বাজাও বাঁশুরি।
জলের ঘাটে গিয়ে আমার ভাইঙ্‌ল হে কাঁখের ঝারি।।
তুমি কি জান না হে শ্যাম আমি অবলা নারী।
কাইল্ সকালে হবে দ্যাখা দিও না আর শিশ্‌কারি।।
আমি তুমায় ভুইল্‌তে লারি মরি হে শ্যাম গুমুরি।
তুমার প্রেমে পইড়ে আমি ছাইড়্‌লি হে শ্বশুরবাড়ি।।
অনেক দিনের পরে দ্যাখা তোমায় কি ভুইল্‌তে পারি।
নিজাম বলে চল ইবার কইর্‌ব গো রেজিস্টারি।।

টুসুগানে রাধাকৃষ্ণ ভাবনায় অনেক পৌরাণিক প্রসঙ্গে ধর্মীয় বাতাবরণ-ও সৃষ্টি হয়। তাই টুসুগানের কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধার উক্তি—

বাঁশীর স্বরে কী মধু আছে।
আমার মনকে হরণ করেছে।।
বল বৃন্দে কোন্ পথে যাব গো বঁধুর কাছে।
জটিলা-কুটিলা আজি দুয়ারে দ্বারী আছে।।
ঘরে বাদী বাইরে বাদী সবাই নিঠুর হয়েছে।
প্রাণসখী বল আমায়, বল কী উপায় আছে।।
ঘরে আমি রইতে নারি বিরহে প্রাণ দহিছে।
শ্যামের মিলন লাগি আঁখি ধারা বহিছে।।
পরান ছাড়িব সখী বিনা শ্যামের পরশে।
ছাড়ি জাতি কুলমান মিলিব বঁধুর সাথে।।

বৃন্দের উক্তি—

ওগো রাধে ধৈরজ ধর।
তোমায় মিলাব বঁধুর কর।।
আর না কাঁদ গো সখী লুটাইয়া ভূমি 'পর।
নিশ্চয় মিলাব তোমায় শ্যামবন্ধু নটবর।।
যত্ন বিনে কোন জন পেয়েছে কি সোনার মোহর।
সবুর বিনে নাহি মিলে অমূল্য রতন পাথর।।
রাধা শ্যামে মিলাইব জুড়ি দুই করে কর।
প্রাণে আমার এই তো আশা বাজিছে যে নিরন্তর।।
কেবা রাধা শ্যাম কেবা চিনে কেবা গিরিধর।
জীব-আত্মা শ্রীরাধা, পরম-আত্মা নটবর।।

কৃষ্ণের উক্তি—

রাধা নামে সেধেছি বাঁশী।
বাঁশী বাজিছে গো দিবানিশি।।
রাধা নামে কত সুধা মধু আনন্দরাশি।
তুলনা নাহিক তার যেন ঘৃতকলসী।।
কোথা রাধা প্রাণ আধা এস গো প্রিয় সখী।
তব আগমন তরে ভ্রমিছি দিবানিশি।।
দুজনে করিব লীলা দুজনে হয়ে সাথী।
বাসর সাজায়ে রামকেলিতে রব মাতি।।
অভিমান করো না রাই করি সখি মিনতি।
বৃন্দাবনে জ্বালাইব প্রেমের আলোবাতি।।

বৃন্দের উক্তি—

হেরিয়া ঐ যুগলবদন।
আজি জুড়াল আমার নয়ন।।
কিবা শোভা মনোলোভা জিনি ভানুর কিরণ।
হৃদয় শীতল হল সার্থক আমার জীবন।।
বনমালী শ্যাম সাথে বামে শ্রীরাধা শোভন।
চূড়াধড়া শিরে পরি সেজেছ বংশীমোহন।।
ময়ূরময়ূরী শোভে যেন রামধনু রঙ্।
শুকসারী খেলা করে হেরিয়া যুগলমিলন।।
জগৎ সৌন্দর্যরাশি জুড়িয়া সকল এখন।
ঝলকে বিজলি যেন গগনেতে নব ঘন।।

বৈষ্ণবভাবনাযুক্ত টুসুগান রচনায় মুসলমান কবিরাও সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন। পুরুলিয়ার কেন্দা গ্রামের সেখ নিজামউদ্দিন আনসারি তাদের একজন। তাঁর লেখা আর একটি গান উদ্ধৃত করা হল—

হরিনামের জপ হে মালা।
ও তোর সময় নাই, গেল বেলা।।
এ হরিনাম পারের ভেলা কর না অবহেলা।
এ হরিনাম পথের সম্বল তর্‌বি রে নিদানবেলা।।
এ হরিনাম সার কর ভাই, যাবে হে দুঃখজ্বালা।
হরি হরি বল রসনা সন্ধ্যাসকাল দু'বেলা।।

পাপ দেহ পবিত্র হবে, এ নামের পর মালা।
নাম বিনে কি আছে গতি ছাড় হে মোহ জ্বালা।

ভবের হাটে এসে রে তুই খেলবি রে কত খেলা।
নিজাম ভনে এ জীবনে নাম বিনে হে পাই জ্বালা।।

লক্ষণীয়, আধ্যাত্মিক ভাবনাযুক্ত বহু টুসুগান রচনাশৈলীর দিকদিয়ে অকৃত্রিম নয়, তার মধ্যে অর্বাচীনকালের শহুরেপনা স্বতঃস্ফূর্ত লোকায়ত চেতনাকে খর্ব করেছে। পক্ষান্তরে, বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে, শৈশবে, ভূতেশ্বর, বিক্‌না, কাটনাড়, তিলাবেদ্যা প্রভৃতি গ্রামে পৌরাণিক কাহিনীমূলক (Ballad) যে টুসুগান শুনেছি, সেখানে লোকভাবনা কৃষ্ণকথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। গানটি নিম্নরূপ—

আচম্বিতে মূচ্ছাগত ধুলায় পইড়ে অচেতন।
মা বইলে ডাকে নাই কৃষ্ণ একি দেখি আচরণ।।
দ্যাখ আইসে রোহিনীদিদি গোপালের কী হইল গো।
বিনা মেঘে বজ্জপাত এ কী আজ হইল গো।।
উঠ রে বাপ চেতন কর খাও রে বাপ নবনী।
তুমার জন্যে গোকুলে কাঁদিছে সব রমণী।।
উঠরে বাপ চেতন কর ওরে আমার নীলরতন।
সিদাম-সুদাম-সুবল সঙ্গে যাবে নাই কি গোচারণ।।
উঠ রে বাপ চেতন কর ওরে আমার কালসনা।
তুমার জন্যে এই গোকুলে কাঁদিছে যে কতজনা।।

অইদ্দ আইল বইদ্দ আইল কৃষ্ণধনকে বাঁচাতে।
অমূল্য ধন দিব বইদ্দ যদি কৃষ্ণের প্রাণ বাঁচে।।
কুথা হইতে আইলে বইদ্দ কুথায় তুমার বসতি।
কেবা তুমার পিতা বঠে, কে বঠে মাতা সতী।।

পিতার নাম গো নন্দ বইদ্দ মাতার নাম যশমতী।
গোপাল বইদ্দ নামটি আমার নন্দালয়ে বসতি।।
পরিচয় কী লিবে মাগো পরিচয়ের কী প্রয়োজন।
গোপাল যাতে বাঁইচে উঠে করগো তার আয়োজন।।

কে আছে গো সতী নারী ডাক গো শীঘ্র গতি।
সতীর জলে ওষুধ বাঁইটে বাঁচাব কালশশী।।
কুটিলা-জটিলা বলে আমরা দুজন হই সতী।
অহঙ্কারে মত্ত হইয়ে কাঁখে করে কলসী।।
আঠার ছিদ্র বারি দেইখে লাগে বুকে ভয়।
আয়ান দাদা বইসে আছে কী হবে প্রত্যয়।।

খড়ি লাড়ি খড়ি চাড়ি খড়িতে দিয়েছি মন।
রাধা নামে উইঠল খড়ি ডাক মা তাকে এখন।।

রাধিকাব বাড়িতে গেল খর পায়ে দু'জনা।
চল্ গো রাধা শীঘ্র কইরে বাঁচাবে কালসনা।।

ওরে দূতী কী শুনালি, কী শুনালি শ্রবণে।
কেমন আছে প্রাণগোবিন্দ দেইখে আসি নয়নে।।

কে আলি মা, গৌরী আলি, বইস কৃষ্ণেব পাশেতে।
আঁধার ঘরে মানিক আমার হেলাতে হারাই পাছে।।
কে আলি মা, রাধা আলি, আলি তো সেই রুক্মিণী।
তুই যদি মা জল আইনে দিস বাঁইচ্‌বে আমার নীলমণি।।

দাও দেখি মা পাটের শাড়ি, দাও দেখি ছিদ্র গারি।
যবুনাতে যাব গো আনিতে শীতল বারি।।

রাধার আনা যবুনার জলে ওষুধ-বাঁটার কাজ হইল।
পালঙ্কেতে উইঠে কিষ্ট মা মা বইলে ডাকিল।।

।। দুই ।।

বিষ্ণুপুরের দশবতার তাস বিখ্যাত। সেই অবসর-বিনোদনমূলক খেলাতেও বৈষ্ণব চেতনা পরিস্ফুট। লক্ষণীয়, দিনের বেলায় রাম-অবতারের তাস দিয়ে খেলা শুরু। রাতের বেলায 'স্টার্টার' মীন অবতার তাস। দশাবতার তাস গোলাকৃতি। মীন, কূর্ম, ববাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ ও কল্কি—এই দশাবতারের রূপ বা প্রতীক নিয়ে তাস খেলা। মীন-অবতারের প্রতীক মাছ, কূর্মের কচ্ছপ, বরাহের শাঁখ, নৃসিংহের চক্র, বামনের কমন্ডলু, রামের তীর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মুষল, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম এবং কল্কির খড়্গ। মোট তাসের সংখ্যা একশ' কুড়ি।

বাঁকুড়ার কবি জগৎরাম রায়ের জগদ্রামী রামায়ণে শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালী'-তে বৈষ্ণবীয় ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। লোক-সঙ্গীত টুসুগানেও বৈষ্ণবচেতনার আরেক প্রকাশ রামচন্দ্রের অনুধ্যানে ফুটে ওঠে। রামায়ণের অশোকবনে কিংবা বাল্মীকির তপোবনে সীতার দুঃখ-বেদনার ছবি লোক-কবির অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, যার সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে টুসুগানে। এখন শোক থেকে শ্লোক, কিংবা "Our sweetest songs are those/ That tell of saddest thought."[৩] তথাকথিত অশিক্ষিতপটু লোক-কবির মনে পঞ্চবটী বনের কথা জেগে থাকলেও, তিনি অসতর্কভাবে অশোকবনের কথা টুসুগানে লিখে ফেলেন—

অশোকবনে পাতার কুঁইড়ায় সীতা পাশা খেলিছে।
যগীর বেশে রাবণ আইসে সীতা হরণ কইরেছে।।

এখানে লক্ষণীয়, রামায়ণের পঞ্চবটী বন শুধু অশোকবন হয়েছে তাই নয়, মহাভারতে পাণ্ডব-কৌরবদের বিখ্যাত পাশাখেলা দৃশ্যও কবির অবচেতন মনের গভীর

প্রভাব, কিংবা রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের বুঝি অনুষঙ্গ ভাবনায় ধরা পড়েছে। তাই তিনি সীতারও পাশাখেলার কথা নির্বিচারে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, নারীহরণকারী, পরস্ত্রীলোভী পাপী রাবণের প্রতি কবির যুগপৎ সতর্কতাবাণী ও ক্রোধের জ্বলন্ত প্রকাশ—

সীতাহরণ করিল রাবণ, রাখবি সীতা যতনে।
নইলে রে তোর সনার লঙ্কা দিব রে ডাহন (দহন) কইর।।

আবার মণিহারা ফণীর মতো সীতাহারা রামের দুঃখও লোক-কবির অন্তরে ব্যথা জাগায়—

রাম কাঁদে বনে।
সীতা হইরে লিল রাবণে।।

কিংবা

কুটীরেতে সীতা ছিল, কুথা গেল কে জানে।
সীতাহারা হয়ে রাম কাঁদিছেন বনে বনে।।

অনুভাবী পাঠক কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতাহারা রামের শোকের সঙ্গে এই টুসুগানে সীতাহারা রামের মনোদুঃখের গভীর মিল সহজেই খুঁজে পাবেন।

টুসুগানে জননী কৌশল্যার প্রাণাধিক পুত্র রামের বনবাসী হওয়ার জন্য মনোবেদনা, বাল্মীকির তপোবনে স্বামী পরিত্যক্তা সীতার লবকুশের প্রতি সন্তান বাৎসল্য ও দূর্বাদলশ্যাম স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতির সঙ্গে অনিষ্ট অশঙ্কায় উৎকণ্ঠা প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড চিত্র গভীর মানবিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে বনবাস গমনের ইঙ্গিত একান্ত বেদনায় টুসুগানে ফুটে ওঠে—

রাম ন কিরে রাজা হবি, কাল ন কিরে অধিবাস।
চৌকাঠেতে লেখা আছে চোদ্দ বছর বনবাস।।

বনগমনকারী রামচন্দ্রের প্রতি মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন ব্যাকুলতা এবং তার উত্তরও লোককবির টুসু গানে ধরা পড়ে—

রাম ন কি রে বনে যাবি, বনে গেলে খাবি কী?
বনে আছে ফলপাকড় মা, রামের খাবার ভাবনা কি।।

সীতাকে রাম যেন সঙ্গে বনে নিয়ে যান, সে-কথাও লোক-কবি প্রস্তাব দিয়েছেন—

রাম ন কিরে বনে যাবি সঙ্গে লে রে সীতাকে।
ই ভারতে কে আছে রাম সীতার ভারাভার লিতে।।

জননী কৌশল্যার কথা ও লোককবি ভেবেছেন—

রামের মা কৌশল্যারাণী বুক বাঁইধেছেন পাষাণে।
প্রাণের রামকে বনে দিয়ে ঘরে আছেন ক্যামনে।।

যোগীয় ছলনায় রাবণের সীতাহরণে রাম ও সীতার কথা লোক-কবিকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে; তাই পঞ্চবটী বনের কথা বলতে গিয়ে কবি 'অযোধ্যার বনে' কথাটি বলেছেন—

রাম কাঁদে মা অযোধ্যার বনে।
সীতা হইরে লিল রাবণে।।

সীতাহরণ কইর‍্লি রাবণ
রাইখ্‌বি সীতায় যতনে।
সীতার পাঁয়ে সনার নেপুর
বাইজ্‌ছে গো আশোক বনে।।

অশোকবনে একাকিনী, পতিপ্রাণা সীতার কথাও কবি ভেবেছেন—

কাঁইদ্‌ছ কি কাঁইদ্‌ছ কি সীতা
অশোকেরি ডাল ধইরে।
আর কাঁইদ্‌অ না ও-ভাই সীতা
গাছের পাতা যায় ঝইরে।।

সীতাহারা রামচন্দ্রের কথাও কবি এঁকেছেন—

বাঁদর বুইলে ডালে ডালে
বাঁদরের কি পা দলে (দোলে)।
সীতাকে রাম হারাই বনে
কাঁইদে বইসে গাছতলে।।

টুসুগানে বাল্মীকির তপোবন, লবকুশের বীরত্ব এবং তাদের জননী সীতাদেবীর উৎকণ্ঠা লোককবি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন—

রাম ছাইড়েছেন যইগ্‌গের ঘঁড়া
তপুবনের কাননে।
লবকুশ ধইরেছে ঘঁড়া
সীতা বলে দাও ছাইড়ে।।

ছাইড়্‌ব না ছাইড়্‌ব না ঘঁড়া
ছাইড়্‌ব না কন মতে।
আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ দিবেক
দেইখ্‌ব বীর ক্যামন বঠে।।

শূরনৃত্য (Heroic dance) ছো-নাচের অন্যতম বিষয় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। মুখোশ-পরা ছো-নাচের বীরত্বব্যঞ্জক শিল্পময় তাণ্ডবে বুঝি লোক-কবিরা উদ্দীপিত হন। মূলত চৈত্রশেষে শিবের গাজন থেকে জ্যৈষ্ঠের তেরো তারিখ 'রোহিণ্'' অবধি

ছো-নাচের বিধিসম্মত কাল হলেও, সেই দৃপ্তভঙ্গির শূরনৃত্যের দৃশ্যময় রসব্যঞ্জনা লোক-কবির অন্তরে টুসুগান রচনাতেও বুঝি প্রেরণা জোগায়। লোক-উৎসব টুসুর সঙ্গে লোক-নৃত্য ছোয়ের এ জাতীয় আন্তর মিল লোকজীবনের সরলীকরণ ভাবেরই পরিচায়ক। টুসু-করা কিশোরী-যুবতীদের টুসুগানে রামায়ণের বহু খণ্ডচিত্র শুধু শ্রব্য নয়, নান্দনিক চেতনায় দৃশ্যময়ও হয়ে ওঠে—

রাম ধইরেছেন হরধনু
কাঁধে ঝুলে গাণ্ডীবাণ (গাণ্ডীব-বাণ)।
হরধনু ভাইঙে দিলেক
জনক করেন সীতাদান।।

শুধু রামের হরধনুভঙ্গের ছবি নয়, রাণী কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের সত্যবন্দীর ছবি-ও টুসুগানে বিধৃত—

কুথা থাইকে কেকয়রাণী
আঙুল-ঢেড়ি আনিল।
দশরথ রাজার হাতে
আঙুলঢেড়ি সঁপিল।।

। আঙুলঢেড়ি = হাতের আঙুলের বিষাক্ত ঘা। ।

যখন রাজা কাঁইদে বেড়ায়
কেকয়রাণী শুনিল।
সইত্তিবন্দী কর রাজা
আঙুল ভাল করিব।।

জীউয়ের জ্বালায় বুঢ়ারাজা
সইত্তিবন্দী করিল।
রামলক্ষ্মণকে বনে পাঠাই
ভরতকে রাজ্য দিল।।

পিতৃসত্যপালনের জন্য সীতালক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের বনগমনের দৃশ্যও টুসুগানে ফুটে ওঠে—

মাথায় জটা বনফুল-আঁটা
পইর্‌ল রাম গাছের বাকল।
যখন রাম সাজিল ও ভাই
বাকল করে ঝলমল।।
নগরে প্রজারা কাঁদে
গাছে কাঁদে ককিলা।

রাজার মহালে কাঁদে
কৌশল্যা আর সুমিতা।।

উপরে সুয্যির ছটা
নাময় তাতা বালি গো।
চলিতে না পারে সীতা
করিছে বিকলি গো।।

রাম ভাঙিলেব গাছের ডাল মা
লক্ষ্মণ ধইর্‌লেন মূলেতে।
তাহারি ছায়ায় সীতা
চলেন ধীবে ধীরেতে।।

আমারি আঙিনা মাঝে
সনার হরিণ যায চইলে।
ঘরে আছ লক্ষ্মণ দেওয়র
সনার মির্‌গী দাও ধইরে।।

বীর হনুমানের সাগর লঙ্ঘনেব পরাক্রমও টুসুগানে ধরা 'পড়ে—

সমুদ্র পেরাইল হনু
শ্বেত মাছিটির বেশ ধইরে।
রামের হাতেব অঙ্গুরিটি
পইড়্‌ল সীতার আঁচলে।।

রাবণ বধের পর—

এক লক্ষ ব্যাটা রাবণের
সুয়া (সওয়া) লক্ষ নাতি (নাতি)।
একটিও রাম রাইখে দেই নাই
বংশে দিতে বাতি।।

পুরুলিয়ার ভুঁড়্‌কু গ্রাম থেকে সংগৃহীত টুসু গানে রামলীলায় আখ্যানমূলক কাহিনীও পাওয়া যায়। যথা, ভরতের বিলাপ—

কৈকয়ী মা নহে জননী।
তুমি হও গো কুটিল ডাকিনী।।
নিজ স্বামী খেলে মা গো যেন কালসাপিনী।
আঁখিজলে ভাসে আজি যত পুরবাসিনী।।
বনেতে পাঠালে রাম, মা-সীতা ঠাকুরাণী।
রাজার ঝিয়ারি সীতা হল চিরদুখিনী।।

শোকের সাগরে ভাসি সদা মাগো জননী।
শয়নে স্বপনে শুনি নরক বাদ্য ধ্বনি।
শৈশবেতে যদি মাগো খাওয়াতে বিষপানি।
এ দুখ-দংশন মা গো নাহি হোত দিবস যামিনী।।

রাম-রাবণের যুদ্ধ—

রাম-রাবণেতে মহারণ।
যেন গগনেতে প্রভঞ্জন।।
নর-বানরেতে যুদ্ধ মহারব ঘন ঘন।
রাবণের বহু পুত্র কাটিল রঘুনন্দন।
মেঘনাদ করে বধ মহাবীর লছমন।
শত শত বীর ধরাশায়ী ক্ষণে ক্ষণ।।
কুম্ভকর্ণ পড়িল, অন্তঃপুরে শুরু রোদন।
রাবণের মৃত্যুশর হনু করিল হরণ।।
পড়িল ত্রিলোকজয়ী ভক্তবীর দশানন।
বৈরীভাবে ভক্তি রামে বৈকুণ্ঠে করে গমন।

শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন—

কি আনন্দ কিবা কলরব।
রাজ্যে ফিরিল রাম রাঘব।।
কিবা শোভে পথঘাট গুঞ্জবিছে অলি সব।
অযোধ্যা সেজেছে আজি যেন বৈকুণ্ঠ স্বরগ।।
চোদ্দ বছর শেষে হরি নারায়ণ শ্রীরাঘব।
বিভীষণ জাম্ববান সুগ্রীব মনে অঙ্গদ।।
ফিরিল জনমভূমে লয়ে বন্ধু পরিষদ।
জ্ঞানী ঋষি মহারাজে পূর্ণ হল দেশ সব।।
কত কথা আলোচিত হল কত বেণুরব।
পুরা মাস আলোকিত করিল কোটি সূরজ।।

ছো-নাচের দেশ পুরুলিয়া-ধলভূমে মহীরাবণ পালা শুধু মাত্র ছো-নাচের দৃপ্তছন্দে রূপায়িত হয়, তাই নয়, টুসু গানেও ছন্দিত—ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা 'ধলভূমের লোকগীতি' গ্রন্থে বলেছেন, 'টুসুগীতের স্মৃতিচিত্র মহীরাবণ পালাটুকু সংক্ষিপ্ত হলেও সুন্দর এবং দেশজ রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুগত—

যত কুলনারী যত কুলনারী,
কলসী কাঁখে জল আনে সারি সারি।
মত্ত (মর্ত) হতে মহীরাজা গ এনেছে নর ধরি।

সুড়ুঙ্গের ভিতরে হনুমান চলে অতি সত্বরে
উপনীত হয় গিএ সেই যে মায়ের মন্দিরে।
বলবে হে আমরা রাজার ছেলে না জানি নমস্কার
নমস্কার করিএ মহীকে দেখাল দুজনেতে
হনুমান তখন মায়ের খাঁড়া আনি
মহীরে দিল বলি।
যত কুলনারী গ যত কুল নারী..."[৮]

টুসুগানে রামচন্দ্রের দৈবীসত্তা কখনও কখনও মানবিক গৃহস্থালিরসে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলা যায়—'ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া'[৯]—

রামের মায়ে রামকে মারে রাম কাঁদে ধুলায় পইড়ে।
কন বিদেশী আইসে ধুলা ঝাইড়ে-ঝুইড়ে লেই কলে (কোলে)।।
ধুলা ঝাইড়ে পরে বলে এই ছেইলাটি কার বটে।
তুমার লয় মা আমার লয় মা ঈশ্বরের দিয়া বটে।।

কৃষিভিত্তিক জীবনে ঘরের ছেলে লাঙল দিয়ে চাষ করবে—এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু গ্রাম্যনারীর মাতৃহৃদয়ে পুত্রস্নেহের মধ্যে রামচন্দ্রের মানবীয় ভাবের ছায়া পড়ে। তাই টুসুগানে শোনা যায়—

আমার রাম হাল জুইড়েছে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু।
চিনে চিনে কামিন কইর্‌ব
দাঁত গাবা কমর সরু।।

দক্ষিণ পশ্চিম-সীমান্ত বাঙলা টাঁইড়্-বাইদের দেশ। রুক্ষবন্ধুর মাটিতে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের মতো সব্‌জিপাতি উৎপন্ন হয় না। তাই নিম্ন মধ্যবিত্ত অনেক পরিবারে গৃহসংলগ্ন সব্‌জিক্ষেতের কাঁটা বেগুন এবং নিকটবর্তী বাঁধের (জলাশয়ের) ছোট গুগলি-শামুক ভাতের সঙ্গে তরকারি হয়। টুসুগানে তারও ছবি ধরা পড়ে —

ও রামের মা, ও রামের মা
আজ কী তোদের তরকারি?
ঐ সতীনের বাড়ির বাইগন্
নাম্‌হ বাঁধের গগ্‌লি।।

দুপুরে বা কিঞ্চিৎ বেলা গড়িয়ে, ভাত-খাওয়া-দাওয়ার পর, সীমান্ত বাঙ্‌লার গ্রামাঞ্চলে বহু কুলনারী পরম তৃপ্তিতে পান চিবাতে চিবাতে পাড়ায়-পাড়ায় একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা, গল্প গুজব করে। তখন কে কী কী তরকারি দিয়ে দুপুরে ভাত খেয়েছে, সে-সব প্রশ্নোত্তর সামাজিক সৌজন্যের বাইরে নয়। উপরিউক্ত টুসুগানে 'ঐ সতীনের

বাড়ির বাইগন' কথায় প্রকৃত অর্থে 'সতীন' নারীর কথা নয়, অবস্থাপন্না প্রতিবেশিনীর গৃহস্থালি সবজিক্ষেত থেকে বেগুন-সংগ্রহ করার বিষয়টিকে রসালাপে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের সুরে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক নীলচাষ-প্রসঙ্গে দেবর-ভ্রাতৃবধূর সহজ কৌতুকপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্কে রামানুজ লক্ষ্মণের কথা টুসুগানে ফুটে ওঠে—

বাড়ির নাময় লীল (নীল) বুইনেছি
লীলে থাক (খোকা) ধরে না।
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর
লীল পেইড়া (কাপড়ের পাড়) বই পরে না।।

এ দেশে নারী জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা রামচন্দ্রের মতো স্বামী লাভ করা। প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ কুলনারী আপন মনের ঐশ্বর্যে বা কল্পনায় রাজনন্দিনী সীতা। তাই টুসুগানে ধ্বনিত হয়-

আমি রাজনন্দিনী।
স্বামী আমার রামচন্দ্রব রঘুমণি।।

অন্ত্যটীকা

১। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির, সাহিত্যসংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১, ৭৭ পাতা।

২। মানিকলাল সিংহ, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪, ১০৭ পাতা।

৩। P B. Shelley, 'To the Skylark'

৪। চিত্তরঞ্জন লাহা, ধলভূমের লোকগীতি [দ্বিতীয় খণ্ড; মকর], ৪৭-৪৮ পাতা।

৫। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'আমরা' কবিতা।

নবম অধ্যায়

টুসুগানে আগমনী-বিজয়া

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাঙলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের একটা মস্ত ভার। কন্যা দায়ের মতো দায় নাই। কন্যা পিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়না-বশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহার রূপ-গুণ-অর্থ-সামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ..... হরগৌরীর কথা বাঙলার একান্নপরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারিঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায়, তখন সমস্ত বাঙলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।"[১] শিউলি-ঝরা সকালে শরতের সোনার আলো, কাকচক্ষুসদৃশ পরিপূর্ণ স্বচ্ছ সরোবরের মতো বাঙালি মাতৃহৃদয়েও 'কি জানি পরান কি যে চায়'—জাতীয় এক অতৃপ্তিবোধ গড়ে তোলে। তারই সুর ধ্বনিত হয় শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' গানে—

> গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
> স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
> চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল।।

[দাশরথি রায়]

আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাঙালির সমাজচেতনা ও পারিবারিক গার্হস্থ্যরসের আশ্চর্য ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে আগমনী-বিজয়ার গীতিকবিতাবলীতে। সেখানে আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অভিমান-বিরহভাবনা মানবিক গার্হস্থ্যরসে সহজগভীরভাবে লীলায়িত হয়েছে, রাঢ়বঙ্গের টুসুগানেও পৌষালি দিনের হিমেল হাওয়ার অনুরূপ ভাবনা ফুটে ওঠে। টুসুর জন্যও মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা—

> বেলা ওঠে ঝিকিমিকি
> তবু টুসু আসে না।
> আইস টুসু চেতন কর
> আমায় জ্বালা দিঅ না।।

রামপ্রসাদ সেনের একটি গানে উমার অভিমানের কথা আছে। জগন্মাতা শক্তিরূপিণীকে ঘরের ছোট্ট মেয়েরূপে দেখে বাঙালির আনন্দ। সেখানে উমা আকাশের

চাঁদ ধরতে চায়, এবং তা না পেয়ে—

উমা করে অভিমান
নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।

টুসুগানেও দেখি শস্যদাত্রী, লক্ষ্মীরূপা টুসুও ছোট্টবালিকা হয়ে চাঁদ ধরতে চায় এবং তা না-পেয়ে অভিমান ভরে খাবার খেতে চায় না—

টুসু আমার খায় না কিছু
শুখাঁয় গেল চাঁদবদন।
রাত হইলে চাঁদ ধইরে দিব
কেঁদ না রে টুসুধন।।

আগমনী গানে দেখা যায় বালিকা উমাকে মা মেনকা স্নেহভরে কোলে নিয়ে আদর করতে চান—

ওগো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' বলে!

[মহেন্দ্রলাল খান]

টুসুগানেও দেখি মাতৃহৃদয়ের স্নেহবিহ্বল আবেগের প্রকাশ—

ভবানী মা, ও টুসুমণি।
কোলে আইস মা এখনি।।

বর্ষা অতিক্রান্ত শরতের সোনার আলোয় যখন শস্যপূর্ণা বাঙ্লার বুকে আনন্দের সুর, তখনই বাঙালি মায়ের প্রতিনিধিস্বরূপা মা মেনকা বলেন—

উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,
মা হতে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না—দিতে এনে।
প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি, কৈলাসে তাই যেতে সাধি
রেখেছ তো বছরাবধি প্রবোধি ছলবচনে।

[মনোমোহন বসু]

মাঠে মাঠে সোনার ধান যখন পরিপূর্ণ আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে, তখনই কৃষিপ্রধান রাঢ়বঙ্গের মাতৃহৃদয়ে আসন্ন মিলনের স্বামি-গৃহে-থাকা, সংসার-অনভিজ্ঞা কিশোরী মেয়ের করুণ মুখচ্ছবি মাতৃহৃদয়ে আবেশে বিরহসজল আবহ তৈরী করে—

দুগ্গা পূজায় চিঠি দিলম্ আসে যেন দুজনে।
কালীপূজায় পূজা কইরে কাঁদি গো মনে মনে।।

টুসুগানে দেখি, 'আসে যেন দুজনে'—অর্থাৎ জামাইসহ টুসু যেন পিত্রালয়ে আসে। দুর্গাপূজায় আগমনী গানেও সেই একই সুর—

গিরিরাজ হে, জামাইয়ে এনো মেয়ের সঙ্গে
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন—

[অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

আগমনী গানে আছে—

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।

[রাম বসু]

মজার ব্যাপার, বাঙালির হৃদয়াবেগে গিরিপুর ও কৈলাসপুর এক হয়ে গেছে; শুধু তাই নয়, "কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্‌লার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।"[২]

টুসুগানেও দেখা যায়, লক্ষ্মীরূপিণী শস্যদেবী টুসু মূলত দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার অভাবসর্বস্ব ঘরের মেয়ে। তাই তার নাকে পাথর-বসানো সুন্দর নাকছাবি দেখে গ্রামের সব নারীরই কৌতূহল। কৌতূহল সীমা মানে না: সেই নাকছাবি গড়াতে কতটাকা বানি অর্থাৎ পোদ্দার বা স্বর্ণকারের পারিশ্রমিক লেগেছে, তা-ও জিজ্ঞাস্য বিষয়। শহুরে মানুষের কাছে বিষয়টি গ্রাম্য পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু গ্রামের মেয়েদের কাছে তা সহজ আন্তরিক প্রশ্নাতুর বিষয়—

টুসুর নাকে আপেল পাথর
কন্ পদ্দার গইড়েছে।
টুসুর মাকে জিগাস্ কর্অ
কত বানি লেগেছে।।

সচ্ছল, বর্ধিষ্ণুচেতনা থেকে শুধু নয়, চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর জন্যও দক্ষিণপশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লার বহু মানুষ কোঠাবাড়ি বানায়। নতুন কোঠাবাড়ির ওপরে উঠতে হলে, অনভ্যস্ত নবনারীকে কিছুটা সাবধানী হতে হয়। টুসুকেও সেই সতর্কবাণী শোনান হয়—

উপর কঠায় উঠ্‌ইলে টুসু
ভাল কইরে ভাইল্‌বে।
নামার সময় মনে কইরে
শিবের মাথায় ফুল দিবে।।

শিবের মাথায় শিবদণ্ড
রামের মাথায় দণ্ডীবাণ।
এ দণ্ডবাণ যে ভাঙিবে
তারে দিব সীতাদান।।

এ অঞ্চলের শৈবভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণবধারার সহজ মিশ্রণের ইঙ্গিত উপরিউক্ত টুসুগানে আছে।

আগমনীগানে উমা যেমন ঘরের মেয়ে, টুসুগানেও টুসু তেমনই আপনজন। টুসুকে ঘিরে কিশোরী মেয়েরা নিজেদের স্বল্পভ্রমণজাত ভৌগোলিক চেতনার ইঙ্গিত দেয়—

চল্ টুসু চল্ দেইখ্‌তে যাব
রানীগঞ্জের বটতলা।
আইস্‌বার সময় দেখাই আইন্‌ব
কয়লাখাদের জলতুলা।।

বাঁকুড়ায় পোরকুলের টুসুমেলা বিখ্যাত। সেখানে অসংখ্য কিশোরীদের মতো টুসুরও মেলা দেখতে যাওয়ার কথা: কিন্তু তার খিদে লাগলে কী খাবে, তার ভাবনাও টুসুগানে ধরা পড়ে—

টুসু ন কি পরকুল যাবেক
খিদা লাইগ্‌লে খাবেক কী।
আন্‌অ টুসু গায়ের গামছা
ঘিয়ের মিঠাই বাঁইধে দিই।।

আগমনীগানে দেখি সুবর্ণলতা উমা শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে কালী হয়েছেন। মা মেনকা আহতচিত্তে ভালোবাসার বেদনায় জানতে চান—

কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে?
জানি. নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।।

টুসুগানেও দেখি, শ্বশুরঘরের অভাবী পরিবেশে বালিকাবধূ টুসুকে গায়ে হলুদ মাখার বিলাসিতা ছাড়তে হয়। জামাই তার চালচুলোহীন ভিখারী, তার ওপর ননদ শাশুড়ির নির্যাতন—

হলুদবনের টুসু তুমি হলুদ কেন মাখ না?
শাশুড়ি ননদের ঘরে হলুদ-মাখা সাজে না।

উমা শুধু ভিখারী শিবের একমাত্র ঘরনী নন, তাঁর আছে সতীন-কাঁটার যন্ত্রণা—

ওহে গিরি কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ।।

* * *

ঘরেতে সতিনী জ্বালা, সদা করে ঝালাপালা।
হয়ে উমা রাজবালা কিসে পাবে ত্রাণ।।

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

টুসুগানেও আছে সতীনযন্ত্রণাব কথা—

ই কুলিতে উ কুলিতে
মাঝ কুলিতে জামবাটি।
এমন কন দিন দেখি নাই মা
এক জামাইকে দু বিটি।।

[কুলি বা কুল্হি = গ্রাম্যপথ]

টুসুগানে এই সতীন যন্ত্রণার হিংস্র প্রতিক্রিয়া ক্ষুব্ধ আক্রোশে ধরা পড়ে—

এক গাড়ি কাঠ দুগাড়ি কাঠ কাঠে আগুন লাগাব।
যখন আগুন হুদ্হুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব।।

মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠিযে মায়ের অন্তর যে শুধু ব্যাকুল হয় তা নয়, মেয়ের মনেও মায়ের জন্য আকুলতা জাগে। সেই তীব্র ব্যাকুলতা আঞ্চলিক চিত্রকল্পে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট—

মা গো আমাব মন ক্যামন করে।
যেন পস্ত কাঁদে গোল আলুব তরে।।

আলু-পোস্ত তরকাবি টাঁইড়্বাইদের রুক্ষজীবনে প্রিয় ব্যঞ্জন। আর সেই পোস্তর সঙ্গে আলুর মিলের মতই মায়ের সঙ্গে মেয়ের মিলন' এই ব্যাকুলতা আরেকটি চিত্রকল্পে ফুটে ওঠে—

মা গো আমার মন ক্যামন করে
যেন শোল মাছে উফাল মারে।

গভীর জলাশয়ে বৃহৎ শোল মাছের উল্লম্ফনে যে গভীর জলাবর্ত সৃষ্টি হয়, সেরূপ মোচড় দেওয়া আর্তি শ্বশুর ঘরে-থাকা নববধূর অন্তরে সদা জাগরূক থাকে। মকর-পরবেই সচরাচর পিত্রালয়ে আসার সহজ সুযোগ ঘটে। তাই টুসুগানে সীমান্ত বাঙ্লার নতুন 'আগমনী' পৌষালি হিমেল হাওয়ায় গুঞ্জরিত হয়।

শ্বশুরঘর অধিকাংশ বধূজীবনে বিচিত্র সংক্ষোভজনিত জটিলতা হেতু যন্ত্রণার কারণ হয়। মেয়ের মা-বাবার রাগ গিয়ে পড়ে জামাইয়ের ওপর। ক্ষোভে দুঃখে মা ভাবেন—মেয়েকে তার পতিগৃহ থেকে এনে পুনরায় তাকে যন্ত্রণার গৃহে ফেরত পাঠাবেন না,

তাতে লোকলজ্জার বিষয় যদি হয় তাও উপেক্ষা করা যাবে। 'আগমনী'-গানে সেই বিচিত্র সুর ফুঠে ওঠে—

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।

[রামপ্রসাদ সেন]

সীমান্ত বাঙ্‌লার কোন-কোন নবকুলবধূ স্বামিগৃহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাপের ঘরে পালিয়ে যায়। তখন মায়ের মনে ক্ষোভ-দুঃখ প্রতিবাদী চেতনায় ধ্বনিত হয়—

আমার টুসুর একটি ছেইলা মানবাজারে শ্বশুরঘর।
কলসির উপর কলসি রাইখে পালাই আইল বাপের ঘর।।
পালাই আলি ভাল কইর্‌লি, আর ত বিদায় দুব না।
জামাই আইলে ঝগড়া কইর্‌ব লাজের বালাই রাইখ্‌ব না।।

সংসার-অনভিজ্ঞা কিশোরী মেয়ে তার স্বামিগৃহ থেকে অত্যাচারপীড়িতা হয়ে বাপের বাড়িতে পালিয়ে না-এসে, সহজভাবে এলেও মায়ের অন্তর প্রবোধ মানে না। পতিগৃহে নববধূর সাংসারিক কাজকর্মের খুঁত ধরার জন্য অনেক জোড়া চোখ সর্বদা জেগে থাকে; তাতে কিশোরী বধূর জীবন অস্বস্তিকর হয়। সে কারণে, সাধের বিবাহিতা মেয়েকে শ্বশুরঘরে পাঠাতে মায়ের মন চায় না—

একটি আমার সাধের টুসু
না পাঠাব শ্বশুর-ঘর।
[illegible]লাতে চাপে যে ঐ
আসছে লিতে স্বয়ং বর।।

তবু অনিবার্যতা, নারীজীবনের সহজ বিকাশ ও পরিণতিকে মেনে নিতে হয়—

"এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"[৩]

শারদ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিনদিন শিবঘরনী, কৈলাসবাসিনীকে বাঙালী আপনগৃহে পেয়ে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। কৈলাসবাসিনীকে গৃহনন্দিনীরূপে পাওয়ার আকুতি এবং প্রাপ্তিশেষে আনন্দ উচ্ছলতা নিয়ে আগমনী গান। সুখ-দুঃখ, আলো-ছায়া জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য আনে, তেমনই আগমনী গানেও জেগে থাকে বিজয়ার করুণ সুর; আর বিজয়া গানের সেই অতলান্ত বেদনার মাঝে আগমনী গানের আসে পূর্ণতা।

নবমীর রাতে মাতৃহৃদয়ে ভরা আনন্দের মধ্যে জাগে আসন্ন বিদায়ের করুণরাগিণী। তাই বাঙালি মাতৃহৃদয়ের করুণ আবেদন—

১। ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

২। যেও না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

[মধুসূদন দত্ত]

৩। যেও না যেও না ··নী রজনি,
সন্তাপহারিণী, লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমাব যাবে চলে।

[নবীনচন্দ্র সেন]

এত আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও গভীর রাত শেষে ভোর-হয়-হয়, তখন মায়ের মনে উৎকণ্ঠা—

নবমী নিশি পোহাল, কি করি কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এল।।

[রূপচাঁদ পক্ষী]

আসন্ন কন্যা বিরহের ভয়ে মায়ের মন সামান্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে সান্ত্বনা পেতে চায়—

কালকে ভোলা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন করে!
বলে বলুক যে যা বলে
মানবো না আর জামাই ব'লে—
যায় যাবে সে, গেলে চলে—যা হয় তখন দেখবো পরে।

[গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

মায়ের কাছে তিনদিন আনন্দে থেকে বিজয়ার দিন উমা কৈলাসে ফিরে যান। দশমীর দিন নবপত্রিকার জলে বিসর্জন। টুসুও তিন দিনের জায়গায় গোটা পৌষ মাস অর্থাৎ তিরিশ দিন পূজা পান, যেন পিত্রালয়ের প্রিয়তার মধ্যে তাঁর তিরিশটি দিন অতিবাহিত হয়; তারপর 'বাঁউড়ি'-র রাতে [টুসু জাগরণের রাত] ফুটে ওঠে আসন্ন বিচ্ছেদের

সুর। সীমান্ত বাংলায় 'বাঁউড়ি'-র রাত—শারদোৎসবের নবমীর রাত! টুসু করা কিশোরীদের কণ্ঠেও জননীর স্নেহবিহ্বল উৎকণ্ঠার সুর—

এতদিন রাইখ্‌লাম মাকে সনার মন্দিরে গো।
আর রাইখ্‌তে লাইর্‌লম মাকে মকর আইছেন লিতে গো।।
মকর আইছেন বেশ কইরেছেন টুসুকে রাইখবেন যতনে।
আমার টুসু শিশু ছেইলা শ্বশুরঘরের কী জানে।।

তবু বিদায় দিতে মন চায় না তাই অনুনয়—

সূর্য তুমায় বিনতি করি—
তুমি উদয় হইও না।
তুমি উদয় হইলে পরে।
টুসুকে রাইখতে পাইর্‌ব না।।

বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। টুসুর জবানীতে সীমান্ত বাঙ্‌লার নববিবাহিতা কিশোরী মেয়েদের দুঃখ ভরা সরল মনের পরিচয় ফুটে ওঠে; তারা অকপটে মাকে অভিযোগ জানায়—

বাঁক ভাঙা, হাঁসুলি ভাঙা
আর কবে গড়াই দিবি?
আর ত যাওয়ার সময় নাই মা—
কৈলাসেতে বিদায় দিবি!

কিন্তু কৃষিভিত্তিক সীমান্ত বাঙ্‌লায় খরা প্রায় ফি-বছর আসে, অজন্মাহেতু গৃহস্থের দুঃখকষ্ট লেগেই থাকে। তাই বিবাহিতা কিশোরী মেয়ের জন্য কিছু দেওয়ার অক্ষমতা টুসুগানে ভিন্নরূপে ধরা পড়ে—

বাড়ির নাময় শিমুল গাছে পায়রা কুহরে গো।
পাখি লয় মা, পায়রা লয় মা টুসু খেলা করে গো।।
খেইল্ না খেইল্ না টুসু কাপড় মলিন হবে গো।
তুমার মা যে অভাগিনী সাবান কুথায় পাবে গো।।

শ্বশুরঘরের দারিদ্র্যপীড়িত লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত জীবন বিবাহিতা কিশোরীর মনে একটা নেতিবাচক ভীতিপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলে—

মায়ে বলে হেঁ গা বিটি অ্যাত ক্যানে শুখালি।
—শ্বশুরঘরের ফঁপ্‌রা মুড়ি সে হ খাঁয়ে শুখালি।।
আর না যাব শ্বশুরবাড়ি, হাম্‌কে কিলাঁই দিইল শাশুড়ি।।

সেইসঙ্গে বাপের বাড়ির নির্ভার সহজজীবনে তার স্বস্তি-বোধ—

বাপের ঘরে বড় সুখ মা
খাওয়া-দাওয়া কি মজা।
সসুর ঘরে বড় দুখ মা
মানুষ বুঝা লয় সঝা।।

পতিগৃহের ভালোবাসাহীন মনোভাব কিশোরী নববধূর মনে এক অভিমানমিশ্রিত বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। তাই সে নিঃসীম কাতরতায় বলে শ্বশুরঘরের যন্ত্রণাপূর্ন জীবন থেকে রুক্ষপ্রান্তরে ঘুঁটে-কুড়ানো (গোবর-কুড়ানো) অনেক ভাল—

টাঁইড়ে টাঁইড়ে গঁইঠা কুড়া'
তা ও বরঞ্চ ভাল।
সসুর ঘরের কাজ নাই মা
সনার অঙ্গ কাল গ।।

শ্বশুরঘরের প্রতি কিশোরীবধূর অনীহা জাগলেও, পতিদেবতা নামক আশ্চর্য জীবটি সামাজিকভাবে অনেককে সাক্ষী রেখে যে কিশোরীটির পাণিপীড়ন করেছেন, তিনি তো চঞ্চলমতি বালিকাটিব তাঁর প্রতি নঞর্থক মনোভাবকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। আর শাক্তপদাবলীর বিজয়া পর্যায়ের গানেও তো আছে, যেখানে মা-মেনকা বলছেন —

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে—
ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার।।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বারে বার।

[রামপ্রসাদ সেন]

সীমান্ত বাঙ্‌লাতেও অনুরূপভাবে জামাইয়ের সঙ্গে কিশোরী কন্যাকে পাঠাতে হয়। কিন্তু তখন বাবার, বিশেষত মায়ের অন্তঃকরণ ভবিষ্যতের নানা দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে। তাই জামাই ও তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সবিনয় সতর্কীকরণ টুসুগানেও ছন্দোবদ্ধ হয়—

টুসু লেইগ্‌ছ ভাল কইর্‌ছ
রাইখ্‌বে টুসু যতনে।
টুসু আমার ছেইলা মানুষ
সসুরঘরের কী জানে।।

মেয়ের বিদায়ের প্রস্তুতি হিসেবে সামাজিক লৌকিকতাবশত 'লাড়ুর হাঁড়ি'-র চট্‌জলদি ব্যবস্থা করতে করত হয়—

আয় রে ময়রা ধর্ রে ঝাঁঝরা
দে রে চিনির পাগ্ কইরে।
টুসু যাবেক শ্বশুরবাড়ি
দে রে ময়রা সাইত্ কইরে।।

বিদায়ের আগে টুসু, নাকি সীমান্ত বাঙ্লার স্বামিগৃহগমনোন্মুখ কিশোরীর চোখে শ্রাবণধারা! সে বড়দাদার কাপড়ের খুঁট্ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে; মনে পড়ে যায় দাদার সঙ্গে কত প্রিয় আনন্দদুঃখ, মান-অভিমানের স্মৃতি! মা-বাবা এবং আত্মীয়-পরিজনের চোখেও অশ্রুসাগর। কিন্তু তাঁরা তা গোপন করে সান্ত্বনার সুরে বলেন—

কাঁইদ্ছ ক্যানে সাধের টুসু
বড় দাদার খুঁট ধইরে।
ই সংসারে বিটি ছেইলার
কে আছে বাপের ঘরে।।

মকর-সংক্রান্তি ভোর। টুসু-করা কিশোরীরা টুসু-খলা নিয়ে টুসুগান গাইতে গাইতে নিকটবর্তী নদী বা জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যায়। অনেকের হাতে চৌডল বা টুসুমূর্তি থাকে। সবাই গাইতে থাকে—

জল জল যে কর টুসু
জলে তুমার কে আছে।
মনেতে ভাবিয়ে দেখ
জলে শ্বশুরঘর আছে।।

তবু, টুসু-করা মেয়েদের সব দলই হৃদয়-নিঙড়ানো আকূতি নিয়ে গায়—

মনের এই বেদনা।
টুসুধনকে জলে দিব না।।

তবু সব ভালোবাসা জল করে টুসুকে জলে দিতে হয়—"বিসর্জনের বেদনায় এ যেন পৌষালি বিজয়া।"[৪]

শাক্তপদাবলীর বিজয়া-পর্যায়ের গানে মা-মেনকা উমাকে বলেন—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই যাই'।
মায়ের কাছে হৈমবতি ও-কথা মা বলতে নাই।।
বৎসরান্তে আসিস আবার, ভুলিস না মায়, ওমা আমার—
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর 'মা'-বোল শুনতে পাই।।
[জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ]

এই 'পুনরাগমনায় চ'-র সুর টুসুগানেও সহজভাবে বিধৃত—

তুমি টুসু জলে যাছ—
কবে দেখা পাব গো।
জলে গেলে কারে মা গো
মা বইলে ডাকিবে গো।।
সুখে চলি যাও গো টুসু
সুখে চলি যাও গো—
আইস্‌ছে বছর এমনি দিনে
আরঅ যেন আইস গো।।

অন্ত্যটীকা

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড) 'লোকসাহিত্য' বিশ্বভারতী (১৩৬৩) ৬৪৮ পাতা।

২। তদেব ৬৪৮ পাতা।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'যেতে নাহি দিব' কবিতা সঞ্চয়িতা বিশ্বভারতী (১৩৭০) ১৩০ পাতা।

৪। সুধীরকুমার করণ 'সীমান্ত বাঙ্‌লার লোকযান' ১৯৪ পাতা।

৫। অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক্তপদাবলী' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

দশম অধ্যায়

টুসুগানে সমাজভাবনা

চলমান জীবনের সুখ-দুঃখ, নানাবিধ সমস্যা, ভাঙা-গড়া, রাজনৈতিক আবর্ত বা সংকট সব কিছু কোন-না-কোন ভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার টুসু গানে ফুটে ওঠে।

করেছি পণ, দেবো না পণ—এ ঘোষণা শুধু আধুনিকা শহুরে মেয়েদের মুখে নয়, গ্রামেগঞ্জেও শোনা যায়, তবু পণপ্রথারূপী অসুরের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি। যৌতুকের নিদারুণ কৌতুকে রক্তবীজের বংশধরের মতো নানারূপে তার অপশক্তির প্রকাশ। আর, আগেকার দিনে 'রামসুন্দর' বা 'যজ্ঞেশ্বরের' মতো পিতারা কত অসহায় হতেন, তার ছবিও টুসুগানে ফুটে ওঠে—

বিটি বিকা হইল বিষম দায়।
বর যে সাইকেল-ঘড়ি চায়।।

কিংবা,

বিহা দিয়া বড় দায় হইল।
দেশে পণপ্রথা রহে গেল।।
কৃত্তিবাইসা[১] বিটির জ্বালায় ভাবনাতে জ্বইলে গেল।
বরের বাপ দেইখ্‌তে আইসে ঘাঁড়াটা[২] খাইয়ে গেল।।

[(১) কৃত্তিবাস কর্মকার। বিখ্যাত লোক-কবি।
(২) ঘাঁড়া হাঁস—পুরুষ হাঁস।]

রবীন্দ্রনাথ একদা সমাজমনস্ক চিত্তে বলেছেন, "কন্যা আমাদের গৃহের একটা মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মতো দায় নেই। কন্যা পিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়নাবশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তাহার রূপ-গুণ-অর্থসামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্যপাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃ-পরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে।"[১] বিস্ময় বা পরিতাপের বিষয়, অনেক সময় নারীর শত্রু নারীরাই হয়; হয়তো সেখানে মর্ষকাম চেতনার অন্তর্গূঢ় প্রকাশ ঘটে। তাই টুসু-করা মেয়েরা গায়—

সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও বিনা।
বিহা কইর না কন্‌হ জনা।।

মেয়ের বিয়ে কোন মতে যদি বা হয়, তবু জামাইয়ের মন-পাওয়া ভার। দেনা-পাওনার জের থাকলে তো তার রূপ আরো ভয়াবহ। সীমান্ত বাঙলার কৃষিভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের সদ্য বিবাহিত যুবক যখন-তখন শ্বশুরঘরে যাওয়া অসম্মানজনক মনে করে। টুসুগানে তার ছবি বিধৃত—

বাড়ির নাময় নাইর্‌কল গাছটি ঘটি ভইরে জল দিব।
একটি নাইর্‌কল ধইরলে পরে ডাকে চিঠি পাঠাব।।
চিঠি পাঠাই ঘঁড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না।
জামাই আদর বড় আদর তিন দিন বই আর থাকে না।।

এ গানটি বাঁকুড়া জেলায় অধিকমাত্রায় প্রচলিত। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল লাল মাটির দেশ। সেখানের 'ল্যাটেরাইট' বা কাঁকুরে মাটিতে তাল-খেজুরগাছ বিস্তর জন্মালেও নারকেল গাছ সহজে হয় না। তাই কোন-কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্বামী শখ করে 'বাড়ির নাময়' অর্থাৎ গৃহ সংলগ্ন বাগানে নারকেল গাছ লাগান। বাড়ির মেয়েরা অনেক সময় শখ করে সেই নারকেল গাছের পরিচর্যার জন্য জলসিঞ্চন করে। এখানে যেন সেই ছবি প্রতিফলিত। সহজেই অনুমেয়, ঐ গানে দেখা যায়—প্রথমে 'চিঠি' এবং পরে 'ঘঁড়া' (ঘোড়া) অর্থাৎ বিশেষ লোকজন পাঠান সত্ত্বেও জমিদারী গোঁ-হেতু জামাই শ্বশুর বাড়িতে আসে না। আর এ জাতীয় মন-কষাকষির ঠিকমত সমাধান না হলে জামাই নববিবাহিত স্ত্রীকেও তার পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। তাতে মেয়ের মায়ের মনে যে দুঃসহ ব্যাকুলতা জাগে, তার ছবিও টুসু গানে ধরা পড়ে—

দুগ্‌গা পূজায় চিঠি দিলম্‌ আসে যেন দুজনে।
কালী মায়ের পূজা কইরে কাঁদি গো মনে মনে।।

অন্যদিকে বাপের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ না-পেয়ে, শ্বশুরবাড়িতে নব বিবাহিতা বধূ আপন মায়ের প্রতি অবুঝ রুদ্ধ অভিমানে, পৌষ পরবের সময় মনোদুঃখে হয়তো গায়—

অ্যাত বড় পৌষ পরবে রাইখ্‌লি মা পরের ঘরে।
পরের মা কি বেদন জানে অন্তর ঝুইরে মরে।।

বাপের বাড়ি আসতে না পারার বেদনার চিত্র সহজ আঞ্চলিক উপমায় অন্য টুসুগানে ফুটে ওঠে--

আমার মন ক্যামন করে।
যেন পস্তু কাঁদে গোল-আলুর তরে।।

কিংবা,

আমার মন ক্যামন করে
যেন শোল মাছে উফাল মারে।।

টাঁহড় বাইদের দেশের রুক্ষতায়, আগেকার দিনে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় তেমন শাক্‌সব্‌জি উৎপন্ন হত না। তাই সাধারণ গৃহস্থে আলু পোস্তর (আঞ্চলিক উচ্চারণঃ আলু-পস্তু) তরকারি রাজকীয় মর্যাদা পেত। এখনও ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'আলু-পস্তু' অনেকেরই খুব প্রিয় তবকারি। এখানে আলুর বিরহে পোস্তর দুঃসহ একাকিত্বের চিত্রকল্পে, কিংবা গভীর জলাশয়ে শোল মাছের উল্লম্ফনে যে জলাবর্ত সৃষ্টি হয়, তারই উপমায় হৃদয়-বেদনার কথা সহজগভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমান যুগে তথাকথিত শিক্ষিত, ধনী পরিবারেও শাশুড়ি-ননদের হাতে বধূ-নির্যাতন থেকে বধূ-হত্যার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায়। গ্রামীণ পরিবেশে, তথাকথিত নিরক্ষর, অভাবগ্রস্ত পরিবারেও বধূ-নির্যাতনের বেদনাদায়ক চিত্র দেখা যায়। টুসুগানে তাই কিশোরী বধূর দুঃখ সরাসরি ক্রোধের দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়—

এ বছরে পৌষ পরবে সবাই্ পরে লীল শাড়ি।
আমার শাউড়ি দুনিয়ার-পাপী নাই দিল গো লীল শাড়ি।।

নির্যাতিতা বধূ পিত্রালয়ে কোন-প্রকারে যাওয়ার সুযোগ পেলে, তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ মায়ের সঙ্গেঁ নিভৃত কথোপকথনে বেদনাবিধুর হয়ে ধরা পড়ে—

মায়ে বলে, হে গ বিটি, অ্যাত কাল শুখালি?
—শ্বশুর ঘরের ফঁপ্‌রা মুড়ি সেই ত যাইরে শুখাঁলি।
আর যাব না শ্বশুর বাড়ি হামকে্ কিলাই দিল শাশুড়ি।।

নববধূর কাছে শাশুড়ি-ভীতি কত ভয়াবহ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দুটি টুসুগান উদ্ধৃত কবলে বোঝা যাবে—

ক) ই-চালে পুই, উ-চালে পুই, পুইয়ের খাব মিচুড়ি।
আর যাব না শ্বশুর বাড়ি, ধইরে মারে শাশুড়ি।।

খ) টাঁইড়ে টাঁইড়ে গবইর্ কুড়া
সে বরঞ্চ ভাল গ।
সসুর ঘরের কাজ নাই মা
সনার অঙ্গঁ কাল্‌হ গ।।

তবু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। সেখানে যেন হৃদয়হীন, গুমোট পরিবেশ। গ্রামের গৃহবধূ হয়েও তার যেন মনে হয়—

কে যেন চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।।২

সেই দুঃসহ চাপা অস্বস্তিতে তার মনে অনেক সময় টুসুগান মনোবেদনা রূপায়িত হয়—

বাপের ঘরে ঘরে ছিলম্ ভাল কাঁখে গইরা চালভাজা।
শ্বশুর ঘরের বড় জ্বালা লোকগুলা কেউ নয় সজ্‌হা।।

নববধূর অবিবাহিত ননদ তেমন কোন সাংসারিক কাজে সহায়তা করে না, সে শাশুড়ির 'সাধের বিটি!' তাই সাংসারিক ঝামেলা বাড়ির বৌয়ের ওপর পড়ে। ভারবাহী জন্তুর মতো সংসারের কাজ নববধূ করে যায়, কিন্তু যখন সে দেখে শাশুড়ির 'সাধের বিটি' পাহাড় তলির ঝর্ণাধারে আলস্য সুখে গান গায়, তখন সংসারের ভারক্লান্তা বধূ ক্ষুব্ধ চিত্তে স্বগতোক্তির সুরে আক্রোশ জানায়—

পাহাড়েতে জল পড়ে ননদিনী গান করে।
থাম্ লো ননদ, ভাইঙব গরব, যবে তুমার মা মরে।।

মধ্যযুগীয় বহুবিবাহপ্রথার জের এখনও সীমান্ত বাঙলার গ্রামে গঞ্জের কোন-কোন পরিবারে টিকে আছে। উদাহরণ হিসাবে পুরুলিয়া ২-নং ব্লকের অন্তর্গত জাহাজপুর গ্রাম। যে গ্রামের বেদিয়া (সাপুড়ে) সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পুরুষেরই একাধিক বিবাহ। পুরুলিয়ায় হেঁস্‌লা গ্রামের রামপদ মাহাত ১৮/০৫/৮৯ এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান— শুধু তারই দুটি স্ত্রী আছে তাই নয়, তাঁদের সম্প্রদায়ের অনেকেরই একাধিক বিবাহ। মানভূমের ঝুমুর-সম্রাজ্ঞী সিন্ধুবালাও (৮৭) বিশেষ সাক্ষাৎকারে (১৯/০৫/৮৯) জানান— জমিদারীপ্রথার যুগে বহুবিবাহ এ অঞ্চলের মানুষ আকছার করত; এখনও অনেকে সে ধারার অনুবর্তী। মধ্যযুগের বা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেই সপত্নী কলহের চিত্র যে পাওয়া যায় তা নয়, টুসুগানেও সপত্নীকলহের ঈর্ষার রূপ পাওয়া যায়—

এক গাড়ি কাঠ দু'গাড়ি কাঠ কাঠে আগুন লাগব।
যখন আগুন হুদ্‌হুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব।।

নারী-কোঁদলের তীব্ররূপ টুসুর 'জাগরণ রাত'-এ সাঙ্গীতিক গীতিমূর্ছনায় ফুটে ওঠে। গ্রামের একপাড়ার টুসু-করা মেয়েরা অন্যপাড়ার টুসু-করা মেয়েদের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম লড়াইয়ের ভঙ্গিতে, ঈষৎ অসূয়ামিশ্রিত চেতনায় হাত-পা নেড়ে চড়া গলায় গেয়ে ওঠে—

আমাদের টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্‌ঝন্ করে লো।
তোদের টুসু হ্যাংলা মাগী আঁচল পাইতে মাগে লো।।

প্রত্যুত্তরে হয়তো শোনা যায়—

তরা যতই সাজা।
তোদের টুসুর চইখ্ দু'টি পিঁয়াজ ভাজা।।

এরকম জবাব দিয়েও হয়তো তারা ক্ষান্ত হয় না। তাই টুসুগানে আরো জানায়—

এক সড়পে[১] দু'সড়পে তিন সড়পে লোক চলে।
আমাদের টুসু এমনি চলে বিন্ বাতাসে গা দলে[২]।।

[(১) রাস্তায় (২) দোলে।]

একদা প্রচলিত কবি-গানের চাপান-উতোরে শ্রোতাদের মনে ফুটে উঠত এক বিচিত্র আনন্দ, তেমনই দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লায় টুসুগানের 'জাগরণ রাত'-এ কিশোরী-যুবতীদের কোঁদল, প্রাকৃতজনের মনে হয়তো বিতৃষ্ণা না-জাগিয়ে, শ্রবণসুখ এনে দেয়। ঐ রাতে একদল মেয়ে হয়তো গেয়ে ওঠে—

টুসুর চালে লাউ ধইরেছে উরুলি ঝুরুলি[১] গো।
উয়াদের টুসুর নাকটা কাইটে গড়াব মুরুলি[২] গো।।

[(১) প্রচুর (২) মুরলী (বাঁশী)]

প্রতিপক্ষের মেয়েরা তখন হয়তো ভিন্ন কৌশলে আঘাত হানে—

গাঁড়র্ ভেঁড়া ভ্যাবায় যেমন কঁচি কঁচি ঘাস বিনে।
তেমনি তর্‌হা ভ্যাবায় মরিস মিলে নাই তদের গানে।।

এ জাতীয় বাক্যবাণের প্রত্যুত্তরে যুক্তিতে নয়, ক্রুদ্ধ ভঙ্গির সপ্তম সুরে হয়তো শোনা যায়—

তদের ডুম্‌কা গালে।
জড়া ঢেঁকি কুইট্‌ব লো তালে তালে।।

প্রতিপক্ষ তখন বিজয়িনী ভঙ্গিতে উত্তর দিতে পারে—

তর্‌হা কথা বইল্‌বি কিসে।
তদের উড়াই দিব ইংলিশে।।

ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা গ্রামীণ জীবনে এখনও যুগপৎ শ্রদ্ধা-ভীতির কারণ। সেই ইংরেজি ভাষায় কথা বলার মতো তুরন্ত বাক্যধারায় প্রতিপক্ষের নারীদের পরাভূত করার তীব্র বাসনা এখানে প্রকাশিত।

আধুনিক জীবনে রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাব দেখে গ্রাম্যকবি টুসুগানের মাধ্যমে মনোবেদনা প্রকাশ করেন—

দেশটা ডুইবে গেল রসাতল।
আমি দোষ দিব ভাই কারে বল?
বুদ্ধিমানে করে চুরি বোকায় ফ্যালে অশ্রুজল।
দাগাবাজি, জুয়াচুরি ঘুষখোরি চলে কেবল।
রাজনীতির নাই নীতির বালাই, চলে কেবল রঙ বদল।।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল বামফ্রন্ট সরকার শাসন পরিচালনা করছেন। তার জয়গানও টুসুগানে ফুটে ওঠে—

পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম. সরকার
রাজ্য চালান ভারি চমৎকার।।
বহু বছর ধরি হইল এদের শাসনভার।
কত কিছু নব রাগে গড়িল নতুন বাহার।।
ইস্কুলের বেতন ফ্রি পড়াশুনা চমৎকার।
প্রাইমারি ছেলেদের ফ্রি দেয় পুস্তক পড়ায়।।
শিশুশ্রেণীতে শিশুদের পাঁউরুটি দেই কেবা আর
মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করিল রাজ্য সরকার।।
সরকারের গুণাবলী লিইখ্‌তে হইল কাগজভার।
রাধুর খুব মনে ধইরে বাস স্ট্যাণ্ড পুরুলিয়ার।।

[রাধানাথ মাহাত গ্রাম ডুঁড়কু, পুরুলিয়া]

রাধানাথ মাহাত ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়েও টুসুগান বেঁধেছেন—

ভারতরত্ন মাতা ইন্দিরা।
দেশে বহাল গঙ্গা ধারা।।
ধনধান্যে পূর্ণ দেশে গড়িল সনার চূড়া।
সার্থক জনম মোদের তাঁরি দেশে বাস-করা।।
(ইত্যাদি)

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কথাও সাম্প্রতিক টুসুগানে ফুটে ওঠে—

ঝাড়খণ্ড রাজ্য হাম্‌দের অধিকার।
ও ভাই কথাটা অনিল দাদার।।
এই মাটিতে জন্ম মোদের এই মাটি যে মা আমার।
এই মাটিকে রক্ষা করার হাম্‌রা হলি দাবিদার।।
বন কাটি বস্‌কইতা বঠি, লই হে বড় জমিদার।
বাপের জমি রক্ষা কইর্‌তে ধর সবাই হাথিয়ার।।
কাঁধেতে লাও তীর-ধনুক হাথে ধর তলোয়ার।
টাঙ্গি-বল্লম-ফার্সা লিয়ে ঘুরাও ইবার অধিকার।।
ঝাড়খণ্ড রাজ্য অলগ্‌ কইর্‌ব—করি না আশা জীবনটার।
শোষকেরা আগাএ আসুক দেইখ্‌ব সাহস কেমন কার।।
লিবই লিব ঝাড়খণ্ড রাজ্য কইর্‌ব রে ঝাড়খণ্ড সনার।
কিরীটী খুড়া বলে দুলাল থাকে না কন্‌হ ভাবার।।

[(১) কিরীটী মাহাত (২) দুলাল মাহাত
গ্রাম কালুহার, পুরুলিয়া।]

ভেজাল-সর্বস্ব আধুনিক জীবনের করুণ ছবিও টুসুগানে চিত্রিত—

খাবার ভেজাল ওষুধে ভেজাল।
মানুষ বাঁচার হবে কী হাল।।
দুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল, জলে হইল ভেজাল।
জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ি হইল আকাশপাতাল।।
এভাবে চলিলে দেশ যাবে চলি পরকাল।
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রইয়ে যাবে চিরকাল।।
(ইত্যাদি)

সমাজসচেতন সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে নিজেদেব অসুবিধার দুঃখ টুসুগানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। লক্ষণীয়, তার মধ্যে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনেব গভীর সূত্র নিহিত—

সরকারের পদে নিবেদন।
মোদেব বাঁচার উপায় কী এখন।।
আমরা হইলম্ পুরুলিয়ার সাদাসিধে জনগণ।
খরায় জরায় জর্জরিত পরণে ছেঁড়া বসন।।
রাজ্য ভিতর্ জেলা মোদের কেন পিছে পড়ি রন[১]।
কলকারখানা কেন না কর জেলায় স্থাপন।।
মোদের বাঁচবার লক্ষ্য বল কেন নাই এখন।
আমরা কি বিড়াল-কুকুর আমরা কি ইতর জন।।
যোগ্যতা দেখিয়া কাজ দিবে কিনা দিবে ধন।
কোন্ পথে বল্হ মোদের দারিদ্র হবে মোচন।।
একসাথে মিলিয়া সবে সাজাব আজ মহারণ।
ছিনিমিনি চইল্‌বে না আর লইয়া মোদের জীবন।।

[(১) রহেন, থাকেন।]

উপরিউক্ত টুসুগানে নিরাবরণ তীক্ষ্নতায় বঞ্চিত জনগণেব ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। সেই একই অভিমান মননের অমোঘ ব্যঞ্জনায় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মূর্ত—

অনেকেই ফিরে চায়, জন্ম নিতে চায় বারবার
তুমিও চাও না?
কেন নয়? পুরুলিয়া তোমার সংসার?
বৃষ্টিহীন দুই হাত উঠে এসেছিল খরা বুকে
এখন সমাজ
কার নাম বলে আর? কাকে দিতে চায় সব ভার?
মাটির ভিতর জমে অন্ধকার, মাটি নিজে আজ
জানে না ফসল
তোমার চোখের জলে ভ'রে ওঠে ছোট ছোট ফল।[৩]

একদা খ্যাত বিহারের মানভূম জেলা আজ মনোভূমে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশে মানভূমের ষোলটি থানা নিয়ে গড়ে ওঠে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির প্রেক্ষিতে যে ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল,[৪] যে-সময় ভজহরি মাহাত, অরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতারা লিখেছিলেন বা বেঁধেছিলেন ঐতিহাসিক টুসুগান—

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই
(ইত্যাদি)

'মানভূম কেশরী' অতুলচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষের অন্যতম বিখ্যাত টুসুগান—

আমার বাংলাভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোবা কে তারে।।
(ইত্যাদি)

ভাষা-আন্দোলনের তীব্রতর রূপ তৎকালীন অন্যান্য টুসুগানেও ফুটে ওঠে—

আইনসভার হুকুম কি বাহার।
হইল বাংলা-ভাষা বহিষ্কার।।
হুকুম কি বাহার.....
আইন সভায় হুকুম জারি, চইল্‌বে না বাংলাভাষা।
বিহার দেশের আইনকানুন দেখ লো সর্বনাশা।।
হুকুম কি বাহার...
মানভুইঞা সব গরীব দুখাঁর দাবি-দাওয়া জানাইতে।
দেশের মাথা পাটনা গেল, গেল আইন বানাইতে।।
(ইত্যাদি)

কিংবা,

জাইগ্‌ল সাড়া ভারতের মনে!
টুসুর জয় হবে সবাই জানে।।
টুসুর বাণী উইঠ্‌ছে ধ্বনি
শুন্‌গো তর্‌হা স্বকানে।।
বাংলাভাষায় রাজ্যগঠন
তাহারি বিজয় গানে।।
(ইত্যাদি)

তীব্র সমাজমনস্ক এ জাতীয় টুসুগানগুলিকে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'আমার বিবেচনায় এই গানগুলিকে টুসুসঙ্গীত না বলে, রাজনৈতিক লোক-সঙ্গীত, এঙ্গেল্‌স যাকে বলেছেন, Political folksong—তাই বলা বিধেয়।'[৫]

ইংরেজ আমলের সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার পর ভারতের স্বাধীনতা এলে, অনেকে ভেবেছিলেন—'রামরাজত্ব'-এর সূচনা হবে; কিন্তু জনগণের আশাভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে নি। সেই আশাভঙ্গের করুণচিত্র টুসুগানে বিধৃত—

কন্ট্রোল রেটে পাই না চিনি, ময়দা, ওষুধ, কাপড় রে।
ডবল দামে মিলছে জিনিস পইড়্‌লম্‌ কি ফাঁপরে।।
সব জিনিসের চইল্‌ছে ভেজাল শিয়ালকাঁটা তেল মিশা।
চইখে সইর্‌ষা ফুল ফুইট্‌ছে হারাই যাচ্ছে মনের দিশা।।
চালে কাঁকর পাথর গুড়া কালবাজারী টাকায় লাল।
ফাঁসির কাঠে ঝুলাই দিবেক বইলেছিলেন জওহরলাল।।

চতুর্দিকে কালো টাকার করাল কুটিল ছায়া, উৎকোচপ্রিয় বহু সরকারী আমলা—তারই মাঝে দিশেহারা জনগণের করুণছবি টুসুগানে ধরা পড়ে—

তেইল থাইকে নুন-জিরা তক্ক দাম বাইড়্‌ছে বাজারে।
পইসা কুথায় গরীব লোকের, মানুষ মইর্‌ছে হাজারে।।
ঘুষ না দিলে কাজ হয় না, অফিসাররা চইখ রাঙায়।
টাকা পাইলে হুদ্‌কে উঠে দালাল গুলা আইসে যায়।।

অনেক গ্রামেগঞ্জে বৈদ্যুতিক সুযোগ হয়েছে সত্যি, তবু সব গ্রামে বিদ্যুৎ যায়নি; তাছাড়া লোডশেডিংয়ের দাপটে কেরোসিন তেল জনগণের অপরিহার্য। আর খোলা বাজারে বা কন্ট্রোলেও কেরোসিন তেল হামেশা পাওয়া যায় না। তাই কেরোসিন প্রসঙ্গে ব্যঙ্গের খরশান ছবি টুসুগানে চিত্রিত—

অ তুঁই যা বল্‌ইলি রে তাই ভাল।
আর বলিস না—গা জ্বইলে গেল।।
গা জ্বইল্‌ল লো ভালই হইল কেরোসিন নাই ছিল।
রাতের ক্ষণে ডিবা নিম্‌হাই আঁধারটা আল্‌হ[১] হইল।।
কেরাচিন তেল দাম ভারি ভাই তেল কিনা দায় হইল।
গাইল্‌[২] দিয়ে যদি গা জ্বইলে তবে আঁধারটা আল্‌হ হইল।।

[(১) আলো, (২) গালি]

গ্রামে গঞ্জের আদিবাসী জীবনে আনন্দপূর্ণ উৎসবের অনেকখানি অনুষঙ্গ হল দেশী মদ্যপান। তার কথাও টুসুগানে বিধৃত—

কলিযুগের মদ হইল সুধা।
অ মদ খাইলে মাতাল দাদা।।
মদের সংগে খাইতে মজা চেনাচুর বাদামভাজা।
তা না হইলে বইলে দিচ্ছি চাই শুধু মাংস ভাজা।।

বতলভরা গিলাসধরা ঢাইলেছি আধা আধা।
মদটা খাইলে কথা বলে যেমন হে রাজার ব্যাটা।।
(ইত্যাদি)

আধুনিক জীবনের বহুস্তরে মূল্যবোধের দারুণ অবনতি ঘটেছে, পেটের জ্বালায় কন্যাদায়গ্রস্ত অনেক অসহায় পিতা, মোটা টাকার বিনিময়ে অবাঙালি বৃদ্ধের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করে। তার করুণচিত্রও টুসুগানে ধরা পড়ে—

অ্যাত টাকা লিলি বাবা দিলি বুঢ়া বরে।
বুঢ়ার সঙ্গে চইল্‌তে লারি কইল্‌কাতা শহরে।।

কিংবা,

যইবন-জ্বালা সহিব কী কইরে।
বিহা দিলি যা বুঢ়া বরে।।
হাজার টাকা লিয়ে মাগো দিলি বুঢ়া বরে।
বইসতে লারে, উঠতে লারে, চলে গো ঠ্যাঙা ধইরে।।
সাঁতার দিতে পারে না মা আমার যইবন্‌-সায়রে।
এখন বুঢ়ার বয়স যা গো বাপের বয়সের উপরে।।

ভাগ্যবিড়ম্বিতা ঐ রকম বিবাহিতা নারীর ছোটবোনও অনেক সময় টুসুগানে দিদির জন্য বিলাপ জানায়—

ঠাঙ্গা-ধরা চশমা-পরা বর।
দিদি শুইনে লে তুঁই এই বতর।।
কম্‌হর বাঁকা মুখটি ফাঁকা বয়স ষাটের উপর।
কী কইরে তুই উয়ার সঁগে কইর্‌বি দিদি সুখে ঘর।।
রাস্তায় যখন যাবিস দিদি বইল্‌বে লোকে পরস্পর।
বাবা ন তোর দাদু বঠে, কন্‌ গাঁয়েতে তদের ঘর।।

টুসু শস্যদেবী। পৌষ মাসে গ্রামের অধিকাংশ ঘরে ধানের গোলা দেখে কৃষিজীবী মানুষের মন জুড়িয়ে যায়; কিন্তু তাদের প্রসন্ন চিত্তে আশঙ্কার ছায়া জাগায় সরকারী লেভি আদায়ের নামে নানারকম অভিসন্ধিমূলক উৎপাত বা নির্যাতন। তার ছবিও টুসুগানে ধরা পড়ে—

ধান উঠেছে খামারে টুসু ধান-ঝাড়া হইলে পরে।
লেভির নটিশ ঘরে আইস্‌বেক লেভি লিবেক জোর কইরে।।
জমির চাইয়ে লেভি বেশি ভাইব্‌তে জীবন যায় উইড়ে।
বর্গী আইসে জমির ফসল লিলে মাথা যায় ঘুইরে।।

পুরুলিযাব বড় রেল স্টেশন আদরা। একদা ট্রেন-ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে সেখানের সাধারণ কর্মীদের দুর্দশার ছবিও টুসুগানে ধরা পড়ে—

আদরা রেল ধর্মঘটে কাজ ঘুচাইল সব জনা।
না খাঁইয়ে আজ মইর্ছে তারা, নাইক খাবার এককণা।।
মেইয়া লোকের ইজ্জত গেইল ডরাই মইর্ল বৌ-ঝিরা।
বাইরে গেলে বিপদ এখন, মুশকিল হবে ঘর ফিরা।।
সি. আর. পি.-দের সঁগে ঘুইর্ছে কাশীপুরের দারগা।
পুলিশ আইসে মাইর্ছে গুঁতা ভুইগ্ছে সবাই কি ভুগা।।

সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকার গ্রামেগঞ্জে তাঁদের কর্মীবাহিনী গড়ে তুলেছেন। তাঁরা অধিকাংশই ভূমিহীন খেতমজুর, শ্রমজীবী। তাঁরা দীর্ঘকাল উচ্চবর্ণের হাতে শোষিত হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদেরই 'শক্ত্যাধার' অর্থাৎ সমাজশক্তির উৎসস্থল বলেছেন। সেই 'শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ'-এর ভবিষ্যৎ জাগরণ প্রসঙ্গে স্বামীজী একদা বলেছিলেন, 'এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব-সহিত-শূদ্রের প্রাধান্য হইবে,...শূদ্র ধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।'[৬] সেই গণজাগরণের কথা টুসুগানেও ফুটে ওঠে—

কাশীপুরে জে. এল. আর. অফিস[১]— লোক গম্গম্ করিছে।
কী হচ্ছে, কী হচ্ছে টুসু? ভাগচাষ রেকর্ড[২] হচ্ছে।
চাটুজ্যাদের বাঁড়ুজ্যাদের চণ্ডবন্ড নাইক আর।
বাইদ্-বহালের জমিগুলান্ রেকড়্ কইর্ল বর্গাদার।।
আর ছাড়াইতে লাইর্বেক টুসু যখন তখন দুচোক লাল।
লাঠি-পিটে, ডাঙ্ দেখাইয়ে শাসন করার খতম্-কাল।।

[(১) জে. এল. আর. ও (২) রেকর্ড]

পুরুলিয়ার সাঁওতাল -প্রধান গ্রাম অদালী। সেখানে একজন বর্গাদারের নাম রূপাই মাঝি। জমিদার তাকে জব্দ করার জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তার ছবিও টুসুগানে ধরা পড়ে—

অদালীতে রূপাই মাঝি—বাঁড়ুজ্যাদের বর্গাদার।
রক্তে-রুয়া ধান তুইলেছে ভইরে গেছে খামার তার।।
গুণ্ডা দিয়ে মালিক তাকে মাইর্তে যাঁইয়ে হইঠেছে।
মুখ শুঁখাইয়ে আম্সি এখন—যে ঘটনা ঘইটেছে।।

বর্তমানে গ্রামের মেহনতি মানুষরা শ্রমশোষণের প্রতিবাদী হয়েছেন। তাঁরা ন্যায্য মজুরি চান। তার কথাও টুসুগানে চিত্রিত—

কম টাকায় কইর্ব নাই কাজ বেরুন[১] লিব তের টাকা।
দাবি শুইনে ভাইব্ছে মালিক উল্টে গেছে আজ চাকা।।

[(১) শ্রমের মজুরি]

গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চাষীরা সরকারি অনুদান পাচ্ছেন! খরা অঞ্চলগুলিতে সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী হচ্ছে। এখন তাই চাষীদের চোখে সোনার স্বপ্ন, এবং সে স্বপ্নের ছবি টুসুগানে প্রতিবিম্বিত—

খাজনা মুকুব ইবার টুসু চইষ্‌ছে চাষী নিজের খেত।
বীজধান সার দিচ্ছে এখন চাষীর পাশে পঞ্চায়েত।।
সেচের কথা ভাইব্‌ছে সরকার লেভি আদায় নাইক আর।
সনার ধানে ভইর্‌বেক টুসু ইবার চাষীর খেত খামার।।

ছো-নাচের অন্যতম প্রধান রঙ্গালয় পুরুলিয়া। ছো-নৃত্যশিল্পী পদ্মশ্রী গম্ভীর সিংমুড়া, পদ্মশ্রী নেপাল মাহাত, ধনঞ্জয় মাহাত প্রমুখ আজ প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। সমাজজীবনের শিল্পময় শূরনৃত্যের কথা টুসুগানেও স্থান পেয়েছে—

গম্ভীর সিংহের ছো-নাচেতে দেখে লিল ফরেনটা[১]।
ধনঞ্জয়[২] কিরাত নাচে হিলায় কেমন ভুজ দুটা।।
নেপাল মাহাতর[৩] দুর্গাটা ভাই এমন মারে চমকটা।
যা বলাবেক তাই বইল্‌বেক ডি.সি মাহাতর ঘঁড়াটা।।
শঙ্কর মাহাতর এমনি পোশাক দেইখ্‌লে ঘুরে চইখ্ দুটা।
বামু-পাল্‌মা, সুলংজুড়ি ছকে বিজুলির ছটা।।
অনিল মাহাতর শিব নাচেতে তালে নাচে পা দুটা।
ঘুঁঘুরের বাজনা উঠে—মনোরঞ্জনের[৪] কথাটা।।

[(১) বিদেশ (২) ধনঞ্জয় মাহাত (৩) পদ্মশ্রী নেপাল মাহাত (৪) মনোরঞ্জন পান্ডে, গ্রাম ঘাঘরজুড়ি, পুরুলিয়া।]

দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লার লাল কাঁকুরে মাটি, যার পারিভাষিক নাম— 'ল্যাটেরাইট সয়েল'—সেখানে জলধারণের ক্ষমতা কম; তাই বর্ষার জলধারা মাটি ধরে রাখতে পারে না। তাছাড়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম। যে কারণে প্রায় ফি-বছর সীমান্ত বাঙ্‌লায় খরার রুদ্ররূপ দেখা দেয়। এই বিস্তীর্ণ জনজীবনের খরাক্লিষ্ট ভয়ালরূপ যেন কবি বিষ্ণু দে দরদী চেতনায় এঁকেছেন—

'আমিও তো, শুধু চোখে নয়, সারা মনেপ্রাণে
মেঘের কাঙাল।
দগ্ধ মাটি হাহাকারে আমারও স্নায়ুতে আনে
মুমূর্ষু আকাল।
আমারও সম্বিতে ধরে কেউটের হাজার ফাটল,
সূর্যের অসূয়াঘাতে ভেঙেছে আমারও আলবাল।
দেখেছি মানুষ থাকে চেয়ে,
দেখি মাটি চেয়ে থাকে এক দৃষ্টি পাংশুল আকাশে।

কারণ জীবনে আজও মাটি আর সহস্রাক্ষ আকাশ প্রবল।
আমিও চেয়েছি অহর্নিশ ধারাজল।"[৭]

টুসুগানের আনন্দমদিরতার মাঝেও অজন্মা, খরার ভাবনা ফুটে ওঠে—

ই বছর যে হইল রে খরা।
হামি ভাইবে হলি আধমরা।।
জষ্টিমাসে বুইন্‌লম রে ধান ফেলিলাম নতুন চারা।
জল বিহনে মইর্‌ল চারা—হলি রে খ্যাপার পারা।।
শ্রাবণেতে জল হইল ভাই, তখন অমারা পেটমরা।
হালাতে ভাই গরু নাই হে ক্ষেত বহে নদীর পারা।।
ভাঁদর আশ্বিন জপথপ, কার্তিকে আবার খরা।
ঝিঁটা-পাটা কইর্‌লি তবু ক্ষেত হইল টাঁইড়ের পারা।।
ছাগল-ভেঁড়ি সব ফুরাইল, এখন যায় রে কী করা।
বহু-ছেইলা লিয়ে সবাই হব বুঝি দেশছাড়া।
চাষের আশা ছাইড়ে দিঞে খুঁজ্‌রে হাজ্‌রি ধরা।
অবুঝা দুলালকে বুঝায়, বুঝায় রে মটর খুড়া।।

[দুলাল মাহাত, 'আখড়া' পত্রিকা
টুসু সংখ্যা, ১৯৮৫]

টুসু কৃষিলক্ষ্মী। তাই টুসুগানে কৃষিকর্মের কথা ঘুরে ফিরে আসে—

চাষ করিলে চাষার কী হবে।
ক্ষেতে ধান্য নাইরে, কী খাবে।।

*   *   *

ঘরের মধ্যে বাগানবাড়ি কর সর্বজন মিলে।
দুদিন পরে অন্ন কষ্ট সবেই যে যাবে চলে।।
চাষেই অন্ন চাষেই বসন চাষেতেই পালন করে।
চাষের সমান নাই তুলনা খেতে পাবে পেট ভরে।।
(ইত্যাদি)

[রচয়িতা ঃ কালীপদ মাহাত
গ্রাম—নারায়ণপুর, পুরুলিয়া]

'রূপসীবাংলা'-র কবি জীবনানন্দ দাশ ধানভানা-নারীদের কথা কবিতায় উল্লেখ করেছেন। যথা—

'আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—ক্ষুদ—কুঁড়া—কার্তিকের ভিড়;

চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হ্‌তেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়া-গাঁর গায়ে আজ লেগে আছে রূপশালী-ধানভানা রূপসীর
শরীরের ঘ্রাণ।'[৮]

কিংবা

'দূরে
অনেক দূরে
খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—
গান গায় গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।'[৯]

দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লায় টুসুগানেও ধানভানা-নারীদের কথা আছে। পৌষালি দিনে বৌদির প্রতি ননদের কথা টুসুগানে চিত্রিত—

আয় বৌহু আয়, ধান-কুটাতে চল্।
বৌহু, গাঁয়েই আছে দুটা কল্।।
এক ঘড়িকেই[১] কুটায় যাবেক, আয় গো আনবি বাঁধের জল।
দাদাটুকু থাকুক ঘরে, ছেইলাটাকে দিয়ে চল্।।
ননদভাজে গল্ফ[২] কইরে ক্যামন সুন্দর যাব বল্।।

(১) একমুহূর্তে (২) গল্প।

ধান-ভানা কলের যান্ত্রিক জীবনকে গাঁয়ের নররনারী অনেক সময় আবার ভালো চোখে দেখে নি। কারণ, তাতে সাধারণ গরীব দুঃখীদের রুজিরোজগারের পথ বন্ধ হয়েছে। তাই টুসুগানে শোনা যায়—

ধান-কুটা কল্ উঠেছে দেশে।
গিন্নী যাইচ্ছে না ঢেঁকির পাশে—
বউরা বইস্‌ছে না ঢেঁকির পাশে।।
কলের গরবে বৌয়ে ঢেঁকি কি ভালোবাসে।
গোপাল ভনে কলের গুণে ঢেঁকি লা গেল্‌হ বইসে।।

[গোপাল মাহাত]

টুসুগানের সঙ্গে শস্যভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে—তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ জনৈক লোক-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ সংশয় ব্যাকুল চিত্তে প্রশ্ন তুলেছেন—'এই টুসু যদি শস্য-[ফসলকাটা ও তা গোলাজাত করা]-সংক্রান্ত উৎসবই হবে, তবে যে টুসুগান টুসু-উৎসবের অবয়ব ও আত্মা, দেহ ও অস্তিত্বতার প্রতি বছরেই রচিত হাজার হাজার গানের কোথাও শস্যের কথা নেই কেন? এতে টুসু-অঞ্চলের মানুষজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা, সমসাময়িক ঘটনা-জীবন-জগৎ সব কিছুরই কথা আছে, নেই কেবল শস্যের ভালো-মন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ।'[১০] এই প্রশ্ন তোলা মনস্ক চিত্তের যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনার যে ইঙ্গিত দেয় না, তা আগের আলোচনা থেকেই প্রমাণিত হবে—

সীমান্ত বাঙ্‌লার খরার রাজধানী যেন পুরুলিয়া! যেখানে পানীয় জল-সংকট প্রতি বছরই দুঃসহ হয়ে ওঠে। আর্কিয়ান যুগের শিলা দিয়ে গড়ে-ওঠা পুরুলিয়ার শক্ত বুকে সরকারী প্রচেষ্টায় অনেক নলকূপ ফি-বছর ঐ দুঃসহ খরার মোকাবিলা করে। টুসুগানেও তার ছবি ফুটে ওঠে—

নলকূপ হিঁচ্‌কালে উঠে জল।
তরা কন্‌ হাঁড়িতে লিবি বল্‌।
এক হিঁচ্‌কনে যেমন তেমন দু'হিঁচ্‌কনে পড়ে জল।
তিন হিঁচ্‌কনে আধভরা হয়, চারে হাঁড়ি টলমল।।
জলের হাঁড়ি লিয়ে ধনি চলে লো উঝল পাঝল্‌।
জ্যোতি বসু ভাবে শুনে সারাই দিল জলের কল্‌।।
কত সুখে জল-উঠা হয় করতে হয় না পরিশ্রম।
লাইন ধরে ভরাবি হাঁড়ি কর্‌বি না লো গণ্ডগোল।।
পনের হাজার খরচ করে বনাল এই টিউ' কল।
কালী বলে তিনমাস পরে কলটি গেল রসাতল।।

[কালীপদ মাহাত নডিহা, চিড়াবাড়ি, পাড়া, পুরুলিয়া।]

অন্ত্যটীকা

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (৬ষ্ঠখন্ড) বিশ্বভারতী (১৩৬৩) ৬৪৮ পাতা।
২। রবীন্দ্র-রচনাবলী (১ম খন্ড) পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০) ৩৫২ পাতা। ['বধূ' কবিতা, 'মানসী' কাব্য]
৩। শঙ্খ ঘোষ 'খরা' কবিতা, 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' কাব্যগ্রন্থ। শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা দে'জ, কলকাতা (১৯৭৮) ৬৬ পাতা।
৪। এ গ্রন্থের 'মানভূমে ভাষা-আন্দোলন ও টুসুগান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৫। রামশঙ্কর চৌধুরী ভাদু ও টুসু কথাশিল্প, কলকাতা (১৯৮১)। ২য় প্রকাশ ৫৯ পাতা।
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড) উদ্বোধন কার্যালয় (৫ম সংস্করণ, ১৩৮৮), ২৪১ পাতা।
৭। বিষ্ণু দে 'আমিও তো' কবিতা, 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থ। বিশ্ববাণী (১৩৮০), ১৭ পাতা।
৮। জীবনানন্দ দাশ 'অবসরের গান' কবিতা, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (১ম খণ্ড) বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ৯৯ পাতা।
৯। জীবনানন্দ দাশ 'আমাকে তুমি' কবিতা, 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ। ঐ ৩৩ পাতা।।
১০। সনৎকুমার মিত্র 'টুসুগানে সমাজ-মনস্কতা' প্রবন্ধ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত— 'টুসু: ইতিহাসে ও সঙ্গীতে' গ্রন্থ ১১৪ পাতা।

একাদশ অধ্যায়

টুসুগানে প্রেমচেতনা

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অসংখ্য বৈষ্ণব পদের মানবিক আবেদন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন[১]—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার!
এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি-দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?[১]

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে যেমন বৈষ্ণবের গান নয়, তেমনই টুসুগানেও তত্ত্বনিরপেক্ষ মানবিকভাব প্রবল। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার টুসু-করা কিশোরীরা অনেকখানি বিদ্যাপতির রাধা। বিকচোন্মুখ শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্বে তারাও যেন কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।।

*   *   *

চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান।।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু কিশোরী রাধার নবযৌবনের প্রেমদ্বন্দ্বের মানসিক অবস্থাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

"... সে-পথ যৌবন-রহস্যের ঝাঁপিয়া-আসা নিবিড়, গভীর, মায়াকাননের পথ নহে— তাহা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের আলো-আঁধারির জগৎ। যেখানে প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে দোলাচল চিত্তবৃত্তি, 'তেজ' ও 'তমের' পরম বিরোধ, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, লীলা ও লাস্য, সরলতা ও চতুরতার মধ্যে আন্দোলিত দেহ-মন। শৈশবের মন আর যৌবনের মন, শৈশবের দেহ আর যৌবনের দেহে দ্বন্দ্ব পড়িয়া গিয়াছে।"[২]

টুসুগানেও গ্রামীণ কিশোরীদের রহস্যঘন প্রেমময়ী চিত্তের কথা শোনা যায়—

বান আইল বর্ষা আইল ভাঁইসে আইল ঢুল্‌কি।
ঢুল্‌কির ভিতর ল্যাখা আছে নবীন পেমের উল্‌কি।।

নবীন প্রেমের উল্কি-আঁকা তীব্র মধুব জ্বালায় কিশোরীরা টুসুর ওপর নিজেদের মনেব ভাব আবোপ (Self Projection) করে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, ক্বচিৎ-কখনো স্বভাব-কবিত্বযুক্ত গ্রাম্য কিশোরী টুসুগান বাঁধলেও, মূলত টুসুগান বাঁধেন লোক-কবিরা। আর তখনও যেন মনে রাখি—“নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। ..... মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যাক করে, তাহাই কবি কল্পনা, ... যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিযা কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি।”[৩]

কিশোরী রাধার মনোজগতের রূপরসচাঞ্চল্য বর্ণনায় বিদ্যাপতি বলেছেন—

শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত।।

টুসু-করা কিশোরীদের যৌবন-কল্পনার আলোআঁধারি জগতের রহস্যমযতায় মনে হয়, কিশোবী টুসু দেবীর প্রেমের ফাঁদে যেন অচিনদেশের রাজপুত্তুর ধরা পড়েছে—

কুইল গাছে কুইলির বাসা
ডালিম গাছে কের্‌ক্যাটা।
আমার টুসু ফাঁদ আইড়েছে
পইড়েছে রাজার ব্যাটা।।

নবীনা টুসুর নব-অনুরাগের কথা ভাবতে ভাবতে তদ্‌গতচিত্তে আত্মহারা হয়ে তারা অসতর্ক মুহূর্তে গেয়ে ওঠে—

পুরুল্যার পুত্‌নি পকা উইড়ে গেলে ধইর্‌ব না।
যার সঁগে যার ভালবাসা জীবন গেলেও ছাইড়্‌ব না।।

কখনও নতুন প্রেমের রহস্যময় চাঞ্চল্যে পূর্বরাগ ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়—

আর যাব না জলে।
কালা থাকে গ কদমতলে।।

প্রেমের প্রথম প্রকাশ পূর্বরাগে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ‘উজ্জ্বল নীলমণি’ গ্রন্থে বলেছেন—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।

[যে-রতি সঙ্গমের পূর্বে দর্শন এবং শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন, অর্থাৎ বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, পণ্ডিতগণ তাকে পূর্বরাগ বলেন।]

পূর্বরাগের বিভিন্ন ভাগ ও রূপ নিম্নরূপঃ—

পূর্বরাগ

দর্শন	শ্রবণ
(১) সাক্ষাৎদর্শন	(১) বন্দী বা ভাটের মুখে শ্রবণ
(২) চিত্রপটে দর্শন	(২) দূতীমুখে শ্রবণ
(৩) স্বপ্নে দর্শন	(৩) সখীমুখে শ্রবণ
	(৪) গুণিজনের নিকট শ্রবণ
	(৫) বংশীধ্বনি শ্রবণ

টুসুগানেও দেখা যায়, প্রেমের বংশীধ্বনিতে কিশোরীমন ব্যাকুল। অথচ সামাজিক নিয়মের কথা মনে রেখে যাবতীয় সতর্কীকরণ টুসুর ওপর আরোপিত হয়—

কলাতলে বাট রাইখেছি, তবু টুসু পালাইছে।
নন্দের ব্যাটা চিকনকালা সে ত বাঁশী বাজাইছে।।

তবু যৌবনের বনে মন হারিয়ে কিশোরীদের মানস অভিসারের কথা টুসুগানে ধ্বনিত—

চল্ ন সঙ্তি সবাই মিলে খেলাইচণ্ডীর হাট যাব।
গায়ের গয়না বিকে দিয়ে প্রেমডুরিয়া শাড়ি লিব।।

প্রেম সরল পথে যায় না, কুটিল বঙ্কুর তার পথ। 'উজ্জ্বল নীলমণি'-তে আছে—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ মুনের্মান উদঞ্চতি।।

[সাপের গতির ন্যায় প্রেমেরও গতি স্বভাবতই কুটিল। কাজেই দেখা যায় যে, মানের কোন কারণ না থাকলেও যুবক-যুবতীদের চিত্তে মানোদয় হয়।]

টুসুগানেও দেখা যায়, নব অনুরাগে অনুরাগিণী কিশোরী কল্পনার গুঞ্জরণে কিংবা বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায় গায়—

তর পানে রে ভাইল্‌ব[১] না।
ভাইল্‌ব যদি মিটিক্ মাইর্‌ব[২] না।

[(১) তাকাব (২) চোরা চাউনি, অপাঙ্গ ইঙ্গিত]

অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়িকার আট অবস্থার কথা জানা যায়। তা হল—(১) অভিসারিকা (২) বাসক সজ্জিতা (৩) উৎকণ্ঠিতা (৪) বিপ্রলব্ধা (৫) খণ্ডিতা (৬) কলহান্তরিতা (৭) প্রোষিতভর্তৃকা (৮) স্বাধীনভর্তৃকা।

টুসুগানেও দেখা যায় অভিমানিনী নারী স্বাধীনভর্তৃকার (নায়ক সর্বদা যে নায়িকার বশীভূত) মতো মনোভাব প্রকাশ করে—

প্রেমপিরীতি ইশারার গুণে।
ও তোকে রাইখ্‌ব রে চইখের কুণে।।

টুসু-ভাসানের দিন বাঁকুড়ার পোরকুলের টুসুমেলা, পুরুলিয়ার শহরপ্রান্তে কাঁসাইমেলা, জয়দা (চাণ্ডিল), সতীঘাট (তোড়াং-মুরী) প্রভৃতি টুসুমেলায় টুসুগান যেন যৌবনদীক্ষার গান। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন, " .. নদীঘাটে কিংবা দীগড়ি (গালুডি), জয়দা, সতীঘাট আদি মেলায় টুসু-বিসর্জনের সময় টুসুগীতসহ্ বিক্ষিপ্ত নৃত্য যে একেবারেই চোখে পড়ে না, তা নয়; নারীতনু দৃশ্যমান করে অশ্লীলতার পরিবেশ রচনা করাও ঐন্দ্রজালিক আচার বিশেষ। এর ভেতর দিয়ে প্রজনন ক্রিয়া, নবজন্ম আদি ইচ্ছাগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে।"[৪]

টুসুভাসানের দিন টুসুমেলায় হয়তো রইস ছোকরা তার বাঞ্ছিত প্রণয়িনী গোলাপসুন্দরীর উদ্দেশে গেয়ে ওঠে—

তইখে ডাইক্‌ব কত গলাপী।
আয়, খাবি ত গরম ঝিলাপি।।

কিংবা,

খঁপায় দুব চাঁপা ফুল গুঁজে।
অ তুই আইস্‌বি ল রীঝে রীঝে।।

[আনন্দে]

টুসু-গাওয়া নায়কের গানে রোমান্টিকতার প্রকাশ-ও দুর্লভ নয়—

কাজ্‌লি কাল চইখেব তারাতে।
কত লীল সাগরের ঢেউ আছে।।
ঐ সরু সরু বাঁকা ভুরু দুটিতে।
মনটাকে টা'ন দিচ্ছে যেন লুহা (লোহা) টানা চুম্বকে।।

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলা এবং সন্নিহিত ছোটনাগপুর অঞ্চলের সর্বত্র না হলেও, পাহাড়িয়া অঞ্চলের আরণ্যক পরিবেশে কোন কোন তরুণ-তরুণীর কাছে প্রেম দেহনিরপেক্ষ, সৌবভব্যাকুল মানসিক ব্যাপার নয়। তারা জানে না রাবীন্দ্রিক ভাবাদর্শগত 'প্লেটোনিক' ভালোবাসার সেই বিখ্যাত কাব্যপংক্তি—

লও তার মধুব সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষাব ধন নহে আত্মা মানবের।[৫]

কিছু কিছু টুসুগানে আছে গরম জন্হার (ভুট্টা) ভাজার জ্বালা-ধরা স্বাদ, রিরংসামথিত যৌবন কামনা। অনভিজ্ঞা, নবীনা কিশোরীর উদ্দেশে হয়তো 'শাল পংড়া'-র মতো রইস ছোকরা, কিংবা প্রিয় পরিচিতা যুবতী নারী কিছুটা কৌতুকের ভঙ্গিতে যৌন ইঙ্গিত দিয়ে টুসুগান গায়—

অ ল অ ল কঁচি ছুঁড়ি যাইস্ না ল শালের বনে।
খুদি বল্লায় বিঁধে দিবেক মইর্‌বি ল তুই জ্বলনে।।

সীমান্ত বাঙলায় কোন কোন কিশোরী যেন বিদ্যাপতির রাধা। ফলে, লাল মাটি নীল অরণ্যের মায়ায়, চঞ্চল যৌবনের হাতছানিতে কোন সময় হয়তো বয়ঃসন্ধির কৌতূহলে সাড়া দেয়। কিছুটা হঠকারিতায় অনাস্বাদিত যৌবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্বরাগ বা পূর্বভোগ সূত্রে। নাগরের উদ্দেশে তাৎক্ষণিক যন্ত্রণাআনন্দের প্রকাশ টুসুগানের কবিকল্পনায় ফুটে ওঠে—

আঁধার ঘরে কাল ভমব বিঁধে কইর্‌ল জরজর।
আর বিঁধ না কাল ভমর তুমিই আমার হবু-বর।।

সেই কিশোরী প্রবৃত্তির অকালবোধনজাত হঠকারী আচরণে হয়ত ভয়-ব্যাকুল চিত্তে গেয়ে ওঠে—

তুই কিরে আমার হবি।
চিরকালের ভারাভার লিবি।।

সেই প্রেমিক হয়তো সেই মুহূর্ত টুসুগানে গেয়ে ওঠে—

তুই ভাবছিস কি ল ফুলমনি।
কাজ খুইলেছে টাটা কম্পানি।।

বিনয় মাহাত নির্দ্বিধায় বলেছেন, 'টুসুর গানে প্রেম-বিষয়ক সঙ্গীতের অভাব নেই। এই সমস্ত প্রেম-সঙ্গীতগুলিতে লৌকিক প্রেমের অনুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার দৈহিক মিলনই এই প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু। এই প্রেম হাটে-মাঠে-ঘাটে সর্বত্র নায়কের সঙ্গে নায়িকার সাক্ষাৎ হয় এবং পরস্পর প্রেম নিবেদন করে।'[৬]

বাস্তবিক এ অঞ্চলের কুঁদে-কাটা পাথুরে শরীরের ছন্দোময় লাবণ্য নিয়ে কোন কোন যৌবনমত্তা সাহসিকা আদিবাসী রমণী বনের ধারে কিংবা নির্জন প্রান্তরের বৃক্ষচ্ছায়ায় তাদের মনে-ধরা পুরুষের প্রতি নিঃসঙ্কোচে টুসুগানের মাধ্যমে হয়তো প্রেম নিবেদন করে—

অ তুই দাঁড়ালি অনেক ধুরে (দূরে)।
নাম জানি নাই ডাইক্‌ব কী কইরে।।

কিংবা, কিছুটা কৃত্রিম কোপগর্ব নিয়ে জানায়—

তুই বুঝলি না রে চইখ্ ঠারা।
তখে কইর্ব কত হাতের ইশারা।।

যৌবনবতী সাহসিকা নারী যাকে হয়তো 'মনের মানুষ'-এর কোঠায় ঠাঁই দিয়েছে, সেই সমর্থ যুবক যখন স্বাভাবিক আগ্রহের প্রতিক্রিয়া জানায়, তখন বিদ্যুল্লতা নারী স্পষ্টভাবে হয়তো টুসুগানে জানায়—

তুই ভাইল্ছিস কি আড়ে আড়ে।
মন যাইচ্ছে ত আয় পেইছা ধইরে।।

এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন লাহার সুচিন্তিত মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মনের মানুষ ছাড়া অন্যের কাছে অসঙ্কোচে আত্মনিবেদন এদের আচার শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র কুসুমের মতো এরাও 'অত শস্তা নয়'। টুসুগানে মন জানাজানি, মন চেনাচিনির যে বিচিত্র কৌশল, তার শেষ লক্ষ্য দেহ হলেও মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই তার পথযাত্রা। যারা প্রাপ্তিটাকেই পরম জ্ঞান ক'রে পথের সৌন্দর্যকে অবহেলা করে, তারা আক্ষরিক অর্থে অন্ধ। নিছক দেহবাসীর পক্ষে এ কথা বলা কিছুতেই সম্ভব নয় যে,

আমরা রা কাড়ি নাই লক বাদী।
মুঁহে হাঁসি চইখে ভাব রাখি।।

মুখের একটু হাসি, চোখের একটু ইশারা যে-প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সে-প্রেমকে আর যাই হোক দেহবাদী আখ্যা দিতে আমরা অপারগ। প্রকৃত সত্য এই যে, প্রেমের আকর্ষণে এরা ঘর ছাড়তেও রাজি, পথের সঙ্গীটি যদি মনের মানুষ হয় তবেই!"[৭]

কবি চণ্ডীদাস সহজিয়া প্রেমসাধনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনে কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিক রাজ।।

তবু এই পাহাড়িয়া দেশের অনেক রসিকপুরুষ চণ্ডীদাসের সহজিয়া প্রেমসাধনার কথা জানে না; তারা জানে না পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাম-প্রেমতত্ত্ব—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।।

*　　*　　*

অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্বর।।[৮]

তাই নির্জন বনভূমি বা পাহাড়ে-প্রান্তরে প্রেমিকার যৌবন-মধু প্রেমিক হয়তো পান করে, তাকে দূর দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়—

তখে লিয়ে যাব চাঁইবাসা।
অ ভালবাসা, অ ভালবাসা।।

হয়তো অচেনা জায়গায় প্রাকৃত নারী যাওযার ভরসা পায় না। তাই গভীর আবেগে টুসুগানে প্রকাশ করে—

যাব না হে যাইতে দিব না।
আমি ধইর্‌ব গলায়, ছাইড়ে দিব না।।

টুসু-ভাসানোর সময় মানভূম-ধলভূমের টুসুগানে যে যৌবন চাঞ্চল্য এবং দেহ চেতনার সাহসিক উদ্দাম প্রকাশ দেখা যায়, তা বাঁকুড়ার প্রত্যন্তে কাঁসাই তীরবর্তী পোরকুল ও বিষ্ণুপুরের কোন কোন এলাকা ছাড়া বাঁকুড়ার অন্যত্র বা পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় সচরাচর তেমন ভাব দেখা যায় না।

পুরুলিয়ার বহু আদিবাসী যুবক টুসুগান করে। তারা কিন্তু টুসুব্রতের সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে না। টুসু ভাসানের দিন তারা অনেক সময় অবাধ যৌবনের বেগে মত্ত থাকে। টুসু-ভাসানের দিন ভোর থেকে দূর দূরান্তর গ্রামের টুসু-করা কিশোরী যুবতীরা যূথবদ্ধভাবে চৌডল হাতে টুসু গান গাইতে গাইতে পুরুলিয়া শহরের প্রান্তে কাঁসাই নদীর বিভিন্ন ঘাটের দিকে যায়। তখন চলার পথে, কিংবা ক্ষীণস্রোতা কাঁসাই নদীর বালির চরে রইস ছোকরার দল কখনও চোডল হাতে, কখনও ভাড়া-করা মাইক সাইকেলে বা রিক্সায় বেঁধে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে যৌন-আবেদনপূর্ণ টুসুগান গেয়ে টুসু-করা কিশোরী যুবতীদের শোনায় বা উত্ত্যক্ত করতে চায়। নষ্টচন্দ্রের দিন (যা এ অঞ্চলে 'চোখচাঁদা' নামে পরিচিত) যেমন শৌখিন চৌর্যবৃত্তি লৌকিক সমাজের চোখে দূষণীয় নয়, তেমনই টুসু-ভাসানের দিন কিছু দেহাতী যুবকের উদ্দাম নৃত্যগীতে অশালীন ইঙ্গিত থাকলেও সমাজ তাতে বিরক্ত হয় না। যৌবনবতী তরুণীরাও ঐদিন লীলাচঞ্চল মদিরতায় পিছু-লাগা যুবকদের ইঙ্গিতপূর্ণ গানের যথোপযুক্ত উত্তর সাধারণত টুসুগানেই দেয়। মেলায় বা মেলার পথে আসা বিভিন্ন বয়সের মানুষ ঐ চাপান-উতোরের দৃশ্যে কৌতুক অনুভব করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি প্রতিবেদন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। টুসু-ভাসানের দিন। পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে কাঁসাই মেলা। দূরগ্রাম থেকে যূথবদ্ধা তরুণীরা চৌডল হাতে গান গেয়ে আসছে। তাদের উচ্ছল ভাব দেখে একদল দেহাতী তরুণ প্রলম্বিত সুরে গেয়ে ওঠে—

দ্যাখ্ ভাবি দ্যাখ্ মিছ্‌হা নাই বলি।
হাম্‌রা তদের তরেই পাগল হলি।।

তরুণদলের কৃত্রিম প্রেম নিবেদনে তরুণীরা মোটেই লজ্জাহত হয় না; বরং তার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তারা জলের কলতানে গেয়ে ওঠে—

জাড়া গাছে তাড়া লাগাব।
ও তদের ভাতার-হওয়া ছাড়াব।।

তখন তরুণদলের দলপতির সঙ্গে তরুণরাও সমস্বরে তরুণীদের উদ্দেশ্যে গেয়ে ওঠে—

লিয়াই[১] লাইগে যাবি লো কুথায়।
তদের বাঁইধব লো দুধিলতায়।

। (১) লিয়াই—ঝগড়া ।

হাস্যোচ্ছল ভঙ্গিতে তারা আরো যোগ করে—

লাইগ্‌ব লিয়াই লাইর্‌বি ছাড়াইতে।
হাম্‌দের অনেক দিনের রাগ আছে।।

তরল যৌবনের ঝিমঝিম নেশাধরা ভঙ্গিতে তরুণীরা পাল্টা হাসিতে উত্তর দেয়—

তদের জানি ওরে খালভরা[১]।
তদের পিরীত গটাটাই[২] ফরা[৩]।।

। (১) নারীসুলভ গালি বিশেষ
(২) পুরোটাই।
(৩) অন্তঃসারশূন্য ।

তখন তরুণদল প্রতিহত না-হয়ে, আরো উচ্ছল হয়। তাদের দলপতি নাগর মদের ঘোরে কিংবা যৌবনমদে কিছুটা স্খলিত ভঙ্গিতে সেই নারীদলের দিকে কিছুটা এগিয়ে, কোন এক কৃষ্ণাসুন্দরীর উদ্দেশে আবেগতপ্ত, ঢুলুঢুলুভাবে গাইতে থাকে—

তুই যে ধনি, নয়ানের কাজল।
তখে না দেখিলে মন পাগল।।

তার সঙ্গীরাও প্রেমকোপগর্বসুলভ ভঙ্গিতে গাইতে থাকে—

তর্‌হা লাইগ্‌বি নাই লাইগে যাব।
কঁচি কদম তুইলে ঘর যাব।।

। কঁচি কদম—বিকচোন্মুখ পয়োভার ।

এ জাতীয় দৃশ্য রুচিমান্‌দের পরিশীলিত চেতনাকে আহত করতে পারে, তাঁরা মনে করবেন—এ-ও তো 'ঈভ টীজিং'! কিন্তু উদার ব্যাপ্ত লোকায়ত জীবনে এই উচ্ছলতা, প্রেমাভিনয় কোন বিকৃতি আনে না। ডঃ সুধীর কুমার করণ যথার্থই বলেছেন, "এ গানের মধ্যে পল্লী-হৃদয়ের কাব্য আছে। পশ্চিম-প্রান্তিক রাঢ়ভূমির মতো এই গান। ঝর্ণা ধারার

মতো সহজ স্বচ্ছ, এর সুর। ঝর্ণার মতো চঞ্চল আর অনাবৃত এর গতি। এর ভাষায় পাহাড় বনের আদিমতা; পলাশফুলের মাধুর্য এর প্রকাশে; শালবনের ঘনজমাট নিবিড়ভাব এর কথায়। আর আছে পাথরের কুচির মতো, লাল রঙের কাঁকরের মতো প্রকাশভঙ্গী—যা আঘাত দেয় রুচিমান্দের। এ গান সম্পূর্ণরূপে প্রান্তভূমির মাটির গান; মাটির একান্ত কাছাকাছি আছে যে মানুষগুলি, তাদের গান।"[৯] তাই অনেকের সামনেই, মুক্তকণ্ঠে সুরেলা ভঙ্গিতে 'শালপাংড়ার' মতো তরুণ গেয়ে ওঠে—

ও তোর বুকের মাঝে শিম্হল্-কঁড়ি[১] দলকে[২]।
তাই দেখি মন আমার ললকে[৩]।।

[(১) শিমুল কুঁড়ি (এখানে বিকচোন্মুখ পয়োধর।)
(২) দোলায়িত হয়।
(৩) লালায়িত।]

শীতের আতপ্ত রোদ্দুর গায়ে মেখে টাঁইড়-বাইদের দেশে কৃষিজীবী তথা আদিবাসী যুবক-যুবতীরা টুসু ভাসানের দিন সকালে উদ্দাম যৌবন লীলায় ডগমগ হয়। কারণ বুঝি, সংবৎসরের ধান ঘরে উঠলে শরীরের ঘ্রাণও প্রবল হয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও দেখি শীতের প্রকৃতির মাঝে মানবিক ভাবের তীব্র অনুভূতিময় রূপ—

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে-ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চলে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে।

* * *

চোখের সমস্ত ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে![১০]

কাঁসাই-সুবর্ণরেখা নদীর টুসুমেলায় দেখা যায়, কোন আদিবাসী যুবতী-দলের প্রতি একদল দেহাতী যুবক ঢোলমাদল নিয়ে নৃত্যচপল সাঙ্গীতিক চেতনায় গেয়ে ওঠে—

আল্তা পেঁইড়া চাল্তা-বকুলে।
তোদের দেখেছি লো পোর্কুলে।

[বাঁকুড়ায় পোর্কুল টুসুমেলা বিখ্যাত।]

তার উত্তরে সাহসিকা যুবতীরা হয়তো রসতনু দুলিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করে—

ডালিম খাঁইয়ে যারে খালভরা।
পাকা ডালিম রসেতে ভবা।।

[পাকা ডালিম—পীন পয়োধর]

কিংবা রহস্যময়ী নারীরা যৌবন-গর্বে হয়তো অভিনয় ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে গেয়ে উঠতে পারে—

বাসক ফুলের মালা দিইব রে গলে।
ছেইলা আইনে দিবি এই কোলে।।

যৌবনোচ্ছল যুবক-যুবতীদের হাস্য-পরিহাসে গূঢ় আদিরসাত্মক ভাবও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু অন্তত সেদিনের জন্য প্রাকৃত জীবনে তা দূষণীয় নয়। তাই যূথবদ্ধা যুবতীদের মধ্যে কেউ যদি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হয়, এবং তা যুবকদের কাছে সুপরিজ্ঞাত থাকে, এবং সেই তরুণী যদি নব মাতৃত্বের গৌরবে গরবিনী হয়, তবে তার ভরন্ত শরীরের দিকে হয়তো যুবকদল আদিরসের তীক্ষ্ণ তির্যক ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিতে পারে—

ওলো ডুম্‌কা বিলাতি[১]।
তখে কে কইর্‌ল লো পুয়াতী[২]।।

[(১) পাকা টম্যাটোর মতো ভরন্ত শরীর।
(২) গর্ভবতী।]

পুরুষদলের তীক্ষ্ণ, সাঙ্গীতিক বাণে মেয়েরা হার মানে না, কলস্বরা নির্ঝরিণীর মতো, তারা আরো জোর গলায় সমবেত কণ্ঠে হাত পা নেড়ে গায়—

পক্‌রা[১] পক্‌রা পক্‌রা বাইগনে[২]।
তদের মনের কথা সব[৩] জানে।

[(১) পোকা। (২) বেগুনে। (৩) সবাই।]

কিন্তু তখনও হয়তো যুবকদল নাছোড়বান্দা হয়ে টুসুগানের মাধ্যমে আরো প্রবল যৌন-বিদ্রূপ জানায়—

বুঢ়া ডিংলা লতে
জল দিলে ফল ফলে না কন্‌হ মতে।
বুঢ়া ডিংলা লতে।।

[ডিংলা লত্—কুমড়া লতা]

তখন সেই মাতৃত্ব গৌরবে গৌরবান্বিতা যুবতীর পক্ষ নিয়ে সঙ্গী-যুবতীরা একসঙ্গে গেয়ে ওঠে—

লকে[১] বলে বুঢ়া বুঢ়া, থাকুন ন আমার বুঢ়া।
বুঢ়া যদি বাঁইচে থাকে দিইবেক গো পায়ের তড়া[২]।

বুঢ়া আমার গুণের নাই হইলে।
আমি ঘর করি বল্ কী কইরে।।

[(১) লোকে। (২) পদমঞ্জরী।]

প্রোষিতভর্তৃকা নারীর যৌবন-বেদনাও টুসুগানে পরিস্ফুট। খেটে-খাওয়া বহু মেহনতি মানুষ টাঁইড় দেশে 'কাম' অর্থাৎ 'কাজ' না-পাওয়ায় সিন্ধ্রি মারাফরি, ধানবাদ, টাটা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে যায়। এ অঞ্চলের বহুমানুষ নিজেদের 'ঝাড়খণ্ডী' অভিধায় চিহ্নিত করে। তাদের কাছে টুসুপূজার আবেদন দুর্গাপূজার চেয়ে অনেক বেশি। তবু যদি কেউ টুসুপরবের সময় 'বিদেশ' থেকে 'দেশে' ফিরতে না পারে, তখন হয়তো প্রোষিতভর্তৃকা যুবতী স্ত্রী টুসুগানের মধ্য দিয়ে মনের বেদনা জানায়—

হাল্কা ধুলা লাইগ্‌ল বাতাসে।
তুমি রইলে বঁধু বিদেশে।।

দীর্ঘশীতরাত্রি হয়তো বিরহজ্বালায় তার বিনিদ্র কাটে, কিন্তু মনোবেদনা অন্য কারো কাছে সহজে প্রকাশ করা যায় না; কারণ, বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না—এই চিরন্তনী নারী বৈশিষ্ট্য টুসুগানেরও বিরহভাবনায় রূপায়িত হয়—

বুকের ডালিম ডাল ভাইঙে পইড়ে।
জড়া শোল মাছে উখাইড় মাইরে।।

[উখাইড় মাইরে—উল্লম্ফন জাগায়]

আগেকার সামন্ততান্ত্রিক কোন কোন উৎকেন্দ্রিক পরিবারে, কিংবা আদিবাসী জীবনের কোন কোন আকস্মিক ঘটনায় ভাসুর-ভ্রাতৃবধূর বা দেবর-ভ্রাতৃবধূর অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠত। তার ইঙ্গিত টুসুগানে বিধৃত—

মাছ কাইট্‌লম চাকা চাকা মাছের কাঁটা সিঝে না।
ভাসুর হইয়ে জিগির কইরে ই জীবন আর রাইখ্‌ব না।।

কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা কোন কোন নারী ভাসুরের যৌন ইঙ্গিতকে হয়তো দিনের পর দিন উপেক্ষা করার মতো মানসিক শক্তির অধিকারিণী হয় না; তাই ঘটে পদস্খলন! ক্ষণিকের প্রবৃত্তি তাড়িত দুবলতার পর সেই গৃহবধূর করুণ কাতরোক্তি টুসুগানে ফুটে ওঠে—

আঁধার ঘরে ছুঁচ-বিঁধাইচি[১]
ভাসুর বইলে জানি না।
ও ভাসুর তোর পায়ে পড়ি
দিদিকে[২] তুই বলিস না।।

[(১) যৌন-সংসর্গ। (২) বড়জা]

ব্যক্তিজীবনের কলঙ্ক সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে স্বামী বিরহিণী নারী নিঃসঙ্গকাতর মুহূর্তে আত্মপরিহাসের সুরে বুঝি বা বিরলে গায়—

বাড়ির নাম্‌হয় রাহেড়[১] বুইন্‌লম্ রাহেড় হইল চমৎকার।
কোলের পুরুষ চাকরি গেল, ভাসুর হইল গলার হার।।

[(১) অড়হর]

ইংরেজিতে যাকে বলে Son of the soil, সেই 'ভূমিপুত্র' হিসাবে সুপরিজ্ঞাত বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত বলেছেন, "ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর পরিহারের সম্পর্ক। টুসু-গীত বাস্তব জীবনের নিখুঁত চিত্র বলেই ভাসুর-প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবেই এসেছে। বলা বাহুল্য, প্রায় প্রতিটি গানেই দেখা যায় ভাসুর বড়ো বেশি ভ্রাতৃজায়ার প্রতি কৌতূহল দেখিয়েছে; কোথাও বধূর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হবার প্রয়াসের আভাস, কোথাও বা দেহমিলনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ...দেবর ভাজ সম্পর্কটিও কিন্তু ঝাড়খণ্ডে অত্যন্ত রঙ্গমধুর। দেবরই যেন শ্বশুরালয় মরুদেশে একমাত্র সবুজ সজীব পান্থপাদপ। ঝাড়খণ্ডী সমাজব্যবস্থায় দেবর-ভাজের মধ্যে দেহ-মিলন নিষিদ্ধ নয়।"[১১] দেবর-ভ্রাতৃবধূর রঙ্গমাধুর্য টুসুগানে সহজেই চিত্রিত—

ও দেওর ধর ছাতা।
কাল মেঘে জল পড়ে ঠঁপা ঠঁপা[১]।।

[(১) ফোঁটা ফোঁটা।]

কামচঞ্চলা ও প্রোষিতভর্তৃকা কোন কোন প্রাকৃত নারী, পৌষ পরবে বাপের বাড়িতে থাকার সময়, ভাইয়ের শালা উপস্থিত থাকলে তাকেই হয়তো কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে অবৈধ মিলনের ইঙ্গিত দেয় তার ছবিও টুসু গানে বিধৃত—

অ ভাইয়ের শালা।
আইজ্ থাইকে যা হাম্‌দের ঘরে এক ব্যালা।।
মদের খালা ধইর্‌ব হে
পর্‌হাব গলায় মালা।।

নারীরা চিরকালই প্রসাধনপ্রিয়। তাই দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লার টুসুগানে গয়না, শাড়ি, লেডিজ চাদর প্রভৃতির কথা বার বাব ঘুরে ফিরে এসেছে। আধুনিকা অনেক কিশোরী অনুরাগরঞ্জিত চিত্তে বন্ধুস্থানীয় তরুণদের প্রতি 'দুষ্টু', 'অসভ্য' শব্দগুলি বিভিন্ন প্রিয়তার মুহূর্তে ব্যবহার করে নতুন ব্যঞ্জনার মাত্রা আনে; তেমনই এই সীমান্ত বাঙ্‌লার প্রণয়মুগ্ধা নারী অনেক সময় বাঞ্ছিত পুরুষকে 'খালভরা', 'ছুঁড়া' ইত্যাকার গালিবাচক শব্দ প্রণয়বাচক হিসাবে ব্যবহার করে। যথা—

(ক) কই দিলি গলার পঁইচা, কই দিলি রে আগবালা।
লুলুক দিবার কথা ছিল, কই দিলি রে খালভরা।।

(খ) কত চাটিচুটি দিয়ে পিরীত করা শিখাইল।
ল্যাডিস চাদর দিব বইলে ছ্যাঁড়া-কাঁথা উড়াইল।।
ও ছুঁড়া তোর ফঁপ্‌রা পিরীত।
আমার জাড়ে শীতে প্রাণ গেল।।

(গ) মনে বড় আশা—ও ভালবাসা।
ওগো কিনে দিবে কানপাশা।।

আর্থিক অসচ্ছলতায় কৃষিজীবী পরিবারের অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীর প্রসাধনপ্রিয়তার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে না; কিন্তু সোনার কানপাশা, নোলক, চুড়বালা ইত্যাদি গয়না দিতে না পারার অক্ষমতাকে সহজে স্বীকার না করে, আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে মোক্ষম যুক্তি খাড়া করে—

ও তোর লাজ লাগে না।
চ্যাপা নাকে লুলুক* পরা সাজে না।।

[* নোলক]

কিংবা স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রলুব্ধ অনুশাসন—

লিবি যদি চুড়বালা।
চল্‌বি ধনি চাবুকের পারা।।

নোলক বা নাকছাবি সীমান্ত বাঙ্‌লার নারীদের বড় প্রিয় অলঙ্কার। লোকায়ত জীবনে এমন ঘটনাও বিরল নয় যে স্বামী তার স্ত্রীকে নোলক দিতে পারেনি, অথচ সেই নারী 'মনের মানুষ'এর কাছ থেকে সেই দুর্লভ বস্তু উপহার পেয়ে সানন্দে তা অঙ্গে ধারণ করে দেহমনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে, দাম্পত্যজীবনে অনিবার্যভাবে অশান্তি ডেকেছে। তখন পুরুষাভিমান নিয়ে স্বামীর নির্দেশ—

কাজ কী লুলুকে।
লুলুক ফ্যালায়ে দে ভুলুকে*।।

[মাঠের গর্তে]

নাকছাবি-পরা নিয়ে দাম্পত্য কলহ অনেক সময় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করতে পারে। কোন বিবাহিতা নারী যদি স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে, যদি কোন গোপন প্রেমিকের দেওয়া নাকছাবি মাঝে মধ্যে পরতে চায়, তবে দাম্পত্য কলহ বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায়ে যেতে পারে। তার ইঙ্গিত টুসুগানে ফুটে ওঠে—

একটা নাকে দুটা নাকছাবি।
তুই থাক্‌বি না বাইরাই যাবি।।

পার্থিব বৈভব বা ব্যক্তিত্বে স্বামী যদি দুর্বল হয়, তবে পরকীয়া প্রেমের জয় হতে পারে। অনেক সময় এ জাতীয় পরকীয়া প্রেম নাচনী নাচের ইতিকথায় সংগুপ্ত। সেখানে

রসিকপুরুষ (রইস্‌কা) নায়ক বা নাগরের ভূমিকায় থাকে। প্রবল পরকীয়া প্রেমের মোহময়ী ইঙ্গিত টুসুগানে প্রতিবিম্বিত—

তুই বাইরাই আয় সাঁগা[১] দিব।
সিলিক্[২] শাড়ি পাঁয়ে মল দিব।।

[(১) পুনর্বিবাহ, (২) সিল্কের]

আর স্বামী ব্যক্তিত্ব যদি প্রবল হয়, তবে শোনা যায় বিরহখিন্ন নাগরের বিলাপোক্তি—

তুই আধা দিনেই ছাইড়্‌লি সই।
ভাব কইয়ে ভাব রাইখ্‌তে পারলি কই।।

মানবেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—একবিবাহরীতি (monogamy) অনেক পরবর্তীকালের বিধান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি-মালিকানার প্রাধান্য পাওয়ায় বহুগামিতা (Polygamy) কিংবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য খর্ব হয়। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স বলেছেন, '... The over-throw of mother-right was the defeat of the female sex, an event effecting the history of the world. The men seized the reins in the house also, the woman was degraded, enslaved, the slave of man's lust, a mere instrument for breeding children.'[১২]

একদিকে পুরুষের প্রবল কর্তৃত্ব ও যথেচ্ছাবিহার, অন্যদিকে বিবাহিতা নারী সংসার জীবনে কর্তৃত্বহীনা ও একতরফা সতীত্বের ঘেরাটোপে আবদ্ধা; তখনই কোন কোন নারী ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্রে বা প্রবল আত্মঅভিমানে, তথাকথিত সামাজিক অনুশাসনের প্রতিবাদ জানায়, এমন কি সামাজিক অনুশাসনবিচ্যুতা হয়ে রীতিমতো খবর হয়।

এ জাতীয় নারী-স্বাতন্ত্রের বা নারী স্বাধীনতার ঘটনা আমাদের দেশে সমাজের একেবারে উঁচুতলায় কিংবা একেবারে নিচুতলায় বেশি দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজে সচরাচর মধ্যবিত্ত মানসকিতার জন্য অধিকাংশ পুরুষ বা নারী সামাজিক অনুশাসন কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে আড়ষ্টপ্রায় জীবন নির্বাহ করে। তবে টুসুগানে পরকীয়া প্রেমচেতনা প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ চিত্তরঞ্জন লাহার একটি সুচিন্তিত মন্তব্য মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন, "এগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত (বা বড়জোর সম্প্রদায়গত) সংবাদ, আঞ্চলিক সংবাদ কদাচ নয়। কয়েকটি জাতে অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকলেও সেগুলি এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবনধর্ম বলে উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।"[১৩] ফলত, কঠোর সামাজিক অনুশাসন তথাকথিত নিম্নবিত্ত, আদিবাসী সমাজের নরনারীদের ওপর গভীরভাবে ক্রিয়াশীল। তবু প্রেম ফল্গুনদীর মতো বহমানা। তাই টুসুগানে শোনা যায়—

আমরা রা কাড়ি নাই লক বাদী।
মুহে হাঁসি, চইখে ভাব রাখি।।

চণ্ডীদাসের রাধা প্রিয় দয়িতের কাছে প্রেম নিবেদন প্রসঙ্গে বলে—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।

ভাবতেও অবাক লাগে টুসুগানেও সেই সহজগভীর, অনন্ত প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে—

ও তোর .হাতে আছে অনন্ত।
দিনে-রাইতে উইড়্ছে আমার কলঙ্ক।।

এই গানটিতে প্রেমের অনন্তময়ী, গভীর ব্যাপক রূপের কথা সহজভাবে বিধৃত ['ও তোর হাতে আছে অনন্ত']। আর এ জাতীয় আত্মহারা, গভীর ব্যাপক প্রেমানুভবের কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ' আমরা যাহাকে ভালোবাসি, কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা।'[১৪]

মিলন নয়, বিরহের মধ্যেই প্রেমের অন্তহীন প্রকাশ মাধুর্য। তাই বিপ্রলব্ধা নারীর প্রেমাকুতি টুসুগানে রূপ যায়—

ভালোবাসা বইলেছিল আইস্‌ব মাসের তিন দিনে।
দিনে দিনে মাস ফুরাইল, আইল না বছর দিনে।।

দুঃসহ বিরহের অন্তহীন মরুপথ পেরিয়ে মিলনের সুধাশ্যামলিম তীরে আসার স্বপ্ন তখনও মনোলোকে গুঞ্জরিত—

আমি জুইলে মবি কার বিষে।
মন ভাইঙেছে মিলন হয় কিসে।।

অন্ত্যটীকা

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈষ্ণব কবিতা, সোনারতরী কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮০), ৪৬০-৬১ পাতা।

২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা (৩য় সংস্করণ), ১৫ পাতা।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য' (৪র্থ সংস্করণ), ১৩৭৩। ৩৬৩ পাতা।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য ১৫০ পাতা।

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড, ঐ ৩১৬ পাতা।

৬। বিনয় মাহাত - লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, ২৫৩ পাতা

৭। চিত্তরঞ্জন লাহা ধলভূমের লোকগীতি (২য় খণ্ড: মকর) ১৩৮৭, ৫২-৫৩ পাতা।

৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমী (১৯৬৩), ১৬৩ ও ১৭০ নং পদ।

৯। সুধীরকুমার করণ সীমান্ত বাঙ্‌লার লোকযান এ মুখার্জী অ্যান্‌ড কোং ১ম সংস্করণ (১৩৭১), ১৯৭ পাতা।

১০। জীবনানন্দ দাশ 'অবসরের গান' কবিতা , 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ কাব্যসমগ্র, বেঙ্গল পাবিলার্শস (১৩৭৭), ৯৯ পাতা।

১১। বঙ্কিম মাহাত তদেব ১৬৬ পাতা।

১২। F. Engels The origin of the Family the Private Property and the State Moscow, 1948, P. 82.

১৩। চিত্তরঞ্জন লাহা তদেব ৩৮ পাতা।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভাষা-আন্দোলন ও টুসুগান

বর্তমান 'বাংলা দেশ'-এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে তীব্র ভাষা- আন্দোলন হয়েছিল। সেই আবেগমথিত, রক্তাক্ত ভাষা-আন্দোলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'-র আন্দোলন নামে বিখ্যাত। এখনও ফি- বছর একুশে ফেব্রুয়ারির দিন, দু'পার বাঙ্‌লায় বহু নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা ঐতিহাসিক গানটি—

'আমার ভাইয়ের রক্তে-রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ও-পার বাঙ্‌লার রাজনৈতিক-সামাজিক-সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অবিচ্ছেদ্য ভাব-বলয় গড়ে তুলেছে, তার নাম—'একুশের সংস্কৃতি'। বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন, "১৯৪৮, বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনই পূর্ব বাঙ্‌লায় পাকিস্তানী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ। এর মাধ্যমে যে প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেই আন্দোলন ক্রমশ বিকশিত হয় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৬৪-৬৫ সালের আইয়ুবী নির্বাচন, ১৯৬৮-৬৯ সালের ডিসেম্বর-মার্চ আন্দোলন এবং সর্বশেষে ২৫শে মার্চ পরবর্তী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ব বাঙলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশের ইতিহাসে ভাষা-আন্দোলন এ জন্যই এত তাৎপর্যপূর্ণ।"[১]

পাকিস্তানী আমলে একুশে ফেব্রুয়ারির বিশেষ দিনে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা শপথ গ্রহণ করতেন, কীভাবে মুসলিম লীগের কর্তৃত্বকে হ্রাস করা যায়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামি লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি এবং ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবি-সম্বলিত প্রাক্ স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল অগ্নিঝরা শপথের কাল। ১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল আইয়ুব শাসন অবসানের দুর্জয় শপথে দৃপ্ত! ১৯৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে জঙ্গী ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকি, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং সাজাহান সিরাজ ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে স্বাধীন বাংলা-গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। ঐ দিন বাঙালি পাকিস্তানী নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার শপথ নেন ঐ শহিদ মিনারের পাদদেশে।

অসমীয়া ভাষাকেই একমাত্র সরকারি ভাষায় রূপ দেওয়ার জন্যই ১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবর অসম ভাষা-বিল আইনে রূপান্তির হয়। তখন অসমের বাঙালিরা বাংলাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি সেই আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মর্যাদা দিয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। সেই ভাষা-আন্দোলন তদানীন্তন কাছাড় জেলায় (বর্তমান বরাক উপত্যকায়) কেন্দ্রীভূত হয়। ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারজন ভাষা-আন্দোলনে শহিদ হন। ফলে ভাষা-আন্দোলন তীব্রতর হয়। ফলে অসম সরকার ১৯৬০ সালের অসম ভাষা-আইন সংশোধন ক'রে ১৯৬১ সালে বরাকের জন্য বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে মান্য করেন। তার ফলে বরাকের অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আজও আইনসম্মত ব্যাপার।

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর; তার আগে এ অঞ্চল বিহারের অধীনে মানভূম জেলার অন্তর্গত। অথচ ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে এ অঞ্চলের মানুষ 'পশ্চিমা-সংস্কৃতি'-প্রভাবিত না-হয়ে বাংলা-সংস্কৃতির গভীর অনুবর্তী ছিল। ফলে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী অধিকাংশ নরনারী নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত বাঙালি হিসাবে দেখার বাসনা পোষণ করতেন। জনমানসে এ জাতীয় অন্তর্লীন মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়ে বিহারের নেতৃবৃন্দ মানভূম জেলায় বাংলা ভাষার প্রভাব হ্রাস করার নানারকম চেষ্টা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই শুরু করেন। অথচ ১৯৩১-এর আদমসুমারি থেকে জানা যায়—মানভূমের সদর মহকুমায় শতকরা ৮৭জন বাংলাভাষী নরনারী। ফলত, মানভূমের জনমানসে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবিতে ক্রমশ বাঙালি-বিহারি সাম্প্রদায়িক মনোভাব চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে 'মানভূম-বিহারী সমিতি' গড়ে ওঠে। তখন ব্যারিস্টার পি. আর. দাসের সভাপতিত্বে তার পাল্টা 'মানভূম বাঙালি সমিতি' গঠিত হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিহার সরকারের রাজনৈতিক প্ররোচনায় মানভূমের সর্বত্র হিন্দী প্রচার অভিযান চলে। ১৯৪৮ সালের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়[২] মানভূম জেলার কোন বিদ্যালয়ে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড টাঙানো চলবে না; তা দেবনাগরী হরফে অর্থাৎ হিন্দীতে লিখতে হবে। স্কুল শুরুর আগে যে প্রার্থনা সভা হয়, সেখানে বাংলা গানেব পরিবর্তে শুধুমাত্র 'রামধুন্' গাইতে হবে। শুধু তাই নয়, জেলা-স্কুল-পরিদর্শক সহকারী স্কুল-পরিদর্শকের কাছে বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন—গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যে-সব বিদ্যালয় সরকারি অনুদান পায়, সেখানে বাংলা ভাষা চলবে না, হিন্দী ভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে।[৩] সরকারি বিভাগেও বাংলা ভাষা ক্রমশ অচল হল। 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ঘটনা. ১৯৪৯ সালের ২৫শে মে. বরাবাজার থানার হেরবনা গ্রামে সরকারি ধান্যগোলা থেকে অনুদান দেওয়ার সময় বাংলা দরখাস্ত বাতিল হয়। আবেদনকারীকে বাংলার পরিবর্তে হিন্দীতে দরখাস্ত লিখতে বাধ্য করা হয়। ঝরিয়া দেশবন্ধু সিনেমা হলে বিজ্ঞাপন-পর্বে দেখানো হতো—Hindi is the mother language of Manbhum. মানভূমের শহর ও গ্রামাঞ্চলে বাংলা সমর্থনকারীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য যত্রতত্র ঘোষণা করা হোত—'মানভূম বঙ্গাল মে নহী জায়েঙ্গে, জানে পর খুন কে নদী বহা দেঙ্গে।'

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে মানভূম, সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানের আন্দোলনকে বিহার সরকার নির্মমভাবে দমন করার প্রতিবাদে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সুচেতা কৃপালনী, এন. সি. চ্যাটার্জী প্রমুখ পাঁচজন লোকসভার সদস্য প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিশেষ হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে আবেদন জানান। সেই সময় 'মানভূম কেশরী' হিসাবে খ্যাত জননেতা অতুলচন্দ্র ঘোষ লোকসেবক-সংঘের মাধ্যমে মানভূমের বঙ্গভুক্তির জন্য বিশাল গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেন; গড়ে ওঠে টুসুগানের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাত তখন কয়েকটি রাজনৈতিক ভাবনা-পুষ্ট টুসুগান বাঁধেন। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক টুসুগানটি হল—

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।।
বাঙ্গালী-বিহারী সবাই
এক ভারতের আপন ভাই
বাঙ্গালীকে মারলি্ তবু
বিষ ছড়ালি — হিন্দী চাই।।
বাংলা ভাষার পদবীতে ভাই
কোন ভেদের কথা নাই
এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে
মাতৃভাষায় রাজ্য চাই।।

লোকসেবক সংঘের কর্ণধার অতুলচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণচন্দ্র ঘোষ সমকালীন ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কয়েকটি টুসুগান রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে জনপ্রিয় একটি টুসুগান হল—

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।।
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা ব'লে।।
এই ভাষাতেই পরচা-রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক-কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাত পুরুষের হক পাটা।।

দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাষার চির অধিকার।
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার।।

অরুণচন্দ্র ঘোষের আরেকটি জনপ্রিয় টুসুগান হল·

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে
মেঠো সুরের কোন্ চুয়া।
বাংলা গানের ছড়া কেটে
আষাঢ় মাসে ধান রুয়া।।
—মনের মাধুরী
মনসা গীতি বাংলা গানে
শ্রাবণে জাত-মঙ্গলে
চাঁদ-বেহুলার কাহিনী গাই
চোখেব জলে গান ব'লে।।
বাংলাগানে করি লো সই
ভাদুপরব ভাদরে।
গরবিনীর দোলা সাজাই
ফুলে-পাতায় আদরে।।
বাংলা গানে টুসু আমার
মকর দিনের সাক্রাতে
টুসুভাসান পরব টাঁড়ে
টুসুর গানে মন মাতে।।

'হরিদাস' ছদ্মনামে চাষ থানার সতনপুর গ্রামেব জগবন্ধু ভট্টাচার্য মানভূমের ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে কয়েকটি টুসুগান রচনা করেন। টুসুগানের মাধ্যমে বিহারের কংগ্রেসি সরকারের ছলনাপূর্ণ মনোভাবকে অত্যন্ত ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে তিনি বাণীরূপ দেন—

প্রাণে আর সহে না
হিন্দী কংগ্রেসীদের ছলনা।।
ইংরাজি আমলে যারা গো
করতো মোসাহেবিয়ানা
এখন তারা হিন্দী কংগ্রেস
মানভূমে দেয় যাতনা।।

বিহার সরকার ছলে-বলে-কৌশলে মানভূমের ভাষা-আন্দোলনকে তথা টুসু সত্যাগ্রহীদের দমন করার জন্য সক্রিয় হলে, জগবন্ধু ভট্টাচার্য মানভূমবাসী-ধলভূমবাসীদের সতর্ক ক'রে টুসুগান বাঁধেন—

মানভূমবাসী থাকবে সতরে
ধলভূমবাসী থাকবে সতরে।।
(হিন্দীর) ফন্দী এল জীপগাড়ি ভরে।। ধুঃ
যত টাকা কেবল ফাঁকা
বাঁধ কুয়ারই খবরে
(মিথ্যা) চালানকাটি, নিচ্ছে লুটি
হিন্দী ভাষার প্রচারে।।
(তাই) এদের তরে চাষের অন্ন
দাও এখন বাঁধা দরে
নইলে পরে কেমন করে
মরবি ক্ষুধায় ভাদরে।।
সেদিন এরা কেউ ছিল না
থাকবে নাকো এর পরে
(এখন) এত ব্যথা গোপন কথা
(শুনায়) কমিশনের ডরে।।

বাঁশাবুরুর মধুসূদন মাহাত টুসুগান বাঁধলেন—

মন মানে না হিন্দীরে সইতে।
ভাষা মোদের হরে নিল হিন্দীতে।।
মাতৃভাষা হরে যদি
আর কি মোদের থাকে রে।
(তাই) মধু বলে মাতৃভাষায়
ধ্বজা হবে বহিতে।।

কাননবিহারী ঠাকুর নামে জনৈক ব্যক্তি গান্ধীবাদী হয়ে টুসু-সত্যাগ্রহ ও ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার জন্য মানভূমবাসীদের ডাক দেন টুসুগানে—

স্বাধীন জীবনে
এবার মিলব রে জনে জনে।। রং
সত্য পথে চল্ রে সবাই
গান্ধী-বাণী রাখ্ মনে।
কানন বলে পাবি আরাম
বাংলা ভাষার জীবনে।।

'মানভূমকেশরী' অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং 'মানভূমগান্ধী' ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম মানভূমের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অতুলবাবু ১৯০৫ সালে বি. এ. পাস এবং ১৯০৮ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঐ বছরই (১৯০৮) জুলাই মাস থেকে পুরুলিয়া কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ঐ বছরই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অঘোরচন্দ্র রায়ের চতুর্থ কন্যা লাবণ্যপ্রভা দেবীর সঙ্গে পরিণত-সূত্রে আবদ্ধ হন। অথচ, ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে অতুলবাবু ওকালতি জীবনের খ্যাতি-প্রতিভা অকাতরে বিসর্জন দিয়ে ঋষি নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে অতুলচন্দ্র মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং ঋষি নিবারণচন্দ্র কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে ঋষি নিবারণচন্দ্রের তিরোধানের পর অতুলচন্দ্র জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন এবং ঐ পদে ১৯৪৮ সাল অবধি বৃত থাকেন। তখন মানভূম জেলা-কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে অতুলচন্দ্র বহুবার স্বদেশী আন্দোলনের ব্রতে কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের শুরুতে তাঁকে নিরাপত্তা-আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়।

অতুলচন্দ্র ১৯৪৬ সালে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে মানভূমে প্রায় তিন হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেন। ১৯৪৭-৪৮ সাল অবধি সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দেশের স্বাধীন সরকারের সুষ্ঠু শাসনের সহায়তা করে। অথচ সেই সতত সজাগ জননেতা অতুলচন্দ্র ১৯৪৮ থেকে বিহার সরকারের বাংলা-ভাষা দমন নীতিতে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রমশ গণ-আন্দোলনের পথে এগিয়ে যান এবং লোক-সেবক সংঘের মাধ্যমে অভিনব টুসু-সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তাঁর দেশব্রতী জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণচন্দ্র, তৎকালীন মানভূমে বঙ্গভুক্তি-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সব টুসুগান লেখা হয়েছিল, সে-সব গানেব সময়োচিত একটি সুনির্বাচিত রচনা সংকলন 'টুসুর গানে মানভূম' সম্পাদনা ও প্রকাশনা করেন।[৫] ষোল পাতার ছোট্ট গীতি সংকলনটির দাম ছিল তখন মাত্র এক আনা। প্রাপ্তিস্থানের নাম ছিল—লোক সাহিত্য ভবন, পুরুলিয়া (মানভূম)। 'মুক্তি'-পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক অরুণচন্দ্র ঘোষের বয়স এখন ৮৬ বছর; এবং তার গর্ভধারিণী জননী—যিনি পুরুলিয়া তেলকল পাড়া শিল্পাশ্রমে জেলার সকলের 'মা' রূপে পূজনীয়া, তাঁর বয়স এখন ১০৩ বছর।

তাঁদের সঙ্গে টুসু-আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ হয়েছে। অরুণবাবু জানান—'টুসুর গানে মানভূম' পুস্তকটি সে-সময় এক লক্ষ কপি ছাপা হয়; অথচ সেই বিশাল সংখ্যক বই জনগণের বিপুল চাহিদায় খুব শিগগির নিঃশেষিত হয়ে যায়। অরুণবাবু আরো জানান—ঐ সঙ্গীত-সংকলনের ১নং. ২নং, ৩নং, ১৩ নং, ১৫ নং প্রভৃতি টুসুগান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল: মানভূমের গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে-প্রান্তরে-অরণ্যভূমিতে সকলের মুখে মুখে গানগুলি শোনা যেত। ইংরেজ শাসন কালে ভারতের স্বদেশীদের মুখে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটি গভীর আবেগে ধ্বনিত হতো,

তেমনই মানভূম টুসু-আন্দোলনের সময় ভজহরি মাহাতর—'শুন বিহারী ভাই/তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই'... ['টুসুর গানে মানভূম' সংকলনের ২নং গান] এবং অরুণচন্দ্র ঘোষের 'আমার বাংলা ভাষা, প্রাণের ভাষা রে—/(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে....' [সংকলনের ১৩ নং গান] এই গান দুটি জনমানসে গভীর আবেগ ও প্রেরণা জাগিয়েছিল। ফলত টুসুগান সংকলনের মধ্যে এই দুটি গানই যথার্থভাবে গণ-সংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল।

বিহারের তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী কে. বি. সহায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন : লোক-সেবক-সংঘ সদর মানভূমকে পশ্চিম বাঙ্লায় নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে টুসু আন্দোলন করছেন। 'টুসুর গানে মানভূম' সংকলন আপত্তিকর। তার উদ্দেশ্য বিহার সরকার ও তার কর্মচারীদের নিন্দা করা; বিহারীদের এবং হিন্দীভাষীদের গালি দেওয়া। আপত্তিকর বক্তব্য প্রতিপন্ন করার জন্য উদাহরণ হিসাবে তিনি উক্ত সংকলন থেকে টুসুগানের কিছু কিছু নিম্নরূপ ইংরেজি তর্জমার ব্যবস্থা করেন—

'শুন বিহারী ভাই/তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই'
(২ নং গান, ভজহরি মাহাত)

'Hear Biharee brothers, you cannot keep us with Bihar by show of 'lathi (force)'.

'প্রাণে আর সহে না/ হিন্দী কংগ্রেসীদের ছলনা'...
[৮ নং গান, জগবন্ধু ভট্টাচার্য]

'Our souls can no longer bear the tricks of the Hindi speaking Congressman.'

মানভূমে বঙ্গভুক্তি-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে টুসু-সত্যাগ্রহীদের আন্দোলনকে বিহার সরকার কঠোরভাবে দমন করার জন্য ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে বিহারের জন নিরাপত্তা আইনের ৯(৫) ধারায় পাঁচটি দলের ১৭জন টুসু-সত্যাগ্রহীকে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ (বে-আইনী জনতা), ২২৫ (সরকারি হেফাজত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা) এবং ১৮৬ (সরকারি কাজে বাধা দান) ধারায় লোকসেবব সংঘের কর্ণধার অতুলচন্দ্র ঘোষ, লোকসভা সদস্য ভজহরি মাহাত, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, অরুণচন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক অশোক চৌধুরী প্রমুখদের গ্রেপ্তার করা হয়। অতুলচন্দ্র তখন ৭৩ বছরের বৃদ্ধ এবং রক্তের নিম্নচাপ, ব্রঙ্কাইটিসেব জন্য শীতের প্রকোপে সাবধানে থাকতেন। তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর মতো জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে রুগ্ণ অতুলচন্দ্রকে খোলা ট্রাকের ওপর চাপিয়ে, পুরুলিয়া থেকে ১৩৫ মাইল দূরে হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ভজহরি মাহাতকে (এম.পি.) সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে হাত-কড়া দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে আনা হয়। আদালতের বিচারে তাঁর এগার মাস কারাদন্ড হয়।

১৯৫৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, অতুলচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী লাবণ্যপ্রভা ঘোষকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর. বি. সিং একমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও একমাস বিনাশ্রমে কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মুক্তি' পত্রিকা (৮/৩/১৯৫৪ সংখ্যা) থেকে জানা যায়—টুসু সত্যাগ্রহীদের আরও পাঁচটি দলেব ২৩ জন সত্যাগ্রহীর কারাদন্ড, লাবণ্যপ্রভা দেবীব আরও এক দফা কাবাদণ্ড ও জবিমানা, হেমচন্দ্র মাহাতর আরও দু-দফা কারাদণ্ড এবং জরিমানা, লোকসভা সদস্য ভজহরি মাহাতর আরো এক দফায় এক বছরের কারাদণ্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা; সমরেন্দ্র ওঝার (এম. এল. এ.) এক বছরের কারাদণ্ড ও ১,০০০ টাকা জরিমানা। বাবুলাল মাহাত নামে পনের বছরের এক জন্মান্ধ বালকের তিনমাস কাবাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে দু'মাস কারাদণ্ডের আদেশ জারি হয়।

অরুণচন্দ্র ঘোষসহ আবো চারজন কর্মীকে চোদ্দমাসেব কারাদণ্ড, সাংবাদিক অশোক চৌধুবী এবং রামচন্দ্র অধিকাবীকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০ টাকা জবিমানা এবং অনাদায়ে আরো তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। বিহার বিধানসভাব সদস্য শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জীর এক বছর কারাদন্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা হয।

বান্দোয়ান থানার মধুপুর গ্রামের কুশধ্বজ মাহাতর নাবালক পুত্র সুধন্বা মাহাত (১৪ বছব বযস) টুসু সত্যাগ্রহে ৯ মাস সশ্রম কাবাদন্ড এবং ১,০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাবালক সুধন্বা মাহাতর ১,০০০ টাকা জরিমানা আদায়ের জন্য পুলিশ ২১/২/৫৪ তারিখে তাদের বাড়ি গিয়ে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি ক্রোক কবার নামে উৎপাত ও জুলুম চালায়।

১৯৫৪ সালের ২ মার্চ হবিবুল্লা নামক সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে গিয়ে মানবাজার থানার পিটিদারি গ্রামে টুসু সত্যাগ্রহীদের জরিমানা আদায়ের নামে বাড়িব তালা ভেঙে সম্পত্তি ক্রোক ও মহিলাদের প্রতি নগ্ন বর্বর আচরণ করে।

টুসু-সত্যাগ্রহীদের দন্ডকৃত অর্থ আদায়ে পুঞ্চা ও বান্দোয়ান থানায় পুলিশি জুলুম অব্যাহত থাকে। ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ বান্দোয়ান থানার মধুপুর গ্রামের লোকসেবক সংঘের কার্যালয়ে পুলিশ সদলবলে হামলা চালায় এবং কিছু গৃহস্থালি জিনিসপত্রের সঙ্গে ২,২৫০ কপি 'টুসুর গানে মানভূম' পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত কবে।

১৯৫৪, ১৬ মার্চ বিহাব সরকাব নতুন কৌশল দেখান। ৯ মাস কারাদন্ডে দন্ডিত অতুলচন্দ্র ঘোষকে দেড়মাস মাত্র কারাদন্ডভোগের মাথায় হাজারিবাগ জেল থেকে মুক্তি দেন; অথচ ঐ দিনই তাঁর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও জনৈকা ভাবিনী মাহাতকে পুরুলিয়া জেল থেকে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। সেইসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী (এম. এল. এ.), সমরেন্দ্রনাথ ওঝা (এম. এল. এ.) সহ একুশজন টুসু-সত্যাগ্রহীদের পুলিশ-ট্রাকে পুরুলিয়া-জেল থেকে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।[৬]

এ সময়ই বিহার সরকার মানভূমে হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। হিন্দী ভাষা- প্রসারের নামে বিহার সরকার অনুগৃহীত নেতৃবৃন্দ এবং কিছু সরকারি কর্মচারি কালনেমির লঙ্কাভাগে মত্ত হন—এমন অভিযোগও শোনা যায়।

১৯৫৪, ২৯ মার্চ লোকসভায় শিক্ষাখাতে দাবি সম্পর্কে আলোচনা কালে ভাষার প্রশ্ন উত্থাপিত হলে এন. সি. চ্যাটার্জী মানভূমে টুসু সত্যাগ্রহীদের দমননীতির প্রতিবাদ করেন। তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি জানান—১৯৩১-এর আদমসুমারিতে মানভূম সদর মহকুমার শতকরা ৮৭ জন বাংলাভাষাভাষী নরনারীর উল্লেখ আছে। তাই তিনি আবেদন জানান—আমাদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে দমন করবেন না।

১৯৫৪, ৫ই জুলাই পাটনায় এক বিশেষ আলোচনা সভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণ সিংহ, বিহারের শিক্ষাসচিব বদ্রীনাথ শর্মা, রাজস্ব সচিব কৃষ্ণবল্লভ সহায়, তথ্য দপ্তরের সচিব মহেশপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। বিহার মন্ত্রীসভার ধুরন্ধর রাজনৈতিক চাতুর্যের শিকার হন তৎকালীন পশ্চিমবাঙ্লার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সাংবাদিকদের জানান—

ক) বিহার রাজ্যে বাংলা-ভাষা-সংরক্ষণের জন্য বিহারের মন্ত্রিসভা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

খ) এ ক্ষেত্রে হয়তো আরো উন্নতি দেখা যেতে পারে।

গ) বিহারে বাংলা-ভাষা অনুশীলন সম্পর্কে তিনি (ডাঃ রায়) অনেক অভিযোগ শুনেছিলেন, কিন্তু কার্যত দেখা গেল—বাঙালি ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য বিহার সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন।

ঘ) বিহার সরকারের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উঠেছিল, সে-সব অভিযোগ সত্য নয়, তার সন্তোষজনক উত্তর বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

ঙ) অন্যান্য যে-সব অভিযোগ আছে, তার সম্পর্কে তদন্ত-করা প্রয়োজন, এবং বিহার সরকার সে সম্পর্কে শিগগির উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই সময় কলকাতা আশুতোষ মেমোরিয়্যাল হলে শ্যামাপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—শিক্ষা ও রাষ্ট্রে মাতৃভাষার অগ্রাধিকার একান্ত দরকার। হিন্দী বিষয়ে অত্যুৎসাহ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

অথচ ১৯৫৪, ৯ জুলাই বিহার কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা বিনোদানন্দ ঝায়ের নেতৃত্বে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে বান্দোয়ান-কল্যাণ-সমিতির সভায় বিহার সরকারের অভিসন্ধিমূলক প্রচার চালান হয়—'মানভূম বঙ্গাল মে নহী জায়েঙ্গে, জানে পর খুন কে নদী বহা দেঙ্গে।' মানবাজারেও হিন্দীতে প্রচার করা হয়—'মানবাজারবাসী বোল্ রহা বিহার মে রহেঙ্গে।' সর্বোপরি, সর্বত্র অভিসন্ধিমূলক প্রচার অভিযান চালানো

হয়—'মানভূম কা জনতা বোল্ তা হামরা বিহার মে রহেঙ্গে।' অধিকাংশ সময় এই স্লোগানগুলি লাল শালুর ওপর সাদা তুলার ব্যানার বানিয়ে গ্রামেগঞ্জে পথ পরিক্রমায় ব্যবহার করা হতো।

১৯৫৪, ২৬ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের কুর্ণুলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ ফজল আলি জানান—কমিশন ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হওয়ার চেষ্টা করবে। কমিশনের কাছে যে-সব অভিযোগ পেশ করা হবে, সে-সব অভিযোগ পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হবে।[৬] ইতিপূর্বে তেলেগু ভাষাভাষী অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবি উঠেছিল, লোকসভায় ১৯৫৩ সালের ১০ আগস্ট বিল আসে এবং ঐ বছর পয়লা অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়।

এই উত্তাল মুহূর্তে পুরুলিয়া উকিল বার-অ্যাসোসিয়েশন, মানভূম জেলা বাঙালি সমিতি প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশ পাতার এক স্মারকলিপি রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের কাছে পেশ করেন। সেই স্মারকলিপিতে মোঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ অবধি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে কিভাবে মানভূম ও ধলভূমবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নতুন প্রদেশের সঙ্গে তাদের জুড়ে দেওয়া হয়, তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

নানা যুক্তিসহ দেখান হয়—মানভূম ও ধলভূমের সংস্কৃতিগত মিল এবং এই বাংলা ভাষা এই দুই অঞ্চলকে বঙ্গদেশের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে—একথাও জানান হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে যখন মানভূম জেলার সৃষ্টি হয়, তখন কবি বড়ু চন্ডীদাসের জন্মভূমি বাঁকুড়া জেলার ছাতনাকে দাবি করা হয় মানভূমের অন্তর্বর্তী এবং চণ্ডীদাস 'মানভূমের কবি'।

সেই স্মারকলিপিতে আরও জানান হয়—সমগ্র মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন ৫,৩০০ বর্গমাইল পরিমিত একই এলাকাভুক্ত অঞ্চল সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হোক।

সেই স্মারকলিপিতে বিহার সবকার বাংলা-ভাষা ও সংস্কৃতি দমনের নামে যে-সব অত্যাচার করেছে, সে-সব প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়।

মুরারডি স্টেশনের অনতিদূরে রামচন্দ্রপুরে 'সংগঠন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী—পূর্বাশ্রমের বিপ্লবী জীবনে যাঁর নাম ছিল অন্নদাকুমার চক্রবর্তী, তিনি হিন্দী ভাষার বিপক্ষে এবং মাতৃভাষার স্বপক্ষে নানা যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন।

১৯৫৪, ২৩ আগস্টের 'মুক্তি' পত্রিকা থেকে জানা যায়—বিহারের রাজস্ব ও বনবিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা মানভূমকে বিহারে রাখার চেষ্টায় পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে জনসভা করেন। বলরামপুরের বিশিষ্ট ধনী জগন্নাথ সরাফের ধর্মশালার দোতলায় তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে বিহারে থাকার সপক্ষে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চন্দনকেয়ারি থানার বারমেস্যা

স্কুলেও তিনি এ জাতীয় সভা করেন। গৌরীনাথ ওঝা, যশোদাদুলাল সিংহ, যুগল সাহানী প্রমুখ ব্যক্তি সেই সভার উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। এ জেলার জননেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাত এবং অজিত প্রসাদ সিংদেও প্রমুখেরও তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর কৃষ্ণবল্লভ সহায় কাশীপুর থানার সোনাথলি আশ্রমে গিয়ে সাধক মনোহর ক্ষ্যাপার দৈবী অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত ১৯৫৪, ১৩ ডিসেম্বর 'মুক্তি' পত্রিকায় বড়ো বড়ো হরফে খবরের শিরোনামে যায়—"সীমা কমিশন বিহার সরকার ও কংগ্রেসের অপকীর্তিসমূহ—'বিহারে থাকিব' ফরমে লোককে ভুল বুঝাইয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ: জাল স্বাক্ষরের হিড়িক, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রচারের জন্য পুলিশের জবরদস্তি, দারোগা ও পুলিশ কর্মচারীদের যথেচ্ছাচার, মানভূমে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার ও অরাজকতার নাদিরশাহী শাসন চলিতেছে।"

'মুক্তি' পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতে আরেকটি খবর ছাপা হয়—"রক্ত দিয়াও সত্যের প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ, রঘুনাথপুরে নতুন ইতিহাস, সত্যাশ্রয়ীদের রক্তপাতের মধ্যে জেলায় দৃঢ়তর সংকল্প, যুক্তিহারা, বুদ্ধিহারা যাহারা—অন্যায় আঘাত তাহারাই করে, অন্যায় আঘাত যাহারা করে ন্যায়ের বিচারে পরাজয় তাহাদেরই ঘটে, সত্য ও অহিংসাব্রতীর পরাজয় নাই।"

মানভূমে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম দিকে পুরুলিয়া শহরের বহু নাগরিক হিন্দী ভাষার মাধ্যমে ছেলেদের লেখাপড়া না-শেখানোর জন্য পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে নিজ নিজ পুত্রকে সরিয়ে শহরের এম. ই. স্কুলে ভর্তি করেন। তখন এম. ই. স্কুলের প্রাতঃবিভাগে জহরলাল বসু, জীমূতবাহন সেন প্রমুখ আদর্শবাদী কৃতী শিক্ষক ক্লাস নিতেন।

১৯৫৫, ২০ ডিসেম্বর দিল্লির লোকসভায় রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত বিষয়ে চৈতন মাঝি (এম. পি.) ভাষণ দেন। চৈতনবাবু দক্ষিণ মানভূম ও ধলভূমের নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে আদিবাসী আসনে লোকসেবক-সংঘের প্রতিনিধিরূপে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছিলেন।

১৯৫৬, ২ জানুয়ারী, 'মুক্তি' পত্রিকায় তাঁর ভাষণের কিছু অংশ মুদ্রিত হয়, এবং তা নিম্নরূপ:

"আমরা বিহারের বাংলাভাষা অঞ্চলগুলি চেয়েছি। সেই সকল অঞ্চলে আদিবাসীদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। তাঁরা একমাত্র বাংলাতেই কথা বলেন। যেমন ভূমিজ, দেশওয়ালি মাঝি, কড়া, মুদি মাহলি ইত্যাদি। এবং প্রকৃতপক্ষে সাঁওতালরাই নিজেদের একমাত্র আদিবাসী বুলি বলেন এবং তার সঙ্গে বাংলা বলেন — যা তাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা।

সাঁওতালরা বিহারে সংখ্যায় ১৭ লক্ষ। তাদের অধিকাংশ এইসব বাংলাভাষী অঞ্চলে বাস করে। যদি এই সমস্ত অঞ্চল বাংলায় যুক্ত হয়, তবে এই সকল অঞ্চলের ১২ লক্ষ সাঁওতাল বাংলার সাড়ে ছয় লক্ষ সাঁওতালের সঙ্গে যুক্ত হবে।

বিহার সরকার দাবি করেছেন যে, আদিবাসীদের সামাজিক জীবনের সম্বন্ধ বিহারের সঙ্গে। সে-কথা ভিত্তিহীন। আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পশ্চিম বাংলার সঙ্গে। আমাদের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক জীবন বাংলার সংস্কৃতি অনুযায়ী।''

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি-ভাবনার প্রেক্ষিতে যে টুসু সত্যাগ্রহ চলছিল, জেলার বিচার বিভাগের চোখে তার স্বরূপ কীভাবে ধরা পড়েছিল, তার দৃষ্টান্ত ১৯৫৬ সালের ২রা জানুয়ারী 'মুক্তি' পত্রিকায় বিধৃত। পুরুলিয়া জর্জকোর্টে দীর্ঘ দু'বছর পরে টুসু সত্যাগ্রহীদের রায় (১ম দফা) নিম্নরূপ:

''অনধিক প্রায় দুই বৎসর পরে টুসু-সত্যাগ্রহে দন্ডিত সত্যাগ্রহীদের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে জর্জকোর্টে আপীলের রায়ের প্রথম দফা গত ২৩ শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হইল।

টুসু-সত্যাগ্রহের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মোট ২৮টি আপীল জর্জকোর্টে দায়ের করা হয়। তাহার মধ্যে এডিশনাল জজ বর্তমানে ১৬টি আপীলে ৪৩জন সত্যাগ্রহীর সম্বন্ধে রায় দেন।

নিম্ন আদালতে বি. এম. পি. ও (বিহার মেনটেনেন্স অব পাবলিক অর্ডার) অ্যাক্টের ৯(৫) ধারায় উক্ত ৪৩ জনের ৬ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০ হইতে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে ১ মাস হইতে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদন্ডের আদেশ হয়। অনেক সত্যাগ্রহীর বিরুদ্ধে ঐ একই ৯(৫) ধারায় ২ দফা হইতে ৫ দফায় পৃথক পৃথক সাজা হইয়াছিল। এই সাজাপ্রাপ্ত সত্যাগ্রহীদের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ অন্ধ বালক ও দুইজন মহিলা আছেন। একজন শ্রীরাঘব চর্মকার ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন।

আপীলের রায়ে—শ্রীঅশোক চৌধুরী ও শ্রীঅরবিন্দ ওঝাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে। আরও চারজন সত্যাগ্রহীকে যাহাদের বিরুদ্ধে ঐ একই ৯(৫) ধারায় ৩ হইতে ৫ দফায় সাজা হইয়াছিল তাহাদেব দু-একটি দফায় খালাস দিয়া বাকী দফায় সাজা দেওয়া হইয়াছে।

সম্পূর্ণ অন্ধ বালক শ্রীবাবুলাল মাহাতকে দুই দফায় মোট ৩ মাস বিনাশ্রম কারদণ্ড ও ২০০টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৪ সপ্তাহের কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। শ্রীবাবুলাল ইতিমধ্যে ৮মাস জেল খাটিয়া বাহির হইয়াছে।

আপীলে সকলেরই নিম্ন কোর্টের দন্ড কমাইয়া ২ মাস সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিন হইতে একমাস কারাদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হইয়াছে।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে—আপীলগুলি দায়ের করিবার প্রায় দুই বৎসর পরে মাত্র ১৬টি মামলার রায় প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যে বেশীরভাগ সত্যাগ্রহীরাই ৬ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত জেল খাটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে কেহ ২১ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে। জরিমানা আদায়ের জন্য বহু অমানুষিক ব্যাপারও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপীলে দণ্ডাদেশ যাহা কমিয়াছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাহার অনেক অনেক কাল জেলখাটা হইয়া গিয়াছে।

এই আপীলের শুনানির সময় আসামীপক্ষের উকিল শ্রীজ্যোতির্ময় দাসগুপ্ত একটি বিশেষ ব্যাপারের প্রতি অ্যাডিসন্যাল জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে—সম্প্রতি 'বাংলায় যাইব না' বলিয়া পুরুলিয়াতে যে তথাকথিত সত্যাগ্রহের অভিনয় করান হইল, তাহাতে ঐ একই বি. এম. পি. ও-র ৯(৫) ধারায় একই ম্যাজিস্ট্রেট তথাকথিত আসামীদের 'আদালতে উঠা পর্যন্ত' সাজা দেওয়াই পর্যাপ্ত মনে করিয়াছিলেন। অথচ এদিকে টুসু-সত্যাগ্রহীদের ঐ একই ধারায় ১ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদন্ডের আদেশও পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। অ্যাডিসন্যাল জজ মহোদয় জানান যে—ইহা বিচার ম্যাজিস্ট্রেটের অভিরুচি।

আপীলের বিচারে এক দফায় শ্রী অটল মাহাত ও হেম মাহাতকে রেহাই দিয়ে অ্যাডিসন্যাল জজ মন্তব্য করেন যে—রেহাই দেওয়া হইল; কর্তৃপক্ষ ইহাদের বিরুদ্ধে আবার নূতন করিয়া মোকদ্দমা আনিতে পারেন।

উকিল সর্বশ্রী জ্যোর্তিময় দাসগুপ্ত , জগদীশ চ্যাটার্জী, সতীশচন্দ্র সাহা, প্রমোদকুমার ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হরকালী মুখার্জী প্রভৃতি আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।"

বিহার সরকার পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির বিরুদ্ধে জনমত সমর্থনের চেষ্টায় বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে হরতালের ডাক দেন। ১৯৫৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী 'মুক্তি' পত্রিকা থেকে জানা যায়, হরতাল জন-সমর্থন না-পাওয়ায় ব্যর্থ হয়। তখন পুলিশ জেলার সব বাস সার্ভিস বন্ধ করে এবং জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গুণ্ডাবাহিনী নিয়োগ করে। সেই গুণ্ডারা ঝালদা ও চাণ্ডিলে বাঙালিদের সম্পত্তি লুঠ করে। প্রশাসনিক অরাজকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিবাদে মানভূম কেশরী অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৮/১/৫৬ তারিখে তারবার্তাযোগে মানভূমের দুঃসহ পরিস্থিতির কথা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে জানান। সেইসঙ্গে বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহের দাবিতে কেন্দ্রীয় সবকারের আচরণের প্রতিবাদে ১৯৫৬ সালের ২১শে জানুয়ারি পুরুলিয়ায় সর্বাত্মক হরতাল পালন হয়। জেলার সর্বত্র দোকানপাট যানবাহন বন্ধ থাকে। জেলায় অধিকাংশ পরিবার অভাবনীয়ভাবে সন্ধ্যা অবধি অরন্ধন দিবস পালন করেন। বিকাল পাঁচটায় পুরুলিয়া শহরের রাসমেলা ময়দানে বিশাল জনসভা হয় এবং সেই সভার পবিচালক ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ।

উত্তাল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ১৯৫৬-র ২৩শে জানুয়ারি যুক্ত বিবৃতি দিয়ে জানান—

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একত্র করে ‘পূর্বপ্রদেশ’ নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হবে। তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দসহ বিরোধী দল ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।[৮]

পুরুলিয়াকে বিহারে সংযুক্তির প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সারা বাংলা ঐতিহাসিক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতি বসু, গোপাল হালদার, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ বক্তাগণ ভাষণ দেন।

ভাষার দাবি নিয়ে মানভূম-বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদে জামতাড়া গ্রামে দশহাজার লোকের সমাবেশ হয়। লোক-সেবক-সংঘ কর্মীদের জেলা সম্মেলনে বাংলায় সত্যাগ্রহ অভিযানের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৫৬ সালের ২০শে এপ্রিল [বাংলা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ] শুক্রবার সকালে পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাকবিড়র‍্যা গ্রাম থেকে শুরু হয় ঐতিহাসিক বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযান। লোক-সেবক-সংঘের অতুলচন্দ্র ঘোষ-লাবণ্যপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে ১,০০৫ জন নরনারী পদব্রজে কলকাতা অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। দলনেতা বৃদ্ধ অতুলচন্দ্র গোরুর গাড়িতে থাকেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি উচ্চারণ করে পদযাত্রার শুরু।[৯] শোভাযাত্রার মধ্যস্থলে উদীয়মান সূর্য ও চরকা চিহ্ন শোভিত লোক-সেবক-সংঘের সাদা পতাকা। বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, ভজহরি মাহাত, চৈতন মাঝি, অরুণচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের পরিচালনায় মাদল, খোল, করতালসহ পর্যায়ক্রমে টুসুগান গাওয়া হয়—

(১) শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।।
(ইত্যাদি)

(২) আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তারে।
বাংলা ভাষা রে।।
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা ব'লে।
(ইত্যাদি)

টুসুগানের সঙ্গে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ রবীন্দ্র সঙ্গীতটি উদাত্ত-দরদী সুরে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়।

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে (৯/১০/৮৭) তেজস্বিনী লাবণ্যপ্রভা দেবী জানান : পদযাত্রার সময় বিভিন্ন মানুষের অ্যাতো ভালোবাসা পেয়েছি, সে কথা ভাবলে আজ চোখে জল আসে। পথে কত পুরনারী গরদের শাড়ি, বেনারসী শাড়ি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তোরণ বানিয়েছেন। পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে বরণ করেছেন।[১০]

প্রতি জেলার বিভিন্ন গ্রামের বহু মানুষ পদযাত্রীদের সরবত, শশা, আখকুচি দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন। বঙ্গ-সত্যাগ্রহ অভিযানের পদযাত্রার কর্মসূচী আগাম প্রচার করা হয়েছিল। তাই দুপুরে হাজারের ওপর সত্যাগ্রহী কোথায় খাবেন, বিকেলে কোথায় জনসভা হবে এবং রাতে আবার কোন্ জায়গায় বিশ্রাম হবে তার আগাম ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশের অসংখ্য মানুষ উৎসাহের সঙ্গে আমাদের সত্যাগ্রহের আদর্শকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভ্যর্থনা-আপ্যায়ন করতেন। অত্যন্ত খুশি মনে হাজারের বেশি নরনারীর খাওয়া-দাওয়ার আগাম বন্দোবস্ত করতেন এবং তা যথা সময়ে আমাদের জানিয়ে দিতেন।

পুরুলিয়া থেকে কলকাতা পৌঁছতে সত্যাগ্রহীদের পদযাত্রা একটানা ষোল দিন অব্যাহত ছিল। সত্যাগ্রহী দল পদব্রজে বাঁকুড়া শহর, বেলেতোড়, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান শহর, রসুলপুর, মেমারী, পাণ্ডুয়া, মগরা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, গোঁদলপাড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, হাওড়া পেরিয়ে ১৯৫৬, ৬মে রোববার বিকেলে কলকাতায় পৌঁছান এবং কলকাতা ময়দানে জনসভা করেন।[১১]

৭ই মে বিকেলে সত্যাগ্রহীরা অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোডে গ্রেপ্তার বরণ করেন।[১২] কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও আলিপুর স্পেশাল জেলে সত্যাগ্রহীদের রাখা হয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৬ সালের ৩রা মে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং বাঙলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বাতিল করেন। ঐ বছরই ১৬ই আগস্ট লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ-বিহার ভূমি-হস্তান্তর বিল সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। পুরুলিয়া সদরের ১৬টি থানা এবং পূর্ণিয়ার কিয়দংশ ১লা নভেম্বর, ১৯৫৬ থেকে বাঙলায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কার্যকরী সিদ্ধান্ত হয়।[১৩] এবং তা নিম্নরূপ—

থানা	আয়তন(ব[illegible]ল)	লোকসংখ্যা
ঝালদা	২২০	১১৫৩৯৫
জয়পুর	৮৯	৪৩৭৬৪
পুরুলিয়া	২১৬	১৫৬০২৪
বলরামপুর	১০৩	৫৫১৬৯
হুড়া	১৫২	৬২৬১২
আড়শা	১০২	৫৭৩০২

পুঞ্চা	২০১	৫৫৭৫৪
বাগমুণ্ডি	১৭২	৫১১৮৪
বরাবাজার	১৬০	৭৬৯৩৯
বান্দোয়ান	১৪২	৪০০৭৬
মানবাজার	২৫৭	১২০৬৯৯
রঘুনাথপুর	১৫১	১০৫৮১২
সাঁতুড়ি	৭০	৩৩৭৫১
নিতুরিয়া	৮০	৪৬৫৯০
কাশীপুর	১৭৩	৭৯৭৫২
পাড়া	১১৯	৬৮৩০১
১৬	২৪০৭	১১৬৯০৯৭

এছাড়া জাতীয় সড়কের পূর্বভাগে
কিষণগঞ্জ মহকুমা ও গোপালপুর
অঞ্চলের — ৬০০ [ব. মা.] (আনুমানিক)

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। ঐদিন 'মুক্তি'-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কবি নরেন্দ্র দেব ও কবিজায়া রাধারাণী দেবী একটি জেলার শুভ জন্মলগ্নে যে অভিনন্দন-কবিতা পাঠান, সে কবিতাটি 'মুক্তি' পত্রিকায় (১৭শ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা। সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত) অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ—

সুস্বাগতম

বহু মানে আজ মানভূমে মোরা
এই শুভদিনে নিলাম বরি',
ধন্য হলেন জননী আবার
হারানো তনয় বক্ষে ধরি।
জয়গৌরবে এসেছে ফিরিয়া
সন্তান তার আপন গেহে,
ছিন্ন অঙ্গ দেশমাতৃকা
দেখা দিল পুনঃ পূর্ণদেহে।
জানি, জানি যাহা রয়ে গেল বাকি
মাতৃভাষার ঐক্যতীরে
তোমাদের দৃঢ় সাধনার বলে
একদা তাহাও আসিব ফিরে।

অন্ত্যটীকা

১। বদরুদ্দীন উমর ঃ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ — নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা (১৯৮২) ১ পাতা।

২। Circular No. 701/5R-6-48 dt. 18, March, 1948.

৩। Circular of District Inspector of Schools, Manbhum under No. 700. IIG-5-48, Purulia, 8th March, 1948

৪। ধলভূমের বঙ্গভুক্তি ভাবনায় গঠিত হয়েছিল 'মুক্তি পরিষদ'। হিন্দী, ওড়িয়া, সাঁওতালী ভাষাভাষীর মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা সেখানে বেশী ছিল। তবু রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন ধলভূমের বঙ্গভুক্তির দাবি মানেন নি। দ্রষ্টব্য ঃ Report of the states Reorganisation Commission, Para. 667.

৫। 'টুসুর গানে মানভূম' পুস্তিকার কপি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৬। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভাষা-আন্দোলন ও টুসু-সত্যাগ্রহ দমনে বিহার সরকারের নানাবিধ নিপীড়ন চিত্র এবং টুসু-সত্যাগ্রহীদের সুপরিকল্পিত কর্মধারার দিগ্‌দর্শনকারী এগারটি বুলেটিন পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। তাছাড়া ১৯৫৪-১৯৫৬ 'মুক্তি' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

৭। Govt. of India, Home Affairs-এর Resolution No. 53/69/53- Public, dated 29th December, 1953 গঠিত হয়েছিল The States Reorganisation Commission. চেয়ারম্যান সৈয়দ ফলজ্ আলি। অন্যতম সদস্য-হৃদয়নাথ কুন্‌জ্রু। কমিশনের রিপোর্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫।

৮। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাব ছিল ঃ সংযুক্ত 'পূর্বপ্রদেশ'-এ বাংলা ও হিন্দী দুটিই সরকারি ভাষা থাকবে। বিধানসভা, ক্যাবিনেট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি করে থাকবে। হাইকোর্ট থাকবে দুটি।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিমলচন্দ্র সিংহ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেসীরা 'পূর্বপ্রদেশ' গঠন প্রস্তাব সমর্থন করেন নি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (প.বঙ্গ শাখা) এবং অন্যান্য বামপন্থী দল 'পূর্বপ্রদেশ'গঠন-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তুমুল জনমত গড়ে তোলেন।

৯। সত্যাগ্রহীরা ১০টি বাহিনী গড়েছিলেন। ৯টি দল নিয়ে গঠিত প্রতিবাহিনীতে ১০০ জন সত্যাগ্রহী। প্রতি বাহিনীতে ছিলেন একজন দলপতি।

১০। মহিলা সত্যাগ্রহীদের দলনেত্রী ছিলেন ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের মেয়ে বাসন্তী রায়। বর্ষীয়সী নেত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবী ছাড়াও ভামিনী, দামিনী, সারদা, পূর্ণিমা, যশোদা, লক্ষ্মী, চাঁপা প্রমুখ বেশ কয়েকজন অভিযাত্রিণী সত্যাগ্রহীদের দলে ছিলেন।

১১। কলকাতার অসংখ্য নরনারী সত্যাগ্রহীদের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। তাঁদের মধ্যে হেমন্তকুমার বসু, জ্যোতি বসু, মোহিত মৈত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বৈকালি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ধলভূমের বঙ্গভুক্তির দাবিতে বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী ও কিশোরীমোহন উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'মুক্তি পরিষদ'-এর ১৭৫জনের একটি পদযাত্রীদল ধলভূম থেকে কলকাতায় পৌঁছান ৫মে, ১৯৫৬। তাঁরা হাজরা পার্কে একটি জনসভা করেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সাতকড়ি রায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবী সেই জনসভায় ভাষণ দেন।

১২। ৯৬৫ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করেন।

১৩। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৪১৪৭ বর্গমাইল। সদর মহকুমায় ১০টি থানা এবং ৬টি ফাঁড়ি ছিল। সদর এবং ধানবাদ মহকুমার আয়তন ছিল যথাক্রমে ৩,৩৪৪ এবং ৮০৩ বর্গমাইল।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলার আয়তন ছিল ৪১১২ বর্গমাইল।

অথচ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির সময় তার আয়তন দাঁড়ায় ২৪০৭ বর্গমাইল।

চাষ, চন্দনকিয়ারী যুক্ত হয় ধানবাদের সঙ্গে। অন্যদিকে পটমদা, চান্ডিল ও ইচাগড় থানা যায় সিংভূমে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পান ও টুসুগান

আর্যীকরণধারায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রিক যে-কোন শুভ অনুষ্ঠানে সাধারণত হলুদ, সুপারি, পান, ধান, নারকেল ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। আর, এ সবই প্রাগার্য অস্ট্রিকভাষী, কৃষিজীবী আদি অস্ত্রালদের (Proto-Austroliod) অবদান। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার অর্ধেক আসে কৃষিকর্ম থেকে—ইত্যাকার সূক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, প্রাচীন বর্ণহিন্দুসমাজে কৃষিকর্ম অনাদরণীয় ছিল না। অথচ প্‌শিলুস্কি প্রমাণ করেছেন, 'লাঙল' শব্দটি অস্ট্রিকভাষা থেকে সংগৃহীত। সেকালে 'লাঙল' অর্থে চাষ-করার যন্ত্র এবং চাষ-করা দুই-ই বুঝাত।

কৃষিভাবনায় পানচাষের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। কারণ, ধানচাষকে সহজেই পানচাষে পরিণত করা যায় না। লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী সে চাষে চাষীর দিনক্ষণ অনুযায়ী শুদ্ধতা ও মেহনত স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করতে হয়। তবে পান শুধু মাঙ্গলিক পূজা-উপকরণ নয়, তাম্বুলপ্রিয়তা ভোগী জীবনেরও অনুপান! সংস্কৃত সাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজারাজড়া, বাদশাবেগম, নায়ক-নায়িকা থেকে সাধারণ সুখী গৃহস্থ, বিবাগী পুরুষ, এমন কি ধর্মজগতের বিখ্যাত অনেক সন্ত্‌-গুরুরাও তাম্বুলপ্রিয়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী নারীর বর্ণনাও পাওয়া যায়। একদা তাম্বুল-বিক্রেতা হিসাবে তাম্বুলী সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সামাজিক বা রাজকীয় সম্মানের অভিজ্ঞান হিসাবে পান-সম্প্রদান রীতি প্রচলিত।

শিশির রায়চৌধুরী তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বলেছেন, 'বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পর্যটক ইবনবতুতা (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ) কুতবুদ্দিন আইবক থেকে মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করেন। চীন, মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যের প্রায় ৭৭,৬৪০ মাইল ভ্রমণ করেন। ভারতীয়দের পান-চাষ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'পান গাছ দেখতে আঙুরলতার মতো। পানের লতাকে ধারণ করার জন্যে চাষীরা মাচান তৈরি করে দেন। আর তা সম্ভব না হলে নারকেল গাছের পাশেই চাষ করেন, যাতে পান-গাছ লতার মতো নারকেল গাছ বেয়ে উঠতে পারে।' তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন, 'পানের কোন ফল হয় না। কিন্তু এর যথেষ্ট পাতা হয়, আর তা দেখতে কালো রঙের বৈঁচি অর্থাৎ ব্ল্যাকবেরির পাতার মতো। এ সব পাতার ভিতরে হলদে পাতাই সবচেয়ে সেরা। এ থেকে প্রায় রোজই পাতা-তোলা হয়, আর তা ভারতীয়দের নিকট খুব প্রিয়।'[১]

ইতালির নিকোলাও মানুচি ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ বছর বাস করেন। তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ভারতীয় কায়দায় তিনি চুন, খয়ের, জর্দা, কিমাম

এবং অন্যান্য সুগন্ধি সহযোগে পান-খাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ভারতীয়দের পান-খাওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'সৌজন্য হিসাবে পরস্পরকে পান খাওয়ানোর রীতিটা খুবই সাধারণ ও নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। এমনকি রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহ ও গুণীজ্ঞানী যাঁরা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তাঁদেরও যাবার সময় পান খাইয়ে দিয়ে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতেন।'[২]

মধ্যযুগে কোন কোন প্রেমিক পুরুষ পছন্দমত তরুণীকে প্রেমিকা হিসাবে পাওয়ার জন্যে পূর্বরাগ-পর্যায়ে পান নিবেদন করত। ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, জনৈক পান দোকানী এক বিবাহিতা মহিলার ওপর পান ছুড়ে প্রেম-নিবেদন করতে গিয়ে কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করেছিল। পান আবার রাজপুতবীরদের লড়াইয়ের ইন্ধন যোগাত। একটি বীরা পানের ওপর বাজি রেখে তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।[৩]

টুসুগানেও পান প্রসঙ্গ অনেক সময় এসেছে, এবং তা জীবন রাগে সংরক্ত প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। মুখে পান হাতে চুন, জানবি তবে মানভূম—এ প্রবাদটি বৃহত্তর পুরুলিয়ায়, একদাখ্যাত মানভূম অঞ্চলে আজও প্রচলিত। যে-কোন সময় কোনকিছু খাবার খাওয়ার পর পান-খাওয়া শুধু হজমি ব্যাপার বা নেশা নয়, মানভূম অঞ্চলের প্রাকৃত জনজীবনের কোন-কোন অঞ্চলে এই পান দেওয়া-নেওয়া প্রণয়ের বিশেষ অনুপান হিসাবে ব্যবহৃত। পান বশীকরণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়—এ রকম লোক-বিশ্বাস এ অঞ্চলে প্রবল। তাই টুসুকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, যেন তুকতাকের ফাঁদে না যায়—

উ পাড়াতে যাইচ্ছ টুসু
ই-দিক উ-দিক ভাইল না।
দু পাশাড়ি সতীন আছে
পান দিলে পান খাইঅ না।।

একপাড়া থেকেঅন্যপাড়ায় গিয়ে টুসু যেন সেখানের প্রতিবেশিনী—যারা তুকতাকের দিক থেকে সতীনের মতো মন্দকারিণী, তাদের পান গ্রহণ না করে। এই সতর্কবাণী শুধুমাত্র কল্পনাপ্রসূত নয়, জনজীবনে প্রচলিত অভিসন্ধিমূলক বিশেষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত লোকভাবনা মাত্র।

নবীনা টুসু-ও পান দিয়ে তার প্রণয়ীকে বশে রাখতে চায়। কিন্তু দুরন্ত ঝড়বাদলের রাতে টুসুর ঘরে প্রণয়ীর প্রত্যাশিত উপস্থিতি হয় নি। তাই টুসুর আঁচলে বেঁধে-রাখা পান আঁচলেই থেকে গেছে, প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার সুযোগ মিলেনি—

কাইলের ঝড়বাদলে।
খিলি পান রইল সাজা টুসুর আঁচলে।।

বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত পান প্রসঙ্গে বলেছেন, "মুখচেনা, চেনা কিংবা মেলায় চোখের ইঙ্গিতে মন-জানাজানি হয়েছে এমন নরনারী যদি একে অন্যের পান গ্রহণ করে, তবে উভয় পক্ষই যে দেহমিলনে রাজি, একথা উভয়ের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঝাড়খন্ডে

পানের ভিতর মোহিনী দিয়ে বশীভূত করবার তুকতাকে লোকে বিশ্বাস করে। তাই অনিচ্ছুক যুবক যুবতী সহসা পান গ্রহণে রাজি হয় না।"[৫]

গ্রামের অনেক হাটে শাকসব্জি, কৃষি সরঞ্জাম থেকে নারীদের মনোরঞ্জনী প্রসাধনদ্রব্য এবং রূপোর নানাবিধ অলঙ্কার, চা-পান-মিষ্টি সবই পাওয়া যায়। হাটে-যাওয়া বা ফেরার পথে কোন উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতীকে যদি তার চেনা বা অল্পচেনা যুবক পান দেয়, তবে সেই ঘটনা যুবতীটির সঙ্গিনীদের কাছে রীতিমত কৌতূহলের ব্যাপার। তারা নিঃসংকোচে টুসুগানের মাধ্যমে রসসিক্ত প্রশ্ন রাখে—

তখে পানটা দিল কে বঠে?
ডুম্‌কাড়ির হাটে।

এই 'ডুম্‌কাড়ি হাট' টুসুকরা মেয়েদের অতি পরিচিত আঞ্চলিক চেতনায় অনেক সময় 'সেনাবনা হাট', 'কুশটাঁড় হাট' 'বড়টাঁড় হাট', প্রভৃতি হয়ে যায়।

ফলত, পান দেওয়া-নেওয়ায় শরীরী কামনায় ব্যঞ্জনা তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। তাই চোখে ভালো-লাগা অচেনাপ্রায় পুরুষের হাত থেকে পান নিয়ে সাহসিকা যৌবনবতী টুসুগানের মধ্য দিয়ে হাসিমুখে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়—

কী দিলি রে পান পাতে?
মন করে নাই ঘর ঘুরি যাইতে।

পান নিয়ে প্রণয়ের আলো-আঁধারি, মায়াবি জগৎ গড়ে ওঠে। তাই নির্জন মাঠে বা জনবহুল হাটে নাগরপুরুষ বা তার প্রণয়িনী একে অপরকে কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে গানের সুরে বলতে পারে—

ভাব কইরে কাইল কুথায় ছিলি?
তখে নাই দিব আর পান খিলি।

এখানেই প্রসঙ্গ ইতি হয় না। প্রেমগৌরবের সঙ্গে সাধারণত পুরুষাভিমান-মেশা রোমান্টিকতা—

পান খাবি ত পয়সা খুল্।
পান যে আমার গলাপ-গেঁদা ফুল।।

আবার কোন আত্মরূপমুগ্ধা, রহস্যময়ী নারী তার মনের মানুষের কাছে সহজে ধরা দেয় না। চলে মন নিয়ে খেলা। প্রণয়প্রার্থী তার কাছে বার বার আসে। কিন্তু সে হেঁয়ালি করে জানায়—

অ গ পান খাবে যদি।
মনে কইরে আইন্‌বে সনার জাঁতি।।

সে সময় অন্য পুরুষও সেই নারীর প্রণয়প্রার্থী হয়ে আসতে পারে; কিন্তু যৌবনমতী অবাঞ্ছিত প্রণয়ীকে সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। প্রেম-প্রত্যাখ্যানের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশও সহজে টুসুগানে ফুটে ওঠে—

পান খিলিটা ছাগলে খাইল্‌অ।
আমার তখেই দিবার মন ছিল।।

প্রেমপ্রত্যাখ্যাত পুরুষ ব্যর্থতায় বেদনায় দিশেহারা হয়ে গেয়ে ওঠে—

জয়দা দহয় কই দেখা দিলি?
আমি পান কিনে ভাইলে বুলি।।

ভ্রমরের মতো মনোবৃত্তি নিয়ে বিভিন্ন যৌবন-ফুলে মধুপান পিয়াসী প্রেমিক যদি নতুন প্রণয়িণীর কাছ থেকে পান-পাওয়ার সুযোগ পায়, তবে অনেক সময় পুরনো প্রেমিকাকে প্রত্যাখ্যান করে। তার কৌশল হলো অত্যধিক পরিমাণে চুন-মেশানো পান তাকে উপহার দেওয়া। বেশী পরিমাণ চুন-দেওয়া পান চিবিয়ে প্রথমা প্রেমিকার জিভ-মুখ পুড়ে যায়; প্রেমবঞ্চিতা নারী দলিতা ফণিনীর মতো ফুঁসে ওঠে—

ওরে ওরে কালছুঁড়া
পানে ক্যানে চুন দিলি?
অতদিনের ভালবাসা
আজ ক্যানে জবাব দিলি?

লতা যেমন সহকারশাখা বিচ্যুতা হয়ে অসহায়া হয়ে ওঠে, তেমনই বিরহবেদনার ইঙ্গিত পেয়ে গ্রাম্যনারী গালিব মধ্য দিয়ে মনের ক্ষোভ-আর্তি প্রকাশ করে। টুসুগানেও তার অনুরণন—

আমি নাই জানিছিলি বির্‌ (বিরহ) জ্বালা।
জানাই দিল ডাঙ্গুয়া খালভরা।

ব্যথাহত ও আশাহত চিত্তে নতুন প্রেমসম্পর্কের কথাও তার মনে উঁকি দিতে ভরসা পায় না। শুধু অসহায় বেদনার গুঞ্জরন ওঠে টুসুগানে—

পান দিলে পান খাব না।
ভালবাসার আশা কইর্‌ব না।।

পান-সম্পর্কিত টুসুগানে প্রণয়ভাবনা দেহসর্বস্ব যৌন-আবেদনে পর্যবসিত হলেও ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহার একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণীয়—"মনের মানুষ ছাড়া অন্যের কাছে অসঙ্কোচে আত্মনিবেদন এদের আচার শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র কুসুমের মতো এরাও 'অত শস্তা নয়'। টুসুগানে মন জানাজানি, মন চেনাচেনির যে বিচিত্র কৌশল, তার শেষ লক্ষ্য দেহ হলেও মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই তার পদযাত্রা। যারা প্রাপ্তিটাকেই পরম জ্ঞান ক'রে পথের সৌন্দর্যকে অবহেলা করে তারা আক্ষরিক অর্থেই অন্ধ।"[৩]

কোন কৃতিত্বের বিশেষ পুরস্কার বা কোন কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্যও পান দেওয়া হয়। তাই টুসুগানে শুনি—

ঐ টুসুটি গইড়েছে গো লারানগড়েব মিস্তিরি।
মিস্তিরিকে ইনাম দুব কাঁইচিকাটা পান খিলি।

গ্রাম্য ধাঁধাতেও পান প্রসঙ্গ আছে যথা--

স্ত্রী-পুরুষে খায় পান।
দুজনার বাইশ কান।।

[উত্তর ঃ রাবণ ও মন্দোদরী]

অন্ত্যটীকা

১। শিশির রায়চৌধুরী 'বিদেশীদের চোখে ভারতীয় পান' প্রবন্ধ। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ২০ জানুয়ারি, ১৯৮৫।

২। ঐ

৩। ঐ

৪। বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য ১৭৪ পাতা।

৫। চিত্তরঞ্জন লাহা ধলভূমের লোকগীতি (২য় খণ্ডঃ মকর), ৫২-৫৩ পাতা।

চতুর্দশ অধ্যায়

টুসুগানে কলকাতা

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট কলকাতা-নগরীর প্রতিষ্ঠা দিবস-স্মরণে একদা হয়েছে কলকাতার তিনশ' বছর-পূর্তির আয়োজন। কিন্তু জোব চার্ণক আসার আগেও সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর তিনখানি গ্রাম ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'কলিকাতার'-র উল্লেখ আছে—

ত্বরায় বাহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিত্রপুর, সালিখা সে এড়াইয়া যায়।।
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা।।

*　　　*　　　*

বালীঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন।।[১]

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবি '১৫৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন।'[২] (অর্থাৎ জোব চার্ণক আসার একশো বছর আগে।) টোডলমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাঙলাদেশ জরিপ শেষে 'ওয়াশিল-ই-জমা-তুমার' নামে এক তালিকা তৈরী করেন। আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২) তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সেই তালিকা সংযোজন করেছেন। টোডলমলের তালিকায় 'কলিকাতা'-র উল্লেখ আছে। ভ্যান ডেন ব্রুক ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এক মানচিত্র তৈরী করেন। ভ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্রে Collecatta ও তার কিছু দক্ষিণে আরও একটা জায়গা দেখানো হয়েছে, যেটার নাম লেখা আছে Calcuta. এটার অবস্থিতি ঠিক আজকের কালীঘাট যেখানে।'[৩]

'১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ মুখে চার্নক যখন সুতানুটি থেকে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন, তখন যে-সব ঘরবাড়িতে তিনি ও কোম্পানির অন্যান্য লোকজন বাস করতেন, ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ফিরে এসে দেখেন যে, সে-সব কিছুই নেই। সেগুলি হয় লুণ্ঠিত হয়েছে, আর তা নয়তো অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। মাত্র দু'চার খানা কুঁড়েঘর পড়ে আছে। সুতরাং বসবাসের জন্য ইংরেজদের আবাসস্থলের অভাব অনুভূত হল। বিশেষ করে সময়টা বর্ষাকাল ছিল বলে, তাদের দুর্দশার পরিসীমা রইল না। ... কলকাতার তখন জমিদার ছিল সাবর্ণ চৌধুরী (তাদের উপাধি ছিল মজুমদার)। লালদিঘির সামনেই ছিল শেঠ-বসাকদের ভদ্রাসন। আর তার কাছেই ছিল মজুমদারদের কাছারি বাড়ি। জোব চার্নক চেষ্টা করে এই কাছারি বাড়িটা জমিদারদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে ওখানেই স্থাপন করেন কোম্পানির প্রথম সেরেস্তা। ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটাই কোম্পানির অফিসঘর ছিল।'[৪]

ইংরেজ সরকার কলকাতাকে ভারতের রাজধানীর মর্যাদা প্রথমদিকে দিয়েছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে দিল্লিতে দরবার করেন। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। তবু ভারতের মুক্তি সংগ্রামে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বাঙলা তথা কলকাতার একটি বিশেষ স্থান আছে। 'রূপসী বাংলা'-র কবি জীবনানন্দ দাশ একদা স্বপ্ন দেখেছিলেন—'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'।[৫]

কলকাতা-প্রসঙ্গ কবিতায়-গানে-নাটকে-উপন্যাসে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। এখনও কারো কাছে কলকাতা 'আনন্দ নগরী'[৬] কারো কারো কাছে দুঃস্বপ্নের নগরী, আবার কারো কাছে 'স্মৃতির শহর'![৭] দেহতত্ত্বমূলক বাউলগানেও কলকাতা-প্রসঙ্গ এসেছে—

ওরে, মানব-দেহ কলকাতা কেতা চমৎকার।
ও ভাই, তুলনা নাই তার।।
ও ভাই, লাল দীঘির পানি বড় মিঠা যে শুনি
কেউ বলে নুন্‌চা লাগে, ঘর্মের হয় হানি।
ও পানি যে খেয়েছে সেই মজেছে, সেই হয়েছে ভবপার।
কলকাতার কেতা চমৎকার।।
কলকাতার বায়ান্ন বাজার ও তার তেপান্ন গলি।
মনের মানুষ খোঁজে আঁতিপাঁতি, কতই ঢলাঢলি।।
ও নামে সোনাগাছি, মানিকতলা, জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার।
কলকাতার কেতা চমৎকার।।

(ইত্যাদি)

আলো ঝলমল কলকাতা নগরী সম্পর্কে গ্রাম্য নারীদের অপার কৌতূহল। তাদের চোখে কলকাতা ধনী ও রূপবিলাসিনীদের জায়গা। সেই স্বপ্নের অলকাপুরীতে বাস করার স্বপ্ন গ্রাম্য ছড়ায় ফুটে ওঠে—

দালান গোড়ায় দূর্বা ঘাস।
কলকাতায় বাস বারোমাস।।
হায় রে মাঠের ময়না
এমন চাকুরে-স্বামী হয় না—
যে সকল কাজে দিয়ে ফাঁকি
দিবে শুধু গয়না।।

কলকাতা শিল্প নগরী। সেখানে মানুষ টাকা রোজগারের জন্য যায়। সেই ব্যবসায়িক ভাবনার ইঙ্গিত বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় প্রচলিত গ্রাম্য ছড়াগানে পাওয় যায়—

চাবি গো চাবি
কইল্‌কাতায় নাচতে যাবি?
একশ' টাকা বেতন পাবি।

টুসুগানেও কলকাতা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় যেতে হয়। মফঃস্বল নরনারীর চোখে 'ভোরের কুয়াশা-মাখা অলৌকিক হাওড়া-সেতুর শোভা'[৮] প্রথম বিস্ময় জানায়। তারপর পুণ্যতোয়া গঙ্গানদী, বহুতলা বাড়ি, চিড়িয়াখানা, দমদম বিমান-বন্দর প্রভৃতির সঙ্গে সাম্প্রতিক বিস্ময়—পাতাল রেল! অনেক সময় গ্রাম্য কিশোরী তার দাদার সঙ্গে প্রথম কলকাতা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। টুসুগানে তাই শোনা যায়—

চল্‌না দাদা কইল্‌কাতা যাব।
তলের ট্রেন-চালা দেইখে লিব।।
হাওড়া ব্রিজ, চিড়িয়াখানা সব কিছু দেইখে লিব।
পাতালে ট্রেন চলিছে পাক দিয়ে ঘুইরে লিব।।
দমদমের ঐ উড়্‌হা কলে কন্‌ দিকে চইলে যাব।
গঙ্গার জলে লৌকা চলে, লৌকাতে চাইপে লিব।।
লৌকা ধইরে সাঁতার দিয়ে গঙ্গানদী পার হব।
লোকে বলে তিরিশ তালা ঘর আছে—দেইখে লিব।।

কিংবা,

ভুঁইয়ের তলে রেল চালু হইল।
টুসু কইল্‌কাতা যাব চল।।
লুহার গাড়ি, লুহার চাকা ইঞ্জিনে টাইনে লিল।
ঢ্যাম্‌না সাঁপের মতন গাড়ি পাতালে ঢুইকে গেল।।
ধন্য ধন্য মহামান্য আবিষ্কারের নাম হইল।
দিনেও আঁধার রাতেও আঁধার বিজলি জ্বালাই ট্রেন গেল।।
কত মাটি কত পাথর সুঁইদ্‌ কাইটে ফেলে দিল।
জামশেদপুরের ঢালাই লুহা নাট দিয়ে টাইট দিল।।
কৃত্তিবাস তলে তলে কোথাইলে কোথায় গেল।
কইল্‌কাতার পাতালেতে পাক্‌ দিয়ে ঘুইরে লিল।।

[কৃত্তিবাস কর্মকার]

গ্রাম্য কিশোরীরা বোম্বাই, কটক, ঢাকা শহর মনে-মনে চলে যায় টুসুর গয়না-গড়ানোর জন্য; কিন্তু সেইসব গয়নার রঙ-পালিশ কলকাতাতেই করতে হবে—এ রকম অভিলাষ টুসুগানে শোনা যায়—

শখের খঁপা[১] বাঁইধে লিয়ে তাতে দিব বেলকঁড়ি[২]।
বোম্বাই যাইকে পার্শেল কইরে আইন্‌ব লো সনার চুড়ি।।
কটকে গড়াব গয়না ঢাকাতে গোট গড়াব।
কইল্‌কাতাকে রঙ করাইয়ে টুসুধনকে পরাব।।

[(১) খোঁপা (২) বেলকুঁড়ি।]

টুসুকে শুধু প্রসাধনপ্রিয় রমণী হিসাবে গড়তে গ্রাম্য মেয়েদের মন চায় না। তার পড়াশুনার দিকেও তাদের বিশেষ নজর। তাই মফঃস্বলে নয়, কলকাতায় গিয়ে তার বইখাতা বিশেষভাবে কেনার পরিকল্পনা টুসুগানে ধ্বনিত—

ধর্ গো ছাতা, যাব কইল্‌কাতা।
টুসুর আইনে দিব বইখাতা।।

আলোকোজ্জ্বল মহানগরী কলকাতায় টুসুর বিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে গ্রামীণ কিশোরীরা। কিন্তু বিয়ের পর টুসুকে সুদূর কলকাতায় পাঠাতেও তাদের মন সায় দেয় না, এবং টুসুও বুঝি সহজগভীর গ্রামীণ সম্পর্ক ছেড়ে কলকাতায় যেতে চায় না—

টুসু যাবেক শ্বশুরবাড়ি কইলকাতা শহরে।
আমাদের ছাইড়ে যাইতে লারে।।
উয়ার মন ক্যামন করে।।

তবু কলকাতায় টুসুর বিয়ে হয়। অঘ্রানের শেষে, যখন মাঠ থেকে ওঠে সোনার ধান, তখন শ্বশুর ঘরে-থাকা, কন্যাসমা টুসুর জন্য গ্রাম্য ললনাদের মন করে আনচান। তাই 'আঘন্ সাঁকরাতে' পৌষ পিঠে 'তত্ত্ব' নিয়ে টুসুকে তার কলকাতার শ্বশুরবাড়ি থেকে আনার স্বপ্ন দেখে গ্রাম্য কিশোরীরা—যারা ঐ বয়সে বুঝি সুগৃহিণী; কিংবা প্রতিটি কিশোরীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে যেন সুগৃহিণীবোধ—

টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে।
পিঠা কইরে আঘন্ সাঁক্‌রাতে।।
টুসু আমার একলা বাছা গেছে শ্বশুর ঘরেতে।
ধইয ধইর্‌তে লারি গো—পারি না আর থাকিতে।।
টুসুর বিহা দিয়েছি মা দূরন্ দেশ কইলকাতাতে।
একটি বছর পরে টুসু আইস্‌বে বাপের বাড়িতে।।

কলকাতাব কল্পিত শ্বশুরবাড়ি থেকে টুসু গ্রামের বাপের বাড়িতে যেন আসে। তখন তাকে ঘিবে যেন গ্রাম্য কিশোরীদের কলকাতা সম্পর্কে অবদমিত কৌতূহল শতমুখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তারা টুসুর মুখ থেকে কলকাতার আধুনিকা নারীদের প্রসাধনপ্রিয়তা, শাড়িগয়না ইত্যাদির খবর জানতে চায়। আবার টুসুগানের মাধ্যমে তার মজার মজার উত্তরও ফুটে ওঠে—

কইল্‌কাতা যে গেইছ্‌লে টুসু কার কতটা চুল আছে?
—চুলের কথা বইল্‌ব কি আর পিঠ ভাইঙে চুল পইড়েছে।।
কইল্‌কাতা যে গেইছ্‌লে টুসু কী কী শাড়ি উইঠেছে?
—বেনারসী-সিলিক্‌শাড়ি, তার উপর ছাপ আছে।।
কইল্‌কাতা যে গেইছ্‌লে টুসু কী কী গয়না উইঠেছে?
—ইলির-ঝিলির চুলের কাঁটা, হরেকরকম হার আছে।

কলকাতার অন্যান্য দর্শনীয় জিনিস সম্পর্কেও গ্রাম্য কিশোরীদের অদম্য কৌতূহল, এবং তার সম্ভাব্য উত্তর যুগপৎ টুসুগানে ধরা পড়ে—

কইল্‌কাতা যে গেইছ্‌লে টুসু কী-কী দেইখে আইলে গো?
—টুসু বলে—দেইখে আইলম্‌ সনার খাঁচায় বাঘ বইসে।।
কইল্‌কাতা যে গেইছ্‌লে টুসু কী কী সন্দেশ উইঠেছে?
—এড়াবেড়া ঝিল্‌পি-খাজা ফুলং তেলে ভাইজেছে।।

সম্ভবত, টুসুর কলকাতার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার সঙ্গিনী হতেও গ্রাম্য কিশোরীরা গররাজি নয়, পরন্তু কৌতূহলী। অথচ শহরে ট্রাফিক পুলিশকে উঁচু পাটাতনে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক-কন্ট্রোল করতে দেখে গ্রাম্য কিশোরীদের মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হয়; তবু মনে জোর সাহস এনে তারা যেন দাপটের সঙ্গে বলতে চায়—

উপরে পাটা নাম্‌হয় পাটা তার ভিতরে দারগা।
ও দারগা পথ ছাইড়ে দাও টুসু যাবেক কইল্‌কাতা।।

আলোকনগরী কলকাতার আধুনিকতাকে গ্রাম্য কিশোরীরা বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভালো চোখে নিতে পারে নি; তাই শহুরে নারীদের সাজসজ্জার মধ্যে তারা খুঁজে পায় বে-আব্রুপনা। ফলত টুসুগানেও ধ্বনিত হয় খরশান ব্যঙ্গ—

কইল্‌কাতায় দেইখে আইলম্‌ হরেক রকম ঝাড়কদম।
ছঁড়াগুলান তাকায় ক্যামন, ছুঁড়ির গায়ে বেলাউজ কম।।

কলকাতার পোশাকী জীবনযাত্রা, যার অন্য নাম আধুনিকতা এবং সপ্রতিভতা (স্মার্টনেস), তাকে গ্রামের কিশোরীরা ভালো চোখে নিতে পারে নি। কলকাতার ফুসফুস যেন গড়ের মাঠ; সেখানে বৈকালি বা সান্ধ্য পরিবেশে শহুরে অনেক তরুণী তাদের প্রেমাস্পদের নিবিড় সান্নিধ্যে মনের কিংবা শরীরের উত্তাপ অনুভব করে। সে দৃশ্য গ্রামের কিশোরীদেরও অজানা নয়। তাই টুসুগানে ক্ষুব্ধ অথচ মজার প্রতিকার বাসনা শোনা যায়--

দশটাকার বিরিকলাই গড়ের মাঠে ছড়াব।
কইল্‌কাতার মিঞা-বিবির তেরি মেরি ছাড়াব।।

অর্থাৎ, গড়ের মাঠে বিরিকলাই (বিউলি ডাল) ছড়িয়ে চাষ করা হলে, সেখানে স্থানাভাবে তরুণতরুণীরা বসে আর সান্ধ্যআড্ডা দিতে পারবে না। ফলে তাদের অশালীন মেলামেশা সহজেই বন্ধ হয়ে যাবে।

তবু গ্রামীণ কিশোরীরা কলকাতার চাকচিক্য এবং তরঙ্গিত বহতা জীবনকে গভীর গোপনভাবে কামনা করে। তাই গ্রাম্য প্রসাধনরীতি মাঝেমধ্যে তাদের মনে বুঝি ধরে না—

বাঁকুড়ার আয়না-চিরুণ, কইল্‌কাতার ফিতা।
অতি যতন কইরে বাঁইধেছি মাথা
তা ও যে বাঁকা সিঁথা।।

আবার অনেক অবাঙালী, বিত্তবান কলকাতাবাসী খরাপ্রবণ সীমান্ত বাঙলার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অর্থাভাবের সুযোগ নিয়ে, বৃদ্ধবয়সেও সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে যায়। সেই কলকাতা জীবন—গ্রাম থেকে আসা নারী হৃদয়ের কাছে বেদনাপূর্ণ গ্লানির বিষয়—

অ্যাত টাকা লিলি বাবা-- দিলি বুঢ়া বরে।
বুঢ়ার সঙ্গে চইল্‌তে লারি কইল্‌কাতা শহরে।।

তবু কলকাতা গ্রামের কিশোরীদের রঙিন স্বপ্নের হাতছানি দেয়। তাই স্বপ্নাভিসার চিত্র টুসুগানে সহজেই প্রতিবিম্বিত—

আঁচিলে-পাঁচিলে পদ্ম, পদ্ম বই আঁব ফুটে না।
টুসুর হাতে জড়া পদ্ম ভমর বই আর বসে না।।
ভমর আইল গুনগুনায়ে, টুসু গো তুই ফুল-পাতা।
এমন দেখে ফুল-পাতাবি চইলে যাবি কইল্‌কাতা।।

পদ্ম এখানে শোভা আর প্রেমের প্রতীক। কিশোরীর ভালবাসার চোখে শুধু সরোবরে নয়, আঁচিল-পাঁচিলের সর্বত্রই পদ্মের প্রকাশ বা বিকাশ। অপরূপা সুন্দরী টুসুর হাত দুটিও পদ্মের মতো শোভন-কোমল; কিংবা তার দু'হাতে লীলাকমল! হৃদয়পদ্ম বিকশিত হলেই বুঝি শোনা যায় প্রেমের গুঞ্জরন। আর তাতে যেন 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' ইত্যাকার রাবীন্দ্রিক গীতিব্যঞ্জনা! প্রাণ জাগলেই আসে গান, আর ঘটে আত্মার বা মনের প্রসারতা। গ্রামীণ মেয়েরা প্রসারিত মনের সৌরভে পাতায় 'ফুল'। সেই ফুল-পাতানো ভাবনা নিয়ে টুসুকেও কিশোরীরা আন্তরিক পরামর্শ দেয়--'এমন দেখে ফুল-পাতাবি চইলে যাবি কইল্‌কাতা।'

ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুৎ সন্নিপাতে কালিদাসের মেঘকে দূত নয়, কালো হরিণ চোখের মতো কালো ভ্রমরকে প্রাণের প্রিয় দূত হিসাবে কল্পনা ক'রে গ্রাম্য কিশোরীদের কলকাতার দিকে স্বপ্নাভিসার!

অন্ত্যটীকা

১। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ চণ্ডী বসুমতী প্রা. লি. কলকাতা - ১২, ১৫৬ পাতা।

২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) ১৬৪ পাতা।

৩। অতুল সুর কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স, ২য় সংস্করণ (১৯৮৪) ১৩পাতা।

৪। তদেব ১৮ পাতা।

৫। জীবনানন্দ দাশ 'সুচেতনা' কবিতা, 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থ। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (১ম খণ্ড) বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৩ পাতা।

৬। দোমনিক লাপিয়ের The City of Joy বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ ঃ 'আনন্দ নগরী' এম. সি. সরকার অ্যান্ড কোং কলকাতা।

৭। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'স্মৃতির শহর' কাব্যগ্রন্থ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৮। শান্তি সিংহ 'মাটিতে পা রেখে' কাব্যগ্রন্থ (১৯৮২) প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা- ১৭ 'কবিতা' ৪৪ পাতা।

৯। 'ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ।' কালিদাস পূর্বমেঘ ৫ নং শ্লোক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

টুসুগানের মূল্যায়ন

সজীব প্রাণচাঞ্চল্য লোকগীতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। পরিবর্তমান যুগ ও সমাজে তা জীর্ণ হয় না। লোক-গীতির কালোত্তীর্ণতা প্রসঙ্গে বলা যায়—'Indeed, a floksong is neither new nor old; it is like a forest tree with roots deeply buried in the past but which continuously puts forth new branches, new leaves, new fruits.'[১]

সব গানের মধ্যেই মাত্রাভেদে কাব্যগুণ বা চিত্তচমৎকারিত্বের উপাদান থাকে। অনেক অকবির হাতে শিল্পভাবনাযুক্ত উপকরণ নিকৃষ্ট রচনার জন্ম দেয়, অথচ শিল্পবোধযুক্ত সৎ কবির হাতে তথাকথিত অতি সাধারণ উপকরণও সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টের সেই বিখ্যাত মন্তব্য মনে পড়ে—'Bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something better.'[২]

টুসুগান লোক-গীতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তার মধ্যে বহুস্থানে অ-সাধারণ কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত রোমান্টিক গানে আছে—[৩]

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল—জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।।
(ইত্যাদি)

উপরিউক্ত কাব্যাংশ বা গীতি-অংশের প্রথম পংক্তিতে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে'-র অনুরূপ গুঞ্জরন ধ্বনি টুসুগানেও শোনা যায়—

ভ্রমর আইল গুন্‌গুনায়ে টুসু লো তুই ফুল-পাতা।
এমন দেইখে ফুল-পাতাবি চইলে যাবি কইল্‌কাতা।।

ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুৎ সন্নিপাত মেঘকে দূত নয়, ভ্রমরকে 'ফুল' অর্থাৎ বন্ধু হিসাবে আত্মার আপন ক'রে, তারই সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার স্বপ্নাভিসার!

কিংবা,

আইল রে গুনগুইনা মাছি দখিন দিকের হাওয়াতে।
উড়াইল সনার পাল্‌খি লিয়ে গেল টুসুকে।।

দখিনা পবনে ঘরে শোনা যায় মাছির (মৌমাছির?) গুনগুন ধ্বনি। এই টুসুগানটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আছে চমৎকার fantasy, অর্থাৎ অ-সাধারণ, আজগবি কল্পনার চিত্ত চমৎকারিত্ব—দখিনা বাতাসে অপরূপা টুসুসমেত সোনার পালকিতে ভেসে-যাওয়া কোন্ সুদূর স্বপ্নের দেশে!

চাঁদকে নিয়ে অনেক কবি-কল্পনা আজ বাসি, কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি—'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি'-র ক্ষুধাজর্জর, ভোগলাঞ্ছিত চিত্রকল্পের অনুরূপ না-হোক, একটু কাব্যময়তাযুক্ত চিত্রকল্প টুসুগানেও পাওয়া যায়; যা সম্ভবত অনেক বিদ্যাভিমানী তথা গুণীরসিক ব্যক্তিরও অজানা। তা হল—

লইতন পইখরের আড়ায় চাঁদে লাগে কদ্‌মা।
হাম্‌দের টুসুর বিহা দিব ঝারিঝম্পির বাজ্‌না।।

পৌষালি হিমেল পূর্ণিমা রাতে দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লায় নতুন পুকুরের মাথায় দুধেল জ্যোৎস্না-ঝরানো গোল চাঁদ লোকায়ত কবি ভাবনায় যেন বর্ধমান জেলার মানকরের বড়ো আকারের কদ্‌মা (কদমের আকৃতি বিশিষ্ট চিনির কড়াপাকের মিষ্টি)! চাঁদকে বড় কদ্‌মার সঙ্গে তুলনা করায় অনন্য সাধারণ কাব্যচমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

'খেয়া' কাব্যেব 'দিঘি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'গভীর ঘন কালো' শীতল-অতল জলরাশির মাঝে ডুব দেওয়ার ব্যঞ্জনাময় সুখানুভবের কথা বলেছেন—

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
শেওলা-পিছোল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি ক'রে,
ডুবে যাওয়ার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভ'রে।[৪]

মরমিয়া দৃষ্টিতে 'গভীর ঘন কালো শীতল জলরাশি' মাঝি 'ডুবে যাওয়ার সুখে' যে রহস্য ঘন জীবনরস বা রূপবৈচিত্র্য আছে, তারই অনুরূপ চিত্র টুসুগানেও বিরল নয়। রোদ-ঝলসানো, কৃষ্ণবর্ণের কোন প্রেমিক পুরুষের গভীরগোপন, অগাধ ভালবাসা যেন 'গভীর ঘন কালো শীতল জলরাশি'। আর সেই অতল জলের দুর্নিবার আকর্ষণে অবগাহন স্নানে কিংবা জলকেলিতে নেমেছে তারই প্রণয়রাগমুগ্ধা কোন উচ্ছলা তরুণী। তখন তার প্রেমাভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যরূপ যেন টুসুগানে ফুটে ওঠে—

কাল দেইখে নাইম্‌লম্ জলে
জল হইল মোর একগলা।

কোথায় আছ গুণের বঁধু
তুলে ধর্‌হ এই বেলা।।

কৃষ্ণবর্ণ তরুণের ফর্সা সুন্দরী বৌ কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনেও দেখা যায়। সেই অপ্রাপণীয়কে পাওয়ার আনন্দে রূপমুগ্ধ প্রেমিক চিত্তের আনন্দঘন সুখানুভূতি টুসুগানে সহজ প্রাণবন্ত চিত্রকল্পে ধরা পড়ে—

টাং খিটাখিটি
অ তুই আঁধার-ঘরে জুন্‌পুকিটি। (জোনাকি)

কৃষ্ণবর্ণ প্রেমিক যেন আঁধার ঘর। আর তার সুন্দরী, দীপ্তিময়ী বৌ যেন অন্ধকারের বুকে রোমান্টিক-আলো-জ্বলা জোনাকি! গ্রামীণ ভোগবাদী উপমায় ভালবাসা অনেক সময়ই 'কাতলা মাছের পাতলা তরকারি'-র মতো স্মৃতিসুখময়ী। প্রেমিকের কল্পনায় তাই জাগে—

কাতলা মাছের পাতলা তরকারি।
তখে ভুইল্‌তে যে লো নাই পারি।।

কিংবা,

ভালোবাসা বেলকলির কাঁটা।
মাথায় রাখবি লো গুঁজে দুটা।।

অথবা,

ঝিঙ্গাফুলে জুন্‌পুকির আলো।
আমি তুইল্‌ব লো কবে বলো।।

চণ্ডীদাসের রাধা তীব্র গভীর বিরহে কাতরা হয়ে বলেছেন—

যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া
এমন করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে!

চণ্ডীদাসের রাধার হৃদয়-নিঙড়ানো প্রেমার্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমনি হউক সে!"—এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। সত সহস্র অভিশাপের পরিবর্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, 'আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে।' ইহাতে বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরাণ কেমন করিতেছে।"[৫] অথবা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, "প্রকাশই কবিত্ব।"[৬] তাই মনে হতে পারে, চণ্ডীদাসের রাধিকার গভীর প্রেমার্তির উপযুক্ত চিত্রময়ী বর্ণনার প্রকাশ থেকে আমরা বঞ্চিত। যদিও রসিক বলবেন—

'অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে;
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।'[৭]

অথচ টুসুগানে শ্বশুরঘরে-থাকা কিশোরী বধূর পিত্রালয়ের প্রতি, বিশেষত মায়ের জন্য কী রকম মন ব্যাকুল হয়, তার উজ্জ্বল চিত্রকল্প সহজভাবে পরিস্ফুট—

ও মা, আমার মন ক্যামন করে।
যেন শোল মাছে উফাল মারে।।

কিংবা

ও মা, আমার মন ক্যামন করে।
যেন পস্তু কাঁদে গোল আলুর তরে।।

গভীব জলাশয়ে শোল মাছের উল্লম্ফনে যে তীব্র জলাবর্ত সৃষ্টি হয়, কিংবা আলু-পোস্ত তরকারিতে (যা দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার মানুষের রসনায় রাজকীয় আহার্যরূপে ধার্য!) আলুর বিরহে পোস্তর (আঞ্চলিক উচ্চারণ 'পস্তু') অন্তর্বেদন উপমায় শ্বশুরালয়ে থাকা কিশোরী বধূর বাপের বাড়ির জন্য, বিশেষত মায়ের জন্য মন-উচাটনের কথা সহজগভীর কাব্যব্যঞ্জনায় চিত্রিত। উপমেয়কে প্রবল সাদৃশ্যবশত যদি উপমান বলে সংশয় হয়, তবে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে চিত্তচমৎকারিত্বের সহজ প্রকাশ দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

কামনা-বাসনা-সুখ-দুঃখ-ঈর্ষা-অভিমান মিশ্রিত লোকায়ত জীবনে সাধারণ নরনারীর হৃদয়-নির্ঝরিণীর সাঙ্গীতিক রূপ হল লোক-গীতি। সেখানে মননশীলতার এক বিশেষ ধারা ধাঁধার মধ্যে ফুটে ওঠে। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণজাত জীবন-অভিজ্ঞতাব বুদ্ধি দীপ্ত, কৌতুকরসমিশ্রিত অতি সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপই হল ধাঁধা (Riddle)। ধাঁধা রচয়িতার নাম-পরিচয় অপরিজ্ঞাত, অনির্ণেয়। কারন, তা হল কোন বিশেষ অঞ্চলের সামগ্রিক জনমানসের কিংবা গোষ্ঠীচেতনার ফসল।

টুসুগানেও লোক-ভাবনা সমৃদ্ধ মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত তথা কৌতুকরসমিশ্রিত হেঁয়ালি-ধাঁধার নিদর্শন অপ্রতুল নয়। সেখানেও অতি-সংক্ষিপ্ত পরিসরে চিত্তচমৎকারিত্বের উপাদান যথেষ্ট—

ক) বাঁকুড়াতে দেইখে আইলম্ ব্যাঙে করে কাছারি।
সাপ দেইখে ব্যাঙ পালায় গেল, রইল পইড়ে কাছারি।।

খ) পুরুল্যাতে দেইখে আইলম্ কাওয়াতে গান জুইড়েছে।
বাঁদরে খঞ্জনি বাজায় ঘুঘু-প্যাঁচায় নাচ কইরে।।

গ) বাঁকুড়াতে দেইখে আইলম্ শিকড়ে আম ফইলেছে।
দুর্গার বিটি সরস্বতী এক হাতে চুল বাঁইধেছে।।

ঘ) পুরুল্যাতে দেইখে আইলম্ ব্যাঙের হাটে কাছারি।
সাপ দেইখে ব্যাঙ পালায় গেল্হ্ পইড়ে রইল কাছারি।।

ঙ) বাঁকুড়াতে দেইখে আইলম্ সনার পিঁড়ায় বাঘ বইসে।
সে বাঘে কি মানুষ খায় মা, বইসে বইসে রঙ দ্যাখে।।

চ) পুরুল্যাতে দেইখে আইলম্ দালানে ধান পাইকেছে।
কন্ চাষাতে চাষ কইরেছে শিয়ালে ধান কাইটেছে।।

।। দুই ।।

টুসুগান ব্যক্তিমুখিনতায় লোক-কবির সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সেখানেও সম্প্রদায়গত সৃষ্টিভাবনা (Communal growth) অস্বীকার করা যায় না। তাই ব্যক্তিগত সাঙ্গীতিক ভাবনা আঞ্চলিক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুখদুঃখের আবেগে স্পন্দিত বা ছন্দিত হয়। লোকায়ত জীবনে কিশোরীরা স্বরলিপির খাতা বা বই খুলে টুসুগান শেখে না, বা গায় না। টুসুগানের কথা ও সুর-তাল-লয় শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর। ফলত, একই টুসুগানের কথা বিস্তীর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্লায় অঞ্চলভেদে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, যদিও তার প্রলম্বিত বিশেষ সুর মোটামুটি একইরকম—এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। তাই যে টুসুগান বাঁকুড়ায় শুনেছি, সেই টুসুগান কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপে অন্য জেলায় শোনার সুযোগ হয়েছে।[৮] যথা—

ক) আমার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝন্ঝন্ করে গো।
উয়ার টুসু হ্যাংলা মাগী
আঁচল পাইতে মাগে গো।।

[বাঁকুড়া]

খ) আমার টুসু মুড়ি ভাজে
শাঁখা ঝন্ঝন্ করে।
তোদের টুসু লোভী টুসু
হাত বাড়ায়ে মাগে লো।
ছি ছি লাজ লাগে না
ছোট মুখে বড় কথা সাজে না।

[বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর]

গ) আমার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝন্‌ঝন্ করে গ।
উহার টুসু ছঁচ্‌রা মাগী
আঁচল পাইতে মাগে গ।
ছি ছি লাজে মরি
হাম্‌রা হইলে লিতম গলাম দড়ি।

[পুরুলিয়া]

বৃহৎ আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে লোক-সংস্কৃতি প্রবাহের বিশেষ ধারা যে টুসুগান, সেখানে খণ্ড ভৌগোলিক চেতনা আরোপ করা (যথা ঃ বাঁকুড়ার টুসুগান, মানভূমের টুসুগান, ধলভূমের টুসুগান ইত্যাদি) যেমন পূর্ণাঙ্গরূপ পরিচায়ক নয়, তেমনই অঞ্চলভেদে একই টুসুগান পরিবর্তিত হয়েছে বা ভেঙেছে—সে দিকটিও লক্ষণীয়।

টুসুগান ভাঙার বা রূপবৈচিত্র্যের পিছনে তিনটি প্রধান কারণ ক্রিয়াশীল ঃ (ক) স্মৃতিশক্তির অগভীরতা, অশিক্ষিত পটুত্বের গ্রহণ-বর্জন-কৌশলহেতু অঞ্চলভেদে লোক-সঙ্গীতের রূপান্তর। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, 'A floksong evolves gradually as it passes through the mind of different men and different generations.'[৯] (খ) গোষ্ঠী-চেতনাধর্মী টুসুগানে ব্যক্তিসচেতনতার মোহ বা দুর্বলতায় বিশেষ বিশেষ গানের সাঙ্গীতিক অবয়বে কবিত্ব শক্তিধারী ব্যক্তিচেতনার অভিনব প্রক্ষেপণ। তবু এ ব্যাপারে আমরা যেন মনে রাখি—'A floksong is neither new nor old because it is an individual flowering on a common stem.'[১০] (গ) দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়—যার নাম আধুনিকতা। আধুনিক জীবনের প্রেম ও প্রেমহীনতা, সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন, শোষণ-বঞ্চনার পাশাপাশি বিলাস-উপকরণের প্রাচুর্য—শুধু শহরে নয়, গ্রামজীবনেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছে বা আনছে। তাই সহজেই বলা যায়—'A folksong is always grafting the new on to the old.'[১১]

প্রথম সূত্রের উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে একই টুসুগান [আমাদের টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্‌ঝন্ করে] বাঁকুড়া, মেদিনীপুব বা পুরুলিয়ার অঞ্চলভেদে কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটেছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূত্রের উদাহরণ হিসাবে আপাতত দুটি টুসুগান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

ক) লাইলন শাড়ি খুঁটে খুঁটখাড়ি।
ও তোর দুই হাতে ঝলকে চুড়ি।।
বুকে লিলিস টাইট বডিস, হাতেতে লেডিস ঘড়ি।
সিনেমাতে গেলিস যখন, করলিস লো দৌড়াদড়ি।।
রূপ করে তোর ঝলমল, ঝলকে কানের মাকুড়ি।
হিরোইন দেখালি ভাল, লিলি লো লাইলন শাড়ি।

ধীরেন বলে ড্রেস করিলে যাবি লো শ্বশুর বাড়ি।
হিরোইন দেখাবি ভাল, লিবি লো হাতে ঘড়ি।

খ) তোমার মিষ্টি মুখের চাহনি।
আমায় ডাকে সদাই হাতছানি।।
সজ্জিত টেবিলে ওগো তুমি যে মোর ফুলদানি।
ধেয়ানে মগনা রাখো তুমিই সৌরভদানি।।
তুমি ছন্দা মৃদুগন্ধা তুমি মনোমোহিনী।
তুমি সরল, আরো ভালো, তুমি যে অভিমানিনী।।
কত না সোহাগে হৃদে বস গো আহ্লাদিনী।
মধু ভরা বিম্বাধরে নিত্য দেয় চুমাখানি।।

উদ্ধৃত দুটি গান পুরুলিয়ার লোক-কবি ধীরেন মাহাত ও নিত্যানন্দ মাহাতর রচনা। এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে—টুসুগানে দেহচেতনার পাশে এসে গেছে আধুনিক নাইলন শাড়ি, বক্ষবন্ধনী, সিনেমার অভিনেত্রীর কায়দায় রূপচর্চা; লোকায়ত চেতনায় সফিস্‌টিকেশনের (Sophistication) আরও প্রমাণ—'সজ্জিত টেবিলে ওগো তুমি যে মোর ফুলদানি' উপমা।

লোকায়ত জীবনে টুসু-করা কিশোরীরা টুসুকে শুধু জননীরূপে, দেবীরূপে দেখতেই অভ্যস্ত নয়, টুসুকে সাধারণ মানবীরূপেও তারা দেখে থাকে। তাই একদল নারী অন্যদলের টুসুকে 'হ্যাংলা মাগী', 'ছুঁচরা মাগী' ইত্যাদি ভাষায় গালি দিতেও কসুর করে না। টুসুগানে নারীসুলভ গালিগালাজ বা কটূক্তির চূড়ান্তরূপ—টুসুর মৃত্যুকামনা। যথা—

চাল ভিজাব রসে রসে
মুড়ি ভাইজ্‌ব রগড়ে।
উয়ার টুসু মইরে গেলে
কাঠ চালাব সগড়ে।।

এ সব বাস্তব দিক পর্যালোচনা করে চিত্তরঞ্জন লাহা যথার্থই বলেছেন, 'টুসু যে দেবী নয় তার আর একটি বড় প্রমাণ অপরের টুসুর প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ ও কটূক্তিগুলি। টুসু দেবী হলে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না''[১২] টুসু-ভাসানের সময়ও দেখা যায়, একাধিক টুসুর মধ্যে কোন কোন নারীদল যৌবন লাস্যের বিচারে তাদের টুসুকে শ্রেষ্ঠ ভাবে, কারণ সেই টুসু 'ছলকদারী' অর্থাৎ ছলনাময়ী—যার অপাঙ্গে অশ্রুকণা, নাকি পুষ্পধনুর অমোঘ ইঙ্গিত —

তিনটি টুসু জলে যায় মা
কন টুসুটি ভাল গো।
মাঝের টুসু ছলকদারী
জলে আঁখি ঠারে গো।।

এইসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, টুসু এখন আর নিছক কৃষিলক্ষ্মীর প্রতীক নয়, তার মধ্যে মানবিক আবেদন ক্রমশ প্রবলতর।

আধুনিক কোন কোন লোক-সঙ্গীতে টুসু রক্তমাংসের যৌবনবতী নারী, তার মধ্যেও কামনা বাসনা, ঈর্ষা অভিমান সহজেই খেলা করে। এ প্রসঙ্গে সুভাষ চক্রবর্ত্তীর নাম প্রথমেই করা যায়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের যে মাসে ইনরেকো (INRECO) থেকে তাঁরই কথা ও সুরে E. P. Record-এ চারটি টুসুগান বের হয়, এবং জনমানসে গানগুলি বিতর্ক জাগায়। গান চারটি হল—

(১) পুরুলিয়ার বাজার মোড়ে
কত টুসু আনাগোনা
করে গো
কতক টুসু রাধার পারা গো
(আবার) কতক টুসু প্যাঁচা গো।।
(ইত্যাদি)

(২) টুসু ভাসুর আইলে যাবেক নাই
দেওড়া আইলে যাবেক নাই
যাবেক মরদ ঘরে আইলে গো।।

শ্বশুর ঘরে যাঁইয়ে টুসু
খায় মিঠা পান।
রাইগে গেইলে ক্যাঁথা ছিঁড়ে
করে খান খান।।
টুসু-ক শাউড়িতে পারে নাই
শ্বশুর ত পারে নাই
পারে মরদ ঘরে আইলে গো।।
(ইত্যাদি)

(৩) মকর পরবে মদনা ছঁড়া
ধাম্সা বাজাইছে।
(আর) টুসু ছুঁড়ি ধাম্সার বোলে
ক্যামন দ্যাখ লাচিছে।।

মকরদিনে বিহান কালে
গ্যাল নদী ধার
হইলদ্ রাঙা মুড়ি খাঁইয়ে
দ্যাখ ঠঁটের কি বাহার।

রাঙা ঠঁটে রাঙা মুড়ি
ক্যামন দ্যাখ মানাইছে।।
(ইত্যাদি)

(৪) যা-যা টুসু যা-যা লো
দ্যাখা গ্যাছে তুর পিরীত লো।
তুর পিরীতে মন মানে না
তুর পিরীতে আগুন জ্বলে না।।
(ইত্যাদি)

উপরিউক্ত আধুনিক লোক-গীতির প্রচারে একশ্রেণীর মানুষ ক্ষুব্ধ হন। টুসুর দেবীত্বের অবমাননা করা হয়েছে—এই জেহাদ তুলে গানগুলির প্রচার আইনানুগ পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ করতে তৎপর হন। তখন উক্ত বিতর্কের অন্তর্নিহিত সত্যতা বিচারের প্রাথমিক পর্যায়ে সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ করা হলে, তিনি ৯/১২/৮২ তারিখে সুদীর্ঘ পত্রে, আত্মসমর্থনে যে-সব কথা জানান, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"...গতবারের Record নিয়ে দৈনিক কাগজগুলিতে খুব লেখালেখি হয়েছে, সেটা আমারও চোখে পড়েছে। তবে যাঁরা লেখালেখি করেছিলেন, তাঁরা পরিষ্কার একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিলেন। কেন না Folk tune collection-এর কাজে আমি যখন গ্রামেগঞ্জে ঘুরেছি, তখন দেখেছি 'টুসু' আসলে দেবীর চেয়ে অনেকবেশী মানবী। 'টুসু' আসলে ফসল কেটে ঘরে আনার যে আনন্দ তারই প্রতীক। সেই কারণে 'টুসু'-কে কেউ কেউ কন্যা, কেউ সই, কেউ প্রিয়া, আবার কেউ বা দেখেন মাতৃস্বরূপা। টুসুগান collection-এর সময় আমার Tape Recorder-এ যে-গান ধরা আছে, তা হল— সমসাময়িক যন্ত্রণা, বঞ্চনা, প্রেম, ভালোবাসা, বিরহ, অভাব—এ সবের সুস্পষ্ট বাস্তবচিত্রের লোকগাথা। তাই আমি আমার গানে যে 'ছুঁড়ি' শব্দটি প্রয়োগ করেছি, সেটি মোটেই অশালীন নয়। এখানে 'ছুঁড়ি' শব্দের অর্থ হল—ছুক্‌রী বা যুবতী। অর্থাৎ আমার গানে 'ছুঁড়ি' প্রয়োগ করে টুসুকে যুবতী বা ছুক্‌রী বোঝাতে চেয়েছি। ..... তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত হানার জন্যে সঙ্গীতজগতে প্রবেশ করি নি। ....পশ্চিমবাঙ্‌লার প্রায় সব ক'টি জেলা থেকেই সাধ্যমত Folk tune collection করেছি, এবং তার কাজ আজও চলছে। অবলুপ্ত, পড়ে থাকা, হারিয়ে যাওয়া Disco গানের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ লোক-গান বা লোক-সুরগুলিকে যতদিন সর্বসমক্ষে তুলে না ধরছি, ততদিন শান্তি নেই, আনন্দ নেই।

... সুতরাং কে বা কারা আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, সেদিকে আমার মোটেই নজর নেই। আমি জানি, আমাকে কিছু করতে হবে; আর কিছু করতে গলেই বাধা পেতে হবে। তবে তার জন্যে Inreco Record Co.-কে আমি অজস্র ধন্যবাদ জানাই, কেন

না তারা আমার ইচ্ছামত Record প্রকাশে আগ্রহী। যদিও বাজারে আমার রেকর্ড বিক্রির সংখ্যা কম নয়।"

সঙ্গীতশিল্পী সুভাষ চক্রবর্তী উপরিউক্ত চারটি আধুনিক লোক-সঙ্গীতে (টুসুগানে) কি বলতে চেয়েছেন, তা-ও ঐ প্রসঙ্গে জানান। তাঁর জবানীতেই তাঁর লেখা ও সুর দেওয়া চারটি গানের মূলভাব নিম্নরূপ।

১নং গান ঃ ('পুরুলিয়ার বাজার মোড়ে ....')

"এই গানটিতে কতকগুলি যুবতী নারীর ছবি ফুটে উঠেছে। এখানে টুসু মানবী কোন দেবী নয়।"

২নং গান ঃ ('টুসু ভাসুর আইলে যাবেক নাই ....')

"এখানে টুসু ৬/৭ বছরের একটি আদরিণী কন্যা। আমরা জানি, আগেকার দিনে সামাজিক রীতি ছিল, কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া। সেই রকম একটি কম বয়সে বিয়ে হওয়া মেয়ে—আমার এই গানের টুসু।

বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়িতে আনার জন্য ভাসুর এবং দেওর মেয়ের বাড়ি গেলে, সে তাদের সঙ্গে এল না। শেষে স্বামী নিজে গিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এল।...."

৩নং গান ঃ ('মকর পরবে মদনা ছুঁড়া....')

"পৌষ-সংক্রান্তির দিন গাঁয়ের ছেলে, মেয়ে, বৌ-ঝিরা সবাই নদীতে গিয়ে স্নান করে থাকে। সঙ্গে থাকে গামছা-বাঁধা মুড়ি, পিঠে, চপ-তেলেভাজা, নারকেল নাড়ু। এই রীতি সমাজের সকলের কাছে অজানা নয়। আমার গানের টুসুও একজন 'ছুঁড়ি' অর্থাৎ ছুক্রী—যুবতী, বিবাহিতা নারী। সঙ্গে তার জীবনসাথী মদনাকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে সারাদিন সামাজিক প্রচলিত ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত।

পৌষমাসে যখন খরাক্লিষ্ট মানুষের গৃহে সামান্য ফসল ওঠে, এবং তার ফলে যে আনন্দ—আমার গানের টুসুও সমাজের আর অন্যান্যদের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে জীবনসাথী মদনকে নিয়ে, মদনের ধামসার বোলে নাচতে নাচতে নদীতে গিয়ে হাজির হয়। তার সঙ্গে আছে গাঁমছা বাঁধা পিঠে ও হলুদরাঙা মুড়ি ও অন্যান্য উপকরণ।

মকর স্নানের দিন সকাল বেলাতেই তারা নদীতে যায়। সারা সকাল চলে মাদল এবং ধামসার বোলের তালে নাচ আর গান; তারপর হলুদরাঙা মুড়ি খেয়ে আনন্দ আর হুল্লোড়। ....

এখানে কোন সম্প্রদায়কে আঘাত করার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু আমার গানের 'টুসু' কোন দেবী নয়, বরং মানবী।"

৪র্থ গান ঃ ('যা-যা টুসু যা-যা লো'....)

"এই গানে যে 'টুসু'কে ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল একজন প্রেমিকা। যে প্রেমিকা প্রেমিকের জীবনে শুধু খেলতে এসেছিল। প্রয়োজন যেই ফুরিয়ে গেল, অমনি সেই প্রেমিকা প্রেমিকের জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।...."

শিল্পী সুভাষ চক্রবর্তী আত্মপক্ষসমর্থনে যেসব কথা বলেছেন, সে-রকমই কথা বলেছেন বিশিষ্ট গবেষক ও 'ভূমিপুত্র' (Son of the soil) বিনয় মাহাত—"ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে টুসু কেবলমাত্র কন্যা নয়। সে তার বঞ্চিত জীবনে যা হতে চায়, যা পেতে চায়, 'টুসু'-কে সে ঠিক সেইভাবেই নির্মাণ করে। বিচিত্ররূপে টুসুকে সাজিয়ে ঝাড়খণ্ডী নারী তার অপূর্ণ কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণ করে নিতে চায়। তাই ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে টুসু কখনো দেবী, জননী কখনো কন্যা, কখনো বা সহচরী, প্রেমিকা। ঝাড়খণ্ডী নারীর কল্পনা টুসুকে অবলম্বন করে ঝাড়খণ্ডের পথেপ্রান্তরে হাজার হাজার গীত হয়ে ঝরে পড়েছে। টুসু গানের কোন সীমা নেই। যখন যা কিছু তাদের মনে পড়েছে, তাই নিয়েই গান বেঁধেছে। আর সেই গানের সুরের ধারা লীলাচঞ্চল ঝর্ণার মতো সমগ্র ঝাড়খণ্ডী প্রকৃতিকে মুখর করে রেখেছে।"[১৩]

ফলত, নানা প্রতিকূলতার মাঝেও শিল্পী সুভাষ চক্রবর্তীর টুসুগানের প্রচার বন্ধ হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে আরো টুসুগান রেকর্ড করেছেন। গাথানি রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত টুসুগানগুলি মানবিক যৌবনরসে উচ্ছল। একটি উদ্ধৃত করা হল।

ও মোর টুসুরাণী
তুমি যে গানের রাণী
যাও দুটো গান শুনাইয়া—
পুরুলিয়া বাজার দিয়া
বাঁকুড়া বাজার দিয়া
বীরভূম বাজার দিয়া
আমার মেদিনীপুর বাজার দিয়া রে।
(ইত্যাদি)

স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—আধুনিকতার ছোঁয়ায় টুসুগান ভাঙছে; কিংবা ভিন্নদৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ঃ টুসুগান যুগোপযোগী হচ্ছে। প্রজন্মগত ও কালগত ব্যবধানহেতু (Generation gap, Communication gap) অনেকেই এই অনিবার্য পরিবর্তনশীলতাকে অন্তর থেকে মানতে পারছেন না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—যেমন অনেক নরনারী দুর্গাপূজার সময় কুমারটুলির আধুনিক ছাঁদে-গড়া প্রতিমার মধ্যে মাতৃভাব ঠিকমত খুঁজে না-পেয়ে ক্ষুব্ধ হন। অথচ পরিবর্তমানকালের আদর্শের সঙ্গে ছন্দ না-মেলাতে পারা অনাধুনিকতার পরিচয়; এবং এ প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞানসম্মত মন্তব্য উল্লেখ করছি—"বছর

সাতেক আগে পুরুলিয়ার কুমারী বাঁধের কাছে টুসু-ভাসান দেখতে গিয়েছিলাম। আদাবনা গ্রামের অনন্য ছো-নৃত্য শিল্পী শ্রীনেপাল মাহাতর বাড়িতে আমরা অতিথি ছিলাম। তিনিই সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একজন লোক-সংস্কৃতিবিদ বন্ধু হঠাৎ বললেন, 'আগের মতো আর টুসুপরবে অকৃত্রিমতা নেই, সেই প্রাচীন লোকাচারগুলো কেমন পাল্টে যাচ্ছে।' এই মানসিকতার শিকার আমরা সকলেই। লোকসমাজকে 'অতীত অন্ধকারের' মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার এক রোমান্টিক মানসিকতা আমাদের রয়েছে। গোটা দুনিয়া স্বাভাবিকভাবে পাল্টে যাচ্ছে, শধু পাল্টাবে না আদিবাসী জীবন আর লোকসমাজ। এক অদ্ভুত ধারণা। অকৃত্রিম প্রাচীন সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখবার পরিকল্পনা অমানবিক, সামাজিক অপরাধের আর এক নাম। আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হবে, সর্বজনীন শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে, বৈজ্ঞানিক সুযোগ সুবিধা প্রত্যন্ত এলাকাতেও প্রসারিত হবে—এটাই তো অভিপ্রেত। লোক-সমাজের উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করে আধুনিক দুনিয়ার বিজ্ঞান নির্ভর সভ্যতার আলোকও গ্রহণ করতে হবে। আজকে যোগাযোগের সুযোগ অনেক বেড়ে গিয়েছে এই যোগাযোগের ফলে লোকসমাজের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটবে, বৃহত্তর সমাজে আমরা সকলে মিলে মিশে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হব, আমরা বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে এক হব—আজকের দিনে এই মানসিকতার প্রয়োজন রয়েছে। এই মানসিকতার উত্তরাধিকারী না-হয়ে লোক-সংস্কৃতির অনুসন্ধানে ব্রত হওয়া এক ধরনের সামাজিক অপরাধ। আমরা এই অপরাধ করে চলেছি বলেই লোক-সংস্কৃতির স্বরূপকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। লোকসমাজের মনটিকে ধরতে না-পারলে সব গবেষণাই ব্যর্থ হবে। টুসুপরবকে ঘিরেও এই একই সমস্যা বর্তমান।''[১৪]

পুরুলিয়ার তরুণ লোক-সঙ্গীত শিল্পী সৌমেন ঘোষ একদা আপন কথায় ও সুরে ইনরেকো রেকর্ড কোম্পানি থেকে টুসুগান প্রচার করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গানটি নিম্নরূপ—

মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান।
চল্‌ তর্‌হা চল্‌ কাঁসাই নদী কইর্‌তে মকর চান।।
পিঠা-মুড়ি, চিঁড়া-গুড় সঙ্গে বাঁইধে লে রে।
টুসুর মেলা দমে জমে কাঁসাই নদীর ধারে।।
বুঢ়া-বুঢ়ি কাল্‌হা জলে সিনান কইর্‌তে লারে।
চৌডল লিয়ে মাইয়া-মরদ করে টুসুগান।।
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান।।

পিঠা খাঁইয়ে মাস-ভাত খাব প্যাট্‌ ভইরে।
ভেঁড়ার মাস রাঁইধ্‌বেক বউ আইজ্‌কে যতন কইরে।।
মুরগ লড়াই দেইখ্‌তে যাইব শিয়ালখেদার টাঁইড।
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান।।

খেলাইচণ্ডী মকরবাসী ঘঙ্গা গাঁয়ে হবেক।
গণশার মা জিদ ধইরেছে সঙ্গে হামার যাবেক।।
ধার-দেনা যত হবেক সুইদ্‌ব বিকে চাল।
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে টুসুগান।।

আধুনিকতার ভাবগত সংঘাতে টুসুগান ভাঙছে, বা তার মধ্যে ভাববৈচিত্র্যের নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে—তা শিল্পভাবনাবর্জিত কোন উৎকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়। এ বিষয়টিও ক্রোচের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য—"....If these expressions really are perfect, there is nothing to be done but to advice the critics to leave the artists in peace, for they can only derive inspiration from what has moved their soul. They should rather direct their attention towards effecting changes in surrounding nature and society, that such impressions and states of soul should not recur. If ugliness were to vanish from the world, if universal virtue and felicity were established there, perhaps artists would no longer represent perverse or pessimistic, but calm, innocent and joyous feelings, Arcadians of real Arcady."[১৫]

পুরুলিয়ার একজন বর্ষীয়সী কবি লিখিতভাবে জানিয়েছেন[১৬] "সামনে টুসু পরব। কিছু পল্লীগীতি রচনা করে রেখেছি। আমার মনে হয় বর্তমানে টুসুগীত এবং ঝুমুর ইত্যাদির স্বকীয়তা বজায় রেখেও কিছু কথা, ভাব ও সুরের ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সাজানো চললে রুচি ও স্বাদে মিষ্টতা আসবে।" প্রসঙ্গত নিজের লেখা একটি টুসুগানে তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীণ ও শহুরে মানসিকতার ভাব-সংঘাত। গানটি হল—

না রহিবেন গাঁয়ে টুসু যাবেন ইবার শহরকে।
আলতা চরণ জুতায় ঢেকে দিবেন না পা ডহরকে।।
গীত গাহিবেন আজব কলে পান কিনিবেন দকান লে।
বছর পরে সাধ জাগিলে আসতে পারেন উখান লে।।
গঙ্গা সিনান, সিনেমা-টকি, গড়ের মাঠ আর কালীঘাট।
বতর পাইলে লেখাপড়ার হরের কিসিম লিবেন পাঠ।।
না ন যাহ শহরকে মাঁঙ্গী উখানে ফাঁদ ইঁদুরকল।
বুঝে সুঝে নাই চলিলে মুইছ্‌বে লরে আঁখি-কাজল।।

টুসুগানে নগরকেন্দ্রিক আধুনিক ভাবনার অনিবার্য সংক্রমণের বেদনা আধুনিক কবিতাতেও চিত্রিত—

টুসুমণিকে বলেছিলাম—
রাণীগঞ্জে খেলতে যাবো,
কয়লা খাদের জল-তোলাটা দেখিয়ে আনবো।
টুসুর হলুদ মুখ মনে রেখে
নিঃশব্দে ফুরিয়ে গেল ঝিঙেফুল-রোদ।

বুকে আমার ঘুমিয়ে ছিল ঘুম,
ডানায় ছিল উড়ে বেড়ানোর শখ।
হাঁসের মতো আলতা রাঙা
চরণ দেখে সময় গেল।
টুসু এবার চোখ ফেরালো।
বলেছিলাম—টুসুমণি,
কে দিল এই দু'আনি....
অভিমানিনী টুসুমণি আর এলো না,
স্মৃতি রেখে হারিয়ে গেল—
তলিয়ে গেল অথৈ জলে![১৭]

অন্ত্যটীকা

১। R. V. Williams Folksong, Encyclopaedia Britanica, 14th edn. (1932), P. 448.

২। T. S. Eliot The Sacred wood P. 125

৩। গীতবিতান ২য় খণ্ড বিশ্বভারতী (১৯৭৩), ৩২৬ নং গান ৪০০ পাতা।

৪। সঞ্চয়িতা বিশ্বভারতী (১৯৬৩), ৪৯৮ পাতা।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ সমালোচনা সাহিত্য (১৩৭৩) ৩৬৬ পাতা।

৬। সাহিত্যের সামগ্রী, 'সাহিত্য' গ্রন্থ বিশ্বভারতী (১৯৬৪) ১৩ পাতা।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শেষ সপ্তক' বিশ্বভারতী (১৩৬৭) ৯নং কবিতা ৩৬-৩৭ পাতা।

৮। 'টুসু ঃ লোক-কাহিনী ও ভৌগোলিক রূপবৈচিত্র্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯। R. V. Williams Folksong, Encyclopaedia Britanica 14th edn. (1932) P. 448.

১০। Do

১১। Do

১২। চিত্তরঞ্জন লাহা 'ধলভূমের লোকগীতি' (২য় খণ্ডঃ মকর) ১৩৮৭, ৩০ পাতা।

১৩। বিনয় মাহাত 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ড' নবপত্র প্রকাশন (১৯৮৪) ২৪৬ পাতা।

১৪। দিব্যজ্যোতি মজুমদার 'টুসু ঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে' পুস্তক বিপণি, কলকাতা (১৯৮২) 'সম্পাদকের কথা'-অংশ (২-৩ পাতা)।

১৫। Benedetto Croce AEthetic.

১৬। বেণুদেবী হাজরা 'আখড়া' পত্রিকা, সম্পাদক ঃ অনিল মাহাত, ১৯৮৬, জানুয়ারি সংখ্যা।

১৭। অনিল মাহাত 'টুসুমণি'-কে কবিতা। 'আখড়া' পত্রিকা, ১৯৮৬, জানুয়ারি।

উপসংহার

তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক আমরা; বিবদমান বিশ্বসমাজে কবি সিসিল ডে-লুইসের মতো বলতে পারি—'Only ghosts can live between two fires.' তারই মাঝে লোক-সংস্কৃতিচর্চা যেন 'মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে' উত্তরণ!

রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল আগে নির্দেশ দিয়েছেন, "দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রামপার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে...., যেখানে..... লোকে কোনদিন বিস্ময় দৃষ্টিপাত করে না, ... সেখানে... কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিসমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার, তবে মাতার নিভৃত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দন্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।"

দক্ষিণ-পশ্চিম-সীমান্ত বাঙ্‌লার লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে আবাল্য পরিচয়। সারস্বত-সাধনার মাঝে একটি বিশেষ ধারার পূর্ণাঙ্গরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সর্বসমক্ষে এই প্রথম তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছি; এর মূল্যায়ন মুক্তমনা, যথার্থ রসিকের অপেক্ষা রাখে।

।। পরিশিষ্ট ঃ ক ।।

টুসু-সত্যাগ্রহ বিষয়ক কয়েকটি দলিল

(১৯৫৪ 'মুক্তি'—পত্রিকা থেকে সংকলিত)

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ

মানভূমে টুসুর গানেও সরকারী দমননীতির প্রয়োগ ঃ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোক-সেবক-সংঘ কর্ত্তৃক সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত

রঘুনাথপুরে টুসুর গানে গ্রেপ্তার সুরু ঃ অন্ধ বালক সহ লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদল গ্রেপ্তার ঃ টুসুর গান, বিক্রিত অর্থ ও মাদল পর্য্যন্ত পুলিশের দখলে

সরকারী বাধা উপেক্ষা করিয়া টুসুর গানে জেলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে কর্ম্মীদের প্রতি নির্দ্দেশ

গত ৯ই জানুয়ারী শনিবার টুসুর গান করিবার সময় রঘুনাথপুরে একদল কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুরুলিয়া আনা হয়। এই গ্রেপ্তারের পরে গত ১২ই জানুয়ারী মঙ্গলবার লোক-সেবক-সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি ও কর্ম নির্দ্দেশ দেন ঃ—

মানভূমে বিহার সরকারের অবাদ স্বৈরাচার ও অনাচারের কার্যসমূহকে রূপ দিয়া লোক-সাহিত্য-ভবন হইতে টুসুর গান প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং আমরা লোক-সেবক-সংঘ হইতে সমগ্র মানভূম জেলায় এবং ধলভূমে গানের দল বাহির করিয়াছি। সমস্ত থানায় থানায় হাজার হাজার কর্ম্মী এই জাতীর চারণ গানে জেলার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছে ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উত্তপ্ত বিহার সরকারের অত্যাচারে উৎপীড়িত মানভূম ও ধলভূমের জনগণের ক্ষুব্ধ অন্তরের ভাষাকে এই টুসুর গান বলিষ্ঠ সংযত ও শান্তিপূর্ণ ভাষায় রূপ দিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রকাশ করিতে এবং জেলার জনদাবীকে মূর্ত্ত করিতে যে কর্ত্তব্য আমাদের রহিয়াছে—জন-পর্ব্বের এই অবসরে লোক সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাহাই আমরা করিয়াছি।

মানভূমের সমস্ত থানায় ও ধলভূমে সপ্তাহব্যাপী গানের দল টুসুর গান প্রচার করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে বিগত ৯ই জানুয়ারী তারিখে রঘুনাথপুরে আমাদের টুসুর গানের একটি দলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এক অন্ধ বালক সহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি চার্জ্জ দেওয়া হইয়াছে - ১৫১ ও ১০৭ ধারা; শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি টুসুর গানের জন্য, জনগনের ন্যায়সঙ্গত প্রচারের জন্যও মানভূমে গ্রেপ্তার হইতে হইবে!! টুসুর গানের যাহা বলা হইয়াছে তাহা বলিবার অধিকার সমগ্র ভারতবর্ষে আছে—টুসুর গানে যে যে দাবীসমূহ করা হইয়াছে সেই দাবীসমূহ সমগ্র ভারতের দ্বারা স্বীকৃত। উহাতে কোনো বিরোধের, কোনো ভেদের কথা নাই বা কাহারও

ন্যায়সঙ্গত কর্ম্ম, অধিকার ও মনোভাবের প্রতি দোষারোপণ নাই। যাহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবে দেশের লোককে অতিষ্ঠ ও উৎপীড়িত করিয়াছে তাহাদের প্রতি মৈত্রীর কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, যুক্তির কথা এবং জেলার ন্যায়সঙ্গত দাবীর কথা বলা হইয়াছে। মানভূমে আজ ইহা বলিবারও অধিকার নাই—শান্তিভঙ্গ হইবে!! যেখানে জনগণের ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ সত্য দাবীকেও কোনো সরকার আইনের সাহায্যে দাবাইয়া রাখিতে চান, সেখানের জনগণ সেই সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অত্যাচার ও অনাচারী শাসনের হাত হইতে মুক্ত হইতে চাহিবে—ইহাই স্বাভাবিক।

'টুসুর গানে মানভূম' সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই। তবে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা কী কারণে? বইখানির বিষয়বস্তুর জন্য নিশ্চয়ই নহে। তবে কি এক সঙ্গে কয়েকজন গাহিয়া বেড়াইবার জন্য? মানভূমের জনজীবনে টুসু পর্ব্বের স্থান কত বড় তাহা বিহার সরকার বা বিহারের কর্ম্মচারীরা কি জানিবেন? মানভূমের জনগণ তাহা জানে। সমগ্র মানভূমে শত শত নরনারী দলবদ্ধ হইয়া গান গাহিয়া পর্ব্ব-উৎসব করিবে। সেই জনতরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য? 'টুসুর গানে মানভূম' মানভূমের জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও ন্যায়সঙ্গত দাবীর মূর্ত্তরূপ। এই বই যখন আইনসঙ্গত তখন অন্য সকলের ন্যায় পর্ব্বের চিবপ্রচলিত ধারায় লোক-সেবক-সংঘেব কর্ম্মীরাই গান গাহিতে পাবিবেন না ইহাই কি সরকার মনে কবেন?

সরকার 'টুসুর গানে মানভূম' বইটিকে বে-আইনীই ঘোষণা করুন আর দলবদ্ধভাবে গান গাওয়া অন্যায়ই মনে করুন আমি কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিতেছি—তাহাবা পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অব্যাহত রাখিয়া সমগ্র মানভূমব্যাপী টুসুর গান প্রচার করুন ও এই 'টুসুর গানে মানভূম' সহস্র সহস্র সংখ্যায় বিক্রয় করিতে থাকিয়া যে কিছু অবাঞ্ছিত সরকারী আচরণ হউক তাহা প্রতিরোধ করিতে থাকুন এবং যে কোনো দমন পীড়নের জন্য অগ্রসর হউন।

জনগণের ন্যায়সঙ্গত এই সত্যদাবীর প্রতি ও জেলার জনপর্ব্বের অধিকারের প্রতি সরকারী অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা পূর্ণভাবে লড়িব। বন্দেমাতরম্।

পুরুলিয়ায় ১২ জন কর্ম্মীর একটি দল গ্রেপ্তার

এই অন্যায়ের প্রতিবাদে পুরুলিয়া শহরে লোক-সেবক-সংঘের

পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ

বৈকাল ৪।। ঘটিকায় টুসুর গানের দল পরিচালনা করেন।

১১ জন কর্ম্মী সহ শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ গ্রেপ্তার

১৩ই জানুয়ারী বেলা ১২।০০ টার সময় পুরুলিয়া সহরে লোক-সেবক-সংঘের একদল কর্মী বাদ্য সহকারে টুসুর গান গাহিয়া সহরের রাস্তায় যাইতেছিলেন তখন তাঁহাদিগকে বিহার নিরাপত্তা আইনে ধরা হয়।

এ সম্বন্ধে ১৫ই জানুয়ারী লোক-সেবক-সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত একটি বিবৃতি দেন—

গ্রেপ্তারের সংবাদে লোক-সেবক-সংঘের সচিব পুরুলিয়ার থানায় গিয়া থানা অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নিরাপত্তা আইনের দৃষ্টিতে উহাদের কী দোষ দেখা গেল? থানা অফিসার উত্তরে বলেন—ইহারা দলবদ্ধভাবে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন। নিরাপত্তা আইন অনুসারে সরকারের নিকট বিনা সূচনায় যে কোন শোভাযাত্রা অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে লোক সমষ্টির যাতায়াত নিষিদ্ধ। তাহাতে সচিব বলেন যে, চিরাচরিত প্রথায় সমগ্র জেলার লক্ষ লক্ষ লোক শত শত ব্যক্তি দলে একত্রিত হইয়া গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করিয়া টুসু-পর্ব্বে সমবেত হইয়া পর্ব্ব উদযাপন করেন। এই বিরাট জনসমষ্টির চিরপ্রচলিত প্রথার উপরে তো নিরাপত্তা আইন প্রযুক্ত করা যাইবে না। তাহা হইলে লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদের টুসুর গানে আপত্তি কী জন্য—উহা কি গানের বিষয় বস্তুর জন্য? উত্তরে থানা অফিসার বলেন—না তজ্জন্য নহে; সরকারে না-জানাইয়া যে কোনো ভাবে হউক দলবদ্ধভাবে যাতায়াত নিরাপত্তা আইনে নিষিদ্ধ। সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বিনা সংবাদে যে কেহ গান গাহিয়া দলবদ্ধভাবে চলিবে—তাহাদের ধরা হইবে।

উত্তরে সচিব বলেন—কাল লক্ষ লক্ষ নরনারী সহস্র সহস্র মেলায় ও স্নানঘাটে দলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিবে—আপনার কী সাধ্য আছে তাহাদের ধরিবার, আমরা দেখি। আপনারা তাহা পারিবেন-না—করিবেনও না—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উন্মত্ত সরকার কেবল লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদের ধরিয়া নিজেদের স্বরূপ উদঘাটিত করিবেন মাত্র।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত নিরাপত্তা আইনকে লোক-সেবক-সংঘ কালা আইন বলিয়া স্থায়ীভাবে অমান্যের নির্দ্দেশ দিয়া রাখিয়াছে। যে ক্ষেত্রে আইন প্রযুক্ত হইবার মত সেখানেও সংঘ সত্যাগ্রহ করেন। কিন্তু টুসু-পর্ব্বের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হইতে পারে না সংঘ মনে করে। কালা আইনও আজ বে-আইনীভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। সেজন্য একদিকে যেমন এই আইনের অপপ্রয়োগ মানা হইবে না, তেমনি এই আইন এভাবে প্রয়োগের বিরুদ্ধে ভারতের বিচার বিভাগের শেষ পর্যন্ত লড়িয়া দেখা হইবে। সেইজন্য সেই সম্পর্কে জামিন প্রভৃতিব সাধারণ ধারা অবলম্বন করা হইবে।

আমাদের এই ক্ষেত্রে যে সত্যাগ্রহ হইতেছে তাহা আইনটির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ দাঁড়াইতেছে না—আইনের অন্যায় প্রয়োগের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ দাঁড়াইতেছে এবং ইহা আইন অপপ্রয়োগকারী মন্ত্রীগণ ও হাকিমের বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে সঙ্কটরূপে দেখা দিবে।

বিহার সরকার মানভূমকে দমন শক্তির সাহায্যে বিহারে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন; তজ্জন্য সরকারের বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে। আমরা সমস্ত ভারতের কাছে দেখাইয়া দিব যে,

টুসুর গানে মানভূম গানের হইবে জনগণের ন্যায্য দাবী ও অপ্রতিরোধ্য যুক্তি আছে এবং তাহাকে দমন করিতে বিহার সরকার জনগণের জন্মগত অধিকার—এই টুসু-পর্ব্বের অধিকার দমন করিয়া মানভূমের জনগণের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের টুসুর গানের দল পরিচালনা ও গ্রেপ্তার

পুরুলিয়াতে টুসুর গানের দলের অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ১০ই জানুয়ারী বুধবার ১১জন কর্মীর টুসু গানের একটি দল বেলা ৪।।০ টার সময় বাহির করিয়া সহরে পরিচালনা করেন। সহস্র সহস্র লোক রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া এই সত্যাগ্রহের দেখে এবং জয়ধ্বনি দিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করে। গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামী এই ৭৮ বৎসর বয়স্ক শীর্ণদেহ পরিচালক, যিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া অভূতপূর্ব্ব ত্যাগ ও নিষ্ঠায় স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন তাহাকে আজও সত্যাগ্রহে বাহির হইতে হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণ বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়। বিহার সরকারকে জনগণ ধিক্কার দিতে থাকে।

শ্রীযুক্ত অতুলবাবু তাঁহার সহ সদর রাস্তা পরিক্রমা করিয়া মসজিদের রাস্তায় যখন যান তখন তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীয় দলবলকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনা হয়। রাত্রি প্রায় ১০।। টা পর্য্যন্ত থানায় রাখিয়া পরে জেলে পাঠান হয়। পরদিন অতুলবাবুকে ব্যক্তিগত জামিনে ও অন্যান্য ১১ জন কর্মীকে প্রত্যেককে ৩০০০৲ টাকার জামিনে মুক্ত করা হয়।

পুরুলিয়া সহরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরতাল

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষের গ্রেপ্তারের সংবাদ পুরুলিয়া সহরে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া পড়ে। এই গ্রেপ্তারে সহরের অধিবাসীরা মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ হন।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল হইতেই সহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। হরতাল পালন করিবার জন্য কেহ নির্দেশও দেয় নাই বা কেহ কোনরূপ প্রচারও করে নাই। কিন্তু সমস্ত দোকান পাট বাজার স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায় এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। এই সংবাদে মানবাজার ও চেলামাতেও হরতাল হয়।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের সত্যাগ্রহ

১৪ই জানুয়ারী ৩০শে পৌষ বৃহস্পতিবার সংক্রান্তি। পুরুলিয়ার প্রায় ৩ মাইল দূরে কাঁসাই নদীতে পুণ্যার্থীরা ঊষাকাল হইতে মকর স্নান করিতে দলে দলে আসিয়া জমায়েত হইয়াছে ও হইতেছে। গ্রামের শত শত নরনারী দল বাঁধিয়া 'টুসুর গানে মানভূম"-এর গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে ও যাইতেছে

প্রত্যুষে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ টুসুর গানের দল লইয়া কাঁসাই নদীর তীরে পৌঁছেন। দলবল টুসুর গান গাহিয়া 'টুসুর গানে মানভূম' বই বিক্রয় করিতে থাকে।

অতি অল্পকাল মধ্যে সমস্ত বই নিঃশেষ হইয়া যায় এবং এই টুসুর গানের প্লাবনে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী উদ্বেলিত হইয়া উঠে। দলে দলে সহস্র সহস্র নরনারী সমবেতভাবে গাহিতে থাকে "বাংলাভাষা প্রাণের ভাষা রে। ও তাই মারবি তোরা কে তারে।।"

কাঁস্যই নদীর ধারে যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বান্দোয়ান হইতে কাঁসাই নদীর পুলের উপর দিয়া যখন যাত্রীবাহী একটী বাস আসিতেছিল তখন পুলিশ সেই বাসখানা আটক করে। বাসে একদল বান্দোয়ানের লোক-সেবক-কর্মী ছিল। পুলিশ তাহাদের সেখানে নামিতে দেয়না এবং গ্রেপ্তার করা হইল বলিয়া জানায়। বাসসুদ্ধ তাহাদের পুরুলিয়া সহরের থানায় আনা হয়। এখানে আনিয়া বলা হয় যে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই এবং তাহাদের আবার বাসে করিয়া কাঁসাই নদীর ধারে (৩ মাইল) লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে সংঘ-সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ থানায় আসিয়া পৌঁছেন এবং এইরূপ ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিলে তাহাদিগকে থানাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কাঁসাই হইতে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেতৃত্বে কর্মীর দল পদব্রজে টুসুর গান গাহিতে গাহিতে সহরে আসিয়া পৌঁছে এবং সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করেন। বান্দোয়ান হইতে আগত কর্মীরাও শ্রীভজহরি মাহাতর নেতৃত্বে এই দলে যোগ দেন। এই বিরাট দলটী সহর পরিভ্রমণ করিয়া টুসুর গানের প্লাবন বহাইয়া দেয়। এই দিন কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহের কর্ম্মতালিকা

সংঘের পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম

সমগ্র মানভূম ব্যাপী মেলায় সহস্র সহস্র সংঘ কর্ম্মী ও সহায়কের দল দ্বারা টুসুর গানে সরকারের অবৈধ নিষেধ অমান্য

বিরাট শক্তির সামনে সরকারী দমন নীতি ব্যর্থ ঃ গ্রেপ্তার করিতে সরকারের সাধ্য হয় নাই

টুসুর পর্বে টুসুর গান সম্পর্কে বিহার সরকার পুরুলিয়া তথা মানভূমে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন সে সম্বন্ধে লোক-সেবক-সংঘের সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে কার্য্যক্রম ও কর্ম্মতালিকা প্রকাশ করিয়া সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ১৫ই জানুয়ারী শুক্রবার পুরুলিয়া হইতে একটি বিবৃতিতে নিম্নলিখিত ঘোষণা করেন ঃ—

আমাদের ন্যায়সঙ্গত কথা বলাব অধিকার ও চিরাচরিত পর্ব্ব করার অধিকার রক্ষা করিতে বিগত ৯ই জানুয়ারী হইতে আমরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি। সংঘের পরিচালক সহ এ পর্য্যন্ত ৪২ জন ধৃত হইয়াছেন। সরকারী দমনের বিরুদ্ধে কাল অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী

পুরুলিয়া সহরে সংঘের তত্ত্বাবধানে ৪০ জন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সহরের একটি দল এবং সমগ্র মানভূম ব্যাপী মেলায় মেলায় সংঘের নিয়োজিত সংঘের সহস্র সহস্র কর্ম্মী ও সহায়কগণ সরকারী নিষেধ অমান্য করিয়া নিজেদের কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করেন। এবং এই সঙ্গে মানভূমের লক্ষ লক্ষ নরনারী—ইহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে—লোক-সেবক-সংঘের রচিত টুসুর গান দলবদ্ধ ভাবে গাহিয়া পর্ব্ব উদযাপন করেন। টুসুর গানের জন্য সরকারী ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে—ব্যাপক ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে ইহা জেলায় জানাইয়া দেওয়া হয়—তাহা সত্ত্বেও জেলাবাসী ভীত হন নাই।

নিরাপত্তা আইন প্রয়োগে সরকারের সাধ্য ছিল না

কিন্তু কাল বিহার সরকার কোথাও ধরপাকড় করিতে সাহস করেন নাই—এবং সরকারের পাত্তাও ছিল না। নিরাপত্তা আইনের দৃষ্টিতে পর্ব্ব উপলক্ষ্যেও স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ হইয়া চিরপ্রচলিত গান গাহিবার অধিকার পায়। চিন্তাহীন, বিচারহীনভাবে আইন করিলেই তাহা কার্য্যকরী করা যায় না—ইহা বুঝিবারও সরকারের শক্তি নাই। সরকার হইতে দাবীও করা হইয়াছিল যে, টুসু-পর্ব্বেও নিরাপত্তা আইনের নির্দ্দেশ নিতে হইবে। এই আজগুবি দাবী বাস্তব সত্যের সামনে ঝড়ের সম্মুখে ছিন্নপত্রের মত উড়িয়া গিয়াছে। গণদাবী ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'টুসুর গানে মানভূম' সরকারের নিকট আপত্তিকর তথাপি সরকার ধরিতে-অক্ষম

ধৃত সত্যাগ্রহীদের অভিযুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে যে, বে-আইনী শোভাযাত্রা সহ আপত্তিকর গান গাওয়া হইয়াছে। আপত্তিকর গানও যদি ধরিবার এক বিষয় ছিল তবে কাল জেলার লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ দলবদ্ধভাবে প্রাদেশিক তথা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সরকারের নিকট আপত্তিকর এই সঙ্গীত গাহিয়াছে—তাঁহাদের পুরুলিয়ার এই প্রধান কেন্দ্রে আসিয়া গাহিয়াছে—সরকারের ধরিবার সাধ্য কোথায় হইয়াছে? সাম্প্রদায়িক সরকারের পক্ষে ইহা আপত্তিকর হইলেও এই 'টুসুর গানে মানভূম' জনগণের অন্তরের দাবী ও মর্ম্মবাণী।

এই টুসুর গান উত্তেজনা মূলত এই দোষ দিয়া এবং ইহাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার দাবী করিয়া সরকার অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ লোক এই গান করিয়াছে গ্রামে ও পুরুলিয়া সহরে। কোথাও শান্তিভঙ্গ হয় নাই। সরকারের এই মিথ্যা দাবী টিকিল কই?

গণদাবী সমন্বিত টুসুর গানের অধিকার

টুসুর গান জনগণের বিবিধ ভাব প্রকাশের এক আধাররূপে প্রচলিত আছে। সুতরাং ইহা অবলম্বন করিয়া জনগণের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দাবীকে রূপ দিয়া আমরা প্রচলিত রীতিরই অনুসরণ করিয়াছি। ইংরাজ আমলে বিবিধ লোক সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা রাজনৈতিক দাবী ও সংগ্রামের বাণী প্রচার করিয়াছি—

আজ স্বরাজ জীবনে গলিত পঙ্গু শাসন শক্তির বিরুদ্ধে লোকসঙ্গীতের ভিতর দিয়া নিজেদের দাবী, নিজেদের আদর্শময় স্বরাজ ও সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য ন্যায়সঙ্গত দাবীকে মূর্ত্ত করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না? এই অধিকারকে বিনষ্ট করিবে কাহার সাধ্য? ইহা পূর্ণরূপে সঙ্গত ও যুক্তিতে অপ্রতিরোধ্য।

সত্যাগ্রহের সম্মুখের কার্য্যক্রম

কর্ম্ম-তালিকা এখন পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকিবে

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি দিবসে টুসু দেবীর স্থাপনা হয়। তখন হইতে টুসুর গান গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হাটে বাজারে একক ও দলবদ্ধভাবে চলিতে থাকে। পৌষ-সংক্রান্তিতে আসিয়া এই গানপর্ব্ব বিশালরূপ ধারণ করে। সংক্রান্তি দিনে টুসু ভাসান হয়। এবং ইহার পরে সরস্বতী পূজা অর্থাৎ সিঝান-পর্ব্ব পর্য্যন্ত যত মেলা হয় সমস্ত মেলায় নরনারী টুসুর গান দলবদ্ধভাবে গাহিয়া থাকেন। অর্থাৎ টুসুর গানের কার্য্যকাল সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত।

সুতরাং টুসুর গানের প্রতি দমনের বিরুদ্ধে কাল সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিয়াই কাজ শেষ হয় নাই। জনগণের অধিকার রক্ষায় জনদাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের কাজ এখনো রহিয়াছে।

সত্যাগ্রহের কর্ম্ম-নির্দ্দেশ

(১) মেলায় মেলায় 'টুসুর গানে মানভূমের' গান প্রচারের কাজ পূর্ব্বতালিকা মত শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত অব্যাহত চলিতে থাকিবে।

(২) সত্যাগ্রহের রূপকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিবার জন্য বিগত ১৩ই জানুয়ারী হইতে আমরা পুরুলিয়ায় যে সত্যাগ্রহ কর্ম্মতালিকা আরম্ভ করিয়াছি—আনুষ্ঠানিক ভাবে তাহা ১৩ই জানুয়ারী হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত ৭ দিন পুরুলিয়া সহরের কর্ম্ম-তালিকা চলিবে।

(৩) এই আনুষ্ঠানিক সত্যাগ্রহের প্রতি বা মেলায়-মেলায় কর্ম্মরত গানের দলের প্রতি সরকার যদি দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করেন তবে আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমের রূপ নূতন আকার ও ধারা অবলম্বন করিবে।

বর্ত্তমান সত্যাগ্রহের কর্ম্মনীতি অনুসারে পরিচালক সহ ৩২ জন কর্ম্মী—সকলকে জামিনে মুক্ত করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহের সহিত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা চালান হইবে।

সরকারের বুদ্ধি বিভ্রম

সরকারের বুদ্ধি বিভ্রম হইয়াছে। কখনো ১৫১—১০৭; কখনো শান্তিভঙ্গের আইন; কখনো নিরাপত্তা আইন; কখনো গান আপত্তিকর বলিয়া দোষারোপণ হইতেছে। সরকার কখনো ধরিতেছেন—কখনো ধরিতে অক্ষম হইয়া নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া আছেন। শাসন হাতে

লইয়া পূর্ণ ছেলেখেলা চলিতেছে। বিভ্রান্ত বুদ্ধি সরকার আরো কত নিজের বিভ্রান্তি ঘটাইবেন তাহাই দেখিবার রহিল।

সংঘের দৃঢ় সংকল্প

, আমরা জানাইয়া রাখিতেছি যে, 'টুসুর গানে মানভূম' জনগণের অন্তরের দাবীর মূর্ত্তরূপ—সমস্ত ভেদভাব-বজ্জিত, ভারতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আদর্শে তথ্য যুক্তি ও ভারত সমর্থিত প্রীতিতে রচিত। এবং এই গান সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী সরকারের দুনীর্তিপূর্ণ অন্যায় শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে চিরঅধিকারের ভিত্তিতে জনগণের বাণী—যথার্থ স্বরাজ জীবনের জন্য দাবীর বাণী। সরকার যদি সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী মনোভাবে মানভূমের গণদাবীকে ও টুসু গানের অধিকারকে দমন করিতে চান তবে মানভূমের গণশক্তি তাহার যোগ্য উত্তর দান করিবে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হইবে—ইহাই আমাদের দৃঢ় সংকল্প।

লোক-সেবক-সঙ্ঘের সচিব

অরুণচন্দ্র ঘোষ ও ১৫ জন কর্ম্মী প্রহৃত ও গ্রেপ্তার

ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বিরাট জনতার সামনে কোর্ট-ইন্সপেক্টার কর্ত্তৃক প্রহারের অভিযোগ

গত কল্য ১৫ই জানুয়ারী শুক্রবার পুরুলিয়া আদালত প্রাঙ্গণে চৌকীদারী অফিসের সম্মুখস্থ সাধারণ রাস্তার উপরে জনৈক কোর্ট ইন্সপেক্টার একটী 'টুসুর' গানের দলের কয়েকজন কর্ম্মীকে ও লোক-সেবক-সংঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষকে প্রহার করে এবং পরে অরুণবাবু এবং বান্দোয়ানের ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীসুধীর বসু সহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। সেই রাত্রেই তাহাদের জেলে পাঠান হয়।

ঘটনার দিন শুক্রবারে পুরুলিয়ার শ্রী আর. বি, সিং—এর আদালতে লোক-সেবক-সংঘের পরিচালক শ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে এবং আরও একটী টুসুর গানের দলের বিরুদ্ধে মামলার তারিখ ছিল। বেলা প্রায় ৪টা ৪০ এর সময় কয়েকজন কর্ম্মী টুসুর গান গাহিতে গাহিতে চৌকীদারী অফিসের সম্মুখস্থ সাধারণের পাকা রাস্তা দিয়া আসিতেছিল সেই সময় হঠাৎ শ্রী জি, সরণের কোর্ট হইতে সি, আই (কোর্ট ইন্সপেক্টার) বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদের ধমক দিয়া গান বন্ধ করিতে বলে। তাহারা বন্ধ করিতে অস্বীকার করিলে সি, আই তাহাদেব অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মারিতে ও ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে। অরুণবাবু ও শ্রীসুধীর বসু তাঁহারা আদালত প্রাঙ্গণেই কার্য্যব্যাপদেশে অন্যত্র ছিলেন। এই প্রহার যখন চলিতেছিল তখন অরুণবাবু সংবাদ পাইয়া সাইকেলে আসেন এবং সি. আইকে বলেন যে—ইহাদের মারিতেছেন কেন? কোর্ট ইন্সপেকটার তখন অরুণবাবুকেই আক্রমণ করে—তাঁহার গলা টিপিয়া ধরে,

প্রহার করে এবং গলা ধাক্কা দিতে থাকে। শ্রীসুধীর বাবু অরুণবাবুকে রক্ষার জন্য আসিলে তিনিও যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হন। ইত্যবসরে সন্নিকটস্থ কোর্ট হইতে শ্রী আর, বি, সিং ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত হন। তখনও কোর্ট ইন্সপেক্টারের প্রহার অবাধে চলিয়াছে। ইহার পর তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ কোর্টের হাজতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে ঘটনাস্থলে লোক জমিয়া যায় এবং সকলেই মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ হন।

ইহার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। অরুণবাবু যখন ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছেন তখন তাহার সাইকেলটী বুচন মাহাত নামে একটী কর্মীর নিকট রাখিয়া তিনি কোর্ট ইন্সপেক্টারের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। কোর্ট ইন্সপেক্টার সাইকেলটী বুচন মাহাতর হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। বুচন মাহাত ছাড়ে না, তখন কোর্ট ইন্সপেক্টার বুচন মাহাতকে ধাকা দিয়া ফেলিয়া চড়চাপড় জুতা পায়ে ঠোক্কর ও লাথি মারিতে থাকে এবং সাইকেলটী ছিনাইয়া লইয়া যায়। এই সাইকেলটীতে অরুণবাবুর একটী ঝোলা-বাঁধা ছিল তাহাতে টাকা ও বহু দরকারী ও মূল্যবান কাগজপত্র ছিল। ঝোলাসহ সাইকেলটী অফিসে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে পুলিশ স্বেচ্ছামত কাগজপত্র বাহির করিয়া তাহা রাখে এবং পরে ঐ সমস্ত কাগজের একটি অসম্পূর্ণ সিজার (Sizure) লিস্ট তৈরী করিয়া কেবল লিস্টটী, টাকা ও সাইকেলটী ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

রাত্রি প্রায় ৯/৯।। টার সময় অরুণবাবুকে বাদ দিয়া অন্য সকলকে জেলে পাঠান হয়। অনেকে দেখিতে পান যে অরুণবাবুকে একটি আলাদা গাড়ীতে করিয়া অন্য দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইহাতে বহু লোকেই অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। পরে জানা যায় যে তাঁহাকে পরে জেলেই পাঠান হইয়াছে এবং তাঁহার উপর প্রহারের আঘাত পরীক্ষা করার জন্য সিভিল সার্জ্জনের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

শ্রী বুচন যাহাত এই দিনই (১৫ই) বৈকালে এস. ডি, ওর নিকট কোর্ট ইন্সপেক্টারের বিরুদ্ধে প্রহার লাঞ্ছনা প্রভৃতির অভিযোগ করিয়া ৩২৩, ৩৫৫, ৫০৪ প্রভৃতি ধারা অনুযায়ী এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে।

বিচার ও জামীনে মুক্তি

১৬ই জানুয়ারী বুধবার পুরুলিয়ার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সহায়ের কোর্টে ইহাদের দুই দলে বিভক্ত করিয়া বিচারার্থ আনা হয়। অরুণবাবু সুধীরবাবু প্রভৃতি ৫জনের বিরুদ্ধে ১৮৬ ধারা ও ২২৫ ধারা এবং শ্রীহীরু সিং প্রভৃতি বাকী ১১ জনের বিরুদ্ধে বিহার নিরাপত্তা আইন অনুয়ায়ী চার্জ্জ আনা হয়। অরুণবাবুদের বিরুদ্ধে যে ধারায় অভিযোগ করা হয় তাহার অর্থ—আদেশ অমান্য করা, আসামী ছিনাইয়া লওয়া, সরকারী কার্য্যে বাধা দেওয়া ইত্যাদি। এই দিবস কোর্ট ইন্সপেক্টার ও অন্য দু একজনের এজাহার লওয়া হয়।

ইহাদের জামীনের জন্য দরখাস্ত করা হইলে প্রত্যেকের ৩০০০্ টাকার করিয়া জামীনে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। অরুণবাবু ও সুধীরবাবু এই দিন সন্ধ্যায় মুক্ত হন। অন্যান্য ১৪ জন পরদিন রবিবার পূর্বাহ্নে মুক্ত হন।

হাত-কড়ি ও কোমরে দড়ি

অরুণবাবু প্রভৃতিকে পুলিশ হাজত হইতে জেল, জেল হইতে পুলিশ হাজত ও কোর্ট সর্বত্রই হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। হীরু সিং প্রভৃতির দলটীকে বিচারের সময় এজলাসেও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রাখা হয়। তাহাদের পক্ষের উকীল প্রতিবাদ করিলে দড়ি খুলিয়া দেওয়া হয়।

লোক-সেবক কর্মী যাহাদেরই—গ্রেপ্তার করা হইতেছে তাহাদের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া-আসা করা হইতেছে।

জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী সমন

১৭ই জানুয়ারী হইতে একটী নতুন সরকারী ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। মানভূম জিলায় ও পুরুলিয়া সহরে সহস্র সহস্র লোক দল বাঁধিয়া টুসুর গান গাহিয়া শোভাযাত্রা করিলেও বাছিয়া লোক-সেবক-সংঘের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নামে জননিরাপত্তা আইন (বিহার মেনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার) অনুযায়ী সমন জারি করা হইতেছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এইরূপ সমন-পাইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষ; ২। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী; ৩। শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী; ৪। শ্রী অশোক চৌধুরী (সদুবাবু); ৫। শ্রী হেমচন্দ্র মাহাত; ৬। শ্রী অরুণচন্দ্র ঘোষ।

সত্যাগ্রহের কার্য্যধারা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে

সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে ঘোষিত কার্য্যক্রম অনুয়ায়ী পুরুলিয়া সহরে ও গ্রামদেশে টুসুর গানের দল গ্রামে গ্রামে জেলাতে জেলাতে দেশবাসীতে টুসুর গানে যাতোয়াত করিয়া তুলিয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের সত্যাগ্রহ সংবাদ

বিগত সংক্রান্তি-পর্ব্বের পর হইতে মানভূমের প্রতি থানায় থানায় অনুষ্ঠিত বহু সংখ্যক যে মেলা হইয়াছে তাহার বহু মেলায় টুসুর গানে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। এই সংখ্যায় কয়েকটি স্থানের মেলায় কার্য্য বিবরণ দেওয়া হইথেছে। পরে অন্যান্য সমস্ত মেলার বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

পুরুলিয়াতে—প্রত্যহই প্রায় দুই বেলাই পুরুলিয়া সহরে টুসুর গানের দল বিপুল উৎসাহে সহর পরিভ্রমণ করিতেছে। এক পুরুলিয়া সহরেই শত শত সংখ্যায় "টুসুর গানে মানভূম" বিক্রয় হইতেছে।

বান্দোয়ানে চিলাতে খেলাইচণ্ডীর মেলাতে

গত ১লা মাঘ বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত চিলাগ্রামে খেলাইচণ্ডির মেলাতে প্রায় ১০/১২ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে আসিয়াছিল। উক্ত মেলাতে বিভিন্ন গ্রাম হইতে ছোট ছোট প্রায় ২০টি দল টুসুর গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া মেলাস্থলে একত্রিত হয়। পরে ঐ মিলিত দল ৪/৫টি দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত মেলাস্থল জুড়িয়া ঢোল-মাদল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া টুসুর গান গাহিতে থাকে। মেলা বৈকাল ৩টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। সকলেই নাচিয়া গান গাহিয়া মানভূমের এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে। পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

বাঘমুণ্ডি সতীঘাটা-মেলা—সতীঘাটা-মেলা মানভূমে অন্যতম বৃহত্তম মেলা। সুবর্ণ রেখায় উভরতীরে মানভূম ও রাঁচী জেলায় ১লা মাঘ এই মেলা বসে। লোক-সেবক-সংঘের টুসুর একটী দল এই মেলাতে টুসুর গানের প্লাবন বহাইয়া দেয়। সহস্র সহস্র লোক এই গানে যোগ দেয়। শত শত টুসুর গানের বহি বিক্রয় হইতে থাকে। ফিরিবার পথে ২রা মাঘ গ্রামে, বাসে পথে যেখান দিয়া দল আসিযাছে লোকেরা আগ্রহের সহিত টুসুর গানের বই খরিদ করে।

ঝালদা থানার তুলিনে সুবর্ণরেখার তীরে—পৌষ-সংক্রান্তিতে বিরাট মেলায় লোক-সেবক-কর্মীর টুসুর গানের দল বাদ্য ভাণ্ডসহকারে টুসুর গানে দিকদিগন্ত মাতাইয়া তোলে। শত শত টুসুর গানের বই অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়া যায়।

ঝালদা—১৩ই জানুয়ারী লোক-সেবক টুসুর গানের দল ঝালিদা সহর ও চাটামঘুটু প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমা করে। ঝালদার ও গ্রামাঞ্চলে বিরাট উৎসাহ দেখা যায়। টুসুর গানের ভাব সম্পদ বিদ্যুৎগতিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

বেড়ো খেলাইচণ্ডীর মেলায় টুসু সঙ্গীত—১লা মাঘ হইতে তিনদিন রঘুনাথপুর থানায় বেড়ো গ্রামে চণ্ডীমেলায় বিরাট জনসমাবেশ হয় লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মিগণ ১লা মাঘ হইতেই উক্ত মেলায় সত্যাগ্রহ সহযোগে টুসু-সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তোলেন প্রথম দিন টুসু সঙ্গীতের পুস্তক বিক্রয়কালে জনৈক পুলিশ কর্মচাবী লোক-সেবক-সংঘের কর্মী শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্তের নিকট আসিয়া জুলুম করিতে থাকে যে, আপনার বই বিক্রয়ের হুকুম নাই ইত্যাদি। এইরূপে বাদানুবাদ করিতে থাকে এবং শাসাইতে থাকে। শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহাতে পুলিশ ক্যাম্পের সম্মুখে ভীড় জমিয়া যায়। ইত্যবসরে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সহ পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা হাজির হন এবং স্থানীয় দারোগা তাড়াতাড়ি কর্মচারীটিকে চিত্তভূষণ দাশগুপ্তকে এই ভাবে বাধা প্রদান না করিতে উক্ত কর্মচারীটিকে নির্দ্দেশ দেন। লোক সেবক কর্ম্মিবৃন্দ তিনদিন ধরিয়া বিপুল উৎসাহে মেলায় টুসুসঙ্গীত গাহিয়া বেড়ান ও বহু সংখ্যক 'টুসুর গানে মানভূম' পুস্তক

বিক্রয় করেন। কর্ম্মিগণ পাশাপাশি সেনেড়া, বিলতোড়া, মধুতটী প্রভৃতি গ্রামে গিয়াও লোক-সেবক-সংঘের সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার কবেন। গ্রামবাসীগণ তাহাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানান। যেখানেই কর্ম্মীরা গান গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইয়াছেন গ্রামবাসীরা অতি আগ্রহের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের যথোপযুক্ত অতিথি-সৎকারের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করেন। আবাল বৃদ্ধ জনতা আগ্রহের সহিত টুসু সঙ্গীত শুনিয়াছে ও বই কিনিয়াছে।

"বাংলাভাষা প্রাণের ভাষারে
ও ভাই মারবি তোরা কে তাবে।

—অন্তরের এই বাণী ঐ সকল অঞ্চলের প্রাণে নূতন সাড়া জাগাইয়া দিয়াছে।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ১

সর্ব্বঅবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে সংগ্রাম

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিষয়ে লোকসেবক-সংঘের পরিচালকের বিবৃতি

"পুরুলিয়া সহর ও জেলাবাসী ভাইসব,

'টুসুর গানে ও সত্যাগ্রহ ব্যাপারে জনমনে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগিয়াছে। জেলার বিরাট জন দাবীকে ও জন উত্থানকে সাম্রাজ্যবাদী অদূরদর্শী ইংরাজের রাজ্যশাসনের পন্থায় বিহার সরকার দাবাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তজ্জন্য দমননীতি আরম্ভ হইয়াছে। এবং এমন কি ক্ষিপ্ত হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণ সত্যাগ্রহীদের তথা সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের উপর মারপিট আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে আমি দেখিতেছি যে, চতুর্দ্দিকে জনগণের অন্তরে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় আমি জেলাবাসীকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইতেছি যে, সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব প্ররোচনায় সর্বদা সম্পূর্ণ শান্ত থাকিবার আমরা যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি—এক্ষেত্রে যেন তাহা পূর্ণরূপে বজায় থাকে। আমরা বিরাট বিরাট আন্দোলন চালাইয়াছি—সর্বদা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাখিয়াছি; ইহাতে আমাদের ন্যায়ের দাবী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিরোধী পক্ষের ক্ষেত্র দিনে দিনে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমরা যেন সর্ব্বদা সব অবস্থায় শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকিয়া, আমাদের সত্য ও দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করি। সম্মুখে অচিরে বিচারের ক্ষেত্র দেখা দিবে। তাহাতেই এই অবস্থাগুলির যাচাই হইবে এবং সমস্ত দমন শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিরোধ করিয়া নিজেদের অধিকার ও দাবীর জন্য সংগ্রামের অপ্রতিরোধ্য জয়ের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিবে।

ইহা জানা আছে, যাহারা সত্যই যুক্তি ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে হারে—তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে—যুক্তি ও তথ্য বা থাকার কারণে তাহারা পশুবল ব্যবহার করে। ইহাই তাহাদের পরাজয়ের সূচনা করে। সুতরাং দমনে দুঃখ করিবার কিছু নাই উহাদের পক্ষ হইতে

দমন যত আসিবে এবং আমাদের দিক হইতে সহাস্যে পীড়ন বরণ করিয়া নিজেদের ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন যতই চলিবে ততই আমাদের সত্যের দিক বিপুল ও শক্তিশালী হইবে। সুতরাং দমনে বিচলিত যেন আমাদের মধ্যে আমরা একজনও না হই। উহাই আমার বারবার সবিনীত অনুরোধ।

আমাদের পথ ও সরকারী নীতি

আমাদের দাবীর মধ্যে কোনো বিরোধের যা ভেদভাবেব কথা নাই। আমরা শান্তিপূর্ণ গঠন কর্ম্মের ধারায় দেশের স্বরাজ ও জনঅধিকারকে গড়িতে চাহিয়াছি। কিন্তু আমাদের কাজের ভার লইয়া আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ যাঁহারা আজ শাসনে রহিয়াছেন তাঁহারা সত্য ও ন্যায়ের পথ ছাড়াইয়া এক দিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরিয়া কুশাসনের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন অন্য দিকে তেমনি নিজেদের সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক মনোভাবের প্রেরণায় জেলায় বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিদ্বেষমূলক দমন চালাইয়া গিয়াছেন; বাংলাভাষীদের উপর অবিরত পীড়ন ও অপমান করিয়া গিয়াছেন। বিহার সরকারের বহু বিরোধ-করা সত্ত্বেও আজ আবার যখন এই সকল প্রশ্নের অবসানকল্পে সীমা-কমিশন বসিয়াছে—তাহার প্রাক্কালে প্রাদেশিক মনোভাবে বিহার সরকার জেলার মধ্যে ক্ষিপ্তের ন্যায় সর্ব্বভারতে সর্ব্বস্বীকৃত নীতির বিরোধী,—জনগণের বিরোধী দাবী সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন এবং জেলার ভাষা ও টুসুর গান প্রভৃতি জেলায় বাংলা সংস্কৃতিক বিরাট অঙ্গসমূহ দলন করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন।

মানভূমের জীবন ক্ষেত্র

জেলার ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলা বলিয়া, এবং জনগণের মধ্যে বাংলায় দাবী অন্তরে ওতপ্রোত রহিয়াছে বলিয়া বিহার সরকার নিজের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের কার্য্য সাধনের জন্য প্রাদেশিক মনোভাব আশ্রয় করিয়া অবিরত জেলাবাসীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির, ভেদ-সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টার কাজ করিয়াছেন। ইহা আজ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং কমিশনের কাছে তাহা পূর্ণরূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে। যেখানে প্রায় সমস্ত স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে বাংলাভাষা ও ভাষার মাধ্যমে ও অন্য বিবিধ কারণে ভারতীয় সংস্কৃতির অধীনে বাংলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে—সেখানে মিথ্যা এবং অন্য দাবী সৃষ্টি করিতে চাহিলে প্রাদেশিক মনোভাবের বা ঐ জাতীয় আবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি ছাড়া বিহার সরকারের আর অন্য পথ কোথায়? সেজন্য আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিহার সরকার মানভূম ও সংশ্লিষ্ট বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতে প্রাদেশিক মনোভাবে বাংলা-বিহার ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়া জেলাবাসীর জীবন আতঙ্ক করিয়াছেন। এই জেলার ইতিহাস অকাট্য রূপে সাক্ষ্য দিবে যে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রথমে পর্য্যায় হইতে জেলার রাজনৈতিক কর্ম্মীদের পরিচালনাধীনে জেলার মধ্যে বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া মাড়োয়ারী বা হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদভাব যা কোনো জাতি বা শ্রেণীভাব অথবা এই সকল জাতীর কোন পার্থক্য বুদ্ধিতে অবিচারের কোনো অবস্থা বা কোনো অভিযোগ একদিনের

জন্যও উঠে নাই। সর্ব্বদা সম্পূর্ণ মৈত্রীভাব ভ্রাতৃত্বভাবের ক্ষেত্র অটুট রাখিতে মানভূমের কর্মীদের ইতিহাস পরিষ্কার রহিয়াছে।

তাহাকে বিহার কি করিয়াছে

কিন্তু এইরূপ সুন্দর এক মানভূমের জীবন ক্ষেত্রে বিহারের কংগ্রেসী সরকার এক নগ্ন সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি করিলেন। বিহারের রাজনীতি পূর্ণভাবে শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতি বিদ্বেষের মনোভাবে পরিচালিত—ইহা ইতিহাসের ধর্ম্ম। সেই বিদ্বেষদুষ্ট রাজনীতি বিহার সরকার মানভূমে আমদানী করিয়া আজ বৎসরের পর বৎসর জেলাকে অতিষ্ঠ করিয়া চলিয়াছেন। আজ আবার কমিশনের প্রাক্কালে সেই বিহারী-বাঙ্গালী বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করিতে মরিয়া হইয়া লাগিয়াছেন।

সেই জন্য আমরা আমাদের চির অধিকার রাখিতে, স্বরাজ জীবন প্রতিষ্ঠার কাজ করিতে বরাবর কার কাজের অনুরূপে এবং কমিশনের প্রাক্কালে নিজেদের সভা-অধিকার কেউ যাহাতে বিনষ্ট করিতে না পারে তাহার ক্ষেত্রে প্রস্তুতিরূপে—বিহার সরকারের প্রাদেশিক মনোভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আমরা সবিনয়ে জানাইতেছি যে—এক ভারতবর্ষে আমরা বাঙ্গালী-বিহারী সব আপন ভাই। ভাইকে ভুলিয়া আজ মানভূমে বিহার সরকার বাংলা-বিহার বুদ্ধিকেই বড় করিয়াছেন। মানভূমে প্রাদেশিক সরকার যত দলবল নিয়োগ করিয়াছেন—একমাত্র অবাঞ্ছিত প্রাদেশিক মনোভাবেই তাহারা কাজ করিতেছে—বাংলাভাষীদের মধ্যে বিহারের দমন তাহারা চালাইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদের সহায়করূপে মানভূমে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার অনাচার চালাইয়াছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে বিহার সরকার মানভূমের বাসিন্দাদিগকে বিহারী প্রমাণিত করিতে মানভূমে অযথা বাঙ্গালী-বিহারীয় প্রাদেশিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া ঘোর প্রাদেশিক বিদ্বেষ চালাইয়াছেন ও প্রাদেশিক যুক্তিতে দমন চালাইয়া কার্য্য সাধন করিতে চাহিতেছেন।

সত্যের প্রচার ও দমনের প্রতিরোধ

সেজন্য জেলাবাসী যাহাতে প্রাদেশিক বুদ্ধিতে না পড়ে, এবং প্রাদেশিক বুদ্ধি সৃষ্টিকারী সরকারের কার্য্যে অতিষ্ঠ হইয়া যাহাতে তাহাদের বিক্ষোভ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হইয়া যথার্থ সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টির ও মৈত্রীর ভিতর এই প্রাদেশিকতার মনোভাবকে দূর করিতে পারে, সরকারের প্রাদেশিক মনোভাবের বিরুদ্ধে অহিংস ও মৈত্রীভাবে দাঁড়াইতে পারে এবং প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন সরকারের চেতনা আনয়ন করিতে পারে তজ্জন্য আমাদের টুসুর গানে এই মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া বিহার সরকারকে বলা হইয়াছে—তোমরা যাহারা মানভূমে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছ—ভাইকে ভুলিয়া বাংলা বিহার বুদ্ধিকেই বড় করিতেও—তাহারা ভুল করিতেছ। বাংলাভাষায় দাবীকে রোধ করিতে তোমরা বাঙ্গলী-বিহারীর প্রশ্ন তীব্রভাবে তুলিয়াছ; এবং যাহারা প্রাদেশিক মনোভাবে বিহারীরূপে ভেদ সৃষ্টি করিতেছ তাহাদের প্রতি আমাদের বাণী যে, হে বিহারী

ভাই, ভারতে বিহারী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারাঠী সব ভাইই রহিয়াছে—ভাষা ব্যাপারে তোমরা ভ্রাতৃবিরোধ কেন সৃষ্টি করিতেছ? আমাদের বাংলাভাষায় দাবীতে বিহারী বাঙ্গালী ভেদের কোনো প্রশ্ন নাই। রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য ভারতের সকল ভাই মিলিতভাবে স্থির করিয়া আমরা মাতৃভাষায় ভিত্তিতে সকলে রাজ্য চাই। কিন্তু তোমাদের যুক্তি ও ঐক্যের দৃষ্টি নাই—অধিকন্তু তোমরা লাঠির সাহায্যে (ডাঙ্গের সাহায্যে) এই প্রাদেশিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহিতেও—বাঙ্গালী-বিহারী প্রশ্ন তুলিয়া প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন বিহারী জবরদস্তি রাজ কায়েম করিতে চাহিতেছ। কিন্তু হে বিহারী ভাই—তুমি ভাইকে তুলিয়া লাঠি দেখাইয়া অর্থাৎ দমনের দ্বারা আমাদিগকে অন্যায় শাসনের মধ্যে রাখিতে পারিবে না। তাই টুসুর গানে মানভূমের জনগণের ভাষার রূপ দিয়া সত্যাগ্রহীর মনোবলের সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে, সবিনয়ে বলা হইয়াছে—

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্গ দেখাই।

কারণ আমরা লাঠি যা ভাঙ্গে অর্থাৎ দমনে কখনো অবনত হইব না। তোমার সত্য যুক্তির আশ্রয় যদি থাকে তা—আমরা শুনিতে রাজি আছি। কেবল সত্য উপলব্ধি করো—আমাদের যুক্তি অনুভব করো যে,

বাঙ্গালী বিহারী সবাই
এক ভারতে আপন ভাই।

আমাদের দাবীর মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। কারণ—

এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে
মাতৃভাষার রাজ্য চাই।।

আমরা জানি যে, প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন বিহারী ভাইরাই দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অবাঞ্ছিত পথে চলিয়াছেন। আমরা লক্ষ্য করি যে, বিহারের উদাত্ত মনোভাবাপন্ন সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, বিহারের চেতনাশীল বিহারী জনগণ আমাদের ভাব সঙ্গত দাবীর সহিত রহিয়াছেন এবং প্রাদেশিক দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন বিহারী ভাইদের কখনই তাঁহারা সমর্থন করেন না। আজ আমরা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন বিহাবীভাইদের যাঁহারা মানভূম তথা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রাদেশিকতার দমন ও ভেদনীতি চালাইতেছেন তাহাদের প্রতি যে আবেদন ও অমোঘ সত্যের বাণী শুনাইতেছি—বিহারের উন্নত জনগণ সেই জনঅধিকার-দমনকারী বিহারী ভাইদের ডাকিয়া সচেতন করুন যে,

শুন বিহারী ভাই
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্গ দেখাই।

মানভূম বিহার সরকারের হাতে বহু লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে। আজও তাহার অধিকার ও সংস্কৃতি রক্ষায় লাঞ্ছনা পীড়ন বরণ করিতেছে। কিন্তু দুর্যোগের ভিতর দিয়া

মানভূমের জনতার আত্মবল জাগ্রত হইয়া আজ দুর্ব্বার বেগ সঞ্চয় করিতেছে। আমরা বিহার সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে—অপ্রতিরোধ্য সংকল্পে সংগ্রাম করিব—তবে আমাদের এই সংগ্রাম—

পূর্ণ শান্তির মধ্যে—ভ্রান্ত ভাইদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের প্রেম লইয়া পূর্ণ মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবের মধ্যে—অহিংসার ভিত্তিতে—অথচ পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে। সত্য ও শান্তির জয় হোক।

১৮।১।৫৪ **নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ**

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ২

নিরাপত্তা-আইন স্বৈরাচারীর অস্ত্র

আইনের বৈষম্যমূলক ব্যবহার

সরকারের বে-আইনী কার্য্যধারার আর একটি বিশেষ দিক বিধানতন্ত্র বিরোধী বে-আইনীর নগ্নরূপ

সম্প্রতি সরকার হইতে বাছিয়া বাছিয়া সত্যাগ্রহীদের উপর নিরাপত্তা-আইনের নোটিশ দেওয়া হইতেছে। দণ্ড বরণ করিতে প্রস্তুত সত্যাগ্রহীদের কাছে ইহা কিছুই নয়—কিন্তু স্বাধীন ভারতের নাগরিক জীবনের 'পরে ইহা এক নিরতিশয় অবিচার ও আইন বিরোধী কাজরূপে দেখা দিয়াছে। আমরা অতিশীঘ্র সমগ্র ভারতের ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কোন প্রাদেশিক সরকার বা স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীর হাতে ভারতের বিধান কোথাও এমন অধিকার দেয় নাই—যে, কোনোও এক আইনের প্রয়োগ কোন প্রাদেশিক সরকার বা রাজকর্ম্মচারীগণ সুবিধামত বা বিদ্বেষবশতঃ কাহারও উপর করিবেন কাহারও উপর করিবেন না। ইতিমধ্যে একই কাজের জন্য বহু ব্যক্তি জড়িত হওয়া সত্ত্বেও বিহার সরকার লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদের উপর নিরাপত্তা-আইন প্রয়োগ করিতেছেন, কিছু লোকের উপর করিতেছেন না—এই নগ্ন অবিচারের অভিযোগের প্রমাণ-স্বরূপ সহস্র সহস্র সাক্ষী আমাদের নিকট আছে।

যখন নিয়ম আছে যে, নিরাপত্তা আইন-অনুসারে বিনা অনুমতিতে শোভাযাত্রা সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ—এবং এই আইনের প্রয়োগ টুসু পর্ব্বের ক্ষেত্রে অবাস্তব জানিয়াও বিহার সরকার যখন এই আইন প্রযুক্ত করিতে বিরত হন নাই, তখন টুসু পর্ব্বে যত লোক শোভাযাত্রা করিয়াছে—সেই লক্ষ লক্ষ লোককে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল। তাহা যখন পারে না নাই, তখন লজ্জিত না হইয়া, ভ্রান্তি উপলব্ধি না করিয়া জনকতকের উপর সরকারেব আইন প্রয়োগের বাহাদুরীর কি অর্থ থাকিতে পারে? ইহা ব্যতীত সত্যাগ্রহীদলেরও যাহারা সত্যাগ্রহ করিতেছে—তাহাদেরও সকলকে না-ধরিয়া জনকতকের

উপর মাত্র নোটিশ জারি করা হইয়াছে। ভারতের ও জেলার লক্ষ লক্ষ লোক জানেন যে, লোক-সেবক-সংঘ আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া নিরাপত্তা-আইন অমান্য করিয়া অবিরত অজস্র শোভাযাত্রা ও জনসভা করিয়াছে—নিরাপত্তা-আইন নিষ্ক্রিয় করিয়াছে। সরকার ধরেন নাই, ধরিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু কমিশনের প্রাক্কালে সেই একই কাজের জন্য বিসদৃশভাবে, বৈষম্যমূলক নীতি সহকারে ধরিতেছেন—এবং তাহাও জনকতককে মাত্র। এই অবস্থা দেখিয়া জনমনে স্বতঃই এই ধারণা হইতে পারে না কি যে, কমিশনের প্রাক্কালে বিহার সরকার হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় কার্য্যসিদ্ধির জন্য লোক-সেবক-সংঘের জনকতক বিশিষ্ট কর্ম্মী ও পরিচালক শ্রেণীর লোককে অভিযুক্ত করিয়া আটক করিয়া দিতে চান ও এই সময়ে নিজের ষড়যন্ত্রমূলক কাজের উদ্দেশ্যে বৈষম্যমূলক অবিচারের প্রমাণ দিতে চান? ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, এই নিরাপত্তা-আইন জারি থাকা সত্ত্বেও বিগত বৎসরগুলিতে অননুমোদিত দলবদ্ধ টুসুর গানে কোনো ধরপাকড় হয় নাই।

সরকার এই সকল যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিয়াছেন ও করিয়া চলিয়াছেন তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া আমরা শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল সক্রিয় প্রতিবাদ তুলিতে চাই। ভারতের গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত সমঅধিকার, সমব্যবহার সকলের প্রাপ্য। তুমি এক তথাকথিত আইন ভঙ্গের জন্য জানিয়া বুঝিয়া অপরের প্রতি কিছু করিবে না—আমাদের প্রতি করিবে কোন্ অধিকারে? যদি সকলকে ধরিবার সাহস নাই তবে কয়েকজনকে ধরার কী অধিকার আছে? সকলকে ধরিতে সাহস নাই। কারণ, জেল ভরিয়া যাইবে, ভারতের দৃষ্টি পড়িবে।

বিহার শাসনতন্ত্রে এই অনাচার ও বৈষম্য প্রতিনিয়ত চলিয়াছে। আজ এই অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইতে হইবে। নতুবা শাসন চালাকির-রাজত্ব হইয়া পড়িতেছে।

নিরাপত্তা আইন মানভূমের ভাষা ও অধিকার হরণ করিতে প্রযুক্ত। ইহার বহু প্রমাণ আছে। ভারতের বিধান-তন্ত্রে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও জানিযা বুঝিয়া অবিরত আইনের অপপ্রয়োগ ও বৈষম্যমূলক প্রয়োগ চলিতে থাকিলে আইনের পথে ইহার প্রতিকার আছে কিনা আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে কি না—ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের এ বিষয়েও অভিমত প্রদানের জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি। শাসনে-অধিষ্ঠিত আইনভঙ্গকারীদের দণ্ডের বিধান কি নাই?

স্বাধীন জীবনে সত্যাগ্রহের পথে সংগ্রামের সহিত আইনের পথে অধিকারের সংগ্রামও এক বিশিষ্ট সংগ্রাম। এই ভাবেও ভারতে আইনের সুবিচারের পথ গড়িবে।

নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

টুসুর গানে ও সত্যাগ্রহে ধৃত ব্যক্তিগণের নাম ও মামলার বিবরণ

প্রথম দল রঘুনাথপুরে ৯ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন

১। সর্বশ্রী হেমচন্দ্র মাহাত ২। বাঁকু মাহাত ৩। শ্রীপতি মাহাত ৪। বাবুলাল মাহাত (বয়স ১২ বৎসর, অন্ধ) ৫। ভজহরি মাহাত (এম. পি. নহেন) ৬। সূর্য্য মাহাত ৭। রাঘব চর্ম্মকার ৮। হীরু সর্দ্দার ।

ইহাদের বিরুদ্ধে ফৌঃ কাঃ আইনের ১০৭ এবং ১৫১ ধারা অনুযায়ী শান্তিভঙ্গের এবং দুষ্কার্য্য (ক্রাইম) করিতে পারে এই সম্ভাবনায় অভিযোগ আনা হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে ৫০০০ টাকা করিয়া জামীনে খালাস আছেন।

বিচারের দিন ২২শে জানুয়ারী।

২য় দল

ইহারা ১৩ই জানুয়ারী পুরুলিয়াতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন

১। সর্বশ্রী কেরামত আনসারী ২। মিএাজান আনসারী ৩। দুর্গাচরণ মাঝি ৪। আহ্লাদ চন্দ্র গরাএঃ ৫। ভীমদাস গোস্বামী ৬। নকুলচন্দ্র মাঝি ৭। অরুণচন্দ্র মাঝি ৮। বুচন মাহাত ৯। নূতন মাঝি ১০। অরুণ মাহাত ১১। নগেন্দ্রনাথ মাহাত ১২। নকুলচন্দ্র মাঝি।

ইহাদের বিরুদ্ধে বিহার-জননিরাপত্তা আইনের (বিহার মেটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার) ৯(৫) দ্বারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হইয়াছে।

ইহারা প্রত্যেকে ৩০০০ টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

আর, বি. সিং ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ইহাদের মোকদ্দমা চলিতেছে। ১৪ই ও ১৫ই ও ১৮ই জানুয়ারী মোকদ্দমার দিন ছিল। সরকারী সাক্ষী ছিলেন—পুরুলিয়া থানার দারোগা এ, এন, ভট্টাচার্য্য, গোলাম হোসেন, আবদুল মজিদ, দুজন দারোগা, লছমন ওঝা, উচ্চন সিং ও ২ জন কনষ্টেবল ও শ্রীমাহান্তী। আবদুল মজিদ ও শ্রীমাহান্তীকে বিরোধী (হোস্টাইল) বলিয়া ঘোষণা ও জেরা করা হয়।

আসামীদের পক্ষে উকিল :— সর্বশ্রী সুকুমার বিশ্বাস এডভোকেট, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; জ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত; জগদীশ চট্টোপাধ্যায়; হরকালী মুখোপাধ্যায়; দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস; সতীশচন্দ্র সাহা; মহাদেব মুখার্জী; গঙ্গাধর সিং প্রভৃতি।

সরকারী পক্ষে কোর্ট ইন্সপেক্টার মামলা পরিচালনা করেন।

পরবর্ত্তী বিচারের দিন ২৩শে জানুয়ারী।

৩য় দল

ইহারা ১৩ই জানুয়ারী পুরুলিয়াতে গ্রেপ্তার হন।

১। সর্বশ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ ২। কাজল সেন ৩। হরিপদ সহিস ৪। সহদেব সহিস ৫। আনন্দ মাহাত ৬। অমূল্যরতন মাহাত ৭। সুধন্ব মাহাত ৮। হীরু সিং সর্দ্দার ৯। ভজহরি মাহাত (এম, পি. নহেন) ১০। রাধানাথ মাহাত ১১। অরবিন্দ ওঝা ১২। চন্দ্রমোহন দত্ত।

ইহাদের বিরুদ্ধে বিহার জননিরাপত্তা আইনের ৯(৫) ধারা অনুসারে অভিযোগ আনা হইয়াছে।

শ্রীঅতুলবাবু ব্যক্তিগত জামীনে ও অন্যান্য আসামীগণ প্রত্যেকে ৩০০০্ টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

আর, বি, সিং ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ইহাদের বিচার চলিতেছে। ১৪ই ও ১৫ই ও ১৮ই জানুয়ারী মোকদ্দমার দিন ছিল।

সরকারী সাক্ষী ঃ— থানার দারোগা, কোর্ট ইন্সপেক্টার জি শরণ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ১জন কনেস্টবল, ১ জন হাবিলদার, শ্যামল ভাদুড়ী, লছমন ওঝা, উচ্চন সিংকে টেণ্ডার করা হয়।

আসামী পক্ষে উকীল ঃ— যাহারা ২য় দলের আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

সরকারী পক্ষে কোর্ট ইন্সপেক্টার এবং পরে সরকারী উকীল অনিলকুমার সরকার মামলা পরিচালনা করেন।

পরবর্ত্তী মোকদ্দমার দিন ২৩শে জানুয়ারী।

৪র্থ দল

ইহাদের ১৫ই জানুয়ারী পুরুলিয়া আদালতের নিকট কোর্ট ইন্সপেক্টার মুস্তাফা কর্ত্তৃক প্রহৃত হইবার পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

১। সর্বশ্রী অরুণচন্দ্র ঘোষ ২। সুধীরচন্দ্র বসু ৩। কাজল সেন ৪। ভজহরি মাহাত (এম, পি, নহেন) ৫। সুধন্ব মাহাত (অল্পবয়স্ক বালক) ৬। হীরু সিং সর্দ্দার ৭। আনন্দ মাহাত ৮। নূতন মাঝি ৯। ভীমদাস গোস্বামী ১০। হরিপদ মাহাত ১১। অরুণচন্দ্র মাহাত ১২। সহদেব সহিস ১৩। নগেন্দ্রনাথ মাহাত ১৪। দুর্গাচরণ মাঝি ১৫। নকুল মাঝি ১৬। রাধানাথ মাহাত।

ইহাদের প্রথম ৫ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিদির ১৮৬ ও ২২৫ ধারা অর্থাৎ সরকারী কার্য্যে বাধা দান, সরকারী আদেশ অমান্য ও সরকারী হেফাজত হইতে আসামীদের ছিনাইয়া লওয়া প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়।

অপর ১১ জনের বিরুদ্ধে বিহার-জননিরাপত্তা আইনের ৯ (৫) ধারা অর্থাৎ দাঙ্গা করার অভিযোগ আনা হয়।

ইহারা প্রত্যেকে ৩০০০্ টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

আর, এন, এন সহায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ইহাদের বিচার চলিতেছে। ১৬ই ইহাদের মোকদ্দমার দিন ছিল।

সরকারী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন—কোর্ট ইন্সপেক্টার মুস্তাফা হোসেন; এস, এন, সিনহা, এইচ, বি, সিনহা দুজনেই অপিসের কেরাণী।

যাঁহারা ২য় ও ৩য় দলের আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন তাঁহারা এই দলের আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

সরকারী পক্ষে শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সরকারী উকীল মামলা পরিচালনা করেন।

এই মামলা পরিচালনা কালে আসামী পক্ষের উকীল শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা পুলিশের বাধা দানের ফলে আদালত কক্ষে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৩

সত্যাগ্রহের অব্যাহত অগ্রগতি

প্রথম পর্য্যায়ের সংবাদ সমূহ

সত্যাগ্রহের বিষয়ে এবং সত্যাগ্রহীদের কর্ত্তব্য বিষয়ে বর্ত্তমানে একটি বিবৃতি দেওয়ার দরকার মনে করিতেছি।

※ পীড়ন দমন সত্ত্বেও, সত্যাগ্রহের কাজ শান্তি ও শৃঙ্খলা, শক্তি ও উদ্দীপনার সহিত অগ্রসর হইয়াছে। ১৩ই হইতে ১৮ই তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি পুরুলিয়া সহরে টুসুর গানে সত্যাগ্রহী দল বহির্গত হইয়াছে এবং জেলার বহুস্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় মেলায় টুসুসঙ্গীত দল সত্যাগ্রহ করে। কতকগুলি মেলায় বিপুল সংখ্যক সত্যাগ্রহীদল টুসুর গান করে।

※ ১৫ই তারিখে সংঘের সচিব ও সত্যাগ্রহী দলের উপরে মারপিটের সংবাদ 'মুক্তি' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

※ সম্প্রতি সত্যাগ্রহী দলকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না। তবে পরে বাছিয়া বাছিয়া কিছু কর্ম্মীর উপর নিরাপত্তা আইনের নোটিশ জারী হইতেছে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কতকগুলি বিশিষ্ট কর্ম্মীর উপর নিরাপত্তা-আইনভঙ্গের মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

※ খালিদার সত্যাগ্রহীদলকে ধরার যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল ও প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নহে।

※ বর্ত্তমানে কর্ম্মপঃ ব অঙ্গানুযায়ী সমস্ত ধৃত ব্যক্তিকে জামীনে মুক্ত করা হইয়াছে। সংঘের পরিচালককে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে ব্যক্তিগত জামিনের সুযোগ দেওয়া হয়।

※ সংঘের কাজ পরিচালনার জন্য টুসুর গানের সত্যাগ্রহে যুক্ত না-হইতে সচিব হিসাবে অরুণ ঘোষকে সংঘ হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সচিবের নামেও নিরাপত্তা-আইন ভঙ্গেরও একটি মামলা করা হইয়াছে।

※ ১৫ই তারিখে কোর্ট হাজতের সম্মুখে সচিব ও সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ কর্ম্মচারীরর মারপিটের যে ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—সেই ঘটনার ব্যাপারে সচিবের প্রতি আসামী ছিনিয়া লওয়া প্রভৃতিব অভিযোগও আনা হইয়াছে।

※ সচিবকে গ্রেপ্তারের সময়কালে সচিবের অনেকগুলি কাগজপত্র যাহা একটি সাইকেলে একটি থলিতে ঝুলান ছিল তাহা ক্রোক করা হয়। অনেকে উদ্বেগ সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমাদের সংঘের দরকারী কাগজ পত্র ঐ ভাবে সরকারের হস্তগত হইয়াছে কিনা। জনসাধারণের উদ্বেগের নিরসনের জন্য জানাইতেছি যে, যদিও উহাতে সচিবের অনেক দরকারী কাগজ ছিল, কিন্তু উহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা বা কর্ম্মতালিকা বা ঐ সকল জাতীয় জরুরী কাগজপত্র কিছু ছিল না। থলিতে কেবল সচিবের চলতি কাজের জমা কাগজপত্র ও হালের কতকগুলি চিঠিপত্র এবং আইন সংক্রান্ত জরুরী কাগজ ছিল—যাহার অভাবে কাজের অবশ্যই ক্ষতি হইতেছে।

※ কোর্টের কাজের সময় ও কাজেব সীমানার মধ্যে সত্যাগ্রহ না করিতে কর্ম্মিদিগকে আগেই নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম। এবং এখনও সেই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। কারণ জনগণের অধিকারের জন্য সরকারী দমনের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিতেছি। কোর্টের সাধারণ কাজ ব্যাহত করিবার আমাদেব কোনো ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই। আমাদের সত্যাগ্রহীদল দুই কোর্টের মধ্যবর্ত্তী স্থলের পাশ দিয়া সর্ব্বসাধাবণের যাতায়াতের রাস্তায় টুসু গান গাহিয়া গিয়াছেন। এবং তাহা করিবার তাঁহাদের অধিকারও আছে। কোর্টের কাজের অসুবিধা বিষয়ে যে কাহারও যে কিছু বক্তব্য থাকিবে—আমরা শুনিতে আগ্রহান্বিত আছি।

※ বিগত ১৭ই ডিসেম্বর বান্দোয়ানের নিকটবর্ত্তী টটকো নদীর ধারের মেলায় বান্দোয়ান থানার কয়েকশত কর্ম্মী টুসুর গানে সত্যাগ্রহ করে। মেলায় সহস্র সহস্র জনতা ছিল। এই মেলাতে একটি ঘটনা ঘটে। বান্দোয়ান স্কুলের ছাত্রদের পক্ষ হইতে বান্দোয়ান পুলিশের নিকট যে অভিযোগ জানাইতে যাওয়া হইয়াছিল এবং পুলিশ যে অভিযোগ গ্রহণ করে নাই তাহা এই ঃ— যখন টুসুব গান চলিতেছিল—তখন শিরিষগড়্যা হিন্দী স্কুলের পণ্ডিত কয়েকজন. স্কুলের ছাত্র লইয়া আসিয়া বিরোধী মন্তব্য করিতে থাকে। এবং সহসা ঐ পণ্ডিত উত্তেজিত হইয়া সাইকেলের পাম্প দ্বারা বান্দোয়ান এম. ই. স্কুলের তিনটি ছাত্রকে আঘাত করে। এই সকল দেখিয়া জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া পণ্ডিতের কার্য্য প্রতিরোধ করে। সত্যাগ্রহীরা পণ্ডিত ও জনতাকে শান্ত হইতে বলেন। পণ্ডিত ও জনতার মধ্যে কলহ হয়। দুইপক্ষ হইতে থানায় নালিস করা হয়। কিন্তু বান্দোয়ান স্কুলের ছাত্রদের অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ না করিয়া বলে যে, পুরুলিয়া সিভিল সার্জনের পরীক্ষাপত্র না আনিলে অভিযোগ গ্রহণ কবা হইবে না। অপব পক্ষে হিন্দী পণ্ডিতের অভিযোগ ক্রমে ৮ জন লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী ও সমর্থকদের নামে ১৪৮ ও ৩৩৭ ধারা বিধানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছে। ৪ জনকে ধরা হইয়াছে। তাঁহারা জামিনে মুক্ত আছেন—তাঁহারা মামলায় এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে যে, তাঁহাদিগকে মিথ্যা দোযারোপ কবা হইয়াছে। বরং তাঁহারা দুই পক্ষকেই শান্ত থাকিতে অনুরোধ করেন।

* টুসুর গানের ব্যাপারে জড়িত কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার হইতে ১০৭, ১৫১ প্রভৃতি ধারার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সত্যাগ্রহীদের প্রতি নির্দ্দেশ

যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ভাবের প্ররোচনা হউক বা কোনো আঘাত উৎপাত হউক জনগণকে সর্বদা শান্ত থাকিতে সত্যাগ্রহীগণ পূর্ণভাবে সচেষ্ট থাকিবেন। এই সংগ্রাম নীতির সংগ্রাম। জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচার করিয়া বলিবেন শান্ত রাখিতে হইবে।

জনগণের প্রতি আবেদন

জনগণের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন, সমস্ত প্ররোচনায় আমাদিগকে শৃঙ্খলা ও শান্তির সহিত নিজেদের সত্য ও ন্যায়কে ধরিয়া থাকিতে হইবে—ইহার মধ্যেই আমাদের জয় একথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। যে কোনো পক্ষের কেহ উত্তেজনায় অবাঞ্ছিত আচরণ করিলে বা যে কোনো পক্ষের কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাহা অত্যন্ত দুঃখের হইবে। আমরা দেশের প্রত্যেকটি লোকের নিরাপত্তা চাই—প্রকৃত স্বাধীনতা চাই। দেশে শান্তি চাই।

আর এক কথা। যে সমস্ত মামলা মোকদ্দমা হইতেছে—সেইসব মামলার ঘটনা যাহারা দেখিয়াছেন বা দেখিবেন—তাহাদের প্রতি একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা যে পক্ষকে বুঝিবেন যে, তাহারা মিথ্যা করিয়া সাক্ষী সাজাইয়া মামলা চালাইতে চায় ও তাঁহার সাক্ষ্য চায়—ভয়ের চাপে বা প্রলোভনেও সে ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিবেন না। আর যে পক্ষকে ন্যায়সঙ্গত পক্ষ মনে করিবেন—সেই পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য নিজেদের সহায়তার ইচ্ছা তাঁহাদিগকে জানাইবেন।

১৯/১/৫৪ **নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ**

বিহার সরকারের দমন নীতি ও অত্যাচার

পুরুলিয়ায় জনসভায় তীব্র প্রতিবাদ

গত ১৭ই জানুয়ারী রবিবার পুরুলিয়া চকবাজারে সম্মিলিত প্রগতিশীল দলের উদ্যোগে শ্রীঅশোক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বিরাট সনসভা হয়। টুসুর গানের জন্য লোক-সেবক-সংঘের উপর বিহার কর্তৃক যে দমন নীতি চালান হইতেছে বিভিন্ন বক্তা সে সম্বন্ধে তীব্র নিন্দা করেন এবং সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করিয়া লোক-সেবক-সংঘের সত্যাগ্রহীদের মুক্তির দাবী করা হয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য সদস্যদের উপর কোর্ট ইন্সপেক্টার মোস্তাফা হোসেনের মানপত্র ও গ্রেপ্তার সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ইন্সপেক্টারকে অবিলম্বে সাসপেণ্ড রকার দাবী করা হয়।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ—

'টুসু পরব মানভূমের অন্যতম বিশিষ্ট লৌকিক পর্ব এবং এই উপলক্ষ্যে টুসুর গান প্রচলিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং টুসু-গান গাহিবার মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টায় বিহার সরকার অন্যায় ও আইন বিগর্হিত কাজ করিতেছেন এবং মানভূম লোক-সেবক-সংঘের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য কর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের দ্বারা যে দমন নীতির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবেই ক্ষমতায় অপব্যবহার। সুতরাং এই সভা সরকারী দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দাবী করিতেছে যে সরকারী দমন নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিয়া লোক-সেবক-সংঘের নেতৃবর্গ ও কর্ম্মিবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হউক।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ দ্বিতীয় পর্য্যায়

সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে তীব্রতর ও পূর্ণাঙ্গ করিতে

সত্যাগ্রহের নূতন কার্য্যধারা

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৩শে জানুয়ারী আদালতে লোক-সেবক-সংঘের পরিচালক কয়েকজন কর্ম্মীসহ জামিন পরিহার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন না-করিয়া কারাগমন করিয়াছেন।

২২শে জানুয়ারী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী ও শ্রীভজহরি মাহাত, এম. পি. এবং ২৫শে জানুয়ারী শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝা, শ্রীকুশধ্বজ মাহাত, শ্রীকালীরাম মাহাত ও শ্রীমতী ভাবিনী দেবী এই সত্যাগ্রহ পন্থা অনুসরণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন।

সরকার আইনের অজুহাতে জেলাবাসীর প্রতিনিধিগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে ও দণ্ড-বিধানের উদ্দেশ্যে মামলা করিতে চান। সেজন্য সত্যাগ্রহীরা স্বইচ্ছায় সরকারের দণ্ড বরণ করিয়া সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর। তবে বিচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে নমুনা স্বরূপ কিছু মামলা চালান হইবে। নাগরিক-অধিকার-রক্ষায় সংগ্রামের ইহাও আর এক দিক।

প্রথম পর্যায়ের সত্যাগ্রহ ১৯শে জানুয়ারী শেষ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পর্য্যায় চলিতে থাকে। প্রত্যহ সত্যাগ্রহী দল যথারীতি পুরুলিয়া সহরে সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইতেছেন। সরকার হইতে ধরা হইতেছে না। মাঝে মাঝে দুই চারি জনের নামে নিরাপত্তা-আইনভঙ্গের নোটিশ দেওয়া হইতেছে। বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় থাকিবে। থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে বহু দল সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইতেছেন।

কারাগমনকালে পরিচালকের বিবৃতি

কারাগমন প্রাক্কালে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ সংঘের পরিচালকের নিকট অনুরোধ জানাইলে নিম্ন লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন ঃ—

জনগণের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহের অস্ত্র। শাসন দ্বারা—অন্যায়ভাবে অধিকার ও সত্যকে দমন করার প্রচেষ্টা হইলে তাহা ব্যর্থ করিতে সত্যাগ্রহের আগুন। যে সব সত্যাগ্রহী সত্যনিষ্ঠ সংগ্রামী তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা হইয়াই আমরা বিদ্বেষ বৈষম্যের তথা অবিচারের প্রতিবিধানে অগ্রসর হইয়াছি।

দেশের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই একজন ভাষা ও অধিকার বিষয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন—ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যে শাসক শক্তির বৈষম্যমূলক অন্যায় চেষ্টা সমূহের প্রতিকারে আজ জনগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ দেখা দিয়াছে—সেই শাসক শক্তির অন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ ও নিন্দা করার শক্তি তাহাদের নাই। সেই জন্য রাজনৈতিক কারণে তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত আচরণের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করিলেও সত্য প্রতিহাসিত হইবে—ন্যায় পক্ষ জয়যুক্ত হইবে—আমি বিশ্বাস করি। তাহারই প্রচেষ্টা পথে আমি আমার সামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম মাত্র।

২৩/১/৫৪ **অতুলচন্দ্র ঘোষ**

পরিচালক লোক-সেবক-সংঘ, মানভূম

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৪

টুসুর গানে সত্যাগ্রহের নতুন রূপ

মানভূম লোক-সেবক-সংঘের পরিচালকের বিবৃতি

আমরা আজ আত্মবলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে ও দেশের জনমত গঠন করিতে আমাদের সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে তীব্রতর ও পূর্ণাঙ্গ করিতে চাই

আমাদের টুসুর গানে সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে আজ হইতে আমরা এক নূতন রূপ দান করিতেছি।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মানভূমের জন-অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি এবং গণদাবীর প্রতি বিহার সরকারের নিরবচ্ছিন্ন যে দমন ও পীড়ন চলিয়াছে—তাহার এক নবতর অধ্যায় দেখা দিয়াছে—টুসুর গান অবলম্বন করিয়া জেলায় ভাষা, সংস্কৃতি ও জনমতকে দলন করিবার কার্য্যে। যেহেতু নিরাপত্তা আইন জারী করা আছে—সেই হেতু চিরপ্রচলিত বিরাট

এই জন পর্ব্ব এবং জনসংস্কৃতির উপরও নিরাপত্তা আইনের অবাস্তব উদ্ভট প্রয়োগ না করিয়া চলিবে না—ইহাই সরকারী সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছিল। সকলের পর্ব উদযাপন প্রয়োজনে এবং সকলের অধিকার রক্ষায় আমরা আংশিকভাবে তথাকথিত আইন ভঙ্গ করিয়া পর্ব্ব উদযাপন করিয়া ও উদযাপনে সহায়তা করিয়া আইনের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত হইয়া অভিযোগের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় পথে অগ্রসর হইতেছিলাম।

নিরাপত্তা আইনের অজুহাত

কিন্তু দেখা গেল, নিরাপত্তা আইন নিতান্তই অজুহাত ছিল। নিরাপত্তা আইনের তথাকথিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও সরকারের হস্তক্ষেপের যথার্থ উদ্দেশ্য কোনো ছিল না, স্পষ্টই বোঝা গেল। কারণ তথাকথিত মর্য্যাদা রক্ষার পরিস্থিতি অনুসারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ন্যায়সঙ্গত এক সরকারের উচিত ছিল তাহা না করিয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষম্যমূলক ভাবে বিদ্বেষমূলক ভাবে তথা অবিচারমূলক ভাবে এই আইন জেলার জনমতের কণ্ঠরোধ করিতে প্রয়োগ করা হইতেছে। সেজন্য অবস্থার যোগ্য প্রতিকারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে আমরা সংগ্রামকে তীব্রতর ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিতে অগ্রসর হইলাম।

আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগ

মানভূমের উপর নিরাপত্তা আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ইহা অকার্য্যকরী ছিল। আজ যেমন ইহাকে যুক্তিহীনভাবে কার্য্যকরী করা হইল, তেমনি বিসদৃশজনক তথা বৈষম্যমূলকভাবে ইহার প্রয়োগও আরম্ভ হইল। টুসু পর্ব্বের মধ্যে নিরাপত্তা আইন ভঙ্গের তথাকথিত অপরাধে জড়িত অগণিত লোককে অব্যাহতি দেওয়ার সময় লোক-সেবক-সংঘের কর্মীদের অব্যাহতি না দিয়া সরকার পূর্ণ উভয়ে দমনের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। বাছিয়া বাছিয়া সংঘের বিশিষ্ট কর্মী ও পরিচালক শ্রেণীর কর্ম্মী ও পারচালক শ্রেণীর কর্ম্মীগণকে অভিযুক্ত করিতেছেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বিহার সরকার হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে মানভূমে নিরবচ্ছিন্ন যে অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপ চালাইতেছেন, এবং সীমা কমিশন গঠনের প্রদানের সময়কাল হইতে তদুদ্দেশ্যে যে মিথ্যাদাবী ও অবাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন, তাহাই বাধাহীন করিতে সরকার ভিত্তিহীন অজুহাত ভুলিয়া জনগণের মূল্যবান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করিতেছেন—ও জেলায় জনমত ও জনশক্তিতে পঙ্গু ও গলিত করিতে উত্তপ্ত হইয়াছেন।

মনোভাবের সুযোগকে প্রতিরোধ করিয়া রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থার ধারা নির্ণয় করিতে নিরঙ্কুশ বিচারে সুযোগ দান করাই সীমা কমিশন গঠনের লক্ষ্য।

সত্যের বাণী মূর্ত্ত হইবে

ন্যায়সঙ্গত যে অধিকার, দাবী ও অভিমতকে দমন করিতে আজ আইনের এই অপপ্রয়োগ—আমাদের এই সত্যাগ্রহ তাহাকে ব্যর্থ করিয়া আমাদের অধিকারের দাবী

ও অভিমতকে বৃহত্তর সমাজের দরবারে প্রসারিত ও তীব্রতর করিবে। আমাদের আটক করিয়া কণ্ঠরুদ্ধ করিলেও সত্যাগ্রহ সত্যের বাণীকে মূর্ত্ত করিবে।

তাই শান্তি, শৃঙ্খলা, অহিংসার মন্ত্র ও ন্যায়ের দাবী লইয়া আমরা সত্যাগ্রহের নূতন ধারা পথে অগ্রসর হইলাম। সত্যের জয় হোক। নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৫

টুসুর গানে সত্যাগ্রহের

নূতন কর্ম্মনির্দ্দেশ ও কর্ম্মতালিকা

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বৈষম্যমূলক বে-আইনী নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নূতনরূপ

সত্যাগ্রহের নূতন কর্ম্মনির্দ্দেশ

(১) টুসুর গানে সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে আর এক নূতন ধারায় রূপ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের কার্য্য উদযাপনের জন্য আমরা আংশিক সত্যাগ্রহ করিয়া, অভিযুক্ত হইয়া বিচার বিভাগীয় পথ অনুসরণ করিতেছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তা আইনের অজুহাত লইয়া বিহার সৎকার যেভাবে বৈষম্যমূলক কথা অবিচারমূলক দমনের উদ্দেশ্যে আইনের অপব্যবহার করিতেছেন—তাহার উপযুক্ত প্রতিরোধের জন্য সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ তথা তীব্রতর করিয়া জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে তথা সমগ্র সরকারের কর্ম্মধারার প্রতি ভারতের জনমত গঠন করিতে আমাদের এই সত্যাগ্রহ ধারার সিদ্ধান্ত। এই নূতন সত্যাগ্রহের জন্য নির্দ্দেশ প্রাপ্ত সত্যাগ্রহীরা নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া উহার নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কবিবেন। সরকার ধবিয়া লইয়া যাইতে পারেন। এই সত্যাগ্রহীরা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া মামলা লড়িবেন না; তবে নিজেদের ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মনীতি জানাইবার জন্য আদালতে বিবৃতি প্রদানে তাঁহাদের অধিকার তাঁহারা প্রয়োগ করিবেন।

আইন অমান্যের দ্বারা নিজেদেব অধিকাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র আমরা গঠন করিব; দণ্ড বরণ ছাড়া জনমত গঠন তথা দণ্ড বিধানকারী সবকারের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার লক্ষ্যে সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য আমরা পালন করিব।

(২) এ পর্য্যন্ত সাম্প্রতিক যে সত্যাগ্রহ চালান হইয়াছে—তাহাতে নিজেদের অধিকার বজায় রাখিতে, একদিকে তথাকথিত আইনভঙ্গ করিয়া যেমন আংশিক সত্যাগ্রহের পন্থা অনুসরণ কবা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত হইয়া আইনের প্রয়োগকে আমরা অবৈধ মনে করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় পথে সংগ্রামেরও

এক ধারা অনুসরণ করিয়াছি। স্বাধীন জীবনে বিচার বিভাগীয় পথে নিজের দেশেও বিধানতন্ত্রে প্রদত্ত অধিকার রক্ষা করিবার সংগ্রামও এক অন্যতম সংগ্রাম। টুসু-পর্ব্বে বহু লোক আইনে জড়িত হইবে মনে করিয়াও তাহার দৃষ্টিতে বিচার বিভাগীয় পথের কার্য্যক্রম রাখা হইয়াছিল। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনে আজ যে নূতন সত্যাগ্রহের ধারা অনুসৃত হইতেছে—তাহার সহিত আমাদের এই পূর্ব্ব ধারার কাজও আবশ্যকমত অনুসৃত হইবে। তবে নূতন ধারাটাই প্রধান হইয়া উঠিবে। আইনের অপপ্রয়োগ ও বৈষম্যমূলক প্রয়োগের বিরুদ্ধে ভারতের বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রেও লড়বার যে সুযোগ আছে—তাহাও পাশাপাশি গ্রহণ করা হইবে।

(৩) পূর্ব্ব সত্যাগ্রহের জন্য অভিযুক্ত হইয়া যাঁহারা মামলা চালাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদিগকে সংঘ হইতে নূতন সত্যাগ্রহে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হইতেছে—তাঁহারা আজ মামলা না চালাইয়া—নূতন সত্যাগ্রহ অনুসারে বৈষম্যমূলক ভাবে প্রদত্ত সরকারের দণ্ড বরণ করিয়া অধিকার অর্জ্জন ও জনমতের ক্ষেত্রগঠন করিবেন। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা মামলা চালাইতেছেন তাঁহারা জামিনে মুক্ত আছেন। এরূপ কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহারা নূতন সত্যাগ্রহের জন্য যেমন নির্দ্দেশ পাইবেন—তেমনি তেমনি তাঁহাদের জামীনদারকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় লড়াই ব্যতীত নিম্ন লিখিত অবস্থাগুলিতেও বিচার বিভাগীয় পথে লড়া হইবে ঃ—

(ক) সংঘের যে সমস্ত কর্ম্মীকে অন্য বিবিধ কাজের জন্য সত্যাগ্রহে যোগ দিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং তদনুসারে তাঁহারা সত্যাগ্রহে যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের উপর সত্যাগ্রহ করার অভিযোগ আনা হইলে—সেরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করিতে ও তাঁহাদের উপর ন্যায্য কাজ অব্যাহত রাখিলে মামলা লড়া হইবে।

(খ) যে সমস্ত সত্যাগ্রহী বা কর্ম্মীর উপর হিংসাত্মক বা অবাঞ্ছিত অপরাধের দোষারোপ করিয়া মামলা করা হইবে—তাহাদের মামলা লড়া হইবে।

উপরোক্ত দুই ধারায় সত্যাগ্রহের কাজ চলিবে। একটিতে দণ্ড বরণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ সত্যাগ্রহ পালন করা হইবে—অন্যটিকে অন্যায় আইন ভঙ্গ করিয়া বিচার বিভাগের পথে অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে লড়িয়া ভারতীয় বিধানতন্ত্রে প্রদত্ত নিজেদের জন-অধিকার অর্জ্জনের কার্য্যক্রম অনুসরণ করা হইবে।

এই দুই ধারার কার্য্যক্রম সম্বন্ধে সংঘ হইতে যাহাকে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে—সেই সত্যাগ্রহী সেই মত কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কার্য্যতালিকা নিম্নলিখিত ক্রমে নির্দ্ধারিত হইতেছে ঃ—

তাহারাই বাহিরে আসিয়াও সেই মনোভাবে দেশের জীবন অতিষ্ঠ করিতেছে; কিন্তু কংগ্রেস কঠোর হস্তে এই উৎপাত দমন করিতে উদাসীন রহিয়াছেন। কল্যাণী কংগ্রেস তাহারই পরিচয়। কংগ্রেসে এই উৎপাতের উৎপত্তি কেন্দ্র কে তাহাই আলোচনা করিতেছি।

কংগ্রেসে যাহাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যপুনর্গঠনের নীতি ও ইহাতে কার্য্যকরী করার জন্য ভারত গভর্মেন্ট কর্ত্তৃক কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা স্বীকৃত না হয় তাহার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বিহারের কতিশয় প্রতিনিধি বহু সংখ্যক অতিরিক্ত লোক (যাঁহারা প্রতিনিধি নহেন), সম্ভবতঃ ভাড়াটে লোক লইয়া ইহার বিরোধিতা করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটী বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে—বিহারের অন্তর্গত উত্তর বিহারের মিথিলার কয়েক সহস্র কংগ্রেসকর্ম্মী সম্প্রতি পৃথক মিথিলা প্রদেশ গঠনের জন্য দাবী ও সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন কংগ্রেস প্রতিনিধি যাহারা এই দাবী উত্থাপনের জন্য এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব সমর্থনের জন্য কল্যাণীতে যাইতেছিলেন, বিহার সরকারের যোগাযোগে তাহাদের আসানসোলে আটক করানো হয়। এই ব্যাপার বিহার সরকারের সাম্রাজ্যবাদী আচরণের বিরুদ্ধে বিহারের একটা বিরাট অংশ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে।

সুতরাং একদিকে সীমা কমিশনের বিরুদ্ধে বিহারের পক্ষে আন্দোলনের চেষ্টা অন্যদিকে সীমা কমিশনকে সমর্থন করিয়া স্বতন্ত্র মিথিলা গঠনের যে দাবী তাহার প্রতি অবৈধ দমনকারী লইয়া বিহারের মধ্যে ঘোরতর বিরোধী লড়াই এই মিলিয়া কংগ্রেসের কল্যাণী অধিবেশন নষ্ট অকল্যাণের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এই ব্যাপার লইয়া বিহারের যে সকল অন্যায় আচরণ সমস্ত ভারতের চক্ষে মূর্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ দীর্ঘ ও বিচিত্র—তাহা অন্যবারের জন্য রহিল। কিন্তু এই সীমা কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একমাত্র বিহারের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধিই বিরোধিতা করেন। এবং ইহা উল্লেখযোগ্য যে—অন্যদিকে ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে আগত সমস্ত প্রতিনিধিরা একবাক্যে এই রাজ্যপুনর্গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন—কি বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে, কি প্রকাশ্য অধিবেশনে।

এই ব্যাপারে এই সমস্ত বিহারের প্রতিনিধিরা তাহাদের যে আচরণ ও মনোভাব প্রকাশ করেন তাহা এরূপ নিন্দার্হ ও গ্লানিজনক রূপ পরিগ্রহ করে যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত প্রতিনিধিরা সমস্বরে তাহাদের ধিক্কার দিতে থাকে। **প্রকাশ্য অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া বাংলাতে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে মানভূমের টুসু-সত্যাগ্রহের উল্লেখ করিয়া বলেন যে—বাংলাতে লক্ষ লক্ষ বিহারী রহিয়াছেন কিন্তু বাংলা গবর্মেন্ট তাহাদের ভাষা বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন দিনই হস্তক্ষেপ তো করেনই নাই বরং তাহার বিকাশের জন্যই সমস্ত সুযোগ দিয়াছেন আর বিহার গবর্মেন্ট মানভূমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে দাবাইবার জন্য অবাধে পীড়ন নীতি চালাইতেছেন। তাঁহার এই বক্তৃতার প্রারম্ভ হইতেই বিহারের কয়েকজন প্রতিনিধিই কেবল এই বলিয়া চীৎকার করে যে—তাহারা বাংলায় বক্তৃতা শুনিবেন না।** সভাপতি পণ্ডিত নেহেরু তাহাদের আচরণে তাহাদের এই বলিয়া প্রকাশ্যে তিরস্কার করিতে বাধ্য হন যে—তাহারা বাংলায় বক্তৃতা শুনিতে না চাহিলে সভাক্ষেত্র

হইতে যেন বাহির হইয়া যান এবং বাংলা শিখিয়া যেন কংগ্রেসে আসিয়া যোগ দেন। বিহারের উপদ্রব নানাভাবে এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, এ সকল বিষয়ে উদাসীন শ্রীজওহরলালকেও বিহারের বিরুদ্ধে কঠোর আচরণ না করিয়া উপায় ছিল না।

আমরা বিহারের কতিপয় প্রতিনিধির আচরণের সামান্য নমুনা উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। ইহাদের মুখপাত্ররূপে শাহ মহম্মদ ওমরের গরম বক্তৃতা ও শ্রীজগৎনারায়ণ লাল প্রভৃতির অতি নিম্নস্তরের ভাষণ ও তাহাদের অনুচরদের আচরণ বিহারের সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ খানিকটা সম্বন্ধ ভারতবর্ষের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৬

সত্যাগ্রহের দ্বারা জনঅধিকার প্রতিষ্ঠিত

সত্যাগ্রহীদের সংকল্প আজ জয়যুক্ত

জনশক্তি তথা সত্যাগ্রহের সম্মুখীন হইতে সাম্রাজ্যবাদী বিহার সরকার সম্পূর্ণরূপে ভীত, যুক্তি ও জনশক্তির সামনে নিরাপত্তা আইন নামধারী অবাস্তব অন্যায় আইনের স্বরূপ উদঘাটিত

দিকে দিকে সত্যাগ্রহী চারণের দল সত্যের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর

আরো জরুরী অবস্থার জন্য বিরাট বাহিনী নির্দ্দেশের অপেক্ষায়

হাজার হাজার সত্যাগ্রহীর মধ্যে মাত্র শতখানেক বা আর কিছু লোকের উপর ছাড়া বেশী লোকের উপর এ পর্য্যন্ত মামলা বা শমন জারী করিতে সরকারের সাহস হয় নাই

বিগত ৩রা জানুয়ারী হইতে লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে টুসুর গানের দল বহির্গত হয়। জানুয়ারী মাসের সমাপ্তির সঙ্গে প্রায় একমাস কাল টুসুর গানের সময় পার হইয়াছে।

সরকার ৯ই হইতে ১৩ই জানুয়ারীর মধ্যে সত্যাগ্রহীদের মাত্র তিনটি দলকে ধরিয়াই আর ধরিতে সাহস করিলেন না। এই তিন দলকে ধরা মাত্রই সমগ্র সদর মানভূম ব্যাপী থানায় থানায় দলের পর দল সহরে ও গ্রামে টুসুর গানে সত্যাগ্রহ করিয়া চলিয়াছে—সরকার ধরিতে ভীত হইয়াছেন।

প্রথমতঃ, লক্ষ লক্ষ লোকের যে বিরাট টুসু-পর্বের প্রতি সরকার নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের হুমকি দেখাইয়া ছিলেন—হুমকি সত্ত্বেও জনগণ এই তথাকথিত আইন প্রয়োগের

বিরুদ্ধে পর্ব্ব উদ্‌যাপনে অগ্রসর হন—জনগণের এই বিরাট পর্ব্বে এই আইন প্রয়োগ করিতে সরকার শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হন। তাহার মধ্যেই প্রথমে জেলাবাসীর অবিসংবাদী জনশক্তির ও জনঅধিকারের জয় হয়।

দ্বিতীয়ঃ আবার সরকার যখন আইনের যথার্থ প্রয়োগ ছাড়িয়া হিন্দীসাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে বৈষম্যমূলক ভাবে লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদের উপরেই প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন—এখানেও সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। দুই তিন দলকে ধরিতেই শত শত সত্যাগ্রহীর দল বিরাট ক্ষেত্রব্যাপী থানায় থানায় ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া পড়িল। তিন দলকে সত্যাগ্রহ কালে ধরিয়াই সরকার পিটাইয়া গেলেন। ধরা বন্ধ হইল। এক্ষেত্রেও জেলার গণশক্তির—সত্যাগ্রহ শক্তির জেলাবাসীর জয় হইল।

বিরাট সত্যাগ্রহ শক্তির সম্মুখে সরকারী পরাজয় ঃ গ্রেপ্তারে সাহস নাই

ইহার ভিতরেই বুঝা গেল যে, তথাকথিত নিরাপত্তা আইনের তথাকথিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সরকারের মাথাব্যথাও যেমন ছিল না এবং ভ্রান্ত অহমিকার বশে ইহা থাকিলেও তাহা করার সাধ্যও সরকারের ছিল না। কিন্তু একটি আসল অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সরকারের নিকট পরিষ্কার ছিল—সীমা কমিশনের প্রাক্কালে যে কোনো আইনের দোহাই দিয়া লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীদের ধরিয়া জেলে পুরিয়া নিজেদের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ব্যর্থতা মিথ্যাপূর্ণ নগ্ন অপচেষ্টা সমূহে সাধন করা। সরকারের অন্তরের বাসনা সুযোগ বুঝিয়া সহসা রূপ পরিগ্রহ করিল, কিন্তু বিভ্রান্তি বশতঃ সরকারের খেয়াল ছিল না—কি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মীর ইহার যোগ্য উত্তর দিলেন। সরকার কর্ম্মীদের ধরিতে ধরিতেই—মাত্র তিনটি দলকে ধরিতেই দুই তিন দিনের মধ্যেই জেলার সহস্র সহস্র কর্ম্মী দলের পর দল সহরে সহরে থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে টুসুর গানের সত্যাগ্রহে আকাশ বাতাস আলোকিত করিয়া তুলিল। সরকার সত্যাগ্রহীদের কয়েকটি মাত্র দলকে গ্রেপ্তার করিয়া চুপ করিয়া গেলেন। বিবাট সত্যাগ্রহ শক্তির সামনে সরকার শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইলেন। দীর্ঘ এই একমাস ধরিয়া সহস্র সহস্র কর্ম্মী শত শত দলে সত্যাগ্রহ করিয়াছে—তাহাদের ধরিবার সাহস আর হয় নাই। পুরুলিয়া সহরেই তিন সপ্তাহ কাল ধরিয়া সত্যাগ্রহীর কত দল কত শত শত কর্ম্মী দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ করিল। তাহাদের কয়জনকে সরকার ধরিতে সাহস করিলেন।

অবশেষে খিড়কীর পথে তথাপি তাহাতেও সাহস নাই

কিন্তু সরকারের পক্ষে একটা মুখ রক্ষার অভিনয়ও করিতে হইবে। এবং তাহার ভিতর দিয়া যতটা কার্য্যসাধন করিতে পারা যায়। তাই খিড়কীর দরজা পথে জনকতক কর্ম্মীকে আইনে ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। বিরাট সত্যাগ্রহীদলকে সোজাসুজি ধরিবার ক্ষমতা না-হওয়ায় বাছিয়া বাছিয়া বুঝিয়া শুনিয়া প্রয়োজন মত মাত্র জন কতক কর্মীর নামে

নিরাপত্তা আইনের এবং আরো দুই চারি রকমের আইনের ধারা প্রয়োগ হইতে লাগিল এবং তদনুসারে শমন হাজির হইতে লাগিল। সংঘ হইতে আমরা স্থির করিলাম যে, গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত শমন প্রভৃতি সরকারী কোনো নির্দ্দেশ বা কোনো কিছু গ্রাহ্য করা হইবে না—যাহাদের নামে মিথ্যা করিয়া মামলা করা হইয়াছে বোধকরা যাইবে—এবং যাহাদের মারফত মামলা লড়িয়া বিচারের স্বরূপ উদঘাটিত করিতে হইবে—তাহাদের ছাড়া অপর সকলে পূর্ণাঙ্গ সত্যাগ্রহ অনুসরণ করিবেন—তাহারা জামিন বা মোকদ্দমার পথ অনুসরণ করিবেন না। গ্রেপ্তারে বিমুখ সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে আমরা যেমন আরো দৃঢ়তর পথ লইলাম—সরকারের শমন দেওয়ার উৎসাহও কমিয়া গেল। এক মাসের মধ্যে হাজার হাজার সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাত্র শতখানেক কর্ম্মীর নামে শমন জারী করার সাহস হইয়াছে। দীর্ঘ এক মাসের ঘটনা সমূহের জন্য সহস্র সহস্র শমন জারীর যথেষ্ট অবকাশ ছিল। যাহা ছিল না তাহা সাহস। আমরা জানি—এখনো বুঝিয়া শুনিয়া দরকার মত—ব্যবস্থাপক শ্রেণীর কর্ম্মীদের দুইদশ জনের উপর শমন জারী হইবে। আইনকে যথাযথ প্রয়োগ না করিয়া এইভাবে প্রয়োগ করার মধ্যে আইন প্রয়োগ কারীদের বৈষম্যমূলক উদ্দেশ্য কি আছে এবং আইনের ব্যবস্থা প্রয়োগে তাহাদের কর্ম্মতৎপরতার রূপ কি তাহার হিসাবও লইতে হইবে। এবং তাহার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও প্রয়োজন ঘটিতে পারে এবং তাহার লক্ষ্যে গণদাবীও উত্থিত হইতে পারে।

নিরাপত্তা আইন বিষয়ে আমাদের সংকল্প

স্বৈরাচারের অস্ত্র স্বরূপ তথাকথিত আইন এই নিরাপত্তা আইনের বাধাকে ধূলিসাৎ করিয়া আমরা আমাদের শোভাযাত্রার কাজ অবাধে চালাইয়া যাইতেছি। টুসু-পর্ব্বের অধিকার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা অবাধে তাহার কাজ চালাইয়া যাইতেছি। শোভাযাত্রা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও সরকার অপারগ হইয়াছেন। আইন হাতে আছে তাই পরাজয়ের আক্রোশে খিড়কীর দরজা পথে জনকতকের উপর সরকার মামলা করিতেছেন মাত্র। ইহাতে আমাদের অধিকারের জন্য অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। খিড়কীর পথে এই অবিচারের দ্বারা সরকার নিজেই জনগণের নিকট বিরাগ ভাজন হইবেন—জনশক্তিকে আরো সচেতন ও জন জীবনকে কর্ম্মে আরো দৃঢ় করিবেন।

টুসু পর্ব্বের কার্য্যধারা উদ্‌যাপিত হইয়া আসিলেও স্বৈরাচারের অস্ত্র এই নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম স্থায়ীভাবে জাগ্রত ও অব্যাহত থাকিবে এবং জনশক্তি ও সত্যাগ্রহের বলে আমরা আমাদের কাজ উদ্‌যাপন করিয়া চলিব—ইহাই আমাদের সংকল্প।

অতুলচন্দ্র ঘোষ

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৭

টুসুর গানে সত্যাগ্রহের পরবর্ত্তী রূপ

তৃতীয় পর্য্যায়ের কর্ম্মতালিকা

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মত এই সত্যাগ্রহ শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত চলিবে

টুসু-পর্ব্বের অধিকার রক্ষায় টুসু গানের কার্য্যকাল পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ উদযাপনের দায়িত্বপূর্ণ সত্যাগ্রহের শক্তিতে একমাস ধরিয়া টুসু পর্ব্বের অবাধ উদযাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত যে সত্যাগ্রহ টুসুর গানের ধারায় চলিতেছে তাহার রূপ যথাসময়ে শীঘ্রই নুতন আকার ধরিবে

সর্ব্বোপরি নিরাপত্তা-আইনের বিরুদ্ধে স্থায়ী সংগ্রাম জারী রহিল

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মত শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত টুসুর গানে সত্যাগ্রহের কর্মতালিকা চলিবে। টুসুর গানের পূর্ণ কার্য্যকাল শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত আমরা জনপর্ব্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যায়সঙ্গতভাবেই সত্যাগ্রহ চালাইলাম। কর্মসঙ্গতির প্রয়োজনে টুসুরগানে সত্যাগ্রহের রূপ স্থগিত রাখিতে হইলেও—নিরাপত্তা আইন যতক্ষণ আছে—তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের চলিতে থাকিবে। কারণ জনজীবনের যে দিকগুলি এই আইন বাধা দিতেছে জীবনের সেই দিকগুলি অপরিহার্য। সুতরাং সংগ্রামও অনিবার্য।

সেই জন্য জন-অধিকারের জরুরী বিষয় লইয়া ব্যাপক ক্ষেত্রে জনগণের সহিত সংযোগের প্রয়োজনে নিরাপত্তা-আইন উপেক্ষা করিয়া আমাদের নূতন কর্ম্মতালিকা যথাকালে শীঘ্রই দেখা দিবে। তাহার ক্ষেত্রপ্রস্তুতির পথে আমরা অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বোপরি আমাদের সিদ্ধান্ত—নিরাপত্তা-আইনের বিরুদ্ধে আমাদের স্থায়ী সংগ্রাম জারী রহিল।

টুসু-পর্ব্বের কার্য্যকাল ও আমাদের সিদ্ধান্ত

সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত জনসাধারণ টুসুর গান গাহিয়া থাকেন। টুসুর গানের প্রতি সরকারী হস্তক্ষেপ হওয়ায় আমরা টুসু-পর্ব্বের অধিকার রক্ষায় সত্যাগ্রহে অগ্রসর হইয়াছিলাম। এবং টুসুর গান উদযাপনের কার্য্যকাল শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহের সময় ধার্য্য করিয়াছিলাম। সুতরাং শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্তই চলিবে। আমরা আজ কয়েক বৎসর যাবত এই নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছি—এবং যখন যেমন সভা শোভাযাত্রা করার প্রয়োজন হয়, তাহা উদযাপিত করিতে নিয়তই আমরা তথাকথিত নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া আমাদের কাজ উদযাপিত ধরিয়া আসিতেছি—এবং এই ভাবেই আমাদের কাজ চলিবে। এবং তাহাব

জন্য যখন যাহা মূল্য দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে আমরা দিয়া আসিতেছি—আমরা দিয়াও যাইব। বরাবরকার, এই সিদ্ধাত অনুসারে টুসু-পর্ব্বের উৎস গানের প্রয়োজনেও আমরা এই তথাকথিত নিরাপত্তা আইন ভঙ্গ করিয়া বিরাট সত্যাগ্রহ করিলাম। আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলাম এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া দিকে দিকে পূর্ণভাবে পর্ব্ব উদযাপিত করিলাম। সরকারও এই পর্ব্ব উদযাপনের সময়ে প্রথম দিকে দুই এক ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আর ধরিতে সাহস করেন নাই। আমাদের কাজ অবাধে আমরা চালাইলাম। সুতরাং এখন এই পর্য্যন্ত আসিয়াই এই পর্ব্ব স্থাগিত রাখা সঙ্গত হইবে। সত্যাগ্রহের সাফল্যের পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন টুসুর কার্য্যকালের অতিরিক্ত এবিষয়কে টানিয়া লইয়া যাওয়ায় প্রয়োজনীয়তা এখন আমরা দেখিতেছি না। তবে আগাগোড়া যদি সরকার সমস্ত সত্যাগ্রহী দলকে ধরিয়া যাইতেন তাহা হইলে এই সংগ্রাম টুসুর পর্ব্ব উদযাপনেই সীমাবদ্ধ থাকিত না—সংগ্রাম অন্যরূপ লইত এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সংগ্রাম দেখা দিত। প্রথম পর্য্যায়েতেই সরকারের পরাজয়ে সে অবস্থা উদ্ভবের অবকাশ হইল না। সুতরাং জনশক্তির বিজয়ের মধ্যে টুসুর পর্ব্ব উপলক্ষ্য করিয়া গৌরবময় সত্যাগ্রহের যে ইতিহাস গড়িল আপাততঃ তাহা শেষ পরিচ্ছেদ লাভ করিতেছে। জনসাধারণ টুসুর গানগুলি গানের দৃষ্টিতে প্রয়োজনমত গাহিবেন। টুসু-পর্ব্বের আকারে—পর্ব উদযাপনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের রূপে টুসুর গানের প্রয়োজনীয়তা এখন শেষ হইল—আমরা বোধ করিতেছি।

•তৃতীয় পর্য্যায়ের কর্মতালিকা

সুতরাং ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পর্য্যায় শেষ হওয়ার পর ২৭শে জানুয়ারী হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত তৃতীয় পর্য্যায়ের কর্মতালিকারূপে যে কর্মধারা অনুসরণের নির্দ্দেশ পাইয়া কাজ চলিতেছে ও চলিবে তাহা এই ঃ—

(১) থানায় থানায় কর্মরত সত্যাগ্রহী চাবণদল শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইবেন।

(২)পুরুলিয়া সহরে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুই একটি দলের সত্যাগ্রহ চলিতে থাকিবে।

(৩) সত্যাগ্রহীদের মধ্যে যাহাদের নামে সমন জারী করা হইবে—তাঁহাদের মধ্যে যাহাদের প্রতি সমন প্রত্যাহার রূপ সত্যাগ্রহের অনুমতি থাকিবে তাঁহারা সেই সত্যাগ্রহ অনুসরণ করিয়া চলিবেন। যাহাদের মারফত মোকদ্দমা চালান প্রয়োজন মনে করা যাইবে—তাহাদের দ্বারা মামলা চালান হইবে।

আগামী কর্ম্মতালিকা তথা স্থায়ী সত্যাগ্রহের সংকল্প

ইহা ব্যতীত সর্বদা প্রয়োজনে নিরাপত্তা আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত জারী রহিল। এবং যে কোনো প্রয়োজনের জন্য সত্যাগ্রহীর বিরাট বাহিনী নির্দ্দেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত রহিল।

অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপত্তা-আইন বিষয়ে সংঘের সংকল্প

জেলাব্যাপী সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহীকে ধরিতে সাহস না করিয়া তালিকা বাছিয়া অবাঞ্ছিত গোপন পথে দুইদশজনকে ধরায় যে পথ সরকার লইয়াছেন তাহা দ্বারা আমাদের জনপর্ব্ব উদযাপনের কাজ ব্যাহত করিতে পারে নাই—আজও পারিতেছে না। সুতরাং টুসুর গানের অধিকার আজ জেলায় প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হইলেও নিরাপত্তা আইন এখনো জীবিত, সুতরাং যতদিন না নিরাপত্তা আইনের এই স্বৈরাচারী অপপ্রয়োগ পূর্ণরূপে ধুলিসাৎ হইতেছে—ততদিন নিয়ত এই পাশ আইনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম জারী থাকিবে।

অমারা গণশক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় এখনো দিই নাই। সামগ্রিক সংগ্রামের আহ্বান আসিলে জেলায় দুর্জয় আত্মবলের পরিচয় সেদিন লাভ হইবে। বন্দেমাতরম্

বিনীত—অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক-সেবক-সংঘ, মানভূম

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৮

টুসুর গানে সত্যাগ্রহের সংবাদ সমূহ

দিকে দিকে সত্যাগ্রহ অভিযান

থানায় থানায় সত্যাগ্রহের বাণী লইয়া কর্ম্মরত বহু চারণদল

মানভূমের দিকে দিকে সত্যাগ্রহের বাণীতে জনগণের দাবী মুখরিত

১৩ই জানুয়ারী হইতে এপর্য্যন্ত পুরুলিয়া সহরে প্রত্যহ সত্যাগ্রহের অভিযান অনুষ্ঠিত

১লা ফেব্রুয়ারী সত্যাগ্রহী প্রথম দলের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ ঘোষণা

সংঘের কারারুদ্ধ নেতা ও কর্ম্মীগণ

সত্যাগ্রহের নূতন কর্ম্মধারা অনুসারে সংঘের পরিচালক সহ যে সত্যাগ্রহীরা জামিন পরিহার করিয়া কারাবরণ করিয়া বর্ত্তমানে পুরুলিয়া জেলে আছেন তাঁহাদের নাম ও কারাগমনের তারিখ দেওয়া হইতেছে। তাহা এই ঃ—

২২শে জানুয়ারী

(১) শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষ (২) শ্রীভজহরি মাহাত (এম. পি)

২৩শে জানুয়ারী

(১) শ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ (পরিচালক লোকসেবক সংঘ) (২) শ্রী কাজল সেন (৩) শ্রী হরিপদ সহিস (৪) শ্রী সহদেব সহিস (৫) শ্রী আনন্দ মাহাত (৬) শ্রী অযুদ্ধরতন মাহাত (৭) শ্রী সুধন্বা মাহাত (৮) শ্রী হীরু সিং সর্দ্দার (৯) শ্রী ভজহরি মাহাত (১০) শ্রী রাধানাথ মাহাত (১১) শ্রী চন্দ্রমোহন দত্ত।

২৫শে জানুয়ারী

(১) শ্রী সমরেশনাথ ওঝা (এম.এল.এ) (২) শ্রী কুশধ্বজ মাহাত (৩) শ্রীকালীরাম মাহাত (৪) শ্রীমতী ভাবিনী দেবী।

৩০শে জানুয়ারী

(১) শেখ কেয়ামৎ আনসারী (২) শেখ মিএাজান আনসারী (৩) শ্রীদুর্গাচরণ মাঝি (৪) প্রহলাদচন্দ্র গরাঞে (৫) শ্রী ভীমদাস গোস্বামী (৬)শ্রীনকুলচন্দ্র মাঝি (৭) শ্রী অরুণচন্দ্র মাঝি (৮) শ্রীবুচন মাহাত (৯) নূতন মাঝি (১০) অরুণ মাহাত (১১) শ্রীনগেন্দ্রনাথ মাহাত (১২) শ্রী নকুলচন্দ্র মাঝি।

অন্য জনসভা হইতে শোভাযাত্রা সহকারে সদর রাস্তায় আসিবার সময় দলের পরিচালক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মাহাত পুলিশ কর্তৃক সদর থানায় সম্মুখে ধৃত হইয়াছেন।

কয়েকজন সত্যাগ্রহীর প্রতি কারাদণ্ডাদেশ

উপরোক্ত যে সকল সত্যাগ্রহী ৩০শে জানুয়ারী কারাবরণ করে—তাঁহাদের ১২ জনের প্রত্যেককে গত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর, বি, সিংহ সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০০্ টাকা করিয়া জরিমানা—ঋণ অনাদায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দান করেন। আদেশ দানের অব্যবহিত পরেই সত্যাগ্রহীদের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পুলিশ ট্রাকে কারাগারের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। সত্যাগ্রহীরা যাইবার সময় 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ' 'বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ' সত্যাগ্রহের জয়, বাংলা ভাষার জয় ধ্বনি দিতে থাকেন। আদালতে সমবেশ জনতার অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন

১০ই ফেব্রুয়ারী প্রথম বৈঠক সুরু

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের প্রথম বৈঠক সুরু হইবে বলিয়া জানা গিয়েছে।

কমিশনের সভপতি—মিঃ ফজাল আলি উড়িয্যার গভর্ণরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দিল্লী আসিয়াছেন। অন্যান্য দুই জন সদস্য শ্রীপাণিক্কর এবং ডাঃ কুঞ্জরু উভয়ের দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রী পি. সি, চৌধুরী এই কমিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। উনি প্রথমে বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন এবং মানভূম জিলাতেও তিনি এক সময় জিলা জজ ছিলেন। পরে তিনি ভারত গবর্মেন্টের ব্রডকাস্টিং অর্থাৎ বেতারে প্রচাব বিভাগের অধিকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

কমিশনের নিকট মেমোরাণ্ডাম অর্থাৎ স্মারকলিপি দাখিল করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্মেন্ট সরকারী ভাবে ব্যবস্থা করিতেছেন।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ৯

সরকারী আইন প্রয়োগের স্বরূপ উদঘাটিত

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদ্ভব

যে কোনো ভাবে ধরিবার অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্যে কর্ম্মীদের উপর সর্ব্বপ্রথম অন্য আইনের প্রয়োগ

মিথ্যা অভিযোগ ব্যর্থ হইলে অভিযোগ প্রত্যাহৃত ও নিরাপত্তা আইনের আশ্রয় গ্রহণ

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট—নিরাপত্তা আইনের দোহাই অজুহাত মাত্র

নিরাপত্তা আইনের মর্য্যাদা রক্ষার বিষয়ে সরকার আজ দায়িত্বের মস্ত বড় বড় কথা তুলিতেছেন। কিন্তু টুসুর গানের দলকে প্রথম ধরার সময় নিরাপত্তা আইনের খেয়ালও তাঁহাদের ছিল না এবং প্রয়োগ করাও হয নাই; ধরিবার ষড়যন্ত্র স্বরূপে মিথ্যা অভিযোগে অন্য আইনের ধারা প্রয়োগ করিয়া জনগণের নাগরিক অধিকার হরণ করা হইয়াছিল। প্রথম অভিযোগ তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়া সরকার নিজের ষড়যন্ত্র ও নিরাপত্তা আইনের ধুয়া তোলার সত্যকার স্বরূপ উদঘাটিত করিয়াছেন মাত্র।

মিথ্যা ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটিত : নিরাপত্তা আইন অজুহাত মাত্র

বর্তমানে এত যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে নিরাপত্তা আইনের ধুয়াটাই সরকারের নিকট প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সরকার বর্তমানে যে নিরাপত্তা আইনের অজুহাত তুলিয়াছেন—ইহা যে নিতান্তই অজুহাত—অন্য আইন প্রয়োগের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর, নিরাপত্তা আইনের ধুয়া উঠান হইল তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ একটি ঘটনার মূর্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম টুসুর গানের দল সরকার হইতে ধরা হয় রঘুনাথপুরে। শান্তিভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে কর্ম্মীদের নামে ১০৭ ও ১৫১ ধারা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সরকারী আইনজ্ঞদের পরামর্শে ঐ সকল আইনের ধারা ছাড়িয়া নিরাপত্তা আইনের অজুহাতের উদ্ভব করা হয়। এবং অবশেষে ১০৭ ধারা এবং ১৫১ তুলিয়া লইয়া সরকার কর্ম্মীদের মিথ্যা আটক করার ও নিজের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ নিজেই উদ্‌ঘাটন করেন। টুসুর

গান সম্পর্কে প্রথম মামলাটি নিরাপত্তা আইনে না-হওয়া এবং তাহা তুলিয়া লইতে বাধ্য হওয়ায় এই সমগ্র ব্যাপারটি বিরাট সত্যাগ্রহ ব্যাপার তথা সরকারী দমনের ব্যাপারের মধ্যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইয়াছে। এবং নিরাপত্তা আইনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ১০৭ বা ১৫১ যেমন লোক-সেবক-সংঘের কর্ম্মী দমনের ব্যর্থ ষড়যন্ত্র রূপে খাড়া করা হইয়াছিল—তেমনি নিরাপত্তা আইনকেও সেই উদ্দেশ্যেই নিতান্ত হাস্যকর ভাবে খাড়া করা হইয়াছে। সীমা কমিশনের ভীতিতে বিহার সরকার টুসুর গান ব্যাপারে যে সকল অপকীর্তি করিয়াছেন বা করিতেছেন—সমগ্র অবস্থাটির বিচার কালে টুসুর গানে প্রথম ধৃত দল সম্পর্কিত এই ঘটনাটিও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু হইবে।

লাঠির জোর থাকিলেই আইন হয় না—তকমাধারী হইলেই শাসক হয় না

সরকারের পক্ষ হইতে গ্রেপ্তারের কৈফিয়ত স্বরূপ আইন ভঙ্গের অজুহাত তোলা হইতেছে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আইনপ্রণয়ণকারীগণ অভ্রান্ত কোনো দেবতা নহেন এবং আইনেব নামে অবাস্তব কিছু খাড়া করিলেই তাহা আইন রূপে গণ্য করা যায় না। আইনের উদ্দেশ্য থাকা চাই—যুক্তি থাকা চাই—প্রয়োগের মধ্যে ভদ্র তথা বিচারশীল মনোভাব থাকা চাই। **শাসনের তক্তায় উপবিষ্ট কতকগুলি উৎপাতকারীর অন্যায় মুদ্‌গর চালনার নাম আইন হয় না। এবং শাসনের তকমাধারী হইলেই শাসনকারী হয় না। এই বিশ্বসংসার শাসনের নামে বহু উপদ্রবের রাজত্ব, বহু জুলুমের রাজত্বও দেখিয়াছে। শাসনকারীকে সুশাসনের পরিচয় দিতে হইবে। ইংরাজ আমলেও ইংরাজেরা এমন বহু আইন কারিয়াছিল, গান্ধীজী সেই সকল আইন, আইন হিসাবে বর্জ্জনীয় এবং যুক্তিহীন মনে করিয়া প্রতিরোধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।** গান্ধীজী তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়া সুবিচারের দাবী যাহারা করে তাহাদের কাছে উত্তরও আশা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যুক্তি ও জনদাবীর যৌক্তিকতা সরকার সুবিচারক হইলে আন্তরিকতার সহিত শুনিতে চাহিবেন ও সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন। আজ আমাদের এই সত্যাগ্রহের দাবীর মধ্যে যে সকল যুক্তি ও বিচাব লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছি—তাহার কোনোটিরই উত্তর জনসরকার নামে কথিত এই বিহার সরকার দিতে পারে নাই এবং দিবার চেষ্টা করার মত মনোভাবও নাই। জনমতকে বহুজনের দাবীকে গ্রাহ্য করিবার মত অন্তরের স্বাচ্ছন্দ্য জনবিরোধী এই কংগ্রেস সরকারের নাই। সেই জন্য এই সরকার আজ স্বৈরাচারী বলিয়া অভিহিত

স্বৈরাচারী সরকারের যুক্তি কিছু নাই—আছে অন্যায় দমন ও উপদ্রব

যুক্তির দাবীর সহিত আমরা সত্যাগ্রহ করিতেছি। কিন্তু সরকারী উদ্দেশ্যই যেখানে দমন ও অপপ্রচার সেখানে যুক্তির উত্তরেও দমনেরই প্রকাশ হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু দমন বা অপপ্রচারের দ্বার৷ সত্যকে পরাজিত করিতে পারা পার৷ যায় না। সরকারের যুক্তি কিছু থাকিলে দিতে পারিতেন। কিন্তু যুক্তিও নাই—সে সাহসও নাই। তাহা থাকিলে নিরাপত্তা আইন-নামধারী অন্যায় জুলুমের অস্ত্রস্বরূপ এই আইনের বিরুদ্ধে—সরকারের

অপচেষ্টা সমূহের বিরুদ্ধে—সরকারী বৈষ্যমের বিরুদ্ধে আমরা যে সকল তথ্য, যুক্তি ও সত্য উদঘাটন করিয়াছি—তাহার উত্তর দিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেন। যদি কোনো সরকারের আইনসঙ্গত কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে—জনমতের সম্মুখীন হইবার মত মনোভাব ও সাহস থাকে তবেই এ সকলের প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু যে সরকাব সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত নীতি বিসর্জ্জন দিয়া জনপীড়নে অগ্রসর, তাহার পক্ষে আইনের নামে জুলুমই স্বাভাবিক। তথাপি জনগণের যে দাবী যে যুক্তিসঙ্গত অভিমত—সরকারের নিকট হইতে তাহার উত্তর চাহিবার অধিকার জনগণের আছে। দমন ছাড়া সরকারের কোনো উত্তর আছে কি?

আসল বেআইনী কাজের প্রতি দৃষ্টি নাইঃ জনগণের ন্যায়সঙ্গত কাজের উপর অন্যায় দমন

শাসনের অধীনে চারিদিকে আজ দুর্নীতি ও আইন বিরোধী অন্যায়ের স্রোত চলিয়াছে। তাহার প্রতি সরকারের লক্ষ্য নাই। শুধু লক্ষ্য নাই তাহাই নহে—সরকার বহু ভাবে এই সকল দুর্নীতি ও বেআইনী কাজের প্রস্তুতকারী হইয়াছেন। অথচ সেই সরকারই আজ জনগণের ন্যায় সঙ্গত যুক্তিকে ও দাবীকে উপক্ষা করিয়া নিরাপত্তা আইন রক্ষায় অজুহাত তুলিয়া জন অধিকার দমন করিয়া আইনের যথার্থ মর্য্যাদাকে ধূলি মলিন করিয়াছেন নিজেদের—জীবনে কলঙ্কের ইতিহাস রচিত করিতেছেন।

সত্যাগ্রহে জনশক্তি ও সত্যাগ্রহের প্রাণশক্তি

জনবিরোধী সরকার দমনের রাজত্ব চালাইতে চেষ্টা করিলে কি হইবে? জনশক্তি তাহাকে ব্যর্থ করিয়াছে। জনঅধিকার সত্যাগ্রহের শক্তিকে জয়যুক্ত হইয়াছে। যুক্তি ও সত্যাগ্রহের শক্তির সঙ্গে বিরাট জনমত প্রকাশ হইয়াছে। এই সত্যাগ্রহ গ্রামে ঘরে নগরে প্রান্তরে হাটে মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থনে অভিনন্দিত ও প্রাণবান হইয়াছে। তাহার উপর মানভূমের দুইজন পার্লামেন্ট সদস্য ও ৭জন আইন সভার সদস্য এই সত্যাগ্রহ যোগদান করিয়া প্রতিনিধিত্বের অধিকারে ও যুক্তির অধিকারে মানভূমের লক্ষ লক্ষ্য জনগণের দাবীকে মূর্ত্ত করিয়াছেন। সরকারের অন্যায় দমনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের বিরাট প্রাণশক্তি জয়যুক্ত হইয়াছে ও বিজয়ী হইবেই—ইহা অবধারিত।

৩.২.৫৪ নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ।

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ১০

আইন প্রয়োগে কারসাজীসমূহ

সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহী যাহারা তথাকথিত আইন ভঙ্গ করিয়া জেল বরণ করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকে সত্যাগ্রহকালে ধরিতে সরকারের সাহস হয় নাই, পরে মাত্র

জনকয়েকের নামে নিরাপত্তা আইনের সমন, মামলা, গ্রেপ্তার প্রভৃতি হইয়াছে—কিন্তু এ সকলের মধ্যেও নানা কারসাজি সুরু হইয়াছে। প্রথম প্রথম সরকারের সমন জারী করার উৎসাহ বেশী ছিল-- সত্যাগ্রহীরা সমন অগ্রাহ্য করিয়া গ্রেপ্তারের পথ সুগম করিয়া দিলে গ্রেপ্তার এড়াইতে পুলিসও নানা কারচুপি আরম্ভ করিয়াছে অথচ এ সকল বিষয়েও বিবিধ অপকৌশল অবলম্বন করা হইতেছে---সত্যাগ্রহীরা সমনের নির্দ্দেশ মানিতেছে না। তাহারা প্রচারের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে পুলিস তাহাদের অনেককে ইচ্ছা করিয়া না ধরিয়া এবং অনেককে সত্যাগ্রহ করিতেছে জানিয়াও সত্যাগ্রহ স্থলে না ধরিয়া, কোথাও কোথাও প্রচার করিতেছে- -সত্যাগ্রহীরা ধরা দিতেছে না। শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য চাষ থানায় সম্প্রতি সত্যাগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন---পুলিস জানিয়াও ঘরে গিয়া গ্রামে গিয়া তাঁহাকে পলাতক বলিয়া মিথ্যাপ্রচার করিতেছে। ইহারা তো সর্ব্বসমক্ষে সত্যাগ্রহ করিতেছে—তোমরা ধরো তখন, না-ধরিয়া পরে অপপ্রচার।

সমন জারী করিয়াও ধরিতে সাহস নাই

ধরিতে সাহস নাই কিন্তু সরকারের অভিসন্ধি কিছু লোকের উপর মামলা চালাইয়া রাখা। ইহাতে দেশবাসী তেমন টেরও পাইবে না আর জনমতেরও দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবে না। এবং জনকতক কর্ম্মী হয়রাণ হইতে থাকিবে। কিন্তু সমন জারী হইলেও না-ধরা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করা হইবে না—আমাদের সংঘের এই সিদ্ধান্ত হওয়ায় সরকার মুস্কিলে পড়িয়াছেন। সমন জারী করা সত্ত্বেও, এবং সেই সকল কর্ম্মী উহা প্রত্যাখ্যান করিবার পর উহাদিগকে পাওয়া সত্ত্বেও সরকার হইতে বহু ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ধরা হইতেছে না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। ইহা প্রমাণিত করিতে একটি সুন্দর প্রমাণ দিতেছি—যাহা সত্য বলিয়া সহস্র সহস্র লোক এক মুহূর্তে উপলব্ধি করিবেন। **প্রথম দিকে সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে, সমন না লইলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইবে—সমনের সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকিবে। আমাদের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীকুশধ্বজ মাহাত এবং আরো কয়েকজন এইভাবে ধৃত হইয়াছেন। ইহার পর আমাদেরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অনুমতিপ্রাপ্ত সত্যাগ্রহীগণ সমন গ্রাহ্য না করিয়া কারাবরণ করিবেন। ইহার পর সরকারও বিপদে পড়িয়া কি করিতেছেন তাহা দেখুন। আইন সভার সদস্য আমাদের নেতৃস্থানীয় শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবাই চেনেন। আজ প্রায় পক্ষাধিক কালের উপর হইল তাহার উপর সমন জারী হইয়াছে। প্রথম দিকে তাঁহাকে পুলিস খোঁজে। তিনি পাটনা গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার পর আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি সমন প্রত্যাখ্যান করেন। সমনে পুঞ্চা থানার ভুতাম আশ্রমে পুঞ্চা থানার পুলিস যায়। তিনি সমন প্রত্যাখান করায় উহারা ফিরিয়া যায়। শ্রীশবাবু ভুতামে একদিন অপেক্ষা করেন যে, সমন প্রত্যাখানে হয়তো গ্রেপ্তারের নোটীশ আসিতেছে—সুতরাং ধরা দিতে হইবে। তথাপি পুলিস আর যায় না। তিনি পুরুলিয়া ফিরিয়া আসেন। ২৬শে জানুয়ারী প্রচারপত্রে তাঁহার নাম ঘোষণা করিয়া তিনি পুরুলিয়া সহরে সত্যাগ্রহী দল পরিচালনা করেন। ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। তবু ধরা হইল না। তিনি আবার পুঞ্চা থানা গেলেন।**

সেখানেও ধরা হইল না। তিনি পুরুলিয়া আসিয়া সর্বসমক্ষে ৩০শে জানুয়ারী নিবারণ পার্কে চরকা যজ্ঞে সূতা কাটিবেন। তবু ধরা হইল না। আইনসভাব সদস্য সংঘের নেতৃস্থানীয় শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাতর নামেও সমন জারী হইয়াছে। তিনিও সহরে ঘুবিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি যেদিন পুরুলিয়া হইতে বাহিরে যান পুলিস আমাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—তিনি কোথায়—সমন আছে। তিনি পুরুলিয়া আসিয়া হাজির হইলে পুলিসের আর দেখা নাই। শ্রীভজহরি মাহাত এম, পি এবং শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝা এম, এল, এ জামিন পরিহার করিয়া কারাবরণ করেন। তাহার পর আমাদের অপর সমস্ত এম, পি ও এম, এল, এ, গণ সত্যাগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ধৃত হইলেন না বলিয়া এম, এল, এরা ৩১শে জানুয়ারী রাত্রির ট্রেনে সকলের সামনে পাটনা আইন সভায় যোগ দিতে রওনা হইয়াছিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী আইন সভায় যোগ দিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ধরা হইল না। সাপের ছুঁচো গেলা হইয়াছে। একে তো বেশী লোক ধরিবার সাহস নাই তাহার উপর আইন সভার সদস্য বলিয়াও হয়ত সরকারের ভয়। তবে হয়ত অবশেষে সরকার আইনের মান বাঁচাইবার বিভ্রান্তিতে পড়িয়া পাটনা হইতে এই সদস্যদের পাকড়াও করিয়া আনিয়া আইন রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীর বিষয়ে অবস্থা এই—অথচ সমন না-থাকা সত্ত্বেও অন্য লোককে কি ভাবে ধরা হইতেছে দেখুন।

একটি বে-আইনী গ্রেপ্তার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহতর নামে কয়েকটি মামলা করা হয়—সব কয়টি মামলাতেই তাহার জামিন করাইয়া লওয়া হয়। সে জামিন হইতে মুক্ত হইয়া কোর্ট হইতে শিল্পাশ্রমে ফিরিতে ছিল—সদর থানার পাশ দিয়া যাইবার কালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে আনা হয়। সেখানে দেখা গেল—এই গ্রেপ্তার বে-আইনী হইয়াছে—তখন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারি পরওয়ানা না থাকিলে পুলিস ধরে কি করিয়া? সত্যাগ্রহের ব্যাপারে ইহারা দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন।

পুলিশের আর একটি গুরুতর বে-আইনী কাজ

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কোর্টের জনৈক ইন্সপেক্টার বান্দোয়ানের জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানার বলে পুরুলিয়ায় সত্যাগ্রহী শ্রীবাঁকু মাহাতকে বে-আইনী গ্রেপ্তার করেন। লোক-সেবক-সংঘ হইতে তীব্র আপত্তি জানাইলে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

একটি আদিবাসী মহিলার বিপত্তি

হুড়া থানার একটী আদিবাসী মহিলা যে সরকারী হিন্দী প্রচারের অর্থানুকূল্যে হিন্দী সই শিখিয়া সরকারী যোগাযোগে ছিল তাহার প্রতিও নিরাপত্তা ভঙ্গের সমন জারী হইয়াছে এবং তাহাকে ২০০০ টাকা দেওয়া হইবে এই প্রতারণা করিয়া পুলিস তাহার শ্বশুরবাড়ী

হইতে আনিয়া এখানে হাজতবাসের সমন উপহার প্রদান করিয়াছে—ইহাই সেই মহিলার অভিযোগ। বিভ্রান্ত বুদ্ধি এই বিহার সরকারের যোগাযোগে আজও যে দুই চারিটি লোক আছে তাহাদের পক্ষেও কি বিপদ তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিবেন।

সমনের অস্ত্রও একটি অনাচারের অস্ত্র হইয়াছে

সত্যাগ্রহীরা যখন তৈয়ারী হইয়া যাইতেছে—তখন ধরা হইতেছে না। পরে জনকতকের উপর সমন জারী করিয়া অসময়ে অসুবিধাকর অবস্থায় ধরা হইতেছে—কেহ কেহ মনে করিতেছেন তাঁহারা সত্যাগ্রহ করেন নাই অথচ সমন জারী করা হইতেছে। সমনের নামে এই সকল অনাচার চলিতেছে। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে, আইন আজ বিহার সরকারের হাতে বৈষম্য, ষড়যন্ত্র ও অনাচারের নিছক কারণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। আইনের এই সকল অন্যায় অপব্যবহারের যেমন বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই, তেমনি এই অবিচারী রাজত্বের পূর্ণ অবসান চাই।

৬/২/৫৪ **অরুণচন্দ্র ঘোষ**

টুসুর গানে সত্যাগ্রহ বুলেটিন নং ১১

সত্যাগ্রহের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিযান

অভিযানের বিবরণ ও সংবাদ

আকস্মিক সংগ্রামের মধ্যে জেলার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির পরিচয়

মানভূমে ইতিহাসে নারী জাগরণের নূতন অধ্যায় ঃ বজ্রের তরবারী উভয় দিকে সম ধার

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ

টুসুর গানে সত্যাগ্রহে জেলার শক্তির পরিচয় আর এক ভাবে পাওয়া গেল। যদিও আমরা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিহার সরকারের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জীবনে থাকার জন্য সর্ব্বদাই যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তত আছি---তথাপি টুসুর গানের প্রতি সরকারের দমন আকস্মিক রূপে দেখা দিলেও জেলার কর্ম্মিবৃন্দ মুহূর্ত্তে যোগ্যতার সহিত তাহার সম্মুখীন হইবেন।

আমাদের কেন্দ্রীয় বিভাগ হইতে ব্যবস্থা করার উদ্যোগ কবিতে না করিতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে জেলার চতুর্দ্দিকে কর্ম্মীদল বিদ্যুৎ গতিতে বাহির হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আলোড়ন জাগ্রত করিল আজ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিহার সরকারের নগ্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই বিপুল জন জাগৃতির মধ্যে দিকে দিকে জনগণের দাবী—জেলায়

ভাষা, সংস্কৃতি ও অধিকারের দাবী জনগণের সংকল্পে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জেলার জনশক্তির পরিচয় আরো পরিস্ফুট হইয়াছে।

জেলায় নারী জাগরণের বিস্ময়কর নূতন অধ্যায়

জনগণের অধিকারের সংগ্রামে জেলার নারীদের মধ্যে এবারে যে সাড়া দেখা গিয়াছিল তাহাও বিস্ময়কর। পুলিসের দমন চলিতেছে, পুলিসের দ্বারা মারপিঠের সংবাদ শোনা যাইতেছে—সরকার গ্রেপ্তার করিতেছে—তাহা জানিয়াও সকলের সঙ্গে দুঃখ বরণ করিতে ঘরের মেয়েরাও দলে দলে আগাইয়া আসিয়াছে—ইহা যেমন গৌরবের তেমনি ইহা সত্যাগ্রহের প্রাণশক্তির পরিচালক। বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে মেয়েরা পুরুলিয়া আসিয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছেন—নিজেদের গ্রামাঞ্চলেও ঘুরিয়াছেন; আরো বহু স্থানের মহিলারা পুরুলিয়ার সত্যাগ্রহে আসিবার নির্দ্দেশ চাহিয়া পাঠাইতেছিলেন—ইহা গৌরবের কথা।

বজ্রের তরবারী উভয় দিকে সম ধার

বিরাট ক্ষেত্রব্যাপী থানায় থানায় ও সহরে সহরে দলের পর দল সত্যাগ্রহ করিয়াছে কিন্তু সরকার সামান্য কয়েক জনকে ছাড়া ধরিতে সাহস করেন নাই। অন্যায়ের প্রতিরোধে সত্যাগ্রহের দ্বারা দুঃখ বরণ করিয়া জনতার আত্মবল ও সত্যাগ্রহ বলকে গড়িয়া তুলিব এই সংকল্প লইয়া যে সকল কর্ম্মী আগাইয়া আসিয়া দিনের পর দিন সত্যাগ্রহের চারণ দলে ঘুরিতেছেন—না-ধরার জন্য দুঃখ বরণের সুযোগ না-পাওয়ায় অনেকের মনে হয়ত আক্ষেপ হইতে পারে—তেমনি জনশক্তিতে ভীত হইয়া সরকার কর্ত্তৃক না-ধরার মধ্যে জন অধিকারের জয় হইয়াছে দেখিয়া আনন্দও হইয়াছে। ব্যাপক দমন হইলেও যেমন বিরাট কাণ্ড হয়, বিরাট গণশক্তির দ্বারা সরকারের অন্যায়কে অচল করিবার যে পন্থা তাহার সম্মুখে দুর্ব্বলচিত্ত সরকার পিছাইয়া গেলে—তাহাতে সাহস না-করিয়া বাছিয়া ধরিতে থাকিলে—তাহার মধ্যেও জনগণ সরকারের দুর্ব্বলতা, ভয়, বৈষম্য ও অবিচার উপলব্ধি করিয়া সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি লাভ করে—অন্তরে ন্যায়ের আগুন প্রজ্বলিত হইতে থাকে। এ বজ্রের তরবারী—উভয় দিকেই সম ধার সম্পন্ন।

পরিশিষ্ট ঃ খ

।। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান—১ ।।

১। টুসু মাতা করি বন্দনা।
টুসুর গান বলে সর্বজনা।।

২। চল্ টুসু কেঁদার হাট যাব।
আমরা আল' জ্বাইলে ভাত খাব।। (লম্ফ বা হারিকেনের আলো)

৩। টুসু ধনকে লিতে আইল্-অ
মন্ডলবনার শিনিবাস।
টুসুধনকে বিদায় করে
আমরা হব বনবাস।। (শ্রীনিবাস)

৪। টুসুর মাগো, টুসুর মাগো
কী কী তদের তরকারি ?
ঐ রাঁড়িদের[১] বাড়ির বাইগন্
সাহেববাঁধের গগলি[২]।। (১-গালিসূচক শব্দ, ২-গুগলি)

৫। উড়্হ টুসু চল্হ বিদেশে।
আমরা রইব না আর ই দেশে।।

৬। আমার টুসু ইস্কুলে যায় মা
একশ' টাকার বই লিয়ে।
সনার বেনচে হেলন দিয়ে
ইংরেজি কলম টানে।। (সোনার বেঞ্চে)

৭। কইলকাতা গেছলে টুসু
কার কত বা চুল আছে।
কী বলব মা চুলের কথা
পিঠ ভাইঙে চুল শুখাচ্ছে।।

৮। বলেছিলি পড়্কুল যাব পড়্কুল যাওয়া হইল না।
ই বছরে যেমন তেমন আসছে বছর মাইনব না।।

৯। মাথা খুইলে রহ্‌লি বইসে আর আমাদের কে আছে ?
মা মইর্‌-এছে মাসী আছে প্রাণ জুড়াব কার কাছে ?

১০। জইড়তলে দাঁড়াবে টুসু জইড়পাতে কি জল আছে ?
উঁচু করে ধরগো ছাতা সনার অঙ্গে জল পাছে।। (অশ্বত্থ গাছের তলায়)

১১। উপরে পাটা তলে পাটা তার ভিতরে দারোগা।
হে দারোগা সরে দাঁড়া টুসু যাবে কইলকাতা।।
কইল্‌কাতা যে গেছলে টুসু কার বা কত চুল আছে।
কী বইল্‌ব মা চুলের কথা পিঠ ভাইঙে ধুলায় লুটাচ্ছে।।

১২। ই্ঘর কাদা উঘর কাদা বসাব লহার পাটা।
পাটায় পাটায় পান বনাব খেলাব সাধের ব্যাটা।। (লোহার)

১৩। আয় সারদা আয় বরদা কুল্‌হিতে বাঁধ বাঁধাব।
কুল্‌হির জলে সিনান কইর্‌-এ ঝরকায় চুল শুখাব।।

১৪। চুল মেল না চুল মেল না চুল মেলা বারণ আছে।
কন্‌ ডহরে চুল মেলেছ চুলে আগুন লাইগেছে।।

১৫। কুল্‌হি কুল্‌হি ডাক্তার ঘুরে কার ঘরে ডাক্তার আছে।
রামের মা বাহুরাঁয় বলে আমার রাম পইড়ে আছে।।
রামের মায়ে রামকে মারে রাম কাঁদে ধুলায় লুটে।
কাশীপুরের রাজা আইস্‌-এ ধুলা ঝাইড়্‌-এ লেই ক'লে।।
(১-বেরিয়ে, ২-অসুস্থ হয়ে, ৩-কোলে)

১৬। কদম গাছে চইড়্‌লে টুসু কচি কদম পাইড় না।
পাইক্‌লে কদম সবাই খাবেক তাতে বারণ কইর্‌ব না।।

১৭। উপরে হেঁটে বইসরে বনি মাঝে আগুন জ্বালাব।
যখন আগুন পূন্ন হবে সীতাকে ঠেলে দিব।।
সীতা মইর্‌লে সীতা পাব রাম মরিলে কুথায় পাব।
যারে সীতা অশোক বনে রামকে লিয়ে ঘর যাব।।

১৮। একটি ঘরে দুটি দুয়ার জলকে গেলে যায় চুরি।
দুধের পক্ষে চইল্‌তে লারি দাও গো শ্বশুর জলহরি।।

১৯। শ্মশানডি শখের গাঁটি সকাল হইলে খোল বাজে।
শ্বশুরঘর বাহারবার বেলি খোল বাজা মনে পড়ে।। (বেরুনোর সময়)

২০। আমার টুসু ফুলে ভরা পূন্নিমা চাঁদের আলো।
এমনি আলো কইর্‌বে টুসু শ্বশুরঘর যাবার বেলা।।

২১। আহাড়ে পাহাড়ে গাড়োয়ান হে গাড়োয়ান তর ঘর কুথা।
বাঁ কল্‌টি লাইড়ে দিলে উজু রাস্তা কইল্‌কাতা।। (১-নেড়ে, ২-সোজা)

২২। আমার টুসুর একটি ছানা মানবাজারে শ্বশুর ঘর।
পাল্‌খার উপর কলসি রাইখে পালাই আইল বাপের ঘর।।
পালায় আইলে ভালই কইর্‌লে আর ত যাইতে দিব না।
কমর সাঁইটে লড়ায় লাইগ্‌ব জামাই-বেহাই মাইনব না।। (কোমর বেঁধে)

২৩। তলে তলে লাল মাটি হলুদ বড় বাসে রে।
টুসু মিনা হলুদ বাঁটে মনে মনে হাঁসে রে।।

২৪। টুসুর মা-লো ভাদু মা-লো তদের কী কী তরকারি?
ঐ সতীনের বাড়ির বাইগন[১] পেঁড়্‌রাগইড়ার গগলি[২]।।
(১-বেগুন, ২-শামুক)

২৫। বাড়ি বাড়ি পথ রাইখ্‌-এছি মামীর আইস্‌বেক বইলে।
মামীর মাকে খাইতে দিব কুইলপাকা মিঠাই বইলে।।

২৬। বাড়ি বাড়ি আইল গাড়ি আইললো ঢাকাই শাড়ি —।
কন্‌ শাড়িটি লিবে টুসু ঝিঁঝিঁরকাটা পানখিলি।।

২৭। মামী-ভাগ্নী জলকে যায় মা মামীর কলসী ডুবে না।
যাও ন ভাগ্নী বইলে দিবে তর মামার ঘর কইর্‌ব না।।

২৮। আজারে-বাজারে যাব রাজাকে ক'লে লিব।
যেমনি রাজার বাঁকা সিঁথা তেমনি ভাইকে সাজাব।।

২৯। কাল দেখে নাইম্‌লম জলে জল হইল মা একগলা।
হে প্রাণনাথ ধর্‌এ তুল্‌অ রঙ্‌ দেইখ্‌বার লয় বেলা।।

৩০। পুরুল্যাতে দেখে আইলম্ তিন মুধনে ঘর আছে।
উপরে ফতেঙ্গা উড়ে নাময় জড়া খোল বাজে।।

৩১। আয় পুরুল্যা যায় পুরুল্যা পুরুল্যায় তর কে আছে?
পুরুল্যার বাংলা ঘরে পান খিলি গুঁজা আছে।।
পানখিলিটি ছাগলে খাইল।
আমার ফুলকে দিবার মন ছিল।।
উপরে বালি তলে জল আছে।
ও তর ভিতর মনে খল আছে।।

৩২। বাড়ীর নাময় নীল বুইনেছি নীলে শুঁটি ধরে না।
ঘরে আছে ছোট দেওর নীল পাইড়া বই পরে না।।

৩৩। বাড়ীর নাময় জইড় পাইক্-এছে জইড় খাইতে পাইখ আইসেছে।
পাইখের গলায় চন্দমালা দেশ ভাইঙে লক আইসেছে।।
(১-অশ্বত্থফল পেকেছে, ২-পাখি)

৩৪। ই ঘাট উ ঘাট যাব কন ঘাটে সরু বালি।
আমার টুসুর বিহা দিব যার ঘরে সনার ঝারি।।

৩৫। মায়ে বাপে বিহা দিল বড় নদীর উধারে।
এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে।
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে জ্বইলে-মরে।।
তর কি মা গো নাই মনে পড়ে।
আমার দু নয়নে জল ঝরে।।

৩৬। ভাব কইর্-এছি একগলা জলে।
তকে ছাইড়্ব না জীবন গেলে।।
না জাইন্-এ ভাব কইর্-এছিলি নবীন ছঁড়ার সং-এ।
ভুইল্তম না তব সং-এ ভুইলেছিলম চাঁচর চুল দেইখে।।

৩৭। পুরুল্যাতে দেইখে আইলম্ শালগাছে বেল ধইরেছে।
চল্‌রে বেল তুইল্‌তে যাব কার কমরে জোর আছে।।
কে উঠাইল দারুণ শালগাছে।
আমি ডাল ভাঙই-এ পড়ি পাছে।।

৩৮। পুরুল্যাতে দেইখে আইলম্ শিকড়ে ফুল ফুটেছে।
গাছ মরন্ত ফুল জীয়ন্ত বড় হাওয়া লাইগেছে।।

৩৯। ডুংরি গড়ার চিপা কুল্‌হি দুধারে নয়নজুলি।
সাহেব বলে রেল চালাব রেল চালাবার লয় কুল্‌হি।।
উড়ুক ধুলা লাগুক কাপড়ে।
কাপড় কাইচ্-এ লিব সাবনে।।

৪০। ইকি ফুলের ঝিকিমালা বনফুলের বিছানা।
তদের ঘরকে টুসু আইলগো আল জ্বালে পান বনা।।
পান বনা গো পান সজনী এলাচ দিতে ভুইলেছি।
আজের মতন খাও টুসু মা ঘুমের ঘোরে বনাইছি।।
(পানের খিলি বানাও)

৪১। আয় হে কাকা দে হে টাকা আমরা সড়প্ বনাব।
তলে দিব কুচি পাথর উপ্‌রে বালি ছড়াব।। (রাস্তা তৈরী করব)

৪২। সড়পে সড়পে যাব পাথরকে লিয়েই যাব।
চলরে পাথর ধীরে ধীরে দামুদরকে বাঁধাব।।

৪৩। অহড়ে-বহড়ে বাগাল গাই চরালি কুথায় রে।
খুরিয়ে না কাদা লাইগ্‌ল জল খাওয়ালি কুথায় রে।।

৪৪। কাঁসাই যাবি চল্ তাড়াতাড়ি।
আমরা লেগ্‌ব না বুঢ়ী ঠেড়ি।।
আমরা কাঁসাই যাব দল্‌কে দল।
কেন্দা ইস্কুল আমাদের দখল।। (দলে দলে)

৪৫। পায়ে আলতা কুল্‌হি কাদা তাই আইসেছি লিতে গো।
হারাইল সিঁদুরের কৌটা মন সরে না যাইতে গো।।
ভবানী মা ও টুসু ধনি।
তকে আইস মা ক'লে তুলি।।

৪৬। অশোকবনে কাঁইদ্‌ছেন সীতা অশোক-এরই ডাল ধইরে।
আর কাঁইদ্ না প্রাণের সীতা গাছের পাতা যায় ঝরে।।

৪৭। শ্বশুরঘর যাব তখন বইল্‌ব গো আর এই কথা।
দাও গো বাঁইধে বাঁইধ্‌ব চুল আমি কাইট্‌ব গো বাঁকা সিথা।।

৪৮। গাঁ-কে আইল্‌অ সরু শাঁখা বড় বৌয়ের মুখ বাঁকা।
হালের হেইল্যা বিক্‌রে দাদা বড় বৌকে দে শাঁখা।।
তর কথা ভাই আমি শুইন্‌ব না।
তুঁই ছল্‌হাভাজা দিলি না।।
(হেইল্যা-বলদ, ছল্‌হাভাজা-ছোলাভাজা)

৪৯। সাইকেল ঘড়ি রেডিও বিনা।
বিহা কইর না কন্‌হজনা।।

৫০। বসবি ভমর লাল জবা ফুলে।
সে ত তালগাছে বাদুড় ঝুলে।।

৫১। আয়না বইসা ডিজেল গাড়ি রেল চইলে গেল্‌হ।
তদের ভাগিন জামাই কই আইল্‌হ।।

৫২। মু ধুয়া ঢেউ উঠল তামাকে।
সে ত মাইয়া-ছেইলা বৌ-ঝিকে।।

৫৩। তদের ন কি পুয়ালের টুসু।
তরা দেইখ্‌তে দে ন একটুকু।।
(খড়ের নির্মিত টুসু)

৫৪। ভালই তরকারি।
বধুঁ খাঁইয়ে লাও হে চান করি।।

৫৫। আমার পাহাড় যাবার মন ছিল।
বঁধু আমার নাই পাঠাই দিল।।

৫৬। ফুলের জইন্যে ঘুরি আমরা, ঘুরি গো বনে বনে।
কী ফুল দিইব টুসুর চরণে।।
ও ফুল ফুটে না বিদ্যাবনে।
ক্কি ফুল দিইব টুসু চরণে।।

৫৭। বেলা উইঠ্‌ল টিগিমিগি তবু টুসু উইঠ্‌ল নাই।
উঠগো টুসু উঠ খেলাতে টুসুর মাকে জ্বালা দিহ না।।

৫৮। সরু সুতা বেল ফুলের মালা।
আমরা গাঁথেছি ফুলের মালা।।
চল্ গেঁদা ফুল কেঁদার হাট যাব।
আমি মাথা বাঁধা ডোর লিব।।

৫৯। চোখে চশমা হাতে ঘড়ি রেডিওটা বগলে।
মুখে সিজার নিয়ে বাবু চলে গেল সাইকেলে।।
হাতে ঘড়ি সাইকেল না হলে।
তকে বইস্ বইলে আর কে বইলে?

৬০। গপালপুর অঞ্চলে থানা নদাই লঙ্গরখানাটি।
লঙ্গরখানাই চল গুটিগুটি পাবি আড়াই ডাবুর এক বাটি।।

৬১। ও তুঁই আম খাবি, ন জাম খাবি।
<u>ডেস</u> কইরে মইল্যানের হাটে যাবি।। (পোশাক)

৬২। নখেতে নকপালিস লিব পায়ে লিব আলতা।
নয়ন কাজল ভরা করলি লো বিলাসিতা।।
বিলাসিতা চলছে ভারতে।
ও দেশ <u>মাইতে</u> গেল চায়েতে।। (মত্ত)

৬৩। আয়না লে লো চিরুণ লে লো দোরডিহের হাট দিনে।
আড়াই গজের ফিতা লে লো চুল বাঁধ লো যতনে।।
আর কি লো পাবি গোপনে।
ও তোর মাথা বাঁধা যতনে।।

৬৪। বেহাই আমার ডিমভাজা খাছে।
কুল্‌হীর লক্ গিলা <u>হাঁইসে যাছে</u>।।
বেহাই আমার পটল ব্যাপরী।
একটি পটল ভাইঙে দিলে গটা গাঁয়ের তরকারি।। (হেসে যাচ্ছে)

৬৫। দুর্গাপুরে কাজ খুলায়্‌ছে আমরা চল্‌রে সবাই যাব।
কেউ বা কুঁড়্‌ইব কেউ বা ফেইব্‌ব কেউ বা ফিতায় মাপ লিব।।

৬৬। কেন্দার হাট লাগে শনিবারে।
হাটের জিনিস বিকায় কম্ দরে।।

৬৭। ফুল ছাইড়-এছি একগলা জলে।
ও ফুল ছাঁইকে লিব রুমালে।।

৬৮। বড় নদীর পোল ভাইঙেছে কত দেশের লক যাছে।
হাতের বারি মাথায় টেরি রুমালটি পইড়ে আছে।।
ঐ পথে কি টুসুধন গেছে।
সে ত চটিজুতার পাঁজ আছে।।

৬৯। এ আঁধারি অন্ধকারে ছিলে টুসু কার ঘরে?
কে দিল তোর এমন বসন কে দিল মাথা বাঁধ্যে?
দে মা বিদায় সং ছাইড়ে যাছে!
আমার বনের মাঝে ঘর আছে।।

৭০। ই-ধার শিলাই উ-ধার শিলাই মাঝ শিলাইয়ে দাঁড়ায়ে।
কার সাথে মা কইছ কথা বাঁকা নয়ন ফিরায়ে।।
বাঁকা নদী তুলুসীর বনে।
টুসু ভাইবছ কি মনে মনে?

৭১। ই-ধার নদী উ-ধার নদী পাইরায় যাব মঙ্গলপুর।
আমার টুসু সই পাতাবে খুঁজে পায় না টগরফুল।।

৭২। টুসু টুসু করি আমরা নাইখে ঘরে টুসু গো।
কে টুসুকে নিয়ে গেল ফুলের মালা দিয়ে গো।।

৭৩। গলি-এ গলি-এ যাব জরলিতে মুখ ধুব।
ইশারাতে পানের খিলি খঁপাতে গুঁজে লিব।।
উড়ুক ধুলা লাগুক কাপড়।
আমি কাইচ্‌ব জড়া সাবনে।। (পুকুরেতে)

৭৪। টুসুর হেলাইনা-ঝুঁটি।
নেশা খাঁইয়ে ভাইঙ্‌ল লো দুধের বাটি।।

৭৫। যবুনার জল উঠছে লো বাঁকে বাঁকে।
টুসুর গাগরা কাঁখে।।

৭৬। মকর মকর মকর গঙ্গাজল।
তরা কন্ ঘাটে সিনাবি বল্?

৭৭। আমার টুসুর একটি চিঠি মানবাজারে শ্বশুর ঘর।
পাল্‌খির উপর কল্‌সী রাইখে পালায় আইল বাপের ঘর।।
পালায় আলি ভালই কইর্‌লি থাকগো বিটি দিন ধরে।
কমর সাঁইটে লড়াই লাইগ্‌ব জামাই-বেহাই মাইন্‌ব না।।

৭৮। উড় টুসু চল বিদেশে।
আমি রইব না আর ই-দেশে।।

৭৯। আমার টুসু মুড়ি ভাজে দলান-কঠার উপরে।
উয়ার টুসু ছুঁচ্‌রা মাগী আঁচল পাইতে লেয় মাইগে।।

৮০। ফুল ছাইড়েছি এক গলা জলে।
অ ফুল ছাঁইকে লিব রুমালে।।
গেল গেল আমপাকা ভাঁইসে।
তরা লাইব্‌লি ছাঁইকে জল খাইতে।।

৮১। লদীয়ে লদীয়ে যাব কাদা জল কুঁড়ায়ে খাব।
যারেই পাব মমের ছাতা লুট্ কইরে লুটে লিব।।
ধর্‌গো ছাতা যাব কইল্‌কাতা।
টুসুর আইনে দিব বইখাতা।।

৮২। পিঁপাতলে[১] সরু বালি হারাইল লো
বড় বহু চইখেব বালির ছটবহু দুলালী।।
আইস্‌ছে মটর পিঁপা ডাল ধইরে।
মটর ডাঁড়ায় গেল বড়্‌তলে[৩]।।
(১-পেঁপেগাছের তলায়, ২-কাপড়ের খুঁটেবাঁধা চাবি, ৩-বটগাছের তলায়)

৮৩। বাড়ি বাড়ি আইলে গাড়ি আইল্-অ লো টেপের গাড়ি।
টেপ শাড়িটি কে বলে ভাল?
ও তর জলে দিলে হয় কাল।।

৮৪। টুসু আইল পোষের একদিনে।
টুসু ধনকে রাখ যতনে।।

৮৫। আমার টুসুর একটি ছেইলা
কুইলতলে বই খেলে না।
কন্ বিড়ালী ধূলা দিল
ধূলার বরন গেল না।।

৮৬। বাড়ির নাময় তমালের বন
ককিল ডাকে ঘনে ঘন।
আর ডাইক না প্রাণের ককিল
টুসু আমার অচেতন।।

৮৭। বাড়ির নাময় কুঁয়া কুঁড়লি
ঘটি ভরে জল খাব।
এমনি কুঁয়া নিঠুল হইল
পদ্মফুল ফুইটে গেল।।

৮৮। তিরিশ দিন রহিল টুসু
তিরিশটি ফুল পাইলে গো।
আর কি রাখিতে পারি
মকর হইল বাদী গো।।

৮৯। ঝাড় গেঁদাফুল কাপড়ের পাইড়ে।
কাপড় পইর্ভে লো টেরা কইরে।।

৯০। বাঁশের সুপুর কুলির ঐ ধূলা।
আমরা খেলেছি ছুটুর বেলা।।

৯১। লাইগ্‌ব লড়াই লাইর্‌বি ছাড়াইতে।
আমার বহুদিনের রাগ আছে।।

৯২। তিরিশদিন রাখিলাম মাকে
মা বইলে আর বইল্‌ব না।
যাবার সময় রগড় লিল
মা ছাড়া বই যাব না।।

৯৩। মা গো আমি ফুল পাতাব
ফুলকে আমি কী দিব।
বাজার যাব পয়সা পাব
ফুলকে ফুলাম্ তেল দিব।।

৯৪। এক সড়পে দু সড়পে তিন সড়পে লক চলে।
আমার টুসু মধ্যে চলে বিন বাসাতে গা দলে।।

৯৫। রাম ন কিরে বনে যাব্বি বনে গেলে খাবি কী?
বনে আছে বনফল মা রামের খাবার ভাবনা কি।।

৯৬। রামের মা কৌশল্যারানী বুক বাঁইধেছে পাষাণে।
ক'লের রামকে বনে দিয়ে ঘরে আছে কেমনে?

৯৭। রাম কাঁদে মা অযোধ্যার বনে।
সীতা হইরে লিল রাবণে।।
সীতা হইর্‌লে ভালই কইর্‌লে সীতা রাখ যতনে।
সীতার পায়ে সনার নেপুর
বাইজ্‌ছে গো অশোক বনে।।

৯৮। অশোক বনে পাতের কুঁইড়া
সীতা পাশা খেলিছে।
যগির ভেশে বারণ এসে
সীতা হইরে লিয়েছে।। (যোগীর বেশে)

৯৯। তিনটি টুসু জলকে যায় মা
কন্ টুসুটি ভাল গো।
মধ্যের টুসু ছলকদারি
জলে আঁখি ঠারে গো।।

১০০। আইল রে গুনগুইনা মাছি পশ্চিম দিগের হাওয়াতে।
আইল রে সনার পাল্‌কি টুসুধনকে লেগিতে।। (নিতে)

১০১। কুল্‌হির মুড়ায় পাতের কুঁইড়া খোল কীত্তনের গান হছে।
চল্‌রে গান শুনতে যাব রাধিকার মিলন হছে।।

১০২। পুরুল্যাতে দেইখে আইলম্ দালানে ধান পাইকেছে।
এমনি চাষায় চাষ কইরেছে শিয়ালে ধান মাইড়েছে।।

১০৩। মা গো আমি খেইলে আলি যত সঁঙ্গি মেইল কইরে।
খাইতে দে মা ঘিরের মিঠাই শুতে দে আসন পাইড়ে।।

১০৪। কুল গাছে কুইলিনীর বাসা ডালিম গাছে কেরকেটা।
আমার টুসু ফাঁদ আইড়েছে লাইগেছে রাজার ব্যাটা।।

১০৫। সইরষা ফুলটি থঁপা থঁপা হলেদ বইলে বাঁইটেছি।
হে শাশুড়ী গাল দিহ না পাশা খেইলতে বইসেছি।।

১০৬। কে বলে গো কে বলে গো আমার টুসু কাল গো।
বিষ্টুপুরের হলুদ আইনে গা করিব আল' গো।।

১০৭। বড় বনে লতাপাতা ছট বনে শালপাতা।
কন্ বনে হারালে টুসু সনার বাঁধা লাল ছাতা।।
ধর্‌গো ছাতা যাব কইল্‌কাতা।
টুসুর হাতে দিব লাল ছাতা।।

১০৮। পুরুল্যাতে দেখে আইলি ডালায় ডালায় দুধবালা।
আমার টুসুর নাইরে ছেইলা কারে দিব দুধবালা।।

১০৯। তদের ঘরে টুসু ছিল তাই করি আনাগনা।
যখন টুসু চইলে যাবেক করবি গো দুয়ারমানা।।

১১০। কাশীপুরের বাসীকাপড় রাখবি মা পেড়ায় ভইরে।
আমরা সবাই মইরে গেলে কাঁদবি মা পেড়া ধইরে।।

১১১। সামাল সামাল ওহে দকানি।
ও তর পচা বিড়ির আমদানি।।

১১২। কি দেখে মা দিলি গো তরা।
তদের জামাইটা বুঢ়া পারা।।
সাতশ কপাট খাপরা ঘর দেইখে।
বিহা দিলি মা সতীন দেইখে।।

১১৩। সাধের বিটি বড় আদর যদি হয় একটি ছেলে।
সাধের বিটি যায় গো ইস্কুলে।।

১১৪। টুসুধনকে আইন্‌তে যাব চন্দন কাঠের চৌডলে।
যদি টুসু দয়া কর রাইখ্‌ব সনার মন্দিরে।।
টুসুমণির নিয়েছি স্মরণ।
আশা কর মা আমার পূরণ।।

১১৫। সরু সূতা বেল ফুলের মালা।
টুসুব গলে দিলে হয় আলা।।

১১৬। ভাত হইলে তরকারি জুটা দায়।
ভবে কাজ কি হে বাঁইচে থাকায়।।

১১৭। বিরি রাহেড় কুত্থিগুলি[১] ভাল ঝাড়াইছিল[২] ভাই।
পূরব দিগের মেঘ বাদলে ফুলগুলি দিল ঝড়াঁয়।।
(১-বিউলি-অড়হর-কুত্থিকলাই, ২-ঝাড় তৈরী হয়েছিল)

১১৮। বাড়ির নাময় শনইলা একটা সেটার আগায় ধ্বজটা নাই।
কিছু যদি নাহি জুটি সেটায় আমার দিনটা যায়।। (সজিনাগাছ)

১১৯। মনের অনুরাগে একদিন ঘুঘি[১] লিয়ে গেলি ভাই।
হিড়ের ক্ষেতে আইড়ে দিয়ে গাছতলে গেলি ঘুমাঁই।।
ঘন্টা তিন চার ঘুমাঁই পরে দেখি একব্বার ঘুঘিটায়।
যদি কিছু লাইগেছিল খাঁইয়ে গেল ঢঁড় দুটায়[২]।।
(১-মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরী যন্ত্র, ২-ঢোঁড়াসাপ দুটিতে)

১২০। বইসে বইসে চাকরি করে তাদের কেমন বুদ্ধি ভাই।
বার বাজায় মাংসভাতে সন্ধ্যাতে পরটা খায়।।
আমরা হইলাম চাষিভূষি মাটি কুঁইড়ে দিনটা যায়।
রসগোল্লা মনে কইরে ধানের কুঁড়া দমে খাই।।

১২১। টুসু আমার সাধের বিটি অন্য লোকে কী জানে।
কারু কথা, কারু ব্যথা কারু লাগে নয়নে।।

১২২। বাপের বাড়ি আইলে টুসু ঘুইরে যাইতে নাই মানে।
কত বুঝা-সুঝা কইরে বিদায় দিই মানে মানে।

১২৩। দুগ্‌গা পূজায় চিঠি দিলম আসে যেন দুজনে।
কালীমায়ের পূজা কইরে কাঁদি গো মনে মনে।।

১২৪। বছর দিনের পরে টুসু আইল মোদের ভবনে।
কত দুখের সুখের কথা কহিল আমার সনে।।

১২৫। ঘরের কাজে মন বসে না টুসুধনের চিন্তনে।
ভালমন্দ কত জিনিস যাবার সময় হয় মনে।।

১২৬। উড়্‌হাকলে খুড়া উড়্‌এছে
খুড়া লড়্‌এছে কি পইড়্‌ছে।

পুরুলিয়ার কেন্দা আশ্রমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পুষ্প মাহাতোর সৌজন্যে নিম্নলিখিত ছাত্রীদের কাছ থেকে টুসুগানগুলি সংগৃহীত

	নাম	গ্রামের নাম
১।	সুজাতা সিং পাতর	রাইসা (পুরুলিয়া)
২।	সাবিত্রী সিং সর্দার	চাটুমাদার (পুরুলিয়া)
৩।	রূপালি সিং সর্দার	নিশ্চিন্তপুর (পুরুলিয়া)
৪।	সাবিত্রী মুদি	গোবিন্দপুর (পুরুলিয়া)
৫।	পার্বতী সিং	চাটুহাঁসা (পুরুলিয়া)
৬।	মমতা সিং সর্দাব	লায়াডি, কেশরগড় (পুরুলিয়া)
৭।	অলকা মান্ডি	কাদলাগোড়া (পুরুলিয়া)
৮।	নমিত সিং সর্দার	ডুমকাডি (পুরুলিয়া)
৯।	পুষ্প পারুল	সিজাডি (পুরুলিয়া)
১০।	কল্পনা মাহলি	কালীপুর (পুরুলিয়া)
১১।	শুক্লা মাঝি	টুপাডি (পুরুলিয়া)
১২।	সুলেখা সিং সর্দার	তেঁতলা, পিয়ারসোল (পুরুলিয়া)
১৩।	লক্ষ্মীরানী মুদি	টাটাডি (পুরুলিয়া)
১৪।	মমতা সিং সর্দার	কাঠগোড়া (পুরুলিয়া)
১৫।	হিমানি মুদি	লেদাবেড়া (পুরুলিয়া)
১৬।	শিলাবতী সিং	রাইসা (পুরুলিয়া)
১৭।	শান্তা সরেন	বলরামপুর মিশন, রাঙাডি (পুরুলিয়া)
১৮।	মীরা মুদি	হিজুলী, দলদলি (পুরুলিয়া)

(সংগ্রহকাল ১৯৮৪-৮৬)

।। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান—২ ।।

।। ১।।

আমার টুসুর বিয়ে—
তরা সব আইসবি লো
উলু দিয়ে।
উড়াকলে নাইম্‌বে জামাই
দেখবি তরা তাকায়ে।
যেমন তেমন লয় লো জামাই
পাস করা এম.এ.বি.এ.।।

।। ২ ।।

আল' রাইতে কাল শাড়ি
ভুইল্ কইরে কেউ পইর না।
আমার টুসু বাজার যাবেক
চোর বইলে কেউ ধইর না।।

।। ৩ ।।

বাড়ির নাময় নাইর্‌কেল গাছটি
নাইর্‌কেল কেন ধরে না।
একটি নাইর্‌কেল ধইর্‌লে পরে
তারে চিঠি পাঠাই মা।।
চিঠি পাঠাই ঘঁড়া পাঠাই
তবু জামাই আসে না।
জামাই আদব বড় আদর
তিনদিন বই আর বসে না।।
আরও তিনদিন থাক জামাই
খাইতে দিইব পাকা পান।
বইস্‌তে দিইব শীতলপাটি
নীলমণিকে কইর্‌ব দান।।
নীলমণি যে রাজার ছেইলা
সুখ বিনা দুখ জানে না।
ভাল কইরে কর যতন
দুঃখ তারে দিও না।।

।। ৪ ।।

আমাদের টুসু কলেজ যাচ্ছে
কলেজ খঁপা বাঁইধে গো।
কলেজ পেইড়া শাড়ি পইরে
হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ গো।।

।। ৫ ।।

ই-কুলিতে[১] উ-কুলিতে[২]
মাঝকুলিতে জামবাটি।
এমন কোনদিন জানি নাই মা
এক জামাইকে দু বিটি।।
(১ এ-পাড়ায়, ২ ও-পাড়ায়)

।। ৬ ।।

টুসুর হ্যালানা ঝুঁটি।
হোঁচট খাঁইয়ে ভাঙল লো তেলের বাটি।।

।। ৭ ।।

আতপ চালে পাতি মাকে
রোকা ফুলে পুজি গো।
জনম জনম আইস্‌বে টুসু
এই কাঙালের বাড়িতে।।
চাঁদকে যেমন তারায় ঘেরে
যেমনি ঘেরে গোপীজন।
আমরা তেমনি ঘেরে রাইখ্‌ব
টুসু মায়ের শ্রীচরণ।।

।। ৮ ।।

একপাই ধানের মাছ কিনেছি
টুসু দালান পিঁড়ায় দাঁড়ায়ে।
এ মাছ রাঁধা কে খাবে মা
টুসু যাচ্ছে চালানে।।

।। ৯ ।।

একশ' টাকার মাদারপাকা
কোন্ বাজারে নামাব।
দেখেশুনে মন মানে না
দে মা ভাঙি জল খাব।।
(পাকা আতা)

।। ১০ ।।

কুঁয়াতলে সরু বালি
পায়রা গুনগুন করে গো।
পায়রা লয় মা পাইখ্‌ও লয় মা
টুসু খেলা করে গো।।
খেল খেল আরও খেল
শাঁখা যেন ভাইঙ না।
তুমার মা যে অভাগিনী
শাঁখা কুথায় পাবে মা।।

।। ১১ ।।

নদী ধারে মূলা রইল
মূলা খাইল বাঁদরে।
বাঁদরের কি দোষ দুব মা
ঝাঁপ দুব[১] দামুদরে[২]।।
ও দামুদর ও গঙ্গাধর
কোন্ ঘাটে জল ডুবাব।
পায়ের আলতা ঝিকিমিকি
চইখের কাজল মুছাব।।
(১-দিব, ২-দামোদর)

।। ১২ ।।

বাড়ির নাময় দুইধা গাছটি
দুধে টলমল করে গো।
রাজার ব্যাটা হতভাগা
দুধে সিনান করে গো।।

।। ১৩ ।।

করবরী খাইয়ে মরি
করবরী বিছানা।
পাশ ঘুইরে শুইয় না টুসু—
ভাইঙে যাইবেক গহনা।।
(করবী ফুল বা গাছ)

।। ১৪ ।।

জলে গামছা গাড়া।
কন্ বিদেশি আইলি রে
আমার পাড়া।।

।। ১৫ ।।

বাড়ির নাময় শিরা গাছটি
শিরে শিরে কাঁটা গো।
আমার টুসু দাঁড়াই আছে
শ্রীরাধিকার পাবা গো।।

।। ১৬ ।।

ঝিলমিল পস্তুর মালা
টুসুর গলে।
কী কইরে ফুল পাতাইছিস টুসু
কদমতলে।।

।। ১৭ ।।

কালী মেলায় দিলি দলায়
কে পাইড়েছে সতরঞ্জি।
আমার টুসু শিশু ছেইলা
কে সাজাইছে সন্ন্যাসী।।

।। ১৮ ।।

আমরা টুসুর লগন হইল
দু হাতে দুই সনার বালা।
আমার টুসুর বর আইন্‌তে
কে কে যাবি আয় লো তরা।।
আইস্‌ছে পথে জড়া মটর
একটায় বরযাত্রী ভরা।
একটাতে ভাই লতুন জামাই
আই.এ.বি.এ. পাশ করা।।
টুসু বলি গো তুমারে
হইলদ মাইখে যাইঅ না বাইরে।
উলু উলু শঙ্খ ধ্বনি
মটর থাইকে বর নামে।। (মোটর)

।। ১৯ ।।

আমরা টুসু পাইতেছি মা
আঘন মাসের শেষরাতে।
আদারি বাছুরের গবর
লবঙ্ চালের গুঁড়িতে।।

।। ২০ ।।

আমার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝন্‌ঝন্ করে গো।
উহার টুসু ছেঁচ্‌ড়ি মাগী
আঁচল পাইতে খুঁজে গো।।

।। ২১ ।।

গাড়ি আইল বাড়ি বাড়ি
দেখ টুসু বেরাইয়ে।
শখের গাড়ি চইলে গেল
গটা বেঙ্গল বাজাইয়ে।।

।। ২২ ।।

বড় বনে লতাপাতা
ছোট বনে শালপাতা।
কন্ বনে হারাইলে টুসু
সনার বাঁধা মোম ছাতা।।

।। ২৩ ।।

শালতলায় দাঁড়াইল টুসু
শালপাতে কি জল ঠেকে।
উঁচু কইরে ধর ছাতা
সনার অঙ্গ যায় ভিজে।।
লক্ষ্মণ, ধর হে ছাতা
কাল মেঘে জল পড়ে ঠপা ঠপা।।

।। ২৪ ।।

ওহে ঠান্ডা ওহে ঠান্ডা
কন্ কুলিতে রঙ দিলি।
মাঝের কুলিয় টুসু চুরি
কি ঘুমে ঘুমাইছিলি।।

।। ২৫ ।।

আমার টুসু পান খাঁইয়েছে
পানের বোল ফেলেছে।
উয়ার টুসু থোকড়ি মাগী
পানের থুকু চাইটে লাল কইরেছে।।
(থুতু/লালা)

।। ২৬ ।।

টুসু মাকে বিসর্জন কইরে
আমরা ঘর ঘুইর্ব কি কইরে।

।। ২৭ ।।

যাচ্ছ যাচ্ছ যাচ্ছ টুসু
ফিরে দাঁড়াও আঙ্‌নাতে।
সম্বচ্ছরের মনের কথা
খুইলে বল আমাকে।।

।। ২৮ ।।

একটি ডালে দুটি ককিল
ডালে বইসে কর কি।
আর ডাইক না সনার ককিল
আমরা টুসুহারা হইয়েছি।।

।। ২৯ ।।

চল্ রে মিথিলা যাব
ধনুক ভাঙা দেখিতে।
ধনুক ভাইঙে রামের বিহা
জনক রাজার বিটিকে।।
জনকরাজা পণ করেছেন
একশ' টাকার গন্ডীবাণ।
এ গন্ডীবাণ যে ভাঙিবে
তারে দিবে সীতাদান।।

।। ৩০ ।।

বনে চলি বনে চলি
বনে চলা দায় হইল।
ভুঁকিল কুশেরি কাঁটা
কন্ বনে রাম লুকাইল।।
রাম ছাইড়েছেন যইগ্গের ঘঁড়া
তপুবনের কাননে।
লবকুশ ধইরেছে ঘঁড়া
সীতা শইলে দাও ছাইড়ে।।

ছাইড়্ব না ছাইড়্ব না ঘঁড়া
ছাইড়্ব না বিনা রণে।
কে আছ রে যুদ্ধপতি
যুদ্ধ দাও মোদের সনে।।
যুদ্ধ দিতে যাইছ বাবা
প্রাণে মাইরে আইস না।
আমার যেন সিথির সিঁদুর
পায়ের আলতা মুছে না।।
ওবে ও বাপ কী করিলিস্
সিথির সিঁদুর মুছাইলিস্।
বনপুষ্প তুইল্‌তে গিয়ে
পিতারে বইধে আলিস্।।
কোন্‌খানে বধিয়া আলিস্
ওরে আমার নীলরতন।
দে রে অগ্নিকুন্ড জ্বাইলে
এখনি ঘুঁচাই জীবন।।
(পায়ে বিঁধে যাওয়া)

।। ৩১ ।।

সনার গাড়ু সনার দাঁতন
রাম বইসেছেন মুখ ধুইতে।
পরের দিনকে খবর আইল
রাম সাইজেছেন বন যাইতে।।
ও রামের মা ও রামের মা
রাম গেছে তোর কন্ বনে।
রামের পায়ের সনার নিপুর
বাজইছে গো অশক বনে।।
অশক বনের পথে যাইতে
কে শুনালি রামের নাম।
নাম শুনে প্রাণ জুড়াইয় গেইল
কে বঠ রে ভগবান।।
ভগবান ত নয় মা সীতা
আমি বঠি হনুমান।।

।। ৩২ ।।

চল্ টুসু চল্ খেইল্‌তে যাব
রানীগঞ্জের বটতলা।
ঐ পথেতে দেখায় আইন্‌ব
কয়লাখাদের জল তুলা।।
কয়লা খাদের জল তুলা মা
ইঞ্জিনের মাথা ধুঁকা।
কাঁকুড় খাঁইয়ে আপসান হইল
চল্ ভাই লক্ষ্মণ হাত দেখা।।

।। ৩৩ ।।

উপর কঠায় উইঠ্‌লে টুসু
ভাল কইরে ভাইল্‌বে।
নামার সময় মনে কইরে
শিবের মাথায় ফুল দিবে।।
শিবের মাথায় শিবদন্ড
রামের মাথায় দন্ডীবাণ।
এ দন্ডবাণ যে ভাঙিবে
তারে দিব সীতা দান।।
সীতাহরণ করলি রাবণ
রাখ্‌বি সীতা যতনে।
দেইখ্‌ব রে তোর সনার লঙ্কা
দিব রে ডাহন কইরে।।
(তাকাবে)

।। ৩৪ ।।

এ টুসুটি কে গইড়েছে
গোকুল ছুতার মিস্তিরি।
গড়নে গইড়েছে ভাল
গলায় দেয় নাই চাঁপ কলি।।
যাই বলিহারি।
পাশা খেইল্‌ব লো সারি সারি।।

।। ৩৫ ।।

বাড়ির নাময় নারকেল গাছটি
কাইটে কইর্‌ব রেলগাড়ি।
রেলগাড়িতে চাইপে যাব
জামাই শালার ঘরবাড়ি।।
জামাই দিল সরু শাঁখা
দিদির হইল মন বাঁকা।
আসুক জামাই বইল্‌ব কথা
দিদির হইল মন বাঁকা।।

।। ৩৬ ।।

সইর্‌ষা ফুলটি ধপা ধপা
হইলদ বইলে বাঁইটেছি।
ও শাশুড়ি গাইল দিও না
পাশ খেইল্‌তে বসেছি।।
পাশা খেলা যেমন তেমন
জুয়া খেলা দায় হইল।
কী কইরে ঘর যাব সখা
মেঘ ডুমুরে আঁধার হইল।। (থোকা থোকা)

।। ৩৭ ।।

বাড়ির নাময় লীল বুইনেছি
লীলের শুঁটি ধরে মা।
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর
লীল পাইড় বই পরে না।।
লীল ও পাইড়্‌ লাল ও পাইড়্‌
টুসুর কাপড় গাবাব।
আঁচলায় দিব সনার ঝারি
পাড়ার টুসু কাঁদাব।।

।। ৩৮ ।।

ওহে কাকা লিলি টাকা
দিলি হে বুঢ়া বরে।
বুঢ়ার সঙ্গে চইল্‌তে লারি
কইল্‌কাতার শহরে।।
কইল্‌কাতারই লকে বলে
ইটি তুমার কে বঠে?
লাজ শরমে বইল্‌তে হয়
(ইটি) ঠাকুদাদার ভাই বঠে।।

।। ৩৯ ।।

নদীধারে গাই ধেনাইল
গাইয়ের নামটি হাসি গো।
বাগাইলাকে কিনে দুব
সনায় বাঁধা বাঁশি গো।।
যখন বাগাল বাঁশি বাজায়
তখন· আমি হেঁসালে।
কী কইবে ভাত দুব বাগাল
হ্যাংলা ভাসুর দুয়ারে।।
(বাচ্চা প্রসব করল)

।। ৪০ ।।

চালের চটুইয়ের বাসা
এক কথাতে মন চটা।
মনের মতন বৌদি নইলে
কাজ কি দাদার বিয়াতে।।
দাদা মোদের বড় ভাল
দুই-দুই কথা জানে না।
পরের মেয়ে বৌদি আইসে
ভালবাসতে দিল না।।

।। ৪১ ।।

ওরে কালা তামুকআলা
তোব তামুক লিব না।
কী দিয়ে বানালি তামুক
ঘর যাইতে মন সরে না।।

।। ৪২ ।।

পাহাড় উঠইলম্ সিঁড়ি সিঁড়ি
ননদমাগী গাইল্ পাড়ে।
থাম লো ননদ ভাইঙব্ গরব
যখন তুমার মা মরে।।
মা মইর্‌লে লো মাসী আছে
আছে লো আর কে?
আছে লো পরের ব্যাটা
সিথায় সিঁদুর দে।।

।। ৪৩ ।।

মাথা ঘঁইষে রইলম্ বইসে
বাপের ঘর যাবার লাগে।
গুণের দেওর কাঁদইতে বইস্‌ল
করবরীর ডাল ধইরে।।

।। ৪৪ ।।

ভাইগ্যে ছিল বিলিতি বাড়ি[১]
তকে কিনে দিল সিলিক্ শাড়ি[২]।
ঝিল্‌পি লিব জল খাইতে
ভাবরা[৩] লিব ভাইগ্‌না ঘর যাইতে।
সিলিক্ শাড়ি ধূলায় পইড়কিছে[৪]
যেন মাঠাবুরু ঝইল্‌কিছে।।
(১-টম্যাটো ক্ষেত, ২-সিল্কের শাড়ি,
৩-তেলেভাজা বিশেষ, ৪-চকচক করছে)

|| ৪৫ ||

তরা ভাইল্‌ছিস কি লো
ভাকুর ভকুর।
লেলাঁয়ে দিব বিলাতি কুকুর।।
তরা ভাইল্‌ছিস কি লো
আড়ে আড়ে।
বুঁচা টাঙ্গি বসাব ঘাড়ে।। (ভোঁতা টাঙ্গি)

|| ৪৬ ||

ফুটু ফুটু ফুটু সাইকেলে।
তরা চাপিস না রে ফুটু সাইকেলে।।
তরা পইড়ে যাবি টুপ্ কইরে।।
কাল কাল কাল ফক্‌রা।
দাদুর পকেটে নাই খুচ্‌রা।। (যন্ত্রবিকল সাইকেল)

|| ৪৭ ||

টুসুর নাকে আপেল পাথর
কন্ পদ্দার গইড়েছে।
টুসুর মাকে জিগাস কইর
কত বানি লাইগেছে।।

|| ৪৮ ||

সনার গাড়ু সনার দাঁতন
রাম বইসেছেন মুখ ধুইতে।
পরের দিনকে খবর আইল
রাম সাইজেছেন বন যাইতে।।

|| ৪৯ ||

কদম গাছে উইঠ্‌লে টুসু
কচি কদম খাইও না।

পাইক্‌লে কদম সবাই খাবে
কেউ তো মানা কইরবে না।।

।। ৫০ ।।

এক ভরি কাঠ দু ভরি কাঠ
কাঠে আগুন লাগাব।
আগুন যখন ভর কইর্‌বেক
সীতাকে ঠেলে দুব।।
সীতা মইর্‌লে সীতা পাব
রাম মইর্‌লে রাম কুথায় পাব।।

।। ৫১ ।।

মাঠাবুরুয় কী পাবি?
সতীমেলায় পতিফল পাবি।
সতীমেলায় কী আছে লো?
কান ভরা কানদুল আছে লো।।
তরা চা খাবি গেলাসে।
ভত্তি হবি সেকেন কেলাসে।।

পাথররডি (বাগমুন্ডি, পুরুলিয়া) বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রতিবা সোমের সৌজন্যে প্রাপ্ত (১৯৮৭)

।। ১ ।।

চল্‌ টুসু চল্‌ দেইখ্‌তে যাব
রানীগঞ্জের বটতলা।
আসার সময় দেইখে আইস্‌ব
কয়লা খাদের জল তুলা।।
কয়লা খাদের জল শুকাইল
বাবুর বাঁধে অগাম জল।
টুসুর পায়ে দেইখ্‌বি যে লো
হাজার টাকার জড়া মল।।
(অমরকানন, বাঁকুড়া)

।। ২ ।।

চল্ টুসু চল্, সিনান যাইব
বাঁকা দয়ের পাথরে।
কোথাকার শাঁখারি তুই
শাঁখা পরাস আমারে।।
শাঁখা যে পরালি মা গো
টাকা লিব কার কাছে।
ঘরে আছে অভয় দেব্‌তা
টাকা নেওগা তার কাছে।।
ওরে অভয় ওরে অভয়
টাকা দে' না আমারে।
তোর কইন্যা শাঁখা পরাল
বাঁকাদয়ের পাথবে।।
(বাঁকাদহ, বাঁকুড়া)

।। ৩ ।।

তিরিশ দিন রাইখ্‌লাম মাকে
তিরিশ সইল্‌তা দিয়ে গো।
আর রাইখ্‌তে লাইর্‌লাম মা গো
মকর আইল লিতে গো।।
ওরে ময়রা ধর্ না ঝাঁঝরা
দে রে চিনির পাগ্ কইরে[১]।
টুসু যাবে শ্বশুরবাড়ি
দে রে হাঁড়া[২] সাইত্ কইরে[৩]।।
(১-ভিয়েন করে, ২-বড় হাঁড়ি, ৩-প্রস্তুত কবে)
(রাইপুর, বাঁকুড়া)

।। ৪ ।।

মকর পরবে লিতে আইল
টুসু যাবে যমুনা।
টুসু আমার ছোট শিশু
ঘোমটা দিতে জানে না।।
(খালগ্রাম, বাঁকুড়া)

।। ৫ ।।

একটি ঘরে তিনটি টুসু
বইড়কি[১] বড় সুন্দরী।
ছুটকির[২] গলায় রক্তের মালা
মাইতরী[৩] বৌ চমৎকার।।
(১-বড়, ২-ছোট, ৩-মেজ)
(মায়াকানন, বাঁকুড়া)

।। ৬ ।।

ই পাড়াতে উ পাড়াতে
মাঝ পাড়াতে ইশারা।
আমার টুসু দালান দিছে
সুরকী কুট্‌তে যাস্‌ তরা।।
(মানসুমারী, বাঁকুড়া)

।। ৭ ।।

লইতন্‌ পুকুরের পাড়ে
পায়রা গুমুরে গো।
পায়রা লয় মা, পাখি লয় মা
টুসু খেলা করে গো।।
খেইল না খেইল না টুসু
শাঁখা ভাইঙে যাবে গো।
তুমার মা যে অভাগিনী
কুথায় শাঁখা পাবে গো।।
(সাবড়াকোন, বাঁকুড়া)

।। ৮ ।।

টুসু দেইখ্‌তে আলি তুই
ধরিস না লো ছাঁচার বাতা[১]।
চাঁচায় আছে দুইধা খরিস[২]
খাবেক লো তোর চইখ দুটা।।
(১-খড়ের চালের ঢালু নিচের অংশ, ২-সাদা খরিস সাপ)
(সানবাঁধা, মালপাড়া, বাঁকুড়া)

পরিমল পালের (সানবাঁধা, বাঁকুড়া) কাছ থেকে এই গানগুলি সংগৃহীত (১৯৮৬)।

।। ১ ।।

উঠ উঠ উঠ টুসু
উঠাইতে এসেইছি গ'।
তুমারি সেবিকা মোরা
পূজিতে বসেইছি গ'।।

।। ২ ।।

চল্ টুসু চল্ দেখইতে যাব
রানীগঞ্জের বটতলা।
আইস্‌বার সুময় দেখাই আইন্‌ব
কয়লা খাদের জল তুলা।।

।। ৩ ।।

বাড়ির ভিতর নাইরকল গাছটি
কাইটে কইর্‌ব কলগাড়ি।
কলগাড়িতে চাইপে যাব
ডাক্তারবাবুর ঘরবাড়ি।।
ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু
আর খাব না জলসাবু।
জলসাবু খাঁইয়ে ধইর্‌ছে মাথা
আইনে দাও কমলালেবু।।

।। ৪ ।।

কলতলায় সরুবালি
পায়রা গুনগুন করে গ'।
পায়রা লয় মা পাখি লয় মা
টুসু খেলা করে গ'।।

।। ৫ ।।

তিরিশ দিন রাইখলাম মাকে
তিরিশ সইল্‌তা দিয়ে গ'।

আর রাইখ্‌তে লাইর্‌লম্‌ মাকে
মকর আইলেন লিতে গ'।।

।। ৬ ।।

ই বন কাটি সে বন কাটি
কাটি বনের শালঝাঁটি।
বিষ্টুপুরের রাজার ব্যাটা
খুঁইজ্‌ছে দাঁতন খাটি।।

।। ৭ ।।

জড়া জড়া গোল গাড়ি।
টুসু আমার যায় শ্বশুরবাড়ি।।
হায় লখিন্দর আইসেছে লিতে।
লাইর্‌ব তাকে ফিরাই দিতে।।
লাইর্‌ব অপমান কইর্‌তে।
ও টুসুমণি।।

।। ৮ ।।

জলে হেল জলে খেল
জলে তুমার কে আছে?
আপন মনে ভাইবে দ্যাখ
(ওমা) জলে শ্বশুরঘর আছে।।

।। ৯ ।।

বাঁকুড়ায় গেইছ্‌লে টুসু
কার বা কত চুল আছে?
চুলের কথা বইল্‌ব কিবা
খাইটে চুল শুকাচ্ছে।।

।। ১০ ।।

বল্‌ ভাই আমার মা কুথা গেছে?
আমি প্রাণ জুড়াব কার কাছে।।
চল্‌ টুসু চল্‌ খেইল্‌তে যাব
রানীগঞ্জের বটতলা।

ফিরবার সময় দেইখায় আইন্‌ব
কয়লা খাদের জলতুলা।।

।। ১১ ।।

টুসুর মাগো টুসুর মাগো
আজ তোদের কী বেসাতি[১]।
কামার গইড়ার[২] ইঁচ্‌লি পুঁটি
নাময় বাড়ির বিলাতি।।
গেঁতা মাছে কাঁটা।
অভাগিনী খালি লো ভাইয়ের মাথা।।
(১-তরকারি, ২-ছোট ডোবা)

।। ১২ ।।

বেলা উঠে ধিকি ধিকি
টুসু ক্যান উঠে না।
কিসে তুমার ঘুম ভাইঙে মা
খুইলে কথা বল না।।

।। ১৩ ।।

পরকুল দহের হুদ্‌হুদানি
পুঁটি মাছের উজানি।
কী মোহিনী দিলে টুসু
লোক আসিছে আপনি।।
(বাঁকুড়ায় পোরকুল বিখ্যাত টুসুমেলার গান)

।। ১৪ ।।

মনে করি পরকুল যাব
পরকুল যাওয়া হইল না।
ই-বছর যেমন তেমন
উ-বছর আর মাইন্‌ব নাই।।

।। ১৫ ।।

বিষ্টুপুরে দেইখে আইলম্ ব্যাঙে করে কেছারি।
ঐ কেছারি পয়সা চুরি বাঁকুড়াতে ধরাধরি।
সাপ দেইখে ব্যাঙ পালাই গেল, পড়ে রইল কেছারি।।

।। ১৬ ।।

এতদিন রাইখ্‌লাম মাকে সোনার মন্দিরে গো।
আর রাইখ্‌তে লাইর্‌লম মাকে মকর আইছেন লিতে গো।।
মকর আইছেন বেশ্ কইরেছেন টুসুকে রাইখবেন যতনে।
আমার টুসু শিশুছেইলা শ্বশুরঘরের কী জানে।।
তবু বিদায় দিতে মন চায় না
সূর্য তোমায় বিনতি করি।
তুমি উদয় হইও না —
তুমি উদয় হইলে পরে
টুসুকে রাইখ্‌তে পাইর্‌ব না।।

।। ১৭ ।।

তিরিশদিন রাইখ্‌লাম মাকে
তিরিশ সইল্‌তা দিয়ে গো।
আর রাইখ্‌তে লাইর্‌লম্ মাকে
মকর আইছেন লিতে গো।।
মকর আইছ বেশ কইরেছ
রাইখবে টুসু যতনে।
আর বছরকে আইন্‌তে যাব
পৌষের প্রথম দিনে।।
গাঁকে আইল নতুন তাঁতী
টুসুর কাপড় বুনাব।
সোনার জরির আঁচল দিয়ে
পাড়ার টুসু কাঁদাব।।

[ছান্দার (বাঁকুড়া) 'অভিব্যক্তি' চারু-কারু শিল্পসংস্থার ছাত্রীদের গান। শ্রী উৎপল চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

।। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান — ৩ ।।

।। ১ ।।

কংসাবতী মকর মেলাতে।
সখি, পইড়েছি লো ঠেলাতে।।
কংসাবতী বৃহৎ অতি সুবিখ্যাত জেলাতে।
দেখবি যদি, যাবি বৌদি মানভূম-পুরুল্যাতে।।
সব কিশোরী, সারি সারি, আসে যায় লো মেলাতে।
কোলের টুসু জলে দিতে, সঙ্গেতে চৌদলাতে।।
উপর্ পুলে, নামর্ পুলে, মাঝের পুলে, তলাতে।
নানা লীলায় রসের খেলায়, মত্ত সবাই চলাতে।।
আঁচল ধইরে টানাটানি, মারামারি ঠেলাতে।
কত হরষ মধুর পরশ, হারা-জিতার খেলাতে।।
ভবের মেলায় ভাবের লীলায় তে-তাসেরি খেলাতে।
জীবন বলে, থাইক্লে ভুইলে-হারবি শেষ বেলাতে।।

।। ২ ।।

ভাব কইরে ডুবাইল ডাঙ্গালে।
এখন সুখ হবে কি সাঙালে।।
মন পবন উঠিল গগন, পাই যদি শ্যাম নাগালে।
আর গো পাশে মেলে মেশে, থাকে না যে রাগালে।।
মন উচাটন হয় যে যখন বাঁশী বাজায় বাগালে।
আর ত ঘুইরে ঘুম লাগে না, ঘুম থাকে না জাগাইলে।।
রসিক নাগর রসের সাগর, কে গো আমায় ভাঙালে।
নিঠুর ঢ্যাটির কঠিন কঠোর, দ্যায় না সাড়া গাঁগাইলে।।
কপাল ফাটার নাইক ওষুধ কয় জীবইনা কাঙালে।
আর জীবনের সুখ হবে কি ভেঁড়রা গাছে টাঙালে।।

।। ৩ ।।

প্রেম কইরে শ্যাম দিলে ডিগবাজি।
এমন বুঝি নাই আর কারসাজি।।

হাঁইসে হাঁইসে পাশে বসে কলগেটেতে দাঁত মাজি।
মিষ্টি মিষ্টি কথা বইলে, মনমজাই দাগাবাজি।।
পুং রঙ— লুলুক[১] দুলাঁই মুলুক[২] ভুলালি।
এখন ক্যানে গো, মুখ ফুলালি।।
আদর কইরে হাতে ধইরে আঁচল বিছাঁই বসালি।
মুচকি মুচকি হাঁইসে হাঁইসে মোর মুখেতে হাত বুলালি।।
স্ত্রী রঙ— পিরীত কইরে দায় হইল হে শ্যাম।
বঁধু দিলে না ত নাহ্য দাম।।
কলঙ্কিনী কুলমজানি সংসারেতে হইল নাম।
ভাব কইরে আর ভাইবে ভাইবে জীবনের কপালে ঘাম।।
(১-নোলক, ২-চারদিক)

।। ৪ ।।

ক্যানে এমন ফেললি ঝামেলাই।
তোর বড্ড যে মানের বালাই।।
খুঁইজে খুঁইজে প্রেম করেছিস রিঝে রিঝে ছন্‌ছনাই।
সায়া শাড়ি, টাকাকড়ি চাইলে উঠিস ঝনঝনাই।।
হাটবাজারে দেখা হলে আড়ে আড়ে যাইস পালাই।
তোর সঙে আর নাই রে পিরীত, ক্যানে যে মারিস জ্বালাই।।
সুগুম মারে যাহে ফিরে থাকিস না ত আর ডাঁড়াই।
ধুতিটা তর লিব ছাড়াঁই মাইর্‌ব ভেঁড়রা খাড়াই।।
সায়া সাড়ি গয়না দিব—মুখেতে তর খুব বঁড়াই।
চাল কিনবার পয়সা দিতে উইঠে পালাস হড়বড়াঁই।।
হাতে ঘড়ি পায়ে জুতা গায়ে জামা ঝলমলাই।
ধিক্ রে জীবন! আমার বেলায় চোখেতে জল ছলছলায়।।
(পুলক ব্যাকুল)

।। ৫ ।।

ও কথা আর বলিস না পাপের।
হিঁসাব দিঁইব কি মনস্তাপের।।
হাঁইসে হাঁইসে প্রেম কইরে ফাঁস লাগালি রে বে-খাপের।
ছুঁস্ না রে অছুইতা যবন দূরেতে থাক্‌রে কাফের।।
কত কিরা কত কসম দিব্যি খালিস মা-বাপের।
পোষ পরবে শাড়ি দিবিস ঝুমকা পেইড়া ফুল ছাপের।।

ভাঁওতা দিয়ে মন ভুলালিস কথা বইলে বে-মাপের।
তাই জীবনের যৌবন দিলম মণি দিলম ঢঁড় সাপের।

।। ৬ ।।

তোর গো ভারি আছে অহঙ্কার।
পা পড়ে না মাটিতে আর।।
জমি বিকে গহনা দিলম চুড় বালা আর চন্দ্রহার।
হালের বলদ বিকে দিলম বেসিয়ার আর ফেস পাউডার।।
মুখ গুঁমসাই এড়ি ধুমসাঁই চলিস বলিস চমৎকার।
এই দেহে কি চিরকাল তোর রহিবেক ডবল ডেকার।।
এই কলেবর তল আর উপর ধুলাই মিশে একবার।
ভবের মাঝে দেখ না খুঁজে আছে কি সব এক মেকার।।
দেহির গরব করিস বেকার ভাবিস কি একার-ওকাব।
দুনিয়া ডুইবে একহাঁটু জল, দেখছিস কি জীবন বেকার।।

।। ৭ ।।

আর যদি করিস টিটকারি।
তোর চইখে দিব ফিটকারি।।
জানি তকে চিনি তকে করিস পটল পাইকারি।
তাহে হে তর লাভ হইল না ধরেছিস ঠিকাদারি।।
বিহালু[১] পুরুষ ছাইড়েছি সাঙালুর[২] নাই ধারধারি।
চইখ্‌রাঙা তর রাখ্ হে যগাঁই, রাখ্ লে রে তর সর্দারি।।
ভাত কাপড়ের নাইক মুরাদ মিথ্যা মুখের সাওকারি।
তাও কি তকেই ৰাইস্‌ব ভাল ই ত বড় ঝকমারি।।
ডাল ছাড়া বাঁদরের পারা. দল ছাড়া বিপথচারি।
জীবনে জানি হে ভালই কইর্‌ত পেপার হকারি।।
(১-বিবাহিত, ২-দ্বিতীয় বিবাহ)

।। ৮ ।।

ফুল ফুইটে ফুল গেল ঝরিয়া।
আর থাকে নাই রস ভরিয়া।।
ও যুবতী রসবতী, থাক না লো মান করিয়া।
প্রেম অফুরান না কইরে দান রাখিস না লো ধরিয়া।।

নদীতে বান মারে তুফান থাকে কি লো সে থামিয়া।
গগনের মেঘ ভুবনের জল সব দিয়ে যায় ঝরিয়া।।
অবশেষে মহা আফশোসে ভাববি মাথা ধরিয়া।
বলে জীবন, গেলে যৌবন কাঁদবি জীবন ভরিয়া।।

।। ৯ ।।

আয় টুসু বিজলি-বর্না।
আমি তোব লাগি দিই ধর্না।।
হিমেল হাওয়ার পরল গায়ে ও কুরঙ্গ নয়না।
রক্ত অলক্ত পায়ে শুক্লা শশী নয়না।।
হলুদ রাঙা শাড়ি দিব ব্লাউজ খানা নীলিমা।
কাজলায় উজলায় আঁখি কুঙ্কুমের টিকলি মা।।
চন্দনে চর্চিত পিঁড়ি অগুরতে আলপনা।
ফুল তুলসীর আসন পাইতে ডাকি মা গো কল্পনা।।
চঞ্চলা বালিকা তুমি, ফুল মালিকা পরো মা।
আদর কইরে কোলে লিব আর অভিমান করো না।।
মুখেতে হাসি ঝরে বহে মধুর ঝরনা।
সোহাগ ভরে চুমু লিব শেষ জীবনের কামনা।।

[গানগুলি সেখ জীবন রোস্তম আনসারির (পড়াশ্যা, বলরামপুর, পুরুলিয়া) কাছ থেকে পাওয়া।]

।। ১ ।।

হায় রে, আমার সাধের টুসুধন।
মুখে চুম্ দিলে জুড়ায় জীবন।।
টুসু আমার খেলা করে ঢেলা মারে নব ঘন।
ভাইলে ভাইলে বেলা ক'রে রূপ দেইখে তার মন মগন।।
টুসু আমার বাজার বেড়ায়, পরিধানে নীল বসন।
মিনি কাটিং ব্লাউজখানা বেশ মানালো হাল ফ্যাশন।।
টুসু আমার সিনান করে গায়ে মাখে ফুল-সাবন।
কাপড় কাচে মাথা ঘঁষে বাজে তার হাতের কাঁকন।।
টুসু মায়ের চরণ ধরে কাঁদে আকুল ত্রিলোচন।
বচ্ছব দিনেক পরে দেখা আছে বইলে এই জীবন।।

।। ২ ।।

বঁধু আমার নাই ভালোবাসে।
কথা বলে গো হাঁইসে হাঁইসে।।
বঁধু আমার বাজার গেছে, বসে আছি তার আশে।
চপ পকোড়ি দিবার ডরে চইলে যায় হাঁসে হাঁসে।।
দুদিন ধইরে পাইনি দেখা কে জানে কখন আসে।
আজ যদি আর না দেয় দ্যাখা, যাবো লো তার তল্লাসে।।
বঁধুর সঙ্গে ভাব করেছি মধু পাবার উল্লাসে।
পৌষ পরবে শাড়ি দিইবেক সাঁঘা কইর্‌বেক মাঘ মাসে।।
ত্রিলোচন বলে ধনি, থাক না লো পথে বইসে।
তোর বঁধু যে চলে গেছে, কইল্‌কাতার লাল বাসে।।

।। ৩ ।।

নেশা খাঁয়ে কইর্‌ছ তামাশা।
নেশা ভাইঙলে মুখে নাই রা টা।।
কতদিনের ভালবাসা এত দিনে এই রাঃ সাঃ।
আজ কি তুমার চঙ উইঠেছে চঙ দেখাচ্ছ বিদেশা।।
এক বিছানায় বইসে বইসে খেলেছিলে তাস পাশা।
বিহা কইরে ভুলে গেলে চইলে গেলে চাঁইবাসা।।
সাধ বাসনা নাই হে তুমার নাই মনে প্রেম পিপাসা।
প্রেমের সময় না
ত্রিলোচনের মনে
দুয়ার গড়ায় থাই

মুরাদ না
গঁড়াই দি
খাইতে নাই তর
মিথ্যা রে, তোর হিসাব নিকাশ বলে বেড়াস চাল বানের।।
প্রেম কইর্‌ব ভাব কইর্‌ব সাধ যে বড় তর মনের।
ছটফটাই ত ছুটে আলিস ঠেলায় পড়ে ফুলবাণের।।

মিঠাই দিব ঝিলপি দিব বাত বলিস প্রলোভনের।
প্রেম কইরে প্রাণ কাঁদাইলিস বেচারা ত্রিলোচনের।।

।। ৫ ।।

রা-কাড়িস[১] নাই ভাদর আশ্বিনে।
আদর করিস না আর আঘনে[২]।।
পিছু পিছু যাই হে আমি, চাও না ফিরে নয়নে।
চা-চিনি-পকড়ি কিইনতে যাই হে তখন দকানে।।
রাগ কইর না রাগ কইর না ও প্রেয়সী ললনে।
তোমার ফেরে পইড়ে আমার সুখ হল না জীবনে।।
চাকরী ছাইড়ে নকরী ছাইড়ে ঘুরছি গো তোর পিছনে।
এখন হইল কাহিল দশা—তাই ছাড় ত্রিলোচনে।
(১-কথা বলা, ২-অঘ্রানে)

।। ৬ ।।

উল্টা-ঝুঁটি পিন-কাঁটা গুঁজে।
ও তর মাথা বাঁধা নাই সাজে।।
হাল ফেসনেব মাথা বাঁধা উঠেছে সময় বুঝে।
রঙিন রঙিন রেশমী ফিতা, লিবি গো খঁপার মাঝে।।
কলেজ ফেসন বাঁধবি মাথা, বেনীটা উল্টা গুঁজে।
হেলে দুলে চলবি ও তুই সাজবি গো নানা সাজে।।

।। ৭ ।।

রঙিন শাড়ী উঠেছে দেশে।
তোরা বাইছে কিনে বৌকে দে।।
রঙিন রঙিন শাড়ী কত আসছে গো ট্রেনে বাসে।
বড় বড় দকান যারা বিইকছে গো বইসে বইসে।।
ঐ শাড়ীটা লিব আমি বৌয়ের আশা লাইগেছে।
যত টাকা লাগে হে তুই ঐ শাড়ীটা কিনে দে।।

।। ৮ ।।

গোপন প্রেম তুই রাখবি সাবধানে।
যেমন অন্যালোকে না জানে।।
প্রেম কইর‍্ব ভাব কইর‍্ব সাধ বড় যে তর মনে।
ছটফটাছ তুই ছুইটে আলি ঠেলাই পইড়ে ফুলবাণে।।
গোপন প্রেম রয় না ঢাকা যতই রাখ গোপনে।
আলোর মত ছড়ায় হেথা প্রকাশ হয় দিনে দিনে।।

।। ৯ ।।

শিলাই নদী যাবি সজনী।
আমি হেইর‍্ব তুমার মুখখানি।।
শিলাই নদীর ধারে ধারে আইড়েছি জড়া ঘুনি।
ইঁচলা-পুঁটি না লাগে ভাই, লাইগেছে গড়ই টুনি।।
শিলাই নদীর ধারে ধারে বইসেছে দকানদানি।
মিষ্টি খাওয়া রইল বাকি কে হবি জানি চিনি।।
(একজোড়া মাছধরার বাঁশের ফাঁদ)

।। ১০ ।।

কই দিলি হে রাসমেলায় শাড়ি।
বঁধু, তর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি।।
নৈতন কাপড় নাই হে আমার পরেছি মটা খাঁড়ি।
তর কারণে আমি কেবল যাই না হে শ্বশুরবাড়ি।।
ভাঁওতা দিয়ে মন ভুইলালে—দিব কিনে লাল শাড়ি।
পাড়ার লোকে বলে মোকে বলে হে ভাতার ছাড়ি।।

।। ১১ ।।

বড়ই আশা রইল হে মনে।
আমি ভাব কইরে তুমার সনে।।
পুরুলিয়ার রাসমেলাতে ঝুমকা-পাশার দকানে।
বড়ই আশা ছিল মনে দিবে কিনে দু কানে।।

চুল চিপা ডোর রেশমি ফিতা নানারঙের সেখানে।
এত বড় নিঠুর তুমি আমায় দিলে না কিনে।।
হাত ধইরে হে সত করিলি, পান খাওয়ালি দকানে।
আইস্‌ছে মাঘে পড়বি ফেরে তাই ভাবে ত্রিলোচনে।।

(সত্যবন্দী)

।। ১২ ।।

ঝিঙ্গাফুলে জুনপুকির[১] আলো।
আমি তুইল্‌ব লো কবে বলো।।
দেইখ্‌তে তকে দেখায় কাল. বলে লো সবাই ভালো।
তোর সঙ্গেতে প্রেম করিতে তাই তো আমার মন গেল।।
তোর ঝিঙ্গাতে মন লাইগেছে লালসা আর নাই গেল।
তোর ভাবনায় অঙ্গ জ্বর, পেটের ভাত যে চাল হইল।।
তাই ত রাতে স্বপুন[২] দেখি বিফলেতে রাত গেল।
ত্রিলোচনের মনের আশা, মিটাবি কবে বলো।।

(১-জোনাকি, ২-স্বপ্ন)

।। ১৩ ।।

শুনে লে লো যাবি তার পরে।
এমন ঠকাস না বারে বারে।।
মাছির কামড় খাইয়ে আমি পইড়ে আছি পিঁদাড়ে।
কথা দিলিস বাঁধের ঘাটে থাইক্‌ব বইসে গাছ আড়ে।।
(ধনি) বিহা দ্বিতে খুঁজছে ঘরে বৌ দেখেছে জয়পুরে।
তর কারণে আমি কেবল রায় দিলি না লো ঘরে।।
পোষ পরবের পিঠা মুড়ি রাইখ্‌বি লো মনে কইরে।
কয় ত্রিলোচন পেটের জ্বালায় বইসে আছি হাঁ-কইরে।।

(পিছনে)

।। ১৪ ।।

তুই বঁধু ভালিস না আমাকে।
ভাল লাগে না হে তুমাকে।।
জল আইন্‌তে যাই হে যখন যমুনা বাঁধের শানঘাটে।
বঁড়শি-হাতে মাছ ধইর্‌তে দেখে আমার বুক ফাটে।।

দু শ গ্রাম তামাক আমার রোজ চাই হে সন্ধ্যাতে।
দিতে যদি পার মোক্কে বাইস্‌ব ভাল তুমাকে।।

।। ১৫ ।।

টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে।
পিঠা কইরে আঘন সাঁকরাতে।।
টুসু আমার একলা বাছা গেছে শ্বশুর ঘরেতে।
ধইয ধইর্‌তে লারি, পারি না আর থাকিতে।।
টুসুর বিহা দিয়েছি মা দূরন্ দেশ কইল্‌কাতাতে।
একটি বছর পরে টুসু আইস্‌বে বাপের ঘরেতে—
খেলনা কিনে দিইব আর আঙটি চুড়ি দুহাতে।।
টুসু মাকে লিয়ে যাব মারাফরি দেখাতে।
বিদায কইরে পোষের শেষে পাঠাবে ত্রিলোচনেতে।।

[শ্রীত্রিলোচন বাউরির (গ্রাম-পোদলাড়া, জেলা-পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ১ ।।

নম নম অ টুসুমণি।
আমি তুমাব পূজা নাই জানি।।
গেঁদা ফুলের মালা গাঁথে সাজাব চাঁদবদনী।
আট দিন আট কলাইয়া দিব গো তুমায় আমি।।
এমনি আমার পড়া কপাল অভাবেই জ্বইলে গেলি।
খাইটে খাইটে গায়ের রঙটা এখনি যে হারালি।।
শিক্ষিত বব আইস্‌তেছিল ভাল চইল্‌তক ঘরে।
দাবির কথা শুনে বাপেব চিন্তায মাথা ধরে।।
দেইখ্‌তে দেইখ্‌তে হইল মঞ্জুর বাগাল-খাটার ঘরে।
জমি-জায়গা কিছুই নাইক ঘর আছে একটি কইরে।।
কুটুম-বাটুম আইলে ঘরে বসে ঢেঁকির উপরে।
হারু বলে কি করি গো বছরিয়েই ধান মরে।।

।। ২ ।।

ভালবাসা বেলকলির কাঁটা।
মাথায় রাখবি লো গুঁজে দুটা।।
এত দিনের ভালবাসা ভুললি কি লো তুই সেটা।
দ্বারকেশ্বরের পরব, টাঁইড়ের[১] মিষ্টি পানের খিলিটা।।
উপ কুলির[২] কত লকে[৩] বলে গো সেই কথাটা।
বাঁধের ঘাটে মাইয়া লকের বসেছে কাছারিটা।।
ভালাবাসা নাইখ যাদের তাদেরই পকপকিটা।
হাথের আড়ে কতদিন আর লুকাবি ঐ সুরজটা।।
ফুইটে ফাইটে বইল্‌তে গেলে সেটাও হয় যে অসঠা[৪]।
এত দিনেও বুঝলি নাই ভাই ভালবাসার রীতিটা।।
ভালবাসার কি যে জাদু ভুললি নাই আজও সেটা।
কিরীটী ভাইবেছে শেষে ভালবাসাই জীবনটা।।
(১-রুক্ষ প্রান্তর, ২-গ্রামের ছোটপাড়া, ৩-লোক, ৪-ক্ষোভ)

।। ৩ ।।

লেল্‌হা[১] ভ্যাদা এইলাবেইলা[২] বরে।
অ তুই ঘর কইর্‌বি লো কী কইরে।।
হাল লিয়ে সে ক্ষেতে গেলে উর্‌হলে ঢস্‌কে পড়ে।
টাখু[৩] ছুলাইয় হাঁঠু গাইড়ে উঠে লো বঁঠা ধইরে।।
এলপ সেলপ[৪] কাজ করিলে তুরুতেই মাথা ধরে।
খহং খহং কাইশ্‌তে থাকে নাক দিয়ে লে জল পড়ে।।
হায় রে কী বইল্‌বিলি কাইল্‌ ছিলি বাপের ঘরে।
নিজের যেমন গঢ়ন-সঢন পড়লিলো লেল্‌হার ঘরে।।
(১-অতিসরল, বোকা, ২-এলেবেলে, ৩-হাঁটু, ৪-অলসভা)

।। ৪ ।।

অ গ- বাবা বলি তুমারে।
আমার বিহা দাও না এইবারে।।
আমার সঙ্গী জুড়ি যত যায় যখন শ্বশুর ঘরে।
দেইখে তখন অ গ বাবা মন আমার কেমন করে।।
যৌবন করে টলমল ঢেউ মারে বারে বারে।
যৌবন জ্বালা দারুণ জ্বালা ধৈর্য ধরি কী কইরে।।

চাই না আমি রাজার ব্যাটা, বিহা দে গরীব ঘরে।
শিক্ষিত বর নাই বা হইল, নাই যদি কিছু করে।।
সাঁতার দিতে পারে যেমন ভরা যৌবন-সাগরে।
মন্টু বলে রাইতের কালে যৌবন আমার যায় ঝরে।।

।। ৫ ।।

কে ছিল গো তর ভালবাসা।
তকে কিনে দিল কানপাশা।।
এত দিল যে দেইখেছিলি তর ধনি মলিন দশা।
আইজ ক্যানে দেখি গো ধনি কান তলে ফুলের খঁসা।।
মুহেতে হিমানী পাউডার মাথায় গুঁজা চুল চিপা।
কপালে কুমকুমের ফঁটা, দুপায়ে সাজে আলতা।।
দু হাথেতে রেশমি চুড়ি মাথায় আবার ফুল ফিতা।
তাও ত ধনীর মন পালি না খুঁইজে গো জড়া শাঁখা।।
দু পায়েতে নপুর জড়া কমরেতে রেট আঁটা।
মন্টু বলে ভুইলে যাস না ভালবাসার কথাটা।।

।। ৬ ।।

দেখাইস না ওরে লম্পটা।
চেঠা দেইখে লাগে অসঠা।।
ফুটানি তর মুহে কেবল, জানি মুরাদ কতটা।
কুঁড়া খাঁঞে মইরেছে বাপ ঢং দেখাছিস তার ব্যাটা।।
হাঁথে ঘড়ি ফুল পেন পইরে দেখাইস রে বাবুর ব্যাটা।
কুজা হইয়ে গেলিস ভখে[১] সটে গেল নাদাটা[২]।।
তর ঘরেতে যাঞে আমি দেখেছিরে মুরাদটা।
মন্টু বলে বাতাস দিলে হিলে[৩] ভাতের হাঁড়িটা।।

(১-খিদেয়, ২-পেটটা, ৩-দোলে)

।। ৭ ।।

তুই ধনি লো আমায় ভুলালি।
অ তুই ভাব কইরে দাগাদিলি।।
শিশুকালে তুই আমারে কী কথা বইলেছিলি।
সেটা এখন নাই লো মনে সব কিছু ভুইলে গেলি।।

পিঠাজইড়ের পরব টাইড়ে ধুঁধার নাচ দেইখেছিলি।
সেই পরবে গুড়ের মিঠাই আমাকে দিঞেছিলি।।
আগে আমি জানি নাই লো পরে সেটা বুঝিলি।
অধম সন্তোষ বলে ভাব ক্যানে করেছিলি।।
(ছোনাচের বিখ্যাত শিল্পী ধনঞ্জয় মাহাত)

।। ৮ ।।

ঝাড়খন্ড্ রাজ্য হাম্দের অধিকার—
অ ভাই কথাটা অনিলদাদার।।
এই মাটিতে জন্ম মোদের এই মাটি যে মা আমার।
এই মাটিকে রক্ষা করার হাম্রা হলি দাবিদার।।
বন কাটি' বস্‌কইতা[১] বঠি লই হে বড় জমিদার।
বাপের জমি রক্ষা কইর্‌তে ধর সবাই হাতিয়ার।।
কাঁধেতে লাও তীরধনুক হাঁথে ধর তলোয়ার।
টাঙ্গি-বল্লম-ফার্সা লিয়ে ঘুরাও ইবার অধিকার।।
ঝাড়খন্ড্ রাজ্য অলগ্[২] কইর্‌ব—না-আশা জীবনটার।
শোষকেরা আগাএ আসুক দেইখ্‌ব সাহস কেমন কার।।
লিবই লিব ঝাড়খন্ড্ রাজ্য কইর্‌ব রে ঝাড়খন্ড্ সনার।
কিরাটীখুড়া বলে, দুলাল—থাকে না কন ভাবার।।
(১-বসবাসকারী, ২-আলাদা)

।। ৯ ।।

ঝাড়খন্ডীরা হইল হাঁথখালি।
হাম্দের সব কিছু লুঠে লিলি।।
যাদের আছে টাইড়্ চালাকি মাইন্নেহে[১] সলি সলি[২]।
বুদ্ধি ভাঁওর নাই যাদের ভাই তাদের পেটে কলবলি।।
গরীব লকের বুদ্ধি নাই হে চাইর পয়সার খাটালি।
গাঁইতের পাসা উঠাঞ নামাঞ গায়ের বলটা গুছালি।।
হাম্দের জমি হামদের জায়গা তবু হামদের হাঁথ খালি।
উধা মাধা মুইন্‌সা হচ্ছে তাদের হাথে টাকার থলি।।
হাম্দের জায়গায় কলকারখানা হাম্রা রে কামিন-কুলি।
টামনা ঝড়া বেল্‌চা লিয়ে ঘুরছি হে গলি গলি।।

কারখানার ম্যানেজারবাবু কইল্‌কাতার রাসবিহারী।
ভাঁড়ার ঘরে চর ঢুকেইছে বলে ভাই গিরিধারী।।
(১-গুছিয়ে নিল, ২-ধানের পরিমাপ বিশেষ)

[সর্বশ্রী হারাধন মাহাত, দুলাল মাহাত, মন্টু মাহাত, গিরিধারী মাহাত, কিরীটী মাহাত, সন্তোষ মাহাতর (কালুহার, পুরুলিয়া) সৌজন্যে গানগুলি পাওয়া।]

।। ১ ।।

নমঃ নমঃ শ্বেত বসনা।
তোমায় করি মাতঃ বন্দনা।।
বীণাপানি নামটি তোমার করে ধর তাই বীণা।
সরোজ আসনে বসি তাই সরোজ-আসীনা।।
জ্ঞানদায়িনী হলে মাতঃ জ্ঞান করি বিকশনা।
অজ্ঞানে মা দিলে তুমি জ্ঞানালোকের জোছনা।।
মবালে বিহরণ করি হলে মরালবহনা।
মধুবমূরতি হেরি জগৎ কাঙালপনা।।
তোমার মূরতি গড়ি পূজিছে জগৎজনা।।
তব রাতুল চরণ মাগো নিত্য করে কামনা।।

।। ২ ।।

তোমার বঁধু ছাইড়ে দিব না।
আমার পুবাও মন বাসনা।।
মুকুল কমল হল মদনে বিকশনা।
মধু ভারে হলাম ভারি সম্বরিতে পারি না।
পর ফুলে খেতে মধু মন ও আমার মানে না।
মধুকর হইয়ে মধু পিও হে কালোসোনা।।
বিরলে পেয়েছি আজি যেতে তোমায় দিব না।
মধুপান করাইব নিত্য কবির বাসনা।।

।। ৩ ।।

বাঁশী বাজে ললিত সুরে।
মন বিপিনে সাঁঝ-দুপুরে।।

যে রাগেতে বাঁশী বাজে রাধা নামে সুস্বরে।
আমার বিরহ বীণা বেজে উঠে সেই সুরে।
বাঁশীর মধু সুতানে দহে মোর অন্তরে।
আমি ধনি বিরহিণী মরি সদা গুমরে।।
নিশিদিন আমার হে আবেশে তন্দ্রাতে।
প্রেমের মিঠা সুরভি নিত্যকে পালন করে।।
কুঞ্জে ক্যান এল না কালা।
বাসি রইল রে ফুলের মালা।।
কুঞ্জে কালা আইস্‌বে বইলে গাঁথিনু বনমালা।
যতনে রাইখেছি জ্বালি স্নিগ্ধ এ যৌবন আলা।।
চাইয়ে কালার পথ পানে কাইট্‌লো রে অনেক বেলা।
বিরহ-মারুত আসি মরমে দিচ্ছে দোলা।।
বনফুলের মিঠা বাসে করিল মন ব্যাকুল।
নিত্য বলে পর প্রেমে মজেছে রে আজ কালা।

।। ৫ ।।

একলা ধনি যাস না বিকালে।
জল আনিতে নদীর কূলে।।
সরোবরে প্রস্ফুটিত হেরিলে কমল ফুলে।
অনায়াসে পেলে মধু ত্যজে না অলিকুলে।।
তেমনি কালা পেলে একা ছাড়বে না জীবন গেলে।
পান করিবে প্রেম মধু বসিয়া যৌবন-কূলে।।
পথে কালার প্রেমে পড়ে থাকবে না কোন কূলে।
নিত্য বলে একা ধনি যাস্‌ না যমুনার কূলে।।

।। ৬ ।।

মনের কথা রইলো রে মনে।
দাগা দিল ভ্রমর যৌবনে।।
যখন আমি অবুঝ কলি গুনগুনানি গান শুনে।
হরষে ফুটিয়া হেরি কৃষ্ণ বর্ণ নয়নে।
নিশিদিন মিঠা প্রেমের সুমিষ্ট কলতানে।
মধু ভরে পড়লি ঢলে সম্বরিতে পারি নে।
হৃদি মাঝে আরোপিতে মধু দিলাম যতনে।
নিত্য বলে পিয়ে মধু উড়ে গেল কোন্‌ বনে।।

।। ৭ ।।

গাঁথবো মালা—পাইনি খুঁজে ডোর।।
বৃথা কাটলো রে যৌবন মোর।।
ফাগুনের পেয়ে সাড়া ফুল ফুটিল থরে থর।
এলো না ভ্রমরা বঁধু এলো না মোর চিতচোর।।
ঢল ঢল মধু ভরা আমার এ মিষ্টি অধর।
পবন ভরে পড়ছে ঝরে মধু সদা ঝরঝর।।
যৌবনের কুঞ্জ বনে হলো না নিশিভোরে।
মিষ্ট স্বরে নিত্য বলে ঐ যে পিক কুহরে।।

।। ৮ ।।

হার গেঁথেছি—অচেনা ডোরে।
নব যৌবনে সোহাগ ভরে।।
মনের নিকুঞ্জ বনে সুন্দর নিশিভোরে।
ফুটেছিল যে কুসুম যৌবন আলা করে।।
সবুজ মনে হার বিরচি রেখেছি যতন করে।
গহন গভীর কোণে কত না সোহাগ ভরে।
সুস্নিগ্ধ প্রেম সুরভি রয়েছে থরে থরে।
নিত্য বলে যে সুরভি ঝরিবে জীবন ভরে।।

।। ৯ ।।

চপল ভ্রমর কাজল আঁখি।
কারে খুঁজছে হে থাকি থাকি।।
মনলোভা যৌবন মোর, ফুটে আছি একাকী।
গুঞ্জরিয়া এসো কাছে দেখছো কি মারি উঁকি।।
এসো হে মধু ভান্ডারে দেখ না একবার চাখি।
মিষ্টি মাদ্যা নীরব ভাষায় তাইতে তোমায় ডাকি।।
খেলে এমন মিষ্টি মধু ভুলবে পরান পাখি।
নিত্য বলে ঢুলু ঢুল নেশাতে হবে আঁখি।।

।। ১০ ।।

তোমার মুখের মিষ্টি চাহনি।
আমায় ডাকে সদা হাতছানি।।
সজ্জিত টেবিলে ওগো তুমি যে মোর ফুলদানি।
ধেয়ানে মগনা রাখো তুমিই সৌরভ দানি।।
তুমি ছন্দা মৃদু গন্ধা তুমি মনোমোহিনী।
তুমি সরল, আরো ভালো, তুমি যে অভিমানী।
কত না সোহাগে হৃদে বসগো আহ্লাদিনী।।
মধুভরা বিম্বাধরে নিত্য দেয় চুমাখানি।।

।। ১১ ।।

সখি আমাব খুশিতে ভরা।
কুঞ্জে আসবে নাগর ভ্রমরা।।
আগমন শুনি সখী মদনে জরজরা।
অঙ্গেতে উঠিল তাপ তাপেতে পাগল পাবা।।
যামিনীতে বদ্ধ যেমন পঙ্কজেতে ভ্রমরা।
ভৃঙ্গের সঙ্গে মেতে কাঁপে যেমন নলিনী।
সেই মত কাঁপে ধনির শিরা উপশিরা।
নিত্য বলে ভ্রমর হয়ে আপনা যায় পাসরা।।

।। ১২ ।।

বিনয় করি কহেন শ্রীমতী।
বঁধু শুন মম মিনতি।।
তুমি হে ভ্রমরা জাতি নানা ফুলে বসতি।
এ কুসুমে ও কুসুমে মধু খাও নিতি নিতি।।
বিকশিত সরোবরে হেরি নলিনী ভাতি।
মধুকর পিয়ে মধু হইয়া হৃষ্ট মতি।।
নলিনীর তাহে যদি প্রাণে নাহি হয় প্রীতি।
নিত্য কহে মধু করে লুকায়ে রাখে রাতি।।

(শ্রীনিত্যানন্দ মাহাত-র (আড়ষা, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত)

১। আয় টুসুধন আমাব আসরে, আমি পূজবো তোমায় যতনে।
এসো হে শ্যাম করি দরশন আমার মনে পড়ে ঘন ঘন।।

২। মন বাঁধা দিয়ে সই।
আমি বিদায় হই।।
কটকে গড়াব গয়না
ঢাকাতে গোট গড়াব।
কইল্‌কাতাতে রঙ করাইয়ে
টুসুধনকে পরাব।।

৩। অশোকবনে পাতের কুঁইড়া
সীতা পাশা খেলেছে।
ফকির বেশে রাবণ এসে
সীতা হরণ করেছে।।
দ্যাখ্‌ চেয়ে দ্যাখ্‌ সোনার মন্দিরে।
টুসু আসছে কত গম্ভীরে।।

৪। আমার টুসুর একটি ছেইলা
না-পাঠাব শ্বশুর ঘর।
জামাই আইলে বইলে দিব
ঘুইরে বাছা বিহা কর।

৫। আমার টুসু কাশী যাবে
সঙ্গে চাকব দুজনা।
কালীমাটি দিয়ে ফিইর্‌বে
দেখে টাটার কারখানা।।

৬। আমি রইব না পরের ঘরে।
ঘব কইরে দে টাটানগরে।।

৭। মৌলীশোলের সরুচিড়া
বৈদ্যনাথের বসা দই।
বলেছিল সই পাতাব, পরান বঁধু আইল কই ?
ও টুসুমনি--
তোকে কে দিল লো দুআনি।।

৮। টুসু নাকি দখিন[১] যাবে খিদা লাইগ্‌লে খাবে কি?
আন টুসুর গায়ের গামছা ঘিয়ের মিঠাই বাঁইধে দি।।
(পুরী (ওড়িশা)

৯। আয়না কিনতে বায়না দিলাম
তবু আয়না পেলাম না।
দাঁতে নিশি চোখে কাজল
মুখ দেখিতে পেলাম না।
এসো শ্যাম করি দরশন।
আমার মনে পড়ে ঘন ঘন।।
রাম না কিরে বনে যাবি
আজকে রামের অধিবাস।
উল্টা পাল্টা লেখা আছে
চোদ্দ বছর বনবাস।।

১০। আয় সজনী আমরা দুজনা।
আমরা দেখব টাটার কারখানা।
লাইনে লাইনে গেঁদা ফুল
তরা ফুল লিবি তো পয়সা খুল্।।

১১। এ ঘাটেতে বাসন মাজি ও ঘাটেতে হাততালি।
বহুত দিনেব ভালবাসা আজ ক্যানে জবাব দিলি?
ঝাড় গেঁদা ফুল পাইড়ের উপর কাপড় কিনে দিব মকরে।

১২। মাঁইতি পুকুর নাইতে গেলাম
ট্যাংরা মাছে দ্যায় বিঁধে।
বিষে অঙ্গ জরজর
প্রাণনাথকে দাও ডেকে।।

১৩। ওরে ওরে কালা ছুঁড়া
জরি জুতায় মাপ দিলি।
দাঁড়া কদমতলে —
সোনার অঙ্গ দিব কাল করে।
তোকে মাইর্‌ব পায়ের মল খুলে।।

১৪। চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বড়তলা।
অমনি পথে দেখাই আইন্ব কয়লাকাদের জলতুলা।।
উলট্পালট্ ফুলট্[১] বাঁশীতে।
আমার মন মানে না ঘরেতে।।

(ফ্লুট্ বাঁশি)

১৫। মাগো আমি ফুল পাতার
ফুলকে আমি কী দিব?
বাজার যাব পয়সা লিব
ফুলকে ফুলেন তেল দিব।।

১৬। ও রামের মা, ও রামের মা
আজ কী তোদের তবকারি?
ঐ সতীনের বাড়ির বাইগন।
নাম—বাঁধের গগ্লি।।
চল্ টুসু চল্ টাটা যাব
ধান হইল নাই কী খাব।

[শ্রী সমীব দত্তর (মানবাজার, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান - ৪ ।।

।। ১ ।।

দেখ্ না কত আনন্দ দুলে।
টুসু আইস্ছে গো মায়ের কোলে।।
গেল বৎসর আইল টুসু গেল যে চইখের জলে।
এবার আমার টুসুমণি আইস্বে গো কোলাহলে।।
এবৎসর ভাই ধান হইয়েছে গান গারে সবাই মিলে।
টুসুমণি লক্ষ্মীমণি দিয়েছে ভান্ডার খুইলে।।
যেখানে যে আছিস ভখা' আয় সবে দলে দলে।
টুসুর গানে মইজ্ব সবে এই কবি নিজাম বলে।।

(অভুক্ত)

।। ২ ।।

বীণাপাণি গোলোকবাসিনী।
আইস আইস মা গো জননী।।
আইস মাতা বিদ্যাদাত্রী ত্রিজগতের জননী।
হেঁটে মুন্ডে ডাকি মাতা তন্ত্রমন্ত্র নাহি জানি।।
কেবল মা তোমার ভরসায় রচিয়ছি বই খানি।
বোবা মুখে বাক্য দে মা ওগো হংসবাহিনী।।
ভক্তি ভইরে ডাকি মাগো ভজনসাধন নাই জানি।
এই নিজামে তরাও মাগো ওগো বীণাধারিণী।।

।। ৩ ।।

হরিনামের জপ হে মালা।
ও তোর সময় নাই, গেল বেলা।।
এ হরিনাম পারের ভেলা কর না অবহেলা।
এ হরিনাম পথের সম্বল তরবি রে নিদান বেলা।।
এ হরিনাম সার কর ভাই, যাবে হে দুঃখজ্বালা।
হরি হরি বল রসনা সন্ধ্যা-সকাল দুবেলা।।
পাপ দেহ পবিত্র হবে এ নামের পর মালা।
নাম বিনে কি আছে গতি ছাড় হে মোহ জ্বালা।।

ভবের হাটে এসে রে তুই খেলবি যে কত খেলা।
নিজাম ভনে এ জীবনে নাম বিনে হে পাই জ্বালা।

।। ৪ ।।

মরি মরি তোর জ্বালায় মরি।
ও শ্যাম বাজাইস না আর বাঁশুরী।।
ঘরে পরে সবাই শুনে ক্যান বাজাও বাঁশুরী।
জলের ঘাটে গিয়ে আমার ভাইঙল হে কাঁখের বারি।।
তুমি কি জান না হে শ্যাম আমি অবলা নারী।
কাইল্ সকালে হবে দ্যাখা দিও না আর শিশ্কারী।।
আমি তুমায় ভুইল্তে লারি মরি হে শ্যাম গুমুরি।
তুমার প্রেমে পইড়ে আমি ছাইড়লি হে শ্বশুর বাড়ি।।
অনেক দিনের পরে দ্যাখা তোমায় কি ভুইল্তে পারি।
নিজাম বলে চল ইবার কইর্ব গো রেজেস্টারি।।

।। ৫ ।।

মাইরি ধনি তোকে নাই ভালি।
ও তুই ক্যানে লো ছুটে আলি।।
কইর্ব না ধন প্রেম পিরীতি করিস না ভালাভালি।
তবু ক্যান ধইর্ব বইলে আমাকে ধরা দিলি।।
প্রেমেতে হায় মাতুয়ারা হয়ে দিশা হারালি।
আমাকে তুই বারে বারে ক্যানে আইসে সাঁতালি।।
শ্বশুর ঘরে গেলি না তুই বাপের ঘরেই বুঢ়ালি,
আমাকে তুই ভাইলে ভাইলে সারা জীবন কাটালি।।
আমার আশা ছাইড়লি না তুঁই অগাধ জলে ডুব দিলি।
নিজামে হায় পাব বইলে দুটি হাত বাড়াই দিলি।।

।। ৬ ।

দেইখ্ ভইলে দেইখ্ মিছা নাই বলি
আমি তোর তরে জইবে গেলি।।
শিশুকালে পিরীত কইরে আইজ্ ক্যানে এমন হলি।
কেঁদার হাটে দেখা হইল জেইকলি তাও রা না দিলি।

তোকে পাবার আশা কইরে অগাধ জলে ঝাঁপ দিলি।
তবু রে তুই এত নিঠুর— ক্যান নাই আমার হলি।।
ক্যানে তবে বাঁধের ঘাটে সত্যি বন্দী করালি।
আইজ ক্যানে তরে ফাঁকি দিয়ে উইপ্‌রা ভাব দেখালি।।
কুলেতে হায় কালি দিয়ে অকূলেতে ভাসালি।
একি নিজাম ছিল মনে আমাকে তুই কাঁদালি।।

(জর জর হওয়া)

।। ৭ ।।

মিছা মোরে ক্যানে দোষ দিলি।
ও তুই রাগ কইরে চইলে গেলি।।
তুই যে আমার ভালবাসা তোকে যে লো নাই ভুলি।
তবু কেন মিছামিছি আমাকে তুই গাইল্ দিলি।।
উপর মুখে চলি গেলি গরবে না বা কাড়্লি।
আমাকে তুই ফাঁকি দিয়ে অন্যেতে মন মজালি।।
হওয়া প্রেমে দাগা দিলি আগাম দিগাম না-ভাবলি।
প্রেমের অঙ্কুর ভাইঙে দিয়ে অকূলে ভাইসে গেলি।
বুঝলি না পিরীতের রীতি সুজন রসিক হারালি।
শেষের কথা ভাবলি না তুই নিজামকে ছাইড়ে গেলি।।

।। ৮ ।।

টাগর বন্ধু ডাগর হইয়েছে।
হিপি দেইখে হিরো সাইজেছে।।
আ মরি কী রূপের ছটা বাঁকা টেরি কাইটেছে।
মুখেতে পানের খিলি ঠঁটেতে রঙ লাইগেছে।।
বাঁকা ভুরু কাজল মাখা একটানা ভাল ভালিছে।
হিরো কটিন লুঙিটা তার রোদের ছটায় ঝলকিছে।
প্রেম-পিরীতি ভালবাসা কন্ ইস্কুলে পইড়েছে।
কুলি মুড়ায় যাইতে যাইতে বাঁকা নজর মাইরেছে।
ঢং দেখে মন মানে না আর রূপ দেইখে মন ভুইলেছে।
আয়রে নিজাম আয়রে কাছে তুই ছাড়া আর কে আছে?

।। ৯ ।।

কাজ নাই স্বামী তুমার এই ঘরে।
গহম্ ঘাঁটা[১] তাও না প্যাট্ ভইরে।।
শাশুড়ির মন এমন তেমন শ্বশুরে জ্বালাইয় মারে।
রইজ রইজ[২] গহম্ ঘাঁটা দেইখলে হে অঙ্গ জ্বলে।।
গেল বছর খরা খরা এ বছর ত নাই মরে।
তবু ক্যান গহম্ঘাঁটা দিছ হে আমার তরে।।
আইল খরা গেল খবা সাঁতালি পরে পবে।
নাই যদি তর ভাত কাপড় পৌঁছে দে বাপের ঘরে।
শায়া লিব শাড়ি লিব চল স্বামী বাজারে।
নাই যদি রে দিবি নিজাম মইরাব রে এক চড়ে।।
(১- গমচূর্ণ লাপসি ২- প্রতিদিন)

।। ১০ ।।

ঝইলকিছে ধনি তর কচি কদম।
আমার মনে পইড়ে ঘনে ঘন।।
আড় নয়নে মুচকি হাঁইসে ভুলালি তুই আমার মন।
ঝলক দিয়ে চইলে গেলি দিলি আমায় জ্বালাতন।
বাঁধের ঘাটে ভালভালি করিস না ধন সারাক্ষণ।
ললক দিয়ে ঝলক দিলি হরণ করলি আমার মন।।
ধইয যে আর মানে না ধনি দ্যাখে তুয় ঐ নব যইবন।
আইস ধনি মনমোহিনী পরশে জুড়ায় জীবন।।
হাঁইসে হাঁইসে আইল কাছে দে ধরা দে আলিঙ্গন।
হরষে পরশে ধনি মাতালি নিজামের মন।।

।। ১১ ।।

আমি এখন আধফুটা কলি।
ভমর করিস না ভালাভালি।
কলি ফুলে নাইরে মধু করিস না ভালাভালি।
অসময়ে আইসে ভমর আমাকে তুই জ্বালালি।।
শুন না, মান না ভমর ক্যান রে তুই সাঁতালি।
নিশিভোরে ঘুমের ঘোরে ক্যান রে তুই জাগালি।।

কলি ফুলে ভমর-অলি ক্যান রে তুই মাতালি।
ফুল না ফুইট্‌তে আমার যইবনে কালি দিলি।।
কুলেতে হায় কালি দিয়ে অকূলেতে ভাসালি।
নিজাম বলে অবশেষে আমাকে তুই মজালি।।

।। ১২ ।।

লুহা সিঁদুর[১] দিবি কবে বল্।
না হইলে রেজিস্টারি কইর্‌বি চল্।।
আমাকে তুই ফাঁকি দিয়ে কার্ কুঞ্জেতে ছিলি বল্।
সারা নিশি কাঁইদে কাঁইদে পড়ে আমার চইখের জল।।
নাই যদি রে কইর্‌বি বিহা খুইলে খাইলে কথা বল্।
তর্ জইন্যে হইয়েছি পাগল, নাইরে গলায় দড়ি লিব বল
সত্যি বন্দী করা আছে মনের আশা পুরা চল্।
তুই ছাড়া এ জগতে আর কে নিজাম আছে বল্।।
(প্রথাসম্মত বিয়ের লোহা-সিঁদুর)

।। ১৩ ।।

মিঠাই কিনে দিইব ধনি আইলে।
ও তুই থাকিস না মন গুমানে[১]।।
মাইরি ধনি তর কিরা দিইব ধনি মিঠাই আইনে।
রঙিন শায়া শাড়ি দিব পইর্‌বি লো তোর্ জুয়ানে।।
মিথ্যা কথা কইলি নাই ধনি এইখনি দিইব কিনে।
অনেক দিনের পরে দেখা, আইজ এমন হলি ক্যানে।।
আইজকে নিশি তর কুঞ্জে কাটাব লো ধনি দুজনে।
মিঠাই দিইব জিলপি দিইব খাবি লো মনপ্রাণে।
অঘ্যান মাসটা যাইতে দে আর দিইব লো ঝুমকা কিনে।
আর যদি দরকার থাকে বইল্‌বি তখন নিজামে।।
(অভিমানে)

।। ১৪ ।।

পিরীত করা সহজে হয় না।
জলের ঘাটে হইল ঠিকানা।।

একদিন গেল দুদিন গেল তিন দিনেতেও পাইলম্ না।
চাইর্‌দিনেতে ধইরেছি তার আঁচলখানা।।
মাথায় কলসী যায় রূপসী জল ভইর্‌বার ছলনা।।
কত রকম ফইন্দি কইরে ছাইড়ে দাও কালসনা।
নাছড়বান্দা আমি কিন্তু কথাতে আর ভুলি না।
প্রতিদিন ওই বাঁধের ঘাটে তাহারে দিই যাতনা।।
অবশেষে ধনি আইসে আমারে দ্যায় সান্ত্বনা।
নিজাম বইলে এক দিনেতে পিরীত ভাই হবে না।।

(গ্রাম—পো. কেন্দা, পুরুলিয়ার সেখ নিজামউদ্দিন
আনসারির কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত)

।। ১ ।।

আগে বন্দি গুরু গজানন।
হর গৌরীর নন্দন।।
তেত্রিশ কোটি দেবগণ পূজ গো তাঁর চরণ।
সেই চরণে মতি রাইখে পূজি যত দেবগণ।।
কালী বন্দি, বাণী বন্দি, বন্দি কমলার চরণ।
ভক্তি ভইরে মাতা পিতার বন্দি আমি শ্রীচরণ।।
স্বর্গমর্ত্য পাতাল বন্দি বাকি নাহি কনজন
মুখ্যু কালী বলে বাণী ক্ষমা করা সব্বজন।।

।। ২ ।।

টুসুমণি আইস্‌ছে মকরে।
মোরা পূইজ্‌ব মা ক্যামন কইরে।।
অনাবৃষ্টি অনাহারে জ্বইলে মরি সংসারে।
কল্‌হে ঘেরেছে সংসার লক্ষ্মী যায় সুরপুরে।।
খাইতে পাইলে সব ভুইলে যাই লক্ষ্মী নাই যে অন্তরে।
ছেইলা মেইয়া সবাই ক্যান হিংসাতে জ্বইলে মইরে।।
সকালে গইবরের ছড়া, সইন্‌ধা হইলে ধূপ জ্বলে।
মা বোনেরা পূজ্‌ইলে পরে লক্ষ্মী থাকে সেই ঘরে।
মূর্খ কালীর হিতবাণী শুন সবে অন্তরে।
ভক্তিপ্রীতি রাইখ্‌বে টুকু গৃহ ধন্ম সংসারে।।

।। ৩ ।।

বিলাতি বেইগন ঝুড়িকে ঝুড়ি।
কফি আইসেছে গাড়ি গাড়ি।।
বড়টাঁড়ের হাটের পাশাড়ি আছে গো সারি সারি।
লরি লরি চালাই দিছে মারাফরি ফেক্‌টারি।।
সোম শুক্কুর বারে দেইখ হাটে যাবার ধড়ফড়ি।
নানা পকার সইব্‌জি বিকে আনে গো টাকাকড়ি।।
যতই আনুক হাঁস মুরগি থাকে না হেরি হেরি।
চড়া দামে কিনে লিয়ে চইলে যায় সব পাইকারি।।
দখিন পাশে ছাগল ভেড়া গুনিতে না পারি।
উত্তর পাশে গরু কাড়া আছে গো সারি সারি।।
পুব পাশে তাঁতী ভাইরা বইসেছে ঠেটি পাইড়ি।
দখিন পাশে সব সময়ে চইল্‌ছে গো কত গাড়ি।।
মুখ্যু কালী সবজনকে ডাকে গো স্নেহ করি।
হাটের দখিন পাশে হইল গো তার বাড়ি।

।। ৪ ।।

চাষ করিলে চ঺ষার কী হবে।
ক্ষেতে ধান নাইরে কী খাবে!!
গরুকে গোব্‌রা ভেবে সন্ধ্যা হলেও নাই ছাড়ে।
দুদিনে পরে রুয়া ক্ষেতে মাটি ফাটে হাঁ-করে।।
নিয়মকানন না মানিলে বুঝাতে পারে কন্‌কালে।
অন্নশূন্যা ঘরে দেখে কেঁদে কেঁদে বুক জ্বলে।।
ঘরের মইধ্যে বাগন্ বাড়ি কর সর্বজন মিলে।
দুদিনে পরে অন্নকষ্ট সবেই যে যাবে চলে।।
চাষেই অন্ন চাষেই বসন চাষেতেই পালন করে।
চাষের সমান নাই তুলনা খেতে পাবে পেট ভরে।।
কালীপদর্ মুখে বুলি চাষী ভাইয়ে সব জানি।
দারুণ খরাতে দ্যাখ হিরো দাদার ফুটানি।।

।। ৫ ।।

বাস আমাদের কত দরকারি।
যাইতে লাইগে না বেশি দেরি।।

টিন কাঠ দিয়ে বড়ি সাজায়েছে রকমারি।
তুলা দিয়ে সিটটা আঁটা বইস্‌লে বড় মাধুরী।।
আগে পিছে চাকাগুলি মাল থাকে ভাই উপরি।
শত শত লোক নিয়ে পৌঁছে যায় সময় ধরি।।
স্কুল কলেজ অফিস বাজার দৈনিক যাইতে ঝকমারি।
বাস না হইলে দুনিয়াতে আরও হত বেকারি।।
দীন কালীপদ বলে, ভাইব না আর মন ধরি।
যথায় মারে মনে কইরে উঠে যাও তাড়াতাড়ি।

।। ৬ ।।

দ্যাখ টুস্‌ কলির কারখানা।
ক্যান বিষ্টি বর্ষা হইল না।।
অহিংসা পরম ধম্ম করিলেন সাধনা।
হিংসাতে পৃথিবী পূর্ণ তাই ত মনের বেদনা।।
স্বাধীন হইল ভারত পরাধীন বই চইলে না।
সাধ্য মত কম্ম কইর্‌লে কন দুঃখ রবে না।
কালীপদর কপাল মন্দ টুসুর লাগি রচনা।
দেশের দশেব দুঃখ দূর কিসে হবে বল না।।

[শ্রী কালীপদ মাহাতর (নারানপুর, ঠুট্‌কুবাইদ, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি পাওয়া গেছে।]

।। ১।।

গুরুর চবণ অধম তারণ।
আমি লয়েছি তাঁরি স্মরণ।।
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর হন।
গুরু সখা, গুরু পিতা, মাতা-ভাই-জ্ঞাতিজন।
জ্ঞান দাতা, সুখ দাতা তিনি মূর্ত নারায়ণ।
ভবভয়হারী-হরি প্রেম ঘন নিরঞ্জন।।
অসার সংসারে গুরুর পদ সার ধন।
ত্রিভুবনে নাহি ভয় যে লয় গুরুর শরণ।।
কলমের নাই ক্ষমতা গুরু মহিমা বর্ণন।
গুরুর চরণধূলি তলে রাধু অতি দীন জন।

।। ২ ।।

প্রণাম করি শ্রীচরণ ধরি।
কণ্ঠে এস মা আলো করি।।
বীণাপাণি মা জননী, দুই করে বীণা ধরি।
হৃদয় মন্দিরে মম বাস কর জীবন ভরি।।
দিবানিশি করি স্তুতি ডাকি মা বিনয় করি।
করে বসে লিখাও পুঁথি যেন হয় ফুলের কুঁড়ি।।
সুধীজনে পড়িলে মা এ ক্ষুদ্র আঁখি বারি।
পড়া শেষে তারি যেন আনন্দে মন যায় ভরি।।
তুমি ভক্তি তুমি শক্তি তুমি মা দয়া করি।
রচালে সঙ্গীত বচি নাই ক্ষমতা আমারি।

।। ৩ ।।

পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম. সরকার।
রাজ্য চালান ভারি চমৎকার।।
বহু বছর ধরি হইল এদে শাসনভার।
কত কিছু নব রাগে গড়িল নতুন বাহার।।
স্কুলের বেতন ফ্রি পড়াশুনা চমৎকার।
প্রাইমারি ছেলেদের লাগি ফ্রি দেয় পুস্তক পড়ার।।
শিশু শ্রেণী শিশুদেরি পাউরুটি দেয় কিবা আর।
মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করিল রাজ্য মাঝার।
সরকারের গুণাবলী লিখতে হইল কাগজ ভার।
রাধুর খুবই মনে ধরে বাস স্ট্যান্ড পুরুলিয়ার।।

।। ৪ ।।

খাবার ভেজাল ওষুধে ভেজাল।
মানুষ বাঁচার হবে কি হাল।।
দুধে ভেজাল তেলে ভেজাল জলেতে হইল ভেজাল।
জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ি হইল আকাশ পাতাল।।
এভাবে দেশ যাবে চলি পরকাল।
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রইয়ে যাবে চিরকাল।।
সরকারের পদে নিবেদন করি আজিকাল।
শাসনবিভাগ নিদ্রা যায় কি খেয়ে বাদশাহী চাল।।

ভেজালদারী ব্যবসায়ী ভাব বসি ক্ষণকাল।
কর্মফলের অপরাধ খন্ডাবে মহাকাল।।

।। ৫ ।।

সরকারেরই পদে নিবেদন—
মোদের বাঁচার উপায় কী এখন?
আমরা হলাম পুরুল্যার সাধাসিধে জনগণ।
খরায়-জরায় জর্জরিত পরনে ছেঁড়া বসন।।
রাজ্য ভিতর জেলা মোদের কেন পিছে পড়ি রন?
কলকারখানা কেন না-কর জেলায় স্থাপন?
মোদের বাঁচাবার লক্ষ্য বল কেন নাই এখন?
আমরা কি বিড়াল-কুকুর আমরা কি ইতরজন!
যোগ্যতা দেখিয়া কাজ দিবে, দিবে কিনা দিবে ধন?
কোন্ পথে বল্হ মোদের দারিদ্র্য হবে মোচন?
এক সাথে মিলিয়া সবে সাজাব আজ মহারণ।
ছিনিমিনি চইল্‌বে না আর লইয়া মোদের জীবন।।

।। ৬ ।।

কলিকালের একি মহিমা।
দেখ ঘরে মা বাজারে মা।।
কিবা মায়ের রূপের বাহাব কিবা গঠন ভঙ্গিমা।
রইতে নারি নাম না বলি নামটি যে তার সিনেমা।।
সিনেমার অভিনেত্রী কলিকালের দেবী মা।
ঘরেতে সাজায়ে ফটো সকলে দেয় ধূপধুনা।।
অভিনেতা দেবতা ভাই কিবা মোদের মহিমা।
কেশ বেশ তাদের মত করে নকল সবজনা।।
সস্তা প্রেমের হিন্দী ছবি দেখে ছেলে কত না।
চলি যায় রসাতলে ছাড়িয়া পড়াশুনা।।

।। ৭ ।।

বারমাসে তেরটি পরব।
আহা মোদেরি কত গরব।।

মানভূমে জনম হয়ে কিবা ভাগ্য বল সব।
সারা বছর কাটি মোরা করি আনন্দ উৎসব।।
জ্যৈষ্ঠ-বৈশাখ শিব গাজন কত মজা কত রব।
আষাঢ়-শ্রাবণে মজা দেখিয়া রথে মাধব।।
জন্ম-অষ্টমী ভাদ্রে ভগবানের জন্ম সব।
দুর্গাকালী লক্ষ্মীপূজা পার হয় শরতে সব।।
পৌষ মাসে টুসু মেলা. পুরো মাসে কলরব।
দোল-সরস্বতী, শেষে লিখিতে নারিনু সব।।

টুসুগানে রামলীলা

।। ৮ ।।

।। ভরতের বিলাপ ।।

কৈকেয়ী মা নহ জননী—
তুমি হও গো কুটিল ডাকিনী।।
নিজ স্বামী খেলে মাগো যেন কাল সাপিনী।
আঁখিজলে ভাসে আজি যত পুরবাসিনী।।
বনেতে পাঠালে রাম, মা সীতা ঠাকুরানী।
রাজার ঝিয়ারি সীতা হল চিরদুখিনী।।
শোকের সাগরে ভাসি সদা মাগো জননী।
শয়নে স্বপনে শুনি নরকবাদ্য ধ্বনি।।
শৈশবেতে যদি মাগো খাওয়াতে বিষপানি।
এ দুখ দংশন নাহি হোত দিবসযামিনী।।

।। ৯ ।।

।। রামের শোক ।।

না-কেঁদ, না-কেঁদ রঘুবর।
পড়ি লুটাইয়া ভূমি 'পর।।
সীতা সীতা বলি কাঁদ পঞ্চবটী বন-'পর।
জননী কাঁদেন যথা পুত্রহারা শোকাতুর।।
মায়া মৃগ ধরিবারে যবে গেলেন গুণাকর।
লক্ষ্মণ ধাইল গন্ডি আঁকিয়া কুটীর 'পর।।
যোগীবেশে বারণ এসে ধরিল মা-সীতার কর।
রথেতে চাপায়ে তাঁরে লয়ে গেল নিজ ঘর।
পূর্ণ ভগবান প্রভু বিলাপ করেন যেন নর।।

।। ১০ ।।

।। রাম-রাবণের যুদ্ধ ।।

রাম-রাবণেতে মহারণ।
যেন গগনেতে প্রভঞ্জন।।
নর-বানরেতে যুদ্ধ মহারব ঘনঘন।
রাবণের বহুপুত্র কাটিল রঘুনন্দন।।
মেঘনাদে করে বধ মহাবীর লছমন।
শত শত বীর ধরাশায়ী হয় ক্ষণেক্ষণ।।
কুম্ভকর্ণ পড়িল, অন্তঃপুরে শুরু রোদন।
রাবণের মৃত্যুশর হনু করিল হরণ।।
পড়িল ত্রিলোকজয়ী ভক্তবীর দশানন।
বৈরীভাবে ভজি রামে বৈকুণ্ঠে করে গমন।।

।। ১১ ।।

।। শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ।।

কি আনন্দ কিবা কলরব।
রাজ্যে ফিরিল রাম রাঘব।।
কিবা শোভে পথঘাট গুঞ্জরিছে অলি সব।
অযোধ্যা সেজেছে আজি যেন বৈকুণ্ঠ স্বরগ।।
চোদ্দ বছর শেষে হরি নারায়ণ শ্রীরাঘব।
বিভীষণ জাম্ববান সুগ্রীব সনে অঙ্গদ।।
ফিরিল জনমভূমে লয়ে বন্ধু পারিষদ।
জ্ঞানীঋষি মহারাজে পূর্ণ হল দেশ সব।।
কত কথা আলোচিত হোল কত বেণুরব।
পুবা মাস আলোকিত করিল কোটি সূরজ।।

টুসুগানে কৃষ্ণলীলা

।। ১২ ।।

।। শ্রীরাধার উক্তি ।।

বাঁশীর স্বরে কি মধু আছে।
আমার মনকে হরণ করেছে।।

বল বৃন্দে কোন্ পথে যাইব বঁধুর কাছে।
জটিলা-কুটিলা আজি দুয়ারে দ্বারী আছে।।
ঘরে বাদী বাইরে বাদী সবে নিঠুর হয়েছে।
প্রাণ সখী বল আমায়, বল কী উপায় আছে।।
ঘরে আমি রইতে নারি বিরহে প্রাণ দহিছে।
শ্যামের মিলন লাগি আঁখি ধারা বহিছে।।
পরান ছাড়িব সখী বিনে শ্যামের পরশে।
ছাড়ি জাতি কুলমান মিলিব বঁধুর সাথে।।

।। ১৩ ।।

।। বৃন্দের উক্তি ।।

ওগো রাধে ধৈরজ ধর।
তোমায় মিলাব বঁধুর কর।।
আর না কাঁদ গো সখী লুটাইয়া ভূমি 'পর।
নিশ্চয় মিলাব তোমায় শ্যামবন্ধু নটবব।।
যত্ন বিনে কোন জনে কি পেয়েছে সনার মোহর?
সবুর বিনে নাহি মেলে অমূল্য রতন পাথর।।
রাধা শ্যামে মিলাইব জুড়ি দুই করে কর।
প্রাণে আমার এই তো আশা বাজিছে যে নিরন্তর।।
কেবা রাধাশ্যাম কেবা চিনে গিরিধর।
জীব-আত্মা শ্রীরাধা পরম-আত্মা নটবর।।

।। ১৪ ।।

।। কৃষ্ণের উক্তি ।।

রাধা নামে সেধেছি বাঁশী।
বাঁশী বাজিছে দিবানিশি।।
রাধা নামে কত সুধা-মধু-আনন্দ রাশি।
তুলনা নাহিক তার যেন ঘৃতকলসী।।
কোথা রাধা প্রাণ আধা এস গো প্রিয় সখী।
তব আগমন তরে ভ্রমিছি দিবানিশি।।
দুজনে করিব লীলা দুজনে হয়ে সাথী।
বাসর সাজায়ে রামকেলিতে রব মাতি।।
অভিমান করো না রাই করি সখি মিনতি।
বৃন্দাবনে জ্বালাইব প্রেমের আলো বাতি।।

।। ১৫ ।।

।। বৃন্দের উক্তি ।।

হেরিয়া ঐ যুগল বদন।
আজি জুড়াল আমার নয়ন।।
কিবা শোভা মনোলোভা জিনি ভানুর কিরণ।
হৃদয় শীতল হল সার্থক আমার জীবন।।
বনমালী শ্যাম সাথে বামে শ্রীরাধা শোভন।
চূড়া-ধড়া শিরে পরি' সেজেছে বংশীমোহন।।
ময়ূরময়ূরী শোভে যেন রামধনু রঙ।
শুকসারী খেলা করে ঘিরিয়া যুগল মিলন।।
জগৎ সৌন্দর্য রাশি জুড়িয়া সকল এখন।
ঝলকে বিজুলি যেন গগনেতে নবঘন।।

শ্রীরাধানাথ মাহাতর (গ্রাম-ডুঁড়্কু, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।

।। ১ ।।

নমঃ নমঃ গণেশ দেবগণ।
আমি পূইজ্‌ব তোমায় সারাক্ষণ।।
নমঃ নমঃ গণপতি মন্ত্র বলি ঘনে ঘন।
নানা পুষ্প দিইব আমি দিইব হে তোমার চরণ।।
ধুপ-দীপ দিইব আমি ভোগ চাপাব অগণন।
ভক্তিপূন্ন হৃদয়ে আমি প্রণমি তোমার চরণ।।
কুথায় আছে গজানন, সঙ্গে তুমার মূষিক বাহন।
অন্তিম কালে দিবে দেখা ধইরেছি তোমার চরণ।।
নরেশ বলে এ সংসারে যে না-করে তুমার পূজন।
কাজসিদ্ধি হবে না তার নিষ্ফলেতে যাবে জীবন।।

।। ২ ।।

টুসু মায়ের পূজা কইরেছি।
টুসুর চরণে ফুল দিয়েছি।।
অঘ্রানে আন্‌লি টুসু পোষ মাসটা রাখেইছি।
আমার প্রাণে চাহ টুসু তোমার চরণে ধইরেছি।
টুসু মেলা যাইয়ে আমি সব্বদুঃখ ভুলেইছি।।

বছর দিনে আইন্‌ব টুসু আমরা সবাই ভেবেছি।
নিরামিষ বঠে টুসু মিষ্টি কলার ভোগ দিচ্ছি।।
আসমানে আইসেছে টুসু হৃদয় ভইরে রাইখেছি।
নরেশ ভনে টুসুধনে বেদপুরাণে নাই পাচ্ছি।।

।। ৩ ।।

আনাই ধামটা অনেক জাইগেছে।
চার পাশেব লোকই মাইনেছে।।
পশ্চিমে দুই পিঁড়রা আছে ইটভাটায় লোক পুসাচ্ছে।
চাকির বনের শিব মন্দিরে সুন্দর ফটো কাইটেছে।।
উত্তরে আনাই ভাগাবাঁধ দুবচড়কাটা দূর হচ্ছে।
মাকড়া বেড়া ছোট গাঁয়ে কীত্তনের দল রাইখেছে।।
পুবে জামবাইদ বড় গাঁ অনেক তাদের আঁট আছে।
পঞ্চমুখী বড় জাগ্রত বারমাস ধন্না আছে।।
দখিনে নাইক ডুমুরবাইদ বালিবেড়া ঠিক আছে।
তার উপরে টুড়ুহুলু নরেশে বই কইরেছে।।

।। ৪ ।।

বেড়ার ঘাটে মেলা লাইগেছে।
ও ভাই কত টুসু চলিছে।।
কত রকম টুসু আছে দেইখে প্রাণ জুড়াছে।
দুনয়নে ভাইলে দ্যাখ উপরে টুসুর সাজ আছে।।
হেলে দুলে আইস্‌ছে টুসু রাস্তা কেমন সাজাছে।
আগে পিছে খই ছড়াছে কাঁসার থানে ভোগ আছে।।
নানা দিকের নানা পথে অনেক টুসু চলিছে।
রঙ বেরঙের ফুল ফিতাটা টুসুর গায়ে উড়িছে।।
আগে আগে টুসু যাইচ্ছে, পিছনে গান গাহিছে।
নরেশ ভণে পোষ পরেবে টুসুর মা-রাও সাইজেছে।।

।। ৫ ।।

কংসাবতী নদীর মাঝারে।
টুসু নাচছে হে ধীরে ধীরে।।
টুসুর নাচে ধীরে ধীরে দেইখে সবার মন হরে।
দুই কিনারে লোক বইসেছে তারাও হে সাবাস করে।।

এই নদীতে স্ত্রী-পুরুষ নানা রকম গান করে।
গেজেড় গেজেড় বাইজেছে কত বাইজছে নদীর মাঝারে।।
সকালে স্নান কইরে তারা ড্রেস পেনটিংটা ঠিক করে।
হেলে-দুলে আসছে তারা টুসু ভাসায় দুপুরে।।
নরেশ বলে পোষ পরবে আইস্‌বি তরা বছরে।
কুটুম-বন্ধু-ভালবাসা দেখা কইর্‌বি সবারে।।

।। ৬ ।।

মনিহারি দকান বইসেছে।
ও ভাই কত জিনিস বিকাচ্ছে।।
আলতা, নুপুর, তড়া আর ফুল ফিতা রঙিন আছে।
হিমানি কুমকুমের ফঁটা নখ পালিশ কাজল আছে।।
ফুলকাটা কিলিপ পাতা টেসেল লম্বা আছে।
দুকানে দুটা মাকুড়ি নাক ফুলে পাথর আছে।।
ঘাড়েতে রোলগোল্ডের মহর সস্তা দামে পাওয়াছে।
ডিস্কো কাটিং যুগল চুড়ি কত সুন্দর ঝলকিছে।।
হেন নরেশ বলে বিটি ভালই সাইজেছে।
সিথায় সিঁদুরের লাইগে তার মা-বাপ কত ভাবিছে।।

।। ৭ ।।

চল্‌ সজনি আমরা সব যাব।
আমরা মাটি ধুইলে সনা পাব।।
আনাইয়ের ঘাটে যাব ঐ খানেতে খাবার খাব।
গাঁইত্‌-কদালে কুঁড়ে মাটি ঝড়ায় পাছায় সাজাব।।
কাঠের কুলায় চাইল্‌ব মাটি মাঝ নদীতে বসিব।
লাইড়ে চাইড়ে মাটি ধুব তবে ত সনা পাব।।
সকালেতে যাব মোরা বেলা ডুবায় আসিব।
সেই সনাটা বিক্রি কইরে দিনমজুরি কাটাব।।
নরেশ বলে ট্রেনিং দিলে তবে তো সনা পাব।
তা না হইলে সারা দিনটা খাইটে খাইটে মরিব।।

[শ্রী নরেশচন্দ্র মাহাতর (গ্রাম-টুডুহুলু, পোঃ-বালিবেড়া, জিলা-পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান—৫ ।।

।। ১ ।।

মা বল, মা বল, টুসু
আমি তুমার মা হব।
আঁচল ভইরে ঝিল্‌পি দিব
বদন ভইরে চুম্‌ খাব।।

।। ২ ।।

খেইল্‌ব না খেইল্‌ব না টুসু
মায়ে আমার ডাকিছে।
হাতের কড়ি লে গো ফিঁরাই
মা জননী কাঁদিছে।।

।। ৩ ।।

আমার টুসুর একটি ছেইলা
নাম দিয়েঁছি বিমলা।
ও বিমলা ঘরে সিনাও
বাঁধে বড় শেওলা।।

।। ৪ ।।

বেলা উঠে ঝিলিমিলি
তবু টুসু উঠে না।
উঠ টুসু চেতন কর
আমায় জ্বালা দি-অ না।।

।। ৫ ।।

ফুল তুল ফুল তুল টুসু
বাইছে তুল ভাভরি।
বিনা সূতায় হার গাঁথেছি
লকে বলে হাঁসুলি।।

।। ৬ ।।

যাছ যাছ যাছ টুসু
ওগো, ক্ষণেক দাঁড়াও মাঝপথে।
সম্বচ্ছরের কত জ্বালা
ওগো, বল মায়ের সাক্ষাতে।।

ঝিক্ মালা মাদুলী
বেল মালা গলে।
আয় কে যাবি গো
আমাদের দলে।।
টুসু ধনকে জলে দিও না।
আমার বড় মনের বেদনা।।

।। ৭ ।।

পুরুল্যার একটি মিঠাই ভাইঙে হইল
এক কাঁসা।
এ মিঠাই কি খাবার বঠে
সঙ্ঙতিদের মন-রাখা।।
(সঙ্গীদের)

।। ৮ ।।

তদের ঘরকে ৰইস্‌তে আলি
ৰইস্ বইলে আর বইল্‌লি না।
দাওয়ায় আছে উঁচ পিড়্হা
গরবে রা কাড়্লি না।।

।। ৯ ।।

হাটে-বাটে পুকুর-ঘাটে
বলিস্ লো আমার কথা।
বাঁধের ঘাটে শুইন্‌তে পাইলে
কইর্‌ব লো কাপড় কাচা।।

।। ১০ ।।

বাড়ির নাময় লীল বুইনেছি
লীলে শুঁটি ধরে না।
ঘরে আছে ছট দেওর
লীল পাড়্হা বই পরে না।।

কত জলে ডুব দিলি ধনি
অ-তর ভিজল না মাথার বেণী।।
কত ছল কইরে মন ভুলালি।
ঝিল্পি বইলে ভাভ্রা খাওয়ালি।।
তব কি লো তর গাঁয়েই শ্বশুর ঘর।
তর একটা কথায় তল-উপর।।
হিল্ছে কপাট দল্ছে বাসাতে।
কপাট ছুঅনা কলের বঠে।।

(বাতাসে)

।। ১১ ।।

আঁধার ঘরের ভমর তুমি
বিঁধে কর জরজর।
মইরালে বাঁচাতে পার
সে কি ছিল নটবর।।

[শ্রীসৃষ্টিধর মাহাতর (জামবাদ, পুঞ্চা, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ১ ।।

মা নমঃ, নমঃ সরস্বতী
বীণাপাণি আয় মা আয় ঘরে।
ও মা আয় গো হৃদয়-মন্দিরে।।
তুমি গো মা বুদ্ধিদাতা, দাও মা জ্ঞান আমারে।
পূজবো তুমার রাঙা চরণ তাই ডাকি বারে বারে।।

তুমি যে মা থাকো শুনি সর্বজীবের অন্তরে।
তবে কেন বসনা মা প্রতি ঘরের ভান্ডারে।।
নিরাকারে থাকো মাগো পাইনা দেখা তুমারে।
এককালে তোরে দেইখ্‌তে পাইলে থাইক্‌ব গো চরণ ধইরে।
কালী বলে জন্ম কালো রাইখ্‌লি মাগো আমারে।
কবে যে পাব গো দেখা জাগছে সদা অন্তরে।।

।। ২ ।।

ও মা আমার দাও না গো বিয়ে।
ঘবে রইতে লারি মন দিয়ে।।
যৌবনে আইসেছে তুফান রাইখ্‌তে লারি বাঁধিয়া।
এমনি ভাবে আর কতদিন থাইক্‌ব আমি বাঁচিয়া।।
লোকের ঘরে দেইখে শুইনে মন উঠে মচড়্ দিয়া।
কি করি হায় নাই রে উপায় কী হবে আর ভাবিয়া।।
ভাইবে কালীপদ বলে থাইক্‌ব কদিন মন দিয়া।
এ বচ্ছব তোর দিব বিহা হাজার টাকা পণ দিয়া।।

।। ৩ ।।

তকে কত না বলে ছিলি।
রাস দেখাইতে কই লিয়ে গেলি।।
বড় মনে আশা ছিল দেইখ্‌ব গো কাপড়গলি।
রাসমেলাতে ঘুরা ফিরা কইরব লো ভালাভালি।।
রাসমেলাতে চিনা বাদাম কই কিনে হে খাওয়ালি।
করিস না আর পেঁদা ফুটানি করিস না দালালি।।
তর যদি নাই রে পয়সা ক্যানে নাই বইলে দিলি।
লাজ শরমে বইল্‌তে লাইরে শুধু হাতে বাইরালি।।
ভাইবে কালীপদ বসে করালি গো জানাজানি।
যা হবার তা হয়ে গেছে দিস না আর গালাগালি।।

(মিথ্যা)

।। ৪ ।।

মুখটা মনে পড়ে সারাক্ষণ।
হাঁইসে হাঁইসে কুথায় যাচ্ছিস ধন।।

কন মতে ভুইল্‌তে লাইরে দেইখে তোর চালচলন।
বড় মনে আসা ছিল মিইলবো লো তুমারি সন।।
তুমার কথা মনে হইলে ভাবি বইসে সারাখন।
আগু তলে ডেনা মেলা প্রজাপতিটার মতন।।
তবে কালীপদ বলে দেইখ্‌লে কি জুড়ায় জীবন।
যে মধু খাঁয় মিষ্টি জানে সে জানে মধুর মরম।।

।। ৫ ।।

তোর পিরীতি কে বলে ভাল।
আমার কাঁদিতে জনম গেল।।
ইটা দিইব উটা দিইব বইলে মনটা ভুলাল।
দিবার বেলা ঠোঁটের বাসি দাঁত দুটা দেখাই দিল।।
প্রথম পিরীতি কালে কত না বইলে ছিল।
এখন আমি হইলি তিতাঁ, সব কথা ভুইলে গেল।।
তোর সঙ্গে পিরীত কইরে দিনে রাইতে ঘুম গেল।
এমনি কইরে আর দিন বাঁচাবি আমায় বল।।
ভাইবে কালীপদ বলে তোর কপালে এই ছিল।
দিবানিশি ভাইবে ভাইবে দেহটা মলিন হইল।।

।। ৬ ।।

পেঁচা চইখি যেমন মা কালী।
অ তুঁই সারাজীবন কাঁদালি।।
একদিন ভাল দুদিন মন্দ তিন দিনে রাগাই গেলি।
হায় রে আমার ভাঙা কপাল এই দুঃখ কারে বলি।।
ঘরের কথা বইলতে গেলে আমি যে লাজে মরি।
তকে যে ধন বিহা কইরে বিপদ ঘটাই লিলি।।
বাপে হাম্‌কে দিল বিহা আমি নাই বলেছিলি।
মনে মনে দেখাশুনা মামাকে সঙ্গে লিলি।।
ভাইবে কালীপদ বলে এখন আমি কী করি।
দু-এক কতা বইলতে গেলে চইলে যাই বাপের বাড়ি।।

।। ৭ ।।

চল্ সজনী যাব যমুনা।
দেইখে আইস্‌ব গো কালসনা।।
ছল কইরে জল আইন্‌তে যাব দেইখ্‌ব লো কালসনা।
কালশশী দিবানিশি আছে লো কদমতলায়।
আড় নয়নে মুচকি হাঁসি দেইখ্‌লে কিলো প্রাণ জুড়ায়।।
যে দ্যাখে কাল বদন ঘরে রহা বড় দায়।
কালী বলে কালসনা তুমার লীলা বুঝা দায়।
ছলে বলে কৌশলে রমণীদের মন ভুলায়।।

।। ৮ ।।

চল সজনী যাব তোর সঙ্গে।
টুসুর গীত বইলে রঙ্গে রঙ্গে।।
যথা যাবি তথা যাব চইল্‌বো লো সঙ্গে সঙ্গে।
নাইচে নাইচে চইলে যাব চইল্‌বো লো কত ঢঙে।
কত লীলা কত খেলা খেইল্‌ব লো তুমার সঙ্গে।।
আনন্দে জুড়াব জ্বালা কইর্‌ব প্রেমের আলাপন।
কালী বলে কত সাধে পেয়েছি মানব জীবন।
খেইলে লে প্রেমের খেলা পাবি না গো এই জীবন।।

।। ৯ ।।

আয়না বইসা শাড়ি কিনে দে।
মন মাইন্‌ছে কি লোকের দেইখে।।
যদি দিইতে না পাইর্‌বি খুইলে খাইলে বইলে দে।
হাইদে আছে বালতি-দড়ি গাছে টাঙাইয় মইরে দে।।
বিহা করার বড় যে শখ চইড়্‌লি মটর গাড়িতে।
এখন ক্যানে ভারি লাগে একখানা শাড়ি দিতে।।
কালী বলে কলি কালে এই রকমেই উঠেছে,
পয়সা কড়ি নাইরে তুমার, কুচ্‌ড়ি চালটা বিকে দে।।

(লোকশিল্প প্রথায় নির্মিত অনেক চাল-রাখা-আধার বিশেষ)

।। ১০ ।।

ফুল বাগানে আইস্‌বি ভমরা।
মধু খাইতে দিইব পেট-ভরা।।
যত খুশি খাইতে পার মিষ্টি মধু পেটভরা।
ফুল বাগানে মালী এলে পইড় না ভাই কেউ ধরা।।
রূপে রসে মধুগন্ধ আনন্দে মাতোয়ারা।
কালী বলে উজাড় কইরে সকল দিইব আমরা।।

।। ১১ ।।

মুচকি হাঁসি ইশারার গুণে।
আমি রইতে লারি তোর বিনে।।
তোর আশাতে রইলাম বইসে তোর-তোরই ধিয়ানে।
মনেব আশা রইল মনে ঘুম ভাইঙে না স্বপুনে।।
দিবানিশি ও রূপসী মনটা দিলি ভুলাইয়ে।
ছমর্ ছমর্ চইলে গেলি বেণী দুলাইয়ে দুলাইয়ে।।
ভাইবে কালীপদ বইলে কী আছে কলিকালে।
আয় লো দুজন খেইল্‌ব খেলা, খেইল্‌ব হেইলে দুইলে।।

।। ১২ ।।

মরলি ধনি ফুটানির গুনে।
স্বামী জুইট্‌ল না কন দিনে।।
ভাল-মন্দ বড়-ছট চিনইলি না কন দিনে।
এত গরব লয় গ ভাল বিটি ছিলার জনমে।।
কত লীলা কত খেলা খেলি গো এই যৌবনে।
আগে পিছে কন কথা ভাইব্‌লি না কন দিনে।।
ভাল কথা বইল্‌তে গেলে মুখটা দিলি ফুলায়ে।
রাগে কিছু বইল্‌তে লাইরে গাইল্‌দিলি মনে মনে।।
কালী বলে যৌবন গেলে কী হবে ভাব গুণে।
কার কথা না শুনিলি যৌবনেব আগুনে।।

[শ্রীকালীপদ মাহাতর (চিড়াবাড়ি, মাহাতপাড়া, নডিহা, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ১ ।।

কৃপা কর মা বীণাপাণি।
আমার দাও মাগো চরণখানি।।
শ্রীচরণে বন্দি মা গো বন্দি বাক্যবাদিনী।
জপে তপে পায় না যারা, তোমা হেন জননী।।
তিত মিঠা হয় অমৃত—কৃপাতে কমলিনী।
লাবণ্য মোহিত মা গো তোমার গুণখানি।।
লইতে চরণধূলি আশা করি জননী।
জলধর বইসে আছে—দেখা দাও চাঁদবদনী।।

।। ২ ।।

তুই লো ধনি আমায় ভুলালি।
ও তুই গাঁ ছাইড়ে চইলে গেলি।।
যখন ছিল কচি কদম এক সাথে খেলেইছিলি।
এখন কদম পাইকে গেছে মিঠা বইলে নাই দিলি।।
গরীব দেখে আমায় ধনি গোপনেতে ভুলালি।
এখন ক্যানে বাজারেতে কদম দকান বসালি।।
পশাক দেইখে পয়সা পাইয়ে জাতিটা তুই ঘুচালি।
তরুণ বলে জীবন গেলে ওই দকানকে নাই ভালি।।
(পোশাক)

।। ৩ ।।

কলিযুগের লীলা বুঝা দায়।
মাথা বাঁধে হে রঙিন ফিতায়।।
কলিযুগের এমন রীতি মইজেছে বাঁকা সিথায়।
বড় করে খঁপা বাঁইধে রঙিন ফিতা গুঁজে তায়।।
কপালে কুমকুমের ফঁটা ঠঁঠেতে লিপটিক লাগাই।
গায়েতে বেলাউজ পইরে বুকটাও ভাল ঢাকায় নাই।।
সায়ার উপর শাড়ি পইরে সায়াটা গটাই দেখা যায়।
কলিযুগের ইস্টাইল দেইখে মাথা ধইরে যায়।।
পায়ে চটি জুতা লাগাই চইল্‌বার ঢংটা নাই।
এ সব দেইখে চিন্তা করে, ভাবে হে জলধরাই।।

।। ৪ ।।

চল কে যাবি কাঁসাই সিনাইতে।
সিনান কইর্‌ব আমরা ভোরেতে।।
পাড়াপড়শী আপুসবন্ধু দেশ বিদেশের সাক্ষাতে।
জনগণকে দেইখ্‌তে পাব কাঁসাই নদীর ধারেতে।।
সিনান কইরে সবাই মিলে মিঠাই খাব হে আনন্দেতে।
মিঠা সন্দেশ লিয়ে আইন্‌ব ছেইলা মেইয়াদের জন্যেতে।।
জগদীশা বলে দুঃখ—এ বছর অকালেতে।
ভাল কইরে রাইখ্‌তে হবে দিনগুলি কাটাইতে।।

।। ৫ ।।

ওহে বঁধু কি দিলি পানে।
তকে ভুইল্‌তে লারি জীবনে।।
দুর্গাপূজায় দেখাদেখি জাতা মাড়ার ময়দানে।
হাতে দিলে পানের খিলি খাইয়েছি আপন মনে।।
চা-পকড়ি দিইলে বঁধু রাসবিহারীর দকানে।
কিছুতে মন যায় না ধরা, ভাবি হে মনে মনে।।
যোগমোহিনী ছিল পানে অধম তরুণ ভণে।
বঁধু ছাড়া থাইক্‌তে লো তুই পাইর্‌বি না কন দিনে।।
(পারি না)

।। ৬ ।।

তোর পিরীতে আমার মন আছে।
ও তুই বলিস না কারো কাছে।।
উপরে তোর ভালবাসা ভিতরে তোর খল আছে।
ইশারা করিতে বঁধু ননদিনী দেইখেছে।।
ধইয ধইরে রাখ্‌তে লারি যৌবন আছাড় দিছে।
প্রেমের বারি যায় হে বারি স্বপনেতে ঝরিছে।।
তুষের আগুন জ্বইলছে দ্বিগুণ জল দিলে না নিভিতে।
প্রেমে জ্বালা মাইরি ধীরেন স্বপনেতে ঝরিছে।।

।। ৭ ।।

পঁ্যাচা চইখে ইশারা করে।
ও হিরো চইলে কত টেম্পারে।।
মাথাটা তোর চিরুণ চাকলা দেখাই কেবল উপরে।
সাইজে সুইটে মাঝে বুটে কিছুই নাই তোর ভিতরে।।
হাতে মাচিস সিজার প্যাকিট পান খাঁয় সে মুখ ভইরে।
রাজার ব্যাটা দেখায় যেমন থাকে হে ভাঙা ঘরে।।
বাটা জুতা পইরে হিরো চলে হে ধীরে ধীবে।
তুমি ধীরেন রইলে ভুইলে দেখ এই সংসারে।।

।। ৮ ।।

যৌবন জ্বালা সহিব কী কইরে।
বিহা দিলি মা বুঢ়া বরে।।
হাজার টাকা দিলি মাগো দিলি মা বুঢ়া বরে।
বইস্‌তে পারে উইঠ্‌তে লারে চলে হে লাঠি ধইরে।।
সাঁতার দিতে পারে না মা আমার যৌবন সাগরে।
এখন বুঢ়ার বয়স মাগো ষাট বছরের উপরে।
ধীরেন বলে রাত্রিকালে নাক ডাকে ঘড়ঘড় কইরে।।

।। ৯ ।।

কবে শ্যামকে পাব হে দেখা।
একা মন করে ফাঁকা ফাঁকা।
শ্যাম বিনা রইতে লারি পাই না হে তাকে দেখা।
দেখা পাইলে ধইর্‌ব গলে, পাই যদি তার দেখা।।
কার কুঞ্জেতে রইলে ভুইলে তুমি হে বাঁকা সখা।
শিশুকালে পিরীত কইরে আজ কেন দিলে দাগা।।
যৌবন করে টলমল দেখায় হে লেবুপাকা।
তুমি ধীরেন রইলে ভুলে তোমার্‌লে আর কে বোকা।।

।। ১০ ।।

শালী হবি দাদার সম্পর্কে।
আমি কী বলে ডাকি তকে।।

বড় তকে কইর্‌লি আমি ছোট্‌লে দেইখে দেইখে।
অনেক কথা বইল্‌ব বইলে জমা আছে মোর বুকে।।
ডরে কথা বইল্‌তে লারি, পাছে তর কাকায় দেখে।
লোকের মাঝে বইল্‌লে কথা কী বইল্‌বেক কুলির লোকে।।
ওলো ধনী রাখিস কথা ছাবিটি দিব নাকে।
তোর পরানে পরান আমার রাইখ্‌ব চইখে চইখে।।
কৃষ্ণপদ বলে দেখা কইরবি তুই পথের বাঁকে।
দিব লিব বইলব কথা চইখ জুড়াব মুখ দেখে।।

(পাড়ার)

।। ১১ ।।

বাঁকা সিথা ঝিল্‌পি কাটিনে।
ও রূপ দেইখে কি মন মানে।।
টেরি করা চুইল্‌টি ঘুরা কাব্‌লি-কাটা ফ্যাশেনে।
যৌবন কইরে টলমল তোমার নব যৌবনে।।
মানব জনম ভবেব খেলা খেলে লে লো দুদিনে।
প্রেমের জ্বালা অবহেলা কইব না কন জনে।।
রসে ভরা যৌবন তোমার থাইকবে না চিরদিনে।
তরুণ বলে যৌবন গেলে ছুঁইবে না কন জনে।।

।। ১২ ।।

যাবার সময় মন কেমন করে।
বিহা দিলি মা অনেক দূরে।।
বাবার দুলালী আমি যাব গো শ্বশুব ঘরে।
এই পাড়া-পড়শী কত মনে তে দুঃখ করে।।
দাদা বলে বিদায় মা গো, বাবা কাঁদে গুমুরে।
মায়ের দিকে চাইয়ে দেখি সদা দু'নয়ন ঝরে।।
তোর কোলে খেলেছি মাগো কত জ্বালাতন কইরে।
আজ তুমাকে ছাইড়ে দিয়ে যাব গো পরের ঘরে।।
জগদীশে বলে, মাগো, বইল্‌ব আমি কী করে?
মায়ের বেদন মায়ে জানে ঘুণ লাইগে যায় পাঁজরে।।

[শ্রীজলধর মাহাতর (রাঙ্গামেট্যা, ভাউরিডি, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ১ ।।

ওহে বঁধু থাকবো কেমনে?
আমার যৌবন যায় তোমায় বিনে।।
অল্প বয়সে বঁধু শিখালে প্রেম আমারে।
এখন তুমি ছেড়ে গেলে থাকব আমি কেমনে।।
পিরিত করে মন মজালি হারালি লেখাপড়া।
ডাল ছাড়া বাঁদর হলি মন বসে না কোনখানে।।
মায়ে বাপে স্কুল পাঠায় মন সরে না পড়িতে।
বঁধুর উপর মন টানে দেকা পাবো কোন খানে।।
বঁধু তুমি পানের ভিতর কি দিলে পৌষ পরবে।
আনন্দ কালিন্দী বলে থাকবি ধনি সাবধানে।।

।। ২ ।।

তোমায় বঁধু কে করে মানা?
তুমি করহে আনাগোনা।।
তুমি যদি আসবে বঁধু লোকের কথায় ভুলো না।
আমার কাছে দেখলে লোকে অন্য করে বাসনা।।
বাবা বলে বিহা দিব তোদের শখ আর রাখবো না।
আধা রাতে মাকে বলব আমার বিহা দিয় না।।
তুই গো ধনি জবাব দিবি আমার বিহা দিও না।
যদি আমার দিবে বিহা কৃষ্ণ ছাড়া রইব না।।

।। ৩ ।।

সবুজ রঙের দেখায় শাড়িটা।
আমাদের পয়সা আসে পুব-খাটা।।
ঘড়ি যদি না দিবে হে কইর্‌ব স্বামী আরেকটা।
সেই স্বামীটায় দিবেক টাকা লিব সায়া শাড়িটা।।
রঙ দেখে মন টলে গেল বলব স্বামী দাও একটা।
শাড়ি যদি না দিবে হে দাও কিনে লাল বেলাউজটা।।
কুড়িটাকা মোটেই আছে শাড়িটার দাম ষাটটাকা।
কোথায় পাব চল্লিশটাকা ধার কি দিবে শাড়িটা।।
বৌটার মনে আছে ভাইরে দালান দিব দু' তালাটা।
আনন্দকালিন্দী বলে দিব কিনে শাড়িটা।।

॥ ৪ ॥

মনের কথা খুইলে বইল্‌লি না।
ও তোর ছাড়াব বাবুয়ানা॥
মনের মত ফুল ফুটেছে সে ফুলে মন বসে না।
ফোটা ফুলের গন্ধ পেলে ভ্রমর করে আনাগোনা॥
অসময়ে ছেড়ে দিলি এইটাই কি তোর বাসনা?
ছোট ভাইয়ে বলেছিল, নারীর কথায় ভুলো না।
নারী জাতি ধৈর্য ধরে অল্প কথায় ভুলে না॥
আনন্দ কালিন্দী বলে ওদের কথা বলার না।
অল্প কথায় রিঝে গেলে চাঁদমনি ত আসবে না॥

॥ ৫ ॥

তোর মা আমি সাধের এক ব্যাটা।
কত কষ্টে দিলি বিহাটা॥
বাবা বলে তোর কপালে লিখেছে বিধাতা।
সাধ কইরে তর দিলি বিহা শেযে হল কষ্টটা॥
গরীব ঘরে জন্ম হইল দিলে তুমি বিধাতা।
চোকের জলে মাটির ভাঁড়ে দুঃখে গেল জীবনটা॥
গাঁয়ে যদি কাজ করি মা ধান দেয় আগড়া-মথরা।
আউসের ধানে চারজন মানুষ তাই কি চলে দিন কটা॥
দু'মাস পরে চলে যাব ছাড়ে যাব আপনার গাঁটা।
আনন্দ কালিন্দী বলে রঙ্গ দেখে যায় জীবনটা॥

॥ ৬ ॥

ওহে জুগি দাও পরাঁই চুড়ি।
আমার ভাইঙেছে হাতের চুড়ি॥
সাকির জুগি বলে আমায় পয়সা আনে দে দেখি।
পয়সা দিব আইস্‌ব ঘুইরে দিবেক আমার শাশুড়ী॥
কন চুড়িটি পইর্‌ব আমি বাছ গো ছোট কাকী।
বড় মাপের হইলে চুড়ি হাতের হইতে যায় পড়ি॥
দু এক কথা হইলে স্বামী আগে ধরে হাতের চুড়ি।
চুড়ি ভাঙে মারে মা গো আমি ভয়ে যাই মরি॥

বঁধু বলে দেইখ্‌লি তোমায় পারবি নাহো কিনতে চুড়ি।
তখন সনাতন বলে গেল নিয়ে এল সব কড়ি।।

।। ৭ ।।

তুঁই লো ধনি হাম্‌কে কাঁদালি
আমি তোর ভাবনায় জইরে গেলি।।
কত আমার আশা ছিল কই গো ধনি পুরালি?
মনের আশা মনেই রইল আজ কেন জবাব দিলি?
সেবার লো তুঁই চলি গেলি আইস্‌ব বইলে কই আলি?
তোর আশাতে বইসেছিলি শেষকালে দাগা দিলি।।

।। ৮ ।।

মাথার উপর হইল্‌দা ফিতাটা।
ও তার গায়ে উড়ে মলমলটা।।
কমরে তার ফরক্‌ আছে উপরদিকে জামাটা।
জামার ভিতর বেসিয়ার আছে টিপে রাইখে বুকটা
বাঁকা সিথা বেণী ছাড়া নয়নকোলে কাজলটা।
দু হাতে তার চুড়িভরা গলায় দলে মালাটা।।
দুটা পায়ে দুগাছা তড়া তার নিচে লেয় আলতা।
সনাতন কালিন্দী বলে আর দিব টেসেলটা।।

।। ৯

চল্‌ না দাদা কইল্‌কাতা যাব।
তলের ট্রেন-চালা দেইখে লিব।।
হাওড়ার বিরিজ, চিড়িয়াখানা সব কিছু দেইখে লিব।
পাতালের ট্রেন চলিছে পাক দিয়ে ঘুইরে লিব।।
দমদমের ঐ উড়াকলে কন্‌দিকে চইলে যাব।
গঙ্গার জলে নৌকা চলে নৌকাতে চাইপে লিব।।
নৌকা ধইরে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা নদী পার হব।
লোকে বলে চইদ্দ তলা ঘর আছে দেখে লিব—
কৃত্তিবাসে বলে শেযে রায় হোটেলে ভাত খাব।।

।। ১০ ।।

কলিযুগের মদ হইল সুধা।
অ মদ খাইলে মাতাল দাদা।।
মদের সঙে খাইতে মজা চেনাচুর বাদামভাজা।
তা না হইলে বইলে দিছি চাই শুধু মাংসভাজা।।
বতল ভরা গিলাস ধরা ঢাইলেছি আধা আধা।
মদটা খাইলে কথা বলে যেমন হে রাজার ব্যাটা।।
কার্তিক বলে মদ দকানে খাইয়ে দেখুক একবার তারা।
কানায় দ্যাখে কালায় শুনে ঘঁড়ার লাচ দেখায় তারা।।

।। ১১ ।।

এমন সময় তুমি নাই ঘরে।
আমি থাইক্‌ব হে ক্যামন কইরে।।
এই নব যইবন আমার যাই চইলে তুমার ভাবে।
দিছি বইলে রাইত কাটাছে স্বপনে দেখি তুমারে।।
সাত ননদে ঝগড়া করে শ্বশুরে ঠ্যাঙা মাইরে।
মইর্‌ব রে গরল খাঁইয়ে লাইগ্‌ছে ঘুণ পাঁজরে।।
ভাইবে দ্যাখ্‌ বনের পাখি তারা গো স্বামী ধয়ে।
কার্তিক বলে ওগো তুমি রইয়েছ ক্যামন কইরে।।

[শ্রীবৃহস্পতি মাহাতর (গ্রাম-বাগডেগা, পো. মাঝিহিড়া জিলা পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।]

।। ১ ।।

ডাকি মাগো ও বীণাপাণি।
আমায় দিও চরণ দুখানি।।
হংস পৃষ্ঠে আছ তুমি ওগো হংসবাহিনী।
বীণাপাণি কর কৃপা কর মাগো জননী।।
নানা ফুলে বিল্বদলে ওগো মা বীণাপাণি।
দীন হীন সাগর বলে চিত্তে স্থিতি দাও আনি।।

|| ২ ||

বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে।
ভাঙে না চুরে না বাঁশী ফেইলে দেক মা নিরলে।।
কৃষ্ণের বাঁশি দিবা নিশি শুনি মাগো কানেতে।
বাঁশী শুনে হয় না শান্তি হয় না গো জীবনেতে।।
যখন কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় তখন আমি কাঁদি হাসি।
বাঁশী শুনে হয় গো মনে আমি হই কৃষ্ণের দাসী।
ব্রজপুরে ব্রজগোপী কৃষ্ণ নামে হয় সুখী।
ওই কৃষ্ণের থাকে ন কি থাকে গো অষ্ট গোপী।।
নিধুবনে কৃষ্ণসখা বাজায় গো মোহন বাঁশী।
বাঁশীর স্বরে যত দাসী আসে গো হাসি হাসি।।

|| ৩ ||

যৌবন বাড়ছে গো দিনে দিনে।
বাপে মায়ে ধমক দিছে দেখে আমার যৌবনে।।
তবু আমি সময় বুঝে দেখা করি গোপনে।
সকাল বেলা উঠছে সূর্য যেমন অরুণ বরণে।
তেমনি আমার মনের যৌবন বাড়ছে গো দিনে দিনে
যৌবন জ্বালা বড় জ্বালা সইতে লারি জীবনে।
এই যৌবনে হয় গো মনে ঝাঁপ দিব লদীর বানে।।

|| ৪ ||

আমার পাগল কইরে দিল মন।
ভালবাসা এমনি বস্তু ধন।।
ভালবাসা এমন জিনিস জানি না কন দিনে।
ভালবাসা কইর্‌বে সবাই কইর্‌বে মানুষ চিনে।।
যে না জানে ভালবাসি তাকে কি মানুষ বলি।
ভেক জানে কি পদ্মের মরম উঠেডুবে খায় পানি।
এই পথে দেইখেছে যাইতে আমার ভালবাসাকে।
গায়ে আছে কাল চাদর মাথাতে মাফলার আছে।।
ভালবাসা খুঁইজে খুঁইজে পাঁয়েছিলে পুঞ্চাতে।।
তবে যাও ন তুমি কুথা যাবে খুঁইজে আইন্‌ব তুমাকে।
ভালবাসায় রাইখ্‌ব বাঁইধে রাইখ্‌ব বঁধু তুমার মন।।

ভালবাসা কেউ কর না সাগরবাবুর নিবেদন।।
খুহা নিঙড়া কইরে লিবেক মাড়ান আখের মতন।।

।। ৫ ।।

শিলাইদহের কাল জলে আইড়েছি ঝুনকি ঘুঘি।
না লাগে ভাই ইঁচলা পুঁটি লাগেরে গড়ই টুনি।।
শিলাই গেলে কিলাঁই ঘুরাব।
ও় তর শিলাই যাওয়া পুরাব।।

।। ৬ ।।

ও তরা কে যাবি সতীঘাটা?
কার আছে কাঠ ঠিকা টাকা।।
সতীঘাটা ছাতাপুখর আর কত দেখবি চল্।
খাবার কিছু লেরে গাঠাঁই লিয়ে লেরে বুকের বল্।।

(পুরুলিয়ার মাঠাগ্রামের শ্রীকৃষ্ণমাহাত-র কাছ থেকে সংগৃহীত।)

১। টুসু ন কি দক্ষিণ যাবে খিদা লাইগ্‌লে খাবে কী?
আন টুসু গায়ের গামছা ঘিয়ের মিঠাই বাঁইধে দিই।।

২। ঘিয়ের মিঠাই খাবে টুসু গরম জল বৈ খাইঅ না।
পাকা রাস্তায় চইলে যাবে কারো পানে চাইঅ না।।

৩। টুসু টুসু করি আমরা টুসু নাই মা ঘরে গো।
কে টুসুকে লিয়ে গেল ফুলের মালা দিয়ে গো।।

৪। টুসুকে আইসেছে লিতে মঙ্গলবনের মিনিবাস।।
টুসুধনকে বিদায় করে আমরা লিব বনবাস।।

৫। আমার টুসু পইরতে খুঁজে পইরতে খুঁজে টগরফুল।
বাঁকুড়দহে বান পইড়েছে কি করে যাই রঘুনাথপুর।।

৬। আয় চিরুনী আয়না হাতে কাইট্‌ব লো সরু সিথা।
তলে তলে হাত বাঢ়াব আইন্‌ব লো রেশম ফিতা।।

৭। কুল্হি কুল্হি ডাক্তার বুইলে কাব ঘরে রুগী আছে।
রামের মা কৌশল্যা বলে আমার রাম পইড়ে আছে।।

৮। ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, আর খাব না জলসাবু।
আমার লাইগে আইনে দিবে নাসপাতি কমলালেবু।।

৯। রামের মায়ে রামকে মারে রাম কাঁদে ধুলায় পইড়ে।
কনদিগের বিদেশী আইসে ধূলা ঝাইড়ে লেই কোলে।।

১০। ধূলা ঝাইড়ে পরে বলে এই ছেইলাটি কার বটে।
তুমার নয় আমার লয় ঈশ্বরের দিয়া বটে।।

১১। মাথা বাঁধলো অতি যতনে।
জড়া কাঁটা কাজল নয়নে।।
ভাল কইরে বাঁধ্গো মাথা দু তিনটা ফুদ্না দিয়ে।
আঁট্ না হইলে খইসে যাবেক জাল রাখবি কেমনে।।

১২। ফুলাম তেলের শিঁশিভরা থাকে যেন গো সাম্নে। সজা[১]
কইরে কাট্বি সিথা সিঁদুর লাগা মাঝখানে।।
(সোজা)

১৩। তদের ঘরে টুসু ছিল তাই করি আনা গনা।
এবার টুসু চইলে গেলে কইর্বি লো দয়ার মানা।

১৪। আমি নুন দিতে ভুইলে গেছি।
চ্যাং মাছে বেগুনে রাঁইধেছি।।
সিনায় আইসে খাইতে খুঁজে বল্লো ছট্কি দিবি কি?
জল আইনে আর আগুন জ্বালি চাল দিতে ভুইলে গেছি।।
আলু দিয়ে বাইগন[১] পড়ায়[২] তেল দিয়ে নুন মিশাইছি।
খাঁইয়ে খাঁইয়ে লাগে মিঠা কতরে তুই গাইল্ দিছি।।
তর গাইলে কি ডাঙ্গরা আসে বইসে বইসে গাইল্ দিছি।
মাইরে পিটে দে ন খেইদে[৩] দুদিন পরেই রে যাছি।
বাপের ঘরেই বইসে খাব তর কি উধার ধাইরেছি।।
(১-বেগুন, ২-পোড়া, ৩-তাড়িয়ে)

১৫। বাপের ঘরের কাপড় লিলাম ধারে ধারে ধাদ্‌কী ফুল।
শশুর ঘরের লকে বলে গেল বহুর জাতি কুল।
নাঙে দিইল তর ভাইয়ের নাম হইল।
তাকে কী বইলে লো কাপড় দিইল।।
বাপের ঘরে পরব বিহার তার আগে লিয়ে গেল।
যা ছিল পাওনা পাতি পরবে আদায় হইল।।
পরব বাসি লিতে আইলি কত সুন্দর দেখাইল।
বলি তকে কে দিয়েছে নাম করে তর ভাই হইল।।

(উপপতি)

১৬। বইল্‌তে লারি তর ভাইয়ের ডরে।
তাকে বইল্‌ব বইল্‌ব মন করে।
লাজে মরি কিবা করি প্রেম করা না হয় তর তরে।
ফাঁকা পাইলে বইল্‌ব কথা মনে রাখবি সকালে।।
সাঁঝ সকালে বিকাল হইলে ডুবে বেলা মায়ের কলে।
মা আছে তর বাবা আছে আর বা আছে কে ঘরে।
ভাই আছে তর দাদা আছে বলব বলি কী কইরে।।

১৭। ওলো ধনি বাঁকা আড় নয়ন।
তাকে দেইখ্‌লে লো জুড়ায় জীবন।।
সাঁঝ-সকালে জলকে যাবি কাঁখে কলসী লিলি ধন।
রাস্তার মাঝে দেখা হইলে লিব লিব কইরে মন।।
টাঁইড-টিকরে[১] গবর কুড়ায় দেখে কি আর মানে মন।
মনে করি বইল্‌ব কথা লক দেখি ভাই সারাক্ষণ।।

(রুক্ষ প্রান্তরে)

১৮। বিহা দিলি মা বুঢ়া বরে।
ডবল মহর মল দিব বইলে।।
বুঢ়া বরে দিলি বিহা আরো সতীন উপরে।
বল্‌ মা আমি যাই কি কইরে খাইট্‌ব সতীন উপরে।।
লকে বলে বুঢ়া বুঢ়া হইলে কইর্‌ব কি।
যদ্দিন বুঢ়া বাঁইচে আছে খাঁইয়েঁ-মাইখে-পইরে লিই।।

১৯। অ তুঁই যাই বললি রে তাই ভাল।
আর বলিস না গা জ্বইলে গেল।।
গা জ্বইল্‌ল লো ভালই হইল কেরোসিন নাই ছিল।
রাতের ক্ষণে ডিবা নিম্‌হায় আঁধারটা আল' হইল।।

কেরোসিন তেলের দাম ভারি ভাই তেল কিনা দায় হইল।
গাইল্ দিয়ে যদি গা জ্বলে তর আঁধারটা আল' হইল।।

২০। তাকে গা জ্বলা অষধ দিব।
কাঁচা হলইদ্ আলকুসি দিব।।
বাড়িতে ভাই কাঁচা হলইদ্ খেতে অলকুসি ছিল।
বাঁইটে কুইটে ওর গায়ে ভাই জল কইরে ছিটা দিব।।

[কুড়ুক্তোপার (পুরুলিয়া) শ্রীমণীন্দ্রনাথ মাহাত-র কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

১। সাঁঝ হইলে মা সাঁঝ সলিতা
সকাল হইলে মাড়ুলি।
এত যত্ন কে করে মা
যার ঘরে ভগবতী।।

২। গাই আইল বাছুর আইল
আইল গো ভগবতী।
প্রদীপ লিয়ে বাইরাও মাগো
ঘরের যত কুলবতী।।

৩। বনে যাইও না।
বনে গেলে বিপদ আছে
মা বইল্তে পাবে না।।

৪। রাম ন কিরে বনে যাবি
বনে গেলে খাবি কী?
বনে আছে ফল মূল
আমার খাবার ভাবনা কী?

৫। রাম ন কিরে বনে যাবি
সঙ্গে লে রে সীতাকে।
ই ভারতে কে আছে রাম
সীতার ভারাভার লিতে।।

৬। কাঁইদ্‌ছ কি কাঁইদ্‌ছ কি সীতা
আব কি আসে রাম ফিরে।।

৭। আমাব রাম হাল জুইড়েছে
ডাহ্‌নে বাঁয়ে লাল গরু।
চিনে চিনে কামিন কইর্‌ব
দাঁত গাবা কমর সরু।।

৮। রাম ছাইড়েছে যইগ্‌গের ঘঁড়া
অশোক বনের কাননে।
লব কুশ ধইরেছে ঘঁড়া
সীতা বইলে দাও ছাইড়ে।।

৯। ছাইড়্‌ব না ছাইড়্‌ব না ঘঁড়া
ছাইড়্‌ব না বিনা রণে।
কে আছ ভাই যুদ্ধপতি
যুদ্ধ দাও আমার সনে।।

১০। যা মইরে যা ভিতর গুমুরে।
সে ত ইচ্‌লা মাছে ডুমুরে।।

১১। ছুটমুট পানের খিলি
এত কেনে চুন দিলি?
এত লো তর ভালবাসা
আজ ক্যানে জবাব দিলি?

১২। কতই কর না ধন।
তদের টুসু যাবেক বাদাবন।।

১৩। টুসু ন কি পড়্‌কুল যাবেক
খিদা লাইগ্‌লে খাবেক কি?
আন টুসু গায়ের গামছা
ঘিয়ের মিঠাই বাঁইধে দিই।।

১৪। অন্তর ফল আর ভিতর টাসা যার।
যেমন কুইল্‌পাকার ভিতর-বাহার।।

১৫। বাড়ির নাময় পথ রাইখেছি
মামীর মা আইস্‌বেক বইলে।
মামীর মাকে খাইতে দিব
কুইল্‌পাকা মিঠাই বইলে।।

১৬। সকাল হইলে বাঢ়ে যেমন তরুণ তপনে।
তেমনি আমার ধনির যইবন বাঢ়ছে লো দিনে দিনে।।

১৭। মায়ে বাপে ধমক দিছে
দেইখে আমার যইবনে।
তবু আমার মন মানে না
দেখা করি গোপনে।।

১৮। যইবন জ্বালা বড় জ্বালা
সইতে লারি জীবনে।
ই যইবনে সইতে লারি—
ঝাঁপ দিব লদীর বানে।।

১৯। ধনী লো তর এই বাঁকা নয়ন।
আমি ভুইল্‌তে লাইর্‌ব আজীবন।।

২০। হাথেতে তেলের কটি
কাঁখেতে গাগারিয়া।
তর রসে ভালে নাগরিয়া।।

২১। রাইতের বেলা চইমকে উঠি
একলা থাকি বিছানায়।
স্বপুনেতে হইল মিলন
চইলে গেলি ঠিকানায়।।

২২। ভালবাসা কেউ কইর না
শুন সবে নিবেদন।

খহা নিঙড়া[১] কইরে দিবেক
আখ-মাড়া কলের মতন।।

(আখের ছিবড়ে)

২৩। একশ' টাকার খাট কিইনেছি
দুশ' টাকার বিছানা।
তিন শ' টাকার বউ কিনেছি
সঙ্গে শুইতে মানে না।।

২৪। দেখবি শালী একেই চাপড়ে।
তুঁই মুইতে দিবি কাপড়ে।।

২৫। তকে পাই না কভু বহালে।
ল্যাদা কঁমর ভাইঙব গঁড়াইরে।।

(লাথি মেরে)

২৬। তদের ঝাকে ধরে সাদা শিম।
ভাই ভাতারি ভাইয়ের খাওয়াসীন।।

২৭। তুই ডাঁঢ়া কুলহির মাঝখানে।
সত্যবন্দী কইব্ব তর সনে।।

২৮। ভালবাসা এমন বস্তুধন।
আমার পাগল কইরে দিল মন।।

২৯। ভালবাসা এমন জিনিস দেখিনা কন দিনে।
ভেক জানে কি পদ্মের মরম জানতে হইল এই খেনে

৩০। বাসক ফুলের সাদা মালা দিইব তর গলে।
ছেইলা আইনে দিবি এই কোলে।।

৩১। কলিযুগের এই ত ব্যবহার।
ব্যাটায় বউকে করে নমস্কার।।
ব্যাটা চলে বউয়ের কথায় মায়ের কথায় জ্বলে যায়।
রান্নাশালে কাঠ আইনে দাও নাইলে তুমার নাই খাবার।।

ব্যাটায় বুড়ী মাকে বলে শুখ্না কাঠ কর জগাড়।
বউটা কি বনে যাবেক খুইলে লিবেক অলঙ্কার।।
বউয়ে বলে জমি বিক নইলে তুমি কর ধার।
নাইলে আমি চইলে যাব যেখানে বাড়ি বাবার।।
বউয়ের লাইগে শাড়ি-লেপ-বালিশ-বিছানা তার।
মায়ের লাইগে ছিঁড়া কাঁথা ছার উঠে ভাই বারে বার।।
মায়ের গলায় শিকল দড়ি বউয়ের গলায় চন্দহার।
আর বউ মাইখ্‌তে খুঁজে হিমানী স্নো পাউডার।।

[অনিল মাহাতর (মলিয়ান, বারী, পুরুলিয়া) কাছ থেকে গানগুলি সংগৃহীত।]

।। ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান—৬ ।।

।। ১ ।।

টুসু মা টুস্ কলাইটি
সঙ্গে যাবেক কে?
ঘরে আছে গণেশ বুঢ়া
ডাইকে আইনে দে।।
আগে যায় গণেশ বুঢ়া
পেইছে যায় বারি
তার তলে-তলে যায়—টুসু মা
ঘম্টা মাথায় শ্বশ্রার বাড়ি।।
শ্বশ্রায় বলে— বৌটি গরা', না কাল?
শ্বাসে বলে— বৌটি আমার ঘর কইর্লে ভাল।। (ফর্সা)

।। ২ ।।

উপরের ছাদে রইল গো তেলের বাটি।
এখন কি কইর্বি বল্
তুম্ তাক্ তেরি কিটি।।
ওলো টুসুর যে বড় সুন্দর ঝুঁটি
ঐ ঝুঁটিতে বাঁইধে রাইখ্ব
নাগরের উড়া-উড়া মনটি।।
বুঝলি আমার—তুম্ তাক্ তেরে কিটি।
ঐ ঝুঁটিতে বাঁইধে রাইখ্ব
টুসুমণির আদরের ধনটি।
তাক্ তেরে কিটি, তুম্ তাক্ তেরে কিটি।।

।। ৩ ।।

চাঁদকে যেমন তারা ঘেরে
কৃষ্ণ ঘেরে গোপীগণ।
তেমনি আমরা ঘেরে রাইখ্ব
টুসুধনের শ্রীচরণ।।
ওলো তেমনি কইরে ঘেরে রাইখ্ব
টুসুধনের শ্রীচরণ।।

|| ৪ ||

দক্ষিণ দিকে মেঘ কইরেছে
মেঘের নাম কাল শশী।
চল যাইয়ে দেইখে আমি গো
দেখ কি বাজায় বাঁশী।।
টুসুর মন এত উচাটন
কেন হইল বল্ দেখি।
ওগো সখী বল্ দেখি—
কাল শশী দেইখে টুসুর
প্রাণের ধনকে মনে পইড়্ছে
লো সখি!

|| ৫ ||

কত সাধের খোঁপা বাঁইধে টুসু আইসেছে।
আঙ্‌নাতে তাই যে গো চাঁদ হাইসেছে।।
দেইখ্‌তে আসে নগরবাটী কত কত প্রতিবেশী।
আমার পানের খিলি সাজে সাজে হাত ধইরেছে।
ওগো কত সাধের খোঁপা বাঁইধে টুসু আইসেছে।
ওগো দেইখ্‌বি আয় কত সাধের খোঁপা বাঁইধে টুসু আইসেছে।

|| ৬ ||

পুরুলিয়ার রেশমী শাড়ি।
খালভরা[১] তুই কাকে দিলি?
বিহালু তোর চোখের বালি

আজই আমি বাজার যাব
গোছ পেইড়া শাড়ি লিব
ওমা দোকানদারের টাকা ধারি।
কী বইলে জবাব দিব।।

(গালিসূচক শব্দ)

।। ৭ ।।

ওই দেইখ বড়্গাছে[১] ঝুলে খড়ের দড়ি
এত কথায় লে তুই গলায় দড়ি লো
লে তুই গলায় দড়ি।
আগুপাচ্ছু না ভাইব্লি
বিয়ার আগেই প্রেমে মজলি।
জাতকুল সব ভুললি
মান বাঁচাতে লে লো গলায় দড়ি।। (বটগাছ)

।। ৮ ।।

চল্ গেঁদা ফুল চাবুকের পারা।
তরা পথ ছাইড়ে সরাই দাঁড়া।।
হুঁ দ্যাখ, উড়্হাকলে[১] পইড়েছে বমা[২]
ওরে তরা ভুঁই ফাইড়ে[৩] পাতাল সাম্হা।[৪]
জার্মানীর উড়্হাকল জাহাজে
তরা চাপ্লো মনের বিচ্ছেদে।
হামাদের আসাম যাবার কথা ছিল
টিকিটবাবু টিকিট কই দিল?
(১- উড়োজাহাজ ২- বোমা ৩-মাটি খুঁড়ে ৪-প্রবেশ কর)

।। ৯ ।।

বিনা তেইলে জ্বইল্ছে লো সারা রাতি
টাটার বিজলি বাতি।
আমার মন ক্যামন কইরে লো
আমি আর রইব না বুঢ়ার সংগে।
বিহান[১] হইলেই চইলে যাব
চাইক্রা বাবুর[২] সংগে।
আমি আর রইব না বুঢ়ার সংগে।।
(১-সকাল ২-চাকুরী-করা বাবু লোক)

[শ্রীমতী পুষ্পরাণী সিংহ ও শ্রী অসিতবরণ সিংহের (গ্রাম-পাঁড়ই, পো.-পুণ্চা, জেলা-পুরুলিয়া) কাছ থেকে সংগৃহীত।]

।। ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান—৭ ।।

।। ১ ।।

ডেরাইভারবাবু[১] ডাঁঢ়[২] করাও গাড়ি।
তুমায় না দেইখে রইতে লারি।।
তুমায় দ্যাখা কইর্‌ব বইলে চেল্যামাতে[৩] হাট করি।
তুমি ক্যানে আমাব সঙে[৪] কর এ ছলচাতুরী।।
তুমায় না দেইখ্‌লে আমি একটুকুন্‌ রইতে লারি।
তুমাব মুখের ভালবাসা ভুইল্‌তে আমি নাই পারি।।
গাঁয়ের লকে কত বলে তবু তুমায় দ্যাখা করি।
রাইতে আমার ঘুম আসে না, তুমার মু[৫] মনে করি।।
আর কতদিন একা একা থাইক্‌ব গ ধইয[৬] ধরি।
কবে আমি তুমার সঙে যাব গ মারাফরী[৭]।।

(১-ড্রাইভারবাবু ২-দাঁড় ৩-চেলিয়ামা (পুরুলিয়ার বর্ধিষ্ণু গ্রাম) ৪-সঙ্গে ৫-মুখমন্ডল ৬-ধৈর্য ৭-বোকারো (স্থানীয় লোকেরা 'মারাফরী' বলে)

।। ২ ।।

ডেরাইভার দেখে জামাই কইর্‌না।
অ তার আসার নাই নাম ঠিকানা।।
গাড়ির কাজে ফুরসৎ নাই তার, ঘর আইস্‌বার নাই ঠিকানা।
এই ভরা যইবুনে[১] আমি ধইয ধইর্‌তে পাইরব না।।
লেবার বলে ডেবাইভারবাবু আমায় কাজে রাখ না।
ভাল কামিন না থাইক্‌লে ওগো কথা শুনে না।।
কামিন বইলে মুচকি হাঁইসে কাজ কইর্‌তে বাখ না।
কাজ-কামেতে যেমনই হোক কাছ ছাড়া সে বসায় না।।
সাঁঝসকালে মদ বেরান্ডি নেশা ছাড়া থাকে না।
বাইরে উড়ায় টাকাকড়ি ঘর খরচা পাঠায় না।।
ডেরাইভারবাবু বলেই বলে—মন যে আমার মানে না।
এগুপেছু[২] যে যা বলুক মদ খাওয়াটি ছাইড়্‌ব না।।

(১-যৌবনে, ২-আগুপিছু)

।। ৩ ।।

বঁধু আমার আইস্‌বে মেলাতে।
আমি দেখা কইর্‌ব তার সাথে।।
শাড়ি-চুড়ি সায়া-বেলাউজ আমায় কিনে দিয়েছে।
করগালির মকরমেলায় বঁধু আইস্‌ব বলেছে।।
বঙ-বেরঙের ডেস কইরে যায় দেইখ্‌তে যবে মেলাতে।
বঁধুর সঙে দেখা কইরে ঘুইব্‌ব আমি তার সাথে।।
সারা বাজার খুঁইজে বেড়াই দেকতে না পাই নজরে।
যাকে শুধাই সেই বইলেছে দেইখ্‌বি যা তাই বাজারে।।
মেলা খরচ নাই যে আমার খুঁইজ্‌ব বল কার কাছে।
শুকদেব বলে ক'টাকা চাই লে ক্যানে আমার কাছে।।

।। ৪ ।।

বঁধু মনে নাই বিবেচনা।
পিরীত কইরে গেল হে জানা।।
বঁধু আমাব ছিল ভাল আচম্বিতে কী হইল।
অল্প কথায় মন ভাইঙ্‌ল ফিইরে না আর আসিল।।
কী কইর্‌ব কুথা যাব কোথা হে তারে পাব।
বঁধু বিনে আমার প্রাণে এত যাতনা হইল।।
আইস্‌ব বইলে চইলে গেল প্রাণে আমার শেল দিল।
কে জানে সে এমন হবে মনে আমার নাই ছিল।।
আগে আমায় আদর করে দেখ কত বুঝাইছিল।
হায়রে, তবে পিরীত কইরে আজ ক্যানে ছাড়ে দিল।।

।। ৫ ।।

বঁধু আইস্‌ব বইলে ক্যানে আশ্‌ দিলি।
মকবমেলার হাটে কই আলি।।
তুমার জন্যে পিঠামুড়ি আমি যে রাইখেছিলি।
আশায়-আশায় রইলম্‌ বইসে তাও ত তুই নাই আলি।।
আমায় আশা দিয়ে ক্যানে বাইরেতে চইলে গেলি।
মেলা খরচ না দিয়ে তুঁই ঘরে বইসে কাঁদালি।।
মকর মেলায় না আইলে তুমি এইবারে ছাড়াছাড়ি।
শুকদেব বলে দেখ্‌ যাঁইয়ে তুই—তালতলায় খাইছে তাড়ি।।

।। ৬ ।।

খালভরাকে দেখে আসে জ্বর।
আমি যাব নাই আর উয়ার ঘর।।
সাঁঝসকালে মার খাইতে হয়, খাওযাবার নাই শক্তিবল।
সন্ধ্যা হইলে মদ খাইতে যায়—রাত বারটায় টলমল।।
এত কষ্ট এত জ্বালায় আর যাব নাই উয়ার ঘর।
দিবানিশি কাঁইদে কাঁইদে অঙ্গ হইল জরজর।।
কন কিছু বইল্‌তে গেলে যায় রাইগে আমার উপর।
দাঁত খিঁচাইয়ে বলে—ছুঁড়ি, যা চইলে যা বাপের ঘর।।
কয়লা বিকে খাব আমি যাব নাই খালভরার ঘর।
শুয়াং যখন আছে তখন ক্যানে হে উয়ার আদর।।

।। ৭ ।।

করগালির মকর মেলাতে।
জিনিস পাবি ভালবাসাতে।।
মেলা যাবি হেলেদুলে মনের আশা মিটাতে।
মেলাতে তোর দেখা হবেক ভালবাসার সঙেতে।।
আয়না লিয়ে চিরুণ লিয়ে বাঁধবি মাথা যতনে।
স্নো পাউডার সেন্ট লিয়ে তুই ভাববি কত কি মনে।।
সায়া শাড়ি কিনে দিব পরবি লো কত হেলে।
এক খিলি পান দশ পয়সা খাবি লো হাঁইসে হাঁইসে।।
তুই লো ধনি ঘুরবি মেলা সঙ্গীজুড়ির সঙ্গেতে।
দু চোখেতে কাজল দিয়ে মজাবি মন রঙ্গেতে।।

।। ৮ ।।

বিহা আমার দে চাঁড়ে কইরে।
ও মা থাইক্‌ব আমি কী কইরে।।
বাবার দুলালী আমি যাব লিজের ঘরে।
তর ক'লে খেলেছি মাগো কত জ্বালাতন কইরে।।
দাদা বলে ভালই হইল বাবা কাঁন্দে গুমুরে।
মায়ের দিগে চেয়ে দেখি সদাই দুনয়ন ঝরে।।

বন পুইড়্লে সবাই দ্যাখে—চাইয়ে লিজের নজরে।
ও মা যইবন পুড়া কৈ না দ্যাখে, দেইখ্তে না পায় নজরে।।
শুক বলে আর কিছুদিন ধইয ধর অন্তরে—।
মনের মতন পতি পাবি দুএকদিনের ভিতরে।।

(তাড়াতাড়ি)

।। ৯ ।।

জনমের বাদী সতীন আমার।
দেখ কাঁদায় গো সকাল বিকাল।।
নিঃভাবনায় জ্বইলে গেলি এই ত হইল আমার হাল।
সতীন আমার চইখের বালি জ্বইল্ছে গো যেন মশাল।।
ক্যানে বা গইড়েছে হরি আমাব এই ভাঙা কপাল।
এই সতীনের শাপান্তরে আমার দুঃখ চিরকাল।।
সতীন জনমের বাদী এই জীবনের হইল কাল।
এই সতীনে কাঁদায় দেখ প্রতিদিন সকাল-বিকাল।।

।। ১০ ।।

আস্তে কইরে চালাও হে গাড়ি।
কত সাধ আছে গো ভারি।।
তুমার সঙে ভালবাসা এবার দু'চার দিন করি।
শ্বশুরঘর ল্যা আইস্‌ব যখন আইস্‌ব হে কোলে করি।।
আব কী আমায় বাইস্‌বে ভাল সেই দিনটা মনে করি।
(আমি) শ্বশুর ঘরে থাইকে তুমায় কত যে মনে করি।।
হইয়েছি আজ পুয়াতি[১] ওগো তাও তুমায় মনে করি।
মেলা দেইখ্তে আইস্‌ব ইবার নুনুকে[২] ক'লে[৩] করি।।
তুমার দেখা পাব বইলে থাইক্‌ব গো আশা করি।
আমার নুনু লিবে ক'লে মনে বড় সাধ করি।।

(১-গর্ভবতী, ২-শিশুপুত্র, ৩-কোলে)

(পুরুলিয়ার চেলিয়ামার শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্তের কাছ থেকে গানগুলি সংগ্রহ করা।)

।। ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহীত টুসুগান—৮ ।।

মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে টুসু-সঙ্গীতে
চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য

(গীতিনাট্য)

পুরুষচরিত্র— চাঁদ সদাগর (চম্পক নগরের রাজা)
নেড়াই (ঐ বিশ্বস্ত ভৃত্য)
প্রহরীদ্বয়।

স্ত্রী চরিত্র— সনকা (চাঁদসদাগরের স্ত্রী)
মনসা (নাগমাতা)

প্রথম অঙ্ক—১ম সদৃশ্য
(চাঁদসদাগর, নেড়াই ও সনকার প্রবেশ)

চাঁদ— করেরে নেড়াই, কররে আয়োজন
আমার বাণিজ্য হয়েছে মন।।

আমরা বণিকের জাতি, বাণিজ্যে ধরি জীবন।
সাজা ডিঙা তাড়াতাড়ি, করিব বিদেশগমন।।
যত্ন করে সাজা ডিঙা সাজারে মনের মতন।
তাড়াতাড়ি আন্‌রে ডেকে আছে যত মাঝিগণ।।
রত্ন লয়ে ফিরব দেশে সহায় আমার ত্রিলোচন।
বীরবল বলে পূরবে আশা, সেব চাঁদ পদ্মার চরণ।।

নেড়াই— চিন্তা কিছু কর না, রাজন।
আমি করি হে সব আয়োজন।।

দীর্ঘদিনের নফর আমি তোমার অন্নে ধরি জীবন
তাড়াতাড়ি সাজাই ডিঙা কর হে সুখে গমন।
যাত্রা তোমার সফল হউক নিয়ে এস রত্ন ধন।
ঈশ্বর তোমার সফল হউক, আশা তোমার হোক পূরণ।।
আনন্দে করহে গমন, ডেকে আনি মাল্লাগণ।
বীরবল ভণে পদ্মা বিনে বৃথা সবই আয়োজন।

(প্রস্থান)

সনকা— শুন নাথ শুভ সমাচার।
আমার হয়েছে গর্ভের সঞ্চাব।।

যাত্রাকালে জেনে যাও হে, কহি আমি বাবে বার।
দেশে ফিরে ওহে নাথ, কর না হে তিরস্কার।।
বাণিজ্যের কালে মনে রেখো নামটি দাসী সনকাব।
ভুলো না ভুলো না নাথ, রেখ হে স্মরণ আমার।।
তোমায় ছাড়া এ সময়ে চক্ষে দেখি অন্ধকার।
তোমায় ছাড়া হলে নাথ, বাঁচবো না হে প্রাণে আর।
এস ফিরে তাড়াতাড়ি মিনতি হে এই আমার।
বীরবল ভণে তোমায় বিনে গতি নাই এই অবলাব।

চাঁদ— আসবো ফিরে সহায় ত্রিলোচন।
তোমায় বলি গো সত্যবচন।।

আসব ফিরে তাড়াগাড়ি লয়ে বহু যত্ন ধন।
ভেবো না ভেবো না প্রিয়ে চিন্তা তোমার অকারণ।।
রইল নেড়াই দেখবে তোমায় হবে না গো অযতন।
ভয় কিছু নাই করবে সেবা করবে গো মায়ের মতন।।
হাসিমুখে দাও গো বিদায়, কেন গো চঞ্চল মন।
বীরবল বলে চঞ্চল হলে হবে না বিদেশগমন।।

নেড়াইয়ের প্রবেশ— সপ্তডিঙা করেছি সাজন।
এবার সাজ হে সাজ রাজন।।

ডিঙা সব সেজেছি আমি করিয়া মনের মতন।
লাগায়েছি ঘাটে ডিঙা করিয়া অতি যতন।।
অপেক্ষা করিছে ঘাটে ডিঙাবাহক মাল্লাগণ।
আর দেরী নয়, সাজ প্রভু কর হে বিদেশ গমন।
মনের আশা পূরাও প্রভু, নিয়ে এস রত্নধন।
বীরবল বলে যাত্রাকালে কর মা পদ্মার বন্দন।।

চাঁদ— আমি তবে আসিরে নেড়াই।
আমায় আনন্দে কর্‌রে বিদায়।।

চিরদিনের সাথীরে তুই, তুই ছাড়া মোর কেহ নাই।
সংসারের ভার দিয়ে তোরে বিদেশে বাণিজ্যে যাই।।
আছে যত সম্পদ আমার তোরে আমি দিয়ে যাই।
দেখাশুনা করিস রে সব, করিস সেবা সনকার।।
ভালমতে দেখিস রে সব, বারে বারে বলে যাই।
বীরবল বলে ভয় কিছু নাই পূজ যদি মনসায়।।

নেড়াই— আজ্ঞা তব করিব পালন।
নেড়াই নহে প্রভু মূঢ়জন।।

তব সুখে সুখী আমি দুঃখে আমি দুখীজন।
অন্তরে বাসনা আমার সুখে থাক সর্বক্ষণ।।
ভালমতে দেখব সবই, চিন্তা কিছু নাই রাজন।
সর্বসম্পদ করব রক্ষা, করে আমি প্রাণপণ।।
প্রাণ দিয়ে করিব আমি সনকা মায়ের সেবন।
বীরবল বলে যাত্রাকালে কর মা পদ্মার স্মরণ।।
(সকলের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(বাণিজ্য করিয়া ধনরত্নসহ দেশে ফিরিবার কালে মাঝ দরিয়ার মধ্যে চাঁদ সদাগরের তরীতে মনসা দেবীর আবির্ভাব ও চাঁদের প্রতি দেবীর উক্তি)

মনসা— চাঁদ বেনা তুই পূজ্ না আমারে
আমি বলি রে বিনয় করে।।

আমি দেবী বিষহরি আমি রে পূজার তরে।
আশা আমার কর্ রে পূরণ, তাড়াস না বারে বারে।।
অকারণে গালাগালি করিস না আর আমারে।
কর্ রে পূজা বিনয় করি, দিস্ না জ্বালা অন্তরে।।
তুই না পূজা দিলে রে চাঁদ, পূজকে না কেউ আমারে।
দয়া করে পূজ্ রে আমায় বীরবলার আশা পূরে।।

চাঁদ— পূজি আমি দেব শূলপাণি।
আমি পূজব না আর তোকে কানি।।

জানি আমি মহেশ্বরে, তোরে আমি নাই জানি।
তবে কেন পূজার আশে বাবে বারে আসিস কানি।।
পালা পালা পালা কানি, পালা পালা এখনি।
হেতালের বাড়িতে না হয় বধির তোর পরানি।।
মোর হাতে পাবি না পূজা জ্বালাস না আমায় কানি।
বীরবল ভণে, মরবি বেনে না পূজিলে ঐ কানি।

মনসা— দেখ্‌ব রে চাঁদ, দেখ্‌ব রে তোরে।
যদি পূজা না করিস মোরে।।

দেখ্‌ব রে তুই রত্ন লয়ে দেশে ফিরিস কী করে।
দেখ্‌ব দেখ্‌ব কেমন করে ডিঙা লয়ে যাস ঘরে।।
সর্ব ডিঙা ডুবাইব অগাধ দরিয়ার মাঝারে।
সর্বহারা করব তোরে বুঝবি রে তুই এইবারে।।
করব তোরে পথের কাঙাল, ফেল্‌ব রে দারুণ ফেরে।
বীরবল ভণে ওরে বেনে, বাঁচবি না বিবাদ করে।।

(অন্তর্ধান)

(মনসার কোপে ধনরত্ন ও সঙ্গীসহ সমস্ত ডিঙা অতল জলে ডুবিতে আরম্ভ হইলে চাঁদ সদাগরের উক্তি ঃ—)

চাঁদ— ডুবল তরী একি হল দায়।
এবার বাঁচাও হে শঙ্কর আমায়।।

হাবুডুবু খাই সলিলে কিনারা না খুঁজে পাই।
সঙ্কটে রাখ হে প্রভু, মিনতি করি তোমায়।।
ডুবল যত সঙ্গী ছিল, ডুবল যত সম্পদ হায়।
ডুবল সবই অগাধ জলে, চক্ষে কিছুই দেখি নাই।।
তুমি ছাড়া ওহে ভোলা এ বিপদে কেহ নই।
তোমায় ছাড়া ওহে ঠাকুর, অন্যে আমি জানি নাই।।
বীরবল বলে চাঁদসদাগর বুঝেও কেন বুঝ নাই।
পড়বে ফেরে বারে বারে না পূজিলে কমলায়।।
(প্রস্থান)

(রাত্রিকালে চাঁদসদাগরের কলাবনে দুইজন প্রহরীর মধ্যে পরস্পর কথোপকথন)

প্রথম প্রহরী— দেখবি শালা আজ ভাল করে।
কলাচুরি করে কোন্ চোরে।।

জাগ্‌বি বেটা ভাল করে, ঘুমাস না রে হাঁ- করে।।
ধর্‌ব শালা চোর বেটাকে, দেখি পালায় কী করে।।

ধরা যদি পড়ে বেটা আধমরা করব মারে।
বীরবল বলে আসছে চোরা দেরী নাই থাক্ চুপ করে।।

দ্বিতীয় প্রহরী— মিছা কথা বলিস না এমন।
আমি নইরে শালা তোর মতন।।

নিজে যেমন ঘুমাস শালা, থাকে না কোন চেতন।
বসে বসে ঢুলিস যেমন, ভাবিস না আমায় তেমন।।
চোদ্দ ডাকে পায় না সাড়া, ঘুমাস রে মড়ার মতন।
তোর দ্বারা হবে না শালা, গোটা নিশি জাগরণ।।
থাকবি নিজে ভাল করে, করিস না আমার চিন্তন।
বীরবল বলে চোর না ধরলে হবে সবই অকারণ।।

(দীর্ঘদিন পরে মনসার কোপে সর্বহারা চাঁদসদাগরকে কলা বনের দিকে আসিতে দেখিয়া)

প্রথম প্রহরী— চুপ্, শালা, চুপ্, আসে কোন বেটা।
আজ ভাঙব বেটার মাথাটা।।

চুপ্ করে দ্যাখ্ বসে বসে, দেখি শালার মজাটা।।
কেমন করে ঢুকে বেটা ভাঙে গাছের কলাটা।।
চুপ্ করে থাক্, ঢুকুক বেটা, ধরব বেটার গলাটা
মারব বেটার পাঁজর গড়ায় ছালব বেটার চামড়াটা।।
রাজবাড়িতে নিয়ে যাব, দিয়ে গলায় গামছাটা।
বীরবল বলে আজ বাছাধন, পাবি দারুণ সাজাটা।।

(কলাবনের মধ্যে চাঁদ সদাগর প্রবেশ করিল)

উভয়ে— চোর ঢুকেছে কলাবাগানে।
আমরা ধরেছি হে দুজনে।।

অনেকদিন খেয়েছিস কলা, আজ পালাবি কেমনে।
তোর জন্যে আজ বসে আছি, গাছের আড়ে গোপনে।।

পা দুটা তোর ভাঙব বেটা ভাঙব এই কলার বনে।
মারের চোটে আজরে বেটা বাঁচবি না আর পরাণে।।
পড়েছিস আজ ধরা বেটা, দেখি পালাস কেমনে।
রাজবাড়িতে নিয়ে যাব, রজক বীরবল ভণে।।

(গোলমাল শুনিয়া নেড়াইয়ের প্রবেশ)

নেড়াই--

মার্ শালাকে, ভাঙ্‌বে পা দুটা।
কলা চুরি করে এই বেটা।।

দৈনিক দৈনিক ঢুকে বেটা ভাঙে কলার কাঁদিটা।
মার শালাকে ভাল করে, ভাঙরে দাঁতের পাটিটা।।

হাড়ে হাড়ে বুঝুক বেটা, কলা খাওয়ার মজাটা।
গুঁতা শালার পেটটায় আগে, ফাটুক পেটের চামড়াটা।।

দাড়ি ধরে টান শালাকে ছিঁড়ে দে রে কানদুটা।
বীরবল বলে বাধ্ শালাকে শক্ত করে দড়িটা।।

চাঁদ—

মারিস না আর, মারিস না নেড়াই।
আমি চোর নই তোরে জানাই।।

আমি তোদের চাঁদসদাগর, পারলি না চিনতে আমায়,
ভাল করে দেখ্‌বে চেয়ে মিথ্যা কথা বলি নাই।।
হারায়েছি সঙ্গী যত কানি বেটির ছলনায়।
হারায়েছি সর্ব সম্পদ সঙ্গে আমার কিছু নাই।।
অর্ধাহারে অনাহারে ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়।
আর মারিস না বিনয় করি, পেটে এখন কিছু নাই।।
বহু কষ্টে এতদিনে এসেছি রে তোদের ঠাঁয়।
বীরবল ভণে, অকারণে দিস না রে জ্বালা আমায়।।

(সনকার প্রবেশ)

সনকা—

বারে বারে করি রে মানা।
তোরা মারবি না রে, মারবি না।।

দীর্ঘদিনের নফর তোরা, তবু তোরা চিনলি না।
এই যে তোদের চাঁদসদাগর, সবাই কি হলি কানা।।
রাজতিলক রয়েছে ভালে দেখতে তোরা পাস কিনা।
দেখ্‌রে চেয়ে ভাল করে দিস্‌ নারে আর যাতনা।।
বাঁধন খুলে দে রে তোরা মারিস না, আর মারিস না।
বীরবল বলে সবাই মিলে, ধর্‌রে চরণ দু'খানা।।

নেড়াই— (বাঁধন খুলিয়া)—
কেঁদে নেড়াই বলে রাজারে।
রাজন, ক্ষমা কর আমারে।।
চিনতে না পারিয়া আমি দুঃখ দিলাম তোমারে।
হেন দশা হবে তোমার জানব হে কেমন করে।।
আমরা জানি রত্ন লয়ে আসবে হে দেশে ফিরে,
জানি না, জানি না প্রভু, পড়্‌বে হে এমন ফেরে।।
পায়ে ধরি, ক্ষমা কর, বলি হে বিনয় করে।
বীরবল বলে, তা না হলে প্রাণ বাঁচে হে কী করে।।

চাঁদ— কাঁদিস না রে, কাঁদিস না নেড়াই।
জ্বালা দিয়েছে কানি আমায়।।
পূজা না পাইয়া কানি দিল রে দুঃখ আমায়।
সঙ্গীসাথী সহ ডিঙা ডুবাল মাঝ দরিয়ায়।।
সর্বসম্পদ হর্‌ল কানি হর্‌ল রে পূজার আশায়।
দুঃখের উপর দুঃখ দিলেও কানির পূজা করব নাই।।
এসেছি রে ঘরে ফিরে আর কিছু মোর ভাবনা নাই।
আর কী আমায় করবে কানি, পূজা আমি দিব নাই।।

দোষ কারো নাই, ওরে নেড়াই, চল্‌রে সবে ঘরে যাই।
বীরবল ভণে, পদ্মা বিনে চাঁদ বেনে তোর গতি নাই।।

(সকলের প্রস্থান)।

যবনিকা

(রচয়িতা ঃ শ্রীবীরবল রজক। গ্রাম ও পোঃ — নদীয়াড়া, পুরুলিয়া।)

পরিশিষ্ট ঃ গ

।। স্বরলিপি ।

(দশটি টুসুগান)

১। দেখ্ না কত আনন্দ দুলে ....
২। হায় রে, আমার সাধের টুসুধন ....
৩। কংসাবতী মকর মেলাতে ....
৪। যাবার সময় মন কেমন করে ....
৫। টুসুব বাপ্‌কে পাঠাব লিতে ..
৬। চাষ করিলে চাষার কি হবে ....
৭। চল্ না দাদা, কইল্‌কাতা যাব ....
৮। খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল . ..
৯। ঝাড়খন্ড্ রাজ্য হাম্‌দের অধিকাব .....
১০। সরকাবেই্ পদে নিবেদন ..

।। ১ ।।

দেখ্ না কত আনন্দ দুলে।
টুসু আইস্‌ছে গো মায়েব কোলে।।
গেল বৎসর আইল টুসু গেল যে চইখের জলে।
এবার আমায় টুসুমণি আইস্‌বে গো কোলাহলে।।
এ বৎসর ভাই ধান হয়েছে গান গা রে সবাই মিলে।
টুসুমণি—লক্ষ্মীমণি, দিয়েছে ভান্ডার খুইলে।।
যেখানে যে আছিস ভুখা, আয় সবে দলে দলে।
টুসুর গানে মইজ্‌ব সবে—এই কবি নিজাম বলে।।
(অভুক্ত)

(গানটির রচয়িতা ঃ সেখ নিজামউদ্দিন আনসারি। কেন্দা, পুরুলিয়া।)

দেখ্ না কত আনন্দ দুলে .....

।।	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	রা	সা	ণর্সা
	দেখ্	না	ক	ত	আ	ন০

I	-ণা	দা	-পা	দা	ণা	-া	I
	ন্	০	০	দু	লে	০	
I	পা	দা	ণা	র্সা	র্ঋা	র্জ্ঞা	I
	টু	সু	আস্	ছে	গো	মা	
I	-া	-া	র্জ্ঞর্মা	-া	-া	র্মা	I
	০	০	এ০	০	র	কো	
I	র্মর্জ্ঞা	-র্ঋর্সা	-ণা	-া	-া	-া	II
	লে০	০০	০	০	০	০	
II	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	-া	I
	গে	ল	বং	স	০	র্	
I	র্সাঃ	-র্জ্ঞঃ	র্জ্ঞা	র্রা	র্জ্ঞা	-া	I
	আ	ই	ল	টু	সু	০	
I	-া	-া	র্জ্ঞর্মা	র্পা	র্দা	র্পা	I
	০	০	গে০	ল	সে	চো	
I	র্মা	-র্জ্ঞা	র্ঋা	র্সা	-র্ঋর্সণা	-া	I
	খে	র্	জ	লে	০০০	০	
I	র্জ্ঞা	র্মা	র্জ্ঞা	-র্জ্ঞা	র্ঋর্জ্ঞর্ঋা	-র্সর্ঋা	I
	এ	বার্	আ	মার্	টু০০	০০	
I	র্সণা	ণর্সা	-ণা	দা	-পা	-দা	I
	সু০	ম০	০	নি	০	০	
I	ণা	র্সা	র্সা	র্সর্জ্ঞা	র্জ্ঞা	-া	I
	আস্	বে	গো	কো০	লা	০	
I	র্মা	র্জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	II
	হ	লে	০	০	০	০	

।।	ণা	সা	সা	র্সা	র্সজ্ঞা	।	।
	এ	বং	সব্	ভাই	ধা	ন্	
।	জ্ঞা	র্রা	জ্ঞা	-া	জ্ঞর্মা	-া	।
	হ	য়ে	ছে	০	গা০	ন্	
।	র্পা	র্মা	র্মজ্ঞা	-া	র্রা	-া	।
	গা	রে	স০	০	বে	০	
।	র্মা	জ্ঞা	-া	-া	-া	া	।
	মি	লে	০	০	০	০	
।	জ্ঞর্মা	র্মা	র্মা	র্মণা	ণর্মা	-া	।
	এ০	বং	সব্	ভাই	ধা	ন্	
।	র্মর্পা	র্দা	র্পা	-ার্ম	র্মা	-া	।
	হ০	য়ে	ছে	০	গা	ন্	
।	র্পা	র্মা	র্মজ্ঞা	-া	র্রা	-া	।
	গা	রে	স	০	বে	০	
।	র্মা	জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	।
	মি	লে	০	০	০ ·	০	
।	র্রা	জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্সণা	-া	।
	টু	সু	ধ	নি	ল	ক্	
।	র্সা	-ণা	-া	দা	পা	-দা	।
	খী	০	০	ম	ণি	০	
।	দণা	ণা	র্সা	র্সা	র্সজ্ঞা	-া	।
	দি০	য়ে	ছে	ভাণ্	ডা	র্	
।	র্মা	জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	।।
	খু	লে	০	০	০	০	

II	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্রা	র্জ্ঞা	র্মা	-া	I
	যে	খা	নে	যে	ভ	০	
I	র্পা	র্দা	র্পা	-র্মা	র্মা	-া	I
	খা	আ	ছি	স্	আ	য়্	
I	পা	র্মা	র্জ্ঞর্রা	-া	র্রা	-া	I
	স	বে	দ	০	লে	০	
I	র্মা	র্জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	I
	দ	লে	০	০	০	০	
I	র্রা	র্জ্ঞর্রা	র্সা	ণা	ণা	-া	I
	টু	সুর্	গা	নে	ম	জ্	
I	র্সণা	দা	পদা	ণা	ণা	র্সা	I
	ব০	স	বে০	এই	ক	বি	
I	র্সা	র্রা	-া	র্মা	র্জ্ঞা	-া	IIII
	নি	জা	ম্	ব	লে	০	

।। ২ ।।

হায় রে, আমার সাধের টুসুধন
মুখে চুম্ দিলে জুড়ায় জীবন।।
টুসু আমার খেলা করে ঢেলা মারে নব ঘন।
ভাইলে ভাইলে বেলা ক'রে রূপ দেইখে তার মন মগন।।
টুসু আমার বাজার বেড়ায় পরিধানে নীল বসন।
মিনি কাটিং ব্লাউজখানা বেশ মানাল হাল ফ্যাশন।।
টুসু আমার সিনান করে গায়ে মাখে ফুল-সাবন।
কাপড় কাচে মাথা ঘঁষে বাজে তার হাতের কাঁকন।।
টুসু মায়ের চরণ ধরে কাঁদে আকুল ত্রিলোচন।
বছর দিনেক পরে দেখা আছে বইলে এই জীবন।।

(গানটির রচয়িতা ঃ ত্রিলোচন বাউরি। পোদলাড়া, ছড়্রা, পুরুলিয়া।)

হায়রে আমার সাধের টুসু ধন...

II	র্রা	-া	র্মা	র্গা	র্রর্সা	-া	I
	হা	য়	রে	আ	মা০	র্	
I	র্সা	ণধা	-পা	মা	-গবগা	মা	I
	সা	ধে০	র্	টু	০০০	সু	
I	পা	-া	-া	-া	গা	মা	I
	ধ	০	০	ন্	মু	খে	
I	মপা	-া	ধা	ণা	র্সা	-র্রা	I
	চু	ম্	দি	লে	জু	০	
I	র্রর্সা	-া	ণা	ধণা	-ধপা	-া	II
	ড়া০	য়	জী	ব০	০০	ন্	
II	পা	-া	ধা	ধা	ধা	-া	I
	টু	০	সু	আ	মা	র্	
I	ধা	-নর্সা	র্সা	না	র্সা	-া	I
	খে	০০	লা	ক	রে	০	
I	র্সনা	-া	র্গা	র্মা	র্গর্মর্গা	-র্রা	I
	ঢে০	০	লা	মা	রে০০	০	
I	র্রর্সা	-া	ণা	ধণধা	পা	-া	I
	ন	০	ব	ঘ০০০	০	ন্	
I	পর্সা	-র্রর্গর্রা	-া	র্রনা	র্রা	-র্সা	
	ভা	ইলে০	০	ভাই	লে	০	
I	নর্সণা	-ধা	পমা	গা	মা	-া	
	বে০০	০	লা০	ক	রে	০	

	মপা	-া	ধা	ণা	র্সা	-র্র্সা	।
	ক্ল	প্	দে	খে	তা	০র্	
	র্সা	-া	ণা	ধা	-ধর্সণা	-পা	॥
	ম	ন্	ম	গ	০০০	ন্	
।	পা	ধা	ধা	ধা	-া	-া	॥
	টু	সু	আ	মা	০	ব্	
।	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	।
	খা০	০	জাব্	বে	ড়া	য্	
।	র্রা	-া	র্গা	র্মা	র্গর্মা	-র্গা	॥
	প	০	রি	ধা	নে০	০	
।	র্গর্রা	-র্সা	ণা	ধা	-ধণা	-ধপা	।
	নী০	ল্	ব	স	০০	০ন্	
।	র্সা	-া	র্রর্গর্রা	র্সনা	র্সা	-া	।
	মি	০	নি০০	কা০	টি	ং	
।	র্সণা	া	-ধপা	মগা	মা	-া	।
	ব্লা	০	উজ্	খা০	না	০	
।	মপা	-া	ধা	ণা	র্সর্রা	-র্সা	।
	বে	শ্	মা	না	লো০	০	
।	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণা	-ধপা	॥
	হা	ল্	ফ্যা	সা	০	০ন্	
॥	পা	-া	ধা	ধা	ধা	-া	।
	টু	০	সু	আ	মা	র্	
।	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	।
	সি০	০	নান্	ক	রে	০	

।	র্রা	-া	র্গা	র্মা	র্গা	-র্মর্গা	।
	গা	০	য়ে	মা	খে	০০	
।	গর্রা	-র্সা	ণা	ধা	-ণা	-ধপা	।
	ফু	ল্	সা	ব	০	০ন্	
।	র্সা	-া	-র্রর্গর্রা	না	র্সা	-া	।
	কা	০	প০ড্	কা	চে	০	
।	ণর্সণা	ধা	-পা	গা	মা	-া	।
	মা০০	থা	০	ঘঁ	ষে	০	
।	পা	-া	ধা	ণা	র্সা	-র্রর্সা	॥
	বা	০	জে	তার্	হা	০০	
।	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণধা	-পা	॥
	তে	র্	কাঁ	ক	০০	ন্	
।	পা	-া	ধা	ধা	ধা	-া	।
	টু	০	সু	মা	য়ে	র্	
।	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	।
	চ	০	রণ্	ধ	রে	০	
।	র্রা	-া	র্গা	র্গর্মা	র্গা	-া	।
	কাঁ	০	দে	আ০	কু	ল্	
।	র্রর্সা	-া	ণা	ধা	-ণধা	-পা	
	ত্রি০	০	লো	চ	০০	ন্	
।	র্সা	-া	র্রা	না	র্সা	-া	
	বা	০	ছর্	দি	নে	ক্	
।	ণর্সা	-ণা	ধপা	মগা	মা	-া	
	প০	০	রে০	দে০	খা	০	

I	পা	-া	ধা	ণা	সা	-রসা	I
	আ	০	ছে	বই	লে	০০	
I	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণধা	-র্পা	IIII
	এ	ই	জী	ব	০০	ন	

।। ৩।।

কংসাবতী মকর মেলাতে
সখি, পড়েছি লো ঠেলাতে।
কংসাবতী বৃহৎ অতি সুবিখ্যাত জেলাতে
দেখ্‌বি যদি, যাবি বৌদি মানভুম-পুরুল্যাতে।।
সব কিশোরী সারি সারি আসে যায় লো মেলাতে
কোলের টুসু জলে দিতে সঙ্গেতে চৌদোলাতে।।
উপর্ পুলে, নামর্ পুলে, মাঝের পুলে, তলাতে
নানা লীলায় রসের খেলায় মত্ত সবাই চলাতে।।
আঁচল ধরে টানাটানি মারামারি ঢেলাতে।
কত হরষ মধুর পরশ হারা-জিতার খেলাতে।।
ভবের মেলায় ভাবের লীলায় তেতাসেরই খেলাতে।
জীবন বলে-থাক্‌ইলে ভুলে, সব হারাবি শেষ বেলাতে।।

(গানটির রচয়িতা ঃ সেখ জীবন রোস্তম আনসারি। পড়াশ্যা, বলরামপুর, পুরুলিয়া।)

কংসাবতী মকর মেলাতে .....

II	র্সা	-া	র্জ্জা	র্রা	র্সা	-র্রর্সা	I
	ক	ং	সা	বা	তী	০০	
I	র্সণা	দা	-পা	মা	-জ্জরা	জ্জা	I
	ম০	ক	র্	মে	০০	লা	
I	মা	-া	-া	-া	রা	জ্জা	I
	তে	০	০	০	স	খি	
I	মা	-া	পা	দা	ণা	-র্সণা	I
	প	০	ড়ে	ছি	লো	০০	

।	ণা	-র্সণা	দা	পা	-দপা	-মা	॥
	ঠে	০০	লা	তে	০০	০	
-া -া ॥	মা	-া		পা	দা	মা	।
০ ০	ক	ং		সা	ব	তী	০
।	ণা	-া	ণাঃ	-ধঃ	ধা	ণা	।
	বৃ	০	হ	ৎ	অ	তি	
।	র্সা	-া	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	-র্জ্ঞর্রা	।
	সু	০	বি	খ্যা	ত	০০	
।	র্সা	-র্রর্সা	ণা	ণদা	-পা	-দপমা	।
	জে	০০	লা	তে০	০	০০০	
।	মণা	-া	র্সর্রর্সা	ণধা	ণা	-র্সণা	।
	দে	খ্	বি০০	য০	দি	০০	
।	দা	-ণদা	পগা	রা	জ্ঞা	-া	।
	যা	০০	বি০	বৌ	দি	০	
।	মা	-া	পা	দা	ণা	র্সা	।
	মা	ন্	ভূ	মে	পু	রু	
।	র্সণা	-া	ণদা	পা	-দপা	-মা	॥
	০	০	ল্যা	তে	০০	০	
-া -া ॥	মা	-া		দপা	পা	পা -া	।
০ ০	স	ব্		কি	শো	রী ০	
।	পণা	-া	ণা	ধা	ণা	-া	।
	সা০	০	রি	সা	রি	০	
।	ণর্সা	-া	র্রা	র্রর্সা	র্সা	-র্রর্সা	
	আ০ -	০	সে	যায়	লো	০০	

সৰ্ণা -া দা পা -দপা -মা ।
মে০ ০ লা তে ০০ ০

র্সা -া র্রর্সা ণধা ণা -া ।
কো ০ লের্ টু০ সু ০

ণদা -া পমা জ্ঞরা জ্ঞা -া ।
জ০ ০ লে০ দি০ তে ০

জ্ঞমা মা পা দা -ণা -র্সণা ।
সঙ্ গে তে চৌ ০ ০০

। ণা -র্সণা দা পা -দপা -মা ।।
দো ০০ লা তে ০০ ০

-া -া ।। মা পা -া পা পা -া।
০ ০ উ প র্ পু লে ০

। পণা -া ণা ধা ণা -া ।
ণা ০ মর্ পু লে ০

। র্সা -া র্রা র্সা র্সা -র্রর্সা ।
মা ০ ঝের্ পু লে ০০

। র্সণা -া দা পা -দপা -মা
ত০ ০ লা তে ০০ ০

। মণা -া র্সা ণধা ণা -র্সণা
না ০ না লী০ লা ০য়্

। র্সদা -া -পমা জ্ঞরা জ্ঞা -া
ব০ ০ সের্ খে০ লা য়্

। জ্ঞমা -া পা দা ণা -র্সণা
ম ত ত স বা ০ই

I	ণা	-র্সণা	দা	পা	-দপা	-মা	II
	চ	০০	লা	তে	০০	০	
-া -া মা II	-া	-পা		পা	পা	-া	I
০ ০ আঁ	০	চল্		ধ	রে	০	
I	পণা	-া	ণা	ধা	ণা	-া	I
	টা	০	না	টা	নি	০	
I	ণর্সা	-া	র্র্র	র্সা	র্সা	-র্র্সা	I
	মা০	০	রা০	মা	রি	০০	
I	ণা	-া	ধা	পা	-দপা	-মা	I
	ঢে	০	লা	তে	০০	০	
I	ণা	-া	র্সা	ণধা	ণা	-া	I
	ক	০	ত	হ০	র	ষ্	
I	ণদা	-া	-পমা	জ্ঞরা	জ্ঞ	-াম	I
	ম০	০	ধুর্	প০	র	শ্	
I	মা	-া	পা	দা	ণা	-র্সণা	I
	হা	০	রা	জি	তা	০র্	
I	ণা	-র্সণা	দা	পা	-দপা	-মা	II
	খে	০০	লা	তে	০০	০	
II	-া	-া	মা	পা	পা	-া	I
	০	০	ভ	বের্	মে	লায়্	
I	পণা	-া	ণা	ণা	ণা	-া	I
	ভা০	০	বের্	লী	লা	য়্	
I	র্সা	-া	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	-র্জ্ঞর্রা	I
	তে	০	তা	সে	রি	০০	

I	র্র্সা	-র্র্সা	ণা	দা	-পদা	-পমা	I
	খে	০০	লা	তে	০০	০০	
I	ণা	-া	র্সা	ধা	ণা	-া	I
	জী	০	বন্	ব	লে	০	
I	দণা	-দা	পমা	রা	জ্ঞা	জ্ঞা	I
	থা০	ক্	লে০	ভুই	লে	সব্	
I	মা	-া	পা	দা	-ণা	-র্সণা	I
	হা	রা	বি	শে	০	০ষ্	
I	ণা	-র্সণা	দা	পা	-দপা	-মা	IIII
	বে	০০	লা	তে	০০	০	

।। ৪ ।।

যাবার সময় মন কেমন করে।
বিহা দিলি মা অনেক দূরে।।
বাবার দুলালী আমি যাব গো শ্বশুর ঘরে।
এই পাড়া-পড়শী কত মনেতে দুঃখ করে।।
দাদা বলে বিদায়—মাগো, বাবা কাঁদে গুমুরে।
মায়ের দিকে চাইয়ে দেখি সদা দু'নয়ন ঝরে।।
তোর কোলে খেলেছি মাগো কত জ্বালাতন কইরে।
আজ তুমাকে ছাইড়ে দিয়ে যাব গো পরের ঘরে।।
জগদীশে বলে, মাগো, বইল্‌ব আমি কী করে?
মায়ের বেদন মায়ে জানে ঘুণ লাইগে যায় পাঁজরে।

(গানটির রচয়িতাঃ জগদীশ মাহাত। রাঙ্গামেট্যা, ভাউরিডি, পুরুলিয়া।)

যাবার সময় মন কেমন করে.......

I	ণা	ণা	-র্সর্ঋর্সা	নধা	-ণা	-ধণা
	যা	বা	০০র	স০	ম	০য়

I ণা -দা পা মজ্ঞা -রা জ্ঞা I
ম ন্ কে ম০ ন্ ক

I মা -া -া -া রা জ্ঞা I
রে ০ ০ ০ বি হা

I জ্ঞমা -া পা ধা ণা -র্সা I
দি ০ লি মা অ ০

I র্সণা -া ধা পা -দপা -মা II
নে০ ক্ দূ রে ০০ ০

মা পা পা পা II ণা -া ণা ধা ণা -া I
বা বা র দু লা ০ লী আ মি ০

I র্সা -া র্ঋা র্সা ণা -া I
যা ০ বো গো শ্ব ০

I ণা -া ধা পা -দপা -মা I
শু র্ ঘ রে ০০ ০

I ণা -া র্সা -ণা -ধা পা I
এ ই পা ড়া ০ প

I মা -া পমা জ্ঞা রা -জ্ঞা I
ড় ০ শী০ ক ত ০

I জ্ঞমা -া প দা ণা -র্সণা I
ম০ ০ নে তে দু ০০

I র্সণা -া দা পা -দপা -মা II
খ ০ ক রে ০০ ০

মা পা পা পা II পণা -া ধা ণা -া I
দা দা ব লে বি০ ০ দায় মা গো

। র্সা -া র্রা র্সা র্সা -া ।
বা ০ বা কাঁ দে ০

। ণা -া ধা পা -দপা -মা ।
গু ০ মু রে ০০ ০

। ণা -া র্সা ণা ণা ধা ।
মা ০ এর্ দি কে ০

। পাঃ -মঃ পমা জ্ঞা রা -জ্ঞা ।
চা ই য়ে০ দে খি ০

। জ্ঞমা -া পা দা ণা -র্সণা ।
স০ ০ দা দু ন ০০

। ণা -া দা পা -দপা -মা ॥
য় ন্ ঝ রে ০০ ০

মা পা পা পা ॥ পণা -া ণা ধা ণা -া ।
তোর্ কো লে খে লে ০ ছি মা গো ০

। র্সা -া র্ঋা র্সা ণা -া ।
ক ০ ত জ্বা লা ০

। ণা -া দা পা -দপা -মা ।
ত ন্ কই রে ০০ ০

। ণা -া র্সা ধা ণা -ধা ।
আ জ্ তু মা কে ০

। পাঃ -মঃ পমা জ্ঞা রাঃ -জ্ঞঃ ।
ছা ই ড়ে০ দি য়ে ০

। মা -া পা দা ণা -র্সণা ।
যা ০ ব গো প ০০

।	ণা	-া	দা	পা	-দপা	-মা	।।
	রে	র্	ঘ	রে	০০	০	

মা	পা	পা	পা	।।	পণা	-া	ণা	ধা	ণা	-া	।
জ	গ	দী	শে		ব	০	লে	মা	গো	০	

।	র্সা	-া	র্রা	র্সা	র্সা	-ণা	।
	ব	ইল্	ব	আ	মি	০	
।	ণা	-া	ধা	পা	-দপা	-মা	।
	কী	০	ক	রে	০০	০	
।	-া	-া	মণা	র্সা	ণা	ধা	।
	০	০	মা	এর্	বে	দন্	
।	ধপা	-মা	পমা	রা	জ্ঞা	-া	।
	মা০	০	য়ে০	জা	নে	০	
।	।	-া	জ্ঞমা	মা	পা	পা	।
			ঘুণ্	লাই	গে	যায়্	
।	ধা	-া	র্সা	ণা	-া	-া	।।।।
	পাঁ	০	জ	রে	০	০	

।। ৫ ।।

টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে।
পিঠা কইরে আঘন্ সাঁক্‌রাতে।।
টুসু আমার একলা বাছা গেছে শ্বশুর ঘরেতে।
ধইয ধইর্‌তে লারি—পারি না আর থাকিতে।।
টুসুর বিহা দিয়েছি মা দুরন্ দেশ কইল্‌কাতাতে।
একটি বছর পরে টুসু আইস্‌বে বাপের ঘরেতে—
খেল্‌না কিনে দিইব আর আঁঙ্‌টি চুড়ি দু'হাতে।।
টুসু মাকে লিয়ে যাব মারাফরি দেখাতে।
বিদায় কইরে পোষের শেষে পাঠাবে ত্রিলোচনেতে।।

(গানটির রচয়িতা ঃ ত্রিলোচন বাউরি। পোদলাড়া, ছড়রা, পুরুলিয়া।)

টুসুর বাপকে পাঠাব লিতে .....

II ণধা ধা -ণধা পা পা -ধপা I
টু০ সু ০র্ বাপ্ কে ০০

I মা মা -পমা জ্ঞা -রা জ্ঞা I
পা ঠা ০০ ব ০ লি

I মা -া -া -া রা জ্ঞা I
তে ০ ০ ০ পি ঠা

I জ্ঞমা মা পা পা -া -া I
কই রে আ ঘ ০ ন্

I ধা -া র্সা ণা -া -া II
সাঁ ক্ রা তে ০ ০

-া -া -া II । মণা র্সা র্সা র্সা -া I
০ ০ ০ টু সু আ মা র্

I র্সা -া র্রা র্জ্ঞা র্রা -র্সা I
এ ক্ লা বা ছা ০

I র্সা র্সর্রা ণা ধপা -া -া I
গে ছে০ শ্ব শু০ ০ র্

I ধা র্সা ণা -া -া -া I
ঘ রে তে ০ ০ ০

I ধা ধা -ণধা পা -মা পমা I
ধইর্ য ০০ ধই র্ তে০

I জ্ঞরা জ্ঞা -া মা মা পা I
লা০ রি ০ পা রি না

I	পা	-া	-া	ধা	র্সা	ণা	I
	আ	০	র্	থা	কি	তে	
I	-া	-া	-া	-া	-া	-া	II
	০	০	০	০	০	০	
II	।	মণা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
		টু	সু	আ	মা	র্	
I	র্সা	-া	র্রা	র্জ্জা	র্রা	-র্সা	I
	এ	ক্	লা	বা	ছা	০	
I	র্সা	র্সর্রা	ণা	ধপা	-া	-া	I
	গে	ছে	শ্ব	শু০	০	র্	
I	ধা	র্সা	ণা	-া	-া	-া	I
	ঘ	রে	তে	০	০	০	
I	ধা	ধা	-ণধা	পা	-মা	পমা	I
	ধইর্	য	০০	ধই	র্	তে০	
I	জ্ঞরা	জ্ঞা	-া	মা	মা	পা	I
	লা০	রি	০	পা	রি	না	
I	পা	-া	-া	ধা	র্সা	ণা	I
	আ	০	র্	থা	কি	তে	
I	-া	-া	-া	-া	-া	-া	I
	০	০	০	০	০	০	
I	মণা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	-া	I
	টু	সুর্	বি	হা	০	০	
I	র্সা	র্রা	র্জ্জা	র্রর্সা	-া	-া	I
	দি	য়ে	ছি	মা০	০	০	

I	র্সা	র্রর্সা	-া	ণা	-ধপা	-া	I
	দু	র০	ন্	দে	০০	শ্	
I	পা	-া	-া	ধা	র্সা	ণা	I
	ক	০	ইল্	কা	তা	তে	
I	-া	-া	-া	ধা	ধা	-ণধা	I
	০	০	০	এক্	টি	০০	
I	পা	পা	-ধপা	পমা	মা	-পমা	I
	ব	ছ	০র্	প০	রে	০০	
I	রা	জ্ঞা	-া	জ্ঞমা	মা	-া	I
	টু	সু	০	আইস্	বে	০	
I	পা	পা	-া	ধা	-া	র্সা	I
	বা	পে	র্	ঘ	০	রে	
I	ণা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	তে	০	০	০	০	০	
I	ধা	ধা	-ণধা	পা	পা	-ধপা	:
	খেল্	না	০০	কি	নে	০০	
I	মা	পমা	-া	জ্ঞা	-র্রা	-জ্ঞা	I
	দিই	ব০	০	আ	০	র্	
I	মা	মা	পা	পা	-া	-া	I
	আঁং	টি	চু	ড়ি	০	০	
I	ধা	-া	র্সা	ণা	-া	-া	I
	দু	০	হা	তে	০	০	
I	ণধা	ধা	-ণধা	পা	পা	-ধপা	I
	এক্	টি	০০	ব	ছ	০র্	

I	পমা	মা	-পমা	রা	জ্ঞা	-া	I
	পo	রে	oo	টু	সু	o	
I	জ্ঞমা	মা	-া	পা	পা	-া	I
	আইস্	বে	o	বা	পে	র্	
I	ধা	-া	র্সা	ণা	-া	-া	I
	ঘ	o	রে	তে	o	o	
I	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	-া	I
	টু	সু	মা	কে	o	o	
I	র্সা	র্রা	র্জ্ঞা	র্রর্সা	-া	-া	I
	লি	য়ে	যা	বo	o	o	
I	র্সা	র্রর্সা	-া	ণা	ধপা	।	I
	মা	রাo	o	ফ	রিo	o	
I	ধা	র্সা	ণা	-া	-া	-া	I
	দে	খা	তে	o	o	o	
I	ণধা	ধা	-ণধা	ধপা	পা	-দপা	I
	বিo	দা	oয়্	কই	রে	oo	
I	মা	মা	-পমা	রা	জ্ঞা	-া	I
	পো	ষে	oর্	শে	যে	o	
I	মা	মা	মা	পা	পা	-া	I
	পা	ঠা	বে	ত্রি	লো	o	
I	ধা	।	র্সা	ণা	-া	-া	IIII
	চ	o	নে	তে	o	o	

॥ ৬ ॥

চাষ করিলে চাষার কী হবে!
ক্ষেতে ধান নাইরে কী খাবে!!
গরুকে গোব্‌রা ভেবে সন্ধ্যা হলেও না ছাড়ে।
দু'দিন পরে রুয়া ক্ষেতে মাটি ফাটে হাঁ-করে!
নিয়মকানন না-মানিলে বুঝাতে পারে কন্‌ সালে।
অন্নশূন্যা ঘর দেখে কেঁদে কেঁদে বুক জ্বলে।।
ঘরের মধ্যে বাগন্‌ বাড়ি কর সর্ব জন মিলে।
দু'দিন পরে অন্নকষ্ট সবেই যে যাবে চলে।।
চাষেই অন্ন চাষেই বসন চাষেতেই পালন করে।
চাষের সমান নাই তুলনা খেতে পাবে পেট ভরে।।
কালীপদর মুখে বুলি চাষী ভাইয়ে সব জানি।
দারুণ খরাতে দ্যাখ হিরোদাদার ফুটানি।।

(বেগুন ক্ষেত)

(গানটির রচয়িতা ঃ কালীপদ মাহাত। নারানপুর, ঠুট্‌কুবাইদ, পুরুলিয়া।)

চাষ করিলে চাষার কী হবে .....

॥	র্সা	-া	র্রা	র্সা	নর্সা	-না	I
	চা	ষ্	ক	রি	লে০	০	
I	ধা	পধা	-পা	মা	-গা	মা	I
	চা	ষা০	র্	কী	০	হ্	
I	পা	-া	-া	-া	গা	মা	I
	বে	০	০	০	ক্ষে	তে	
I	মপা	পধা	ণা	র্সর্রার্স	র্সা	-র্রর্সা	I
	ধান্	নাই	রে	ভাই	কী	০০	
I	ণা	ধা	-ণধা	-পা	-া	-া	॥
	খা	বে	০০	০	০	০	

II	-া	-া	পা	ধা	ধা	-া	I
	০	০	গ	রু	কে	০	
I	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	I
	গো	ব্	রা	ভে	বে	০	
I	র্রা	র্জ্জা	র্রা	র্সা	র্সা	-া	I
	সন্	ধ্যা	হ	লেও	না	ই	
I	ণা	ধা	-ণধা	-ধা	-পা	-া	I
	ছা	ড়ে	০০	০	০	০	
I	পর্সা	-া	র্সর্রা	না	র্সা	-া	I
	দু	০	দিন্	প	রে	০	
I	র্সণা	-া	ধপা	গা	মা	-া	I
	রু০	০	য়া০	ক্ষে	তে	০	
I	পা	-া	ধা	ণা	র্সা	-র্রর্সা	I
	মা	০	টি	ফা	টে	০০	
I	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণধা	-পা	II
	হাঁ	০	ক	রে	০০	০	
II	-া	-া	পা	ধা	ধা	ধা	I
	০	০	নি	য়ম্	কা	নন্	
I	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	
	না	০	মা	নি	লে	০	
I	র্রা	র্জ্জা	র্রা	র্সা	র্সা	র্সা	
	বু	ঝা	তে	পা	রে	ক	
I	-া	র্সা	ণা	-র্সণা	-ধা	-পা	
	ন	সা	লে	০০	০	০	

।	-া	-া	পর্সা	র্রা	না	র্সা	।
	০	০	অন্	ন	শূন্	ন্যা	
।	র্সণা	-ধা	-পমা	গা	মা	-া	।
	ঘ০	০	০র্	দে	খে	০	
।	মপা	ধা	ণা	র্সা	র্সা	র্রর্সা	।
	কেঁ	দে	কেঁ	দে	বু	০ক্	
।	না	র্সা	-া	-া	-া	-া	॥
	জ্ব	লে	০	০	০	০	
॥	-া	-া	পা	ধা	ধা	ধা	।
	০	০	ঘ	রের্	ম	ধ্যে	
।	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	।
	বা	০	গন্	বা	ড়ী	০	
।	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্সা	-া	।
	ক	র	সর্	ব	জ	ন্	
।	ণা	ধা	-ণধা	-পা	-া	-া	।
	মি	লে	০০	০	০	০	
।	র্সা	র্রা	র্সা	না	ধা	-পা	।
	দু	দিন	প	রে	অ	ন্	
।	ধপা	মা	গা	-মা	-া	-া	।
	ন০	কষ্	ট	০	০	০	
।	মপা	ধা	ণা	র্সা	র্সা	-া	।
	স	বেই	যে	যা	বে	০	
।	র্রা	র্সা	-া	-া	-া	-া	।
	চ	লে	০	০	০	০	

	-া	-া	পা	ধা	ধা	ধা	I
	০	০	চা	যেই	অন্	ন	
	ধর্সা	র্সা	-া	না	র্সা	-া	I
	চা	যে	ই	•ব	স	ন্	
	র্সা	র্রা	র্সা	-নর্সনা	ধা	-পা	I
	চা	যে	তে	০০ই	পা	০	
	ধপা	মা	গা	-মা	-া	-া	I
	লন্	ক	রে	০	০	০	
	মপা	-া	ধা	ধা	ধা	-া	I
	চা	০	যের্	স	মা	ন্	
	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	I
	না০	ই	তু	ল	না	০	
	র্রা	-া	র্জ্জা	র্রা	র্সা	-া	I
	খে	০	তে	পা	বে	০	
I	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণধা	-পা	II
	পে	ট্	ভ	রে	০০	০	
II	-া	-া	পা	ধা	ধা	ধা	I
	০	০	কা	লী	প	দর্	
I	র্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	I
	মু	০	খে	বু	লি	০	
I	-া	-া	র্রা	র্জ্জা	র্রা	র্সা	I
	০	০	চা	ষী	ভাই	য়ে	
I	র্সা	-া	ণা	ধা	-ণধা	-পা	I
	স	ব	জা	নি	০০	০	

I	-া	-া	পর্সা	র্রা	র্সা	র্সা	
	০	০	দা	রুণ্	খ	রা	
I	র্সা	-া	-না	ধা	-া	-পা	
	তে	০	০	দ্যা	০	খ	
I	পা	ধা	না	র্সর্রা	র্রর্সা	-া	
	হি	রো	দা	দার্	ফু	০	
I	না	ধা	-ণধা	-পা	-া	-া	IIII
	টা	নি	০০	০	০	০	

॥ ৭ ॥

চল্ না দাদা, কইল্‌কাতা যাব।
তলের ট্রেন-চালা দেইখে লিব॥
হাওড়ার বিরিজ্, চিড়িয়াখানা সব কিছু দেইখে লিব।
পাতালেতে ট্রেন চলিছে পাক দিয়ে ঘুইরে লিব॥
দম্‌দমের ঐ উড়াকলে কন্ দিকে চইলে যাব।
গঙ্গার জলে নৌকা চলে নৌকাতে চাইপে লিব॥
নৌকা ধইরে সাঁতার দিয়ে গঙ্গানদী পার হব।
লোকে বলে চইদ্দতলা ঘর আছে দেখে লিব—
কৃত্তিবাসে বলে শেষে রায় হোটেলে ভাত খাব॥

(গানটির রচয়িতা ঃ কৃত্তিবাস কর্মকার। গোবিন্দপুর, পুরুলিয়া।)

চল্‌না দাদা কইলকাতা যাব .....

জ্ঞা II	র্মা	জ্ঞা	র্রা	র্রর্সা	-া	র্সণা
চল্	না	দা	দা	কই	ল্	কা০
I	দা	-পা	দা	ণা	-া	-া
	তা	০	যা	ব	০	০
I	-া	-া	-া	-া	-া	পা
	০	০	০	০	০	ত

I	দা	দণা	ণা	সা	-া	সা	I
	লের্	ট্রেন্	চ	লা	০	দে	
I	র্রা	-া	র্মা	জ্ঞা	-া	-া	I
	খে	০	লি	ব	০	০	
I	-া	-া	-া	-া	-া	"জ্ঞা"	II
	০	০	০	০	০	চল্	
ণজ্ঞা II	র্মা	র্মা	র্মা	র্মা	র্মা	র্পা	I
হাও	ড়ার্	বি	রিজ্	চি	ড়ি	য়া	
I	র্পর্দা	র্পর্মা	-া	র্মর্পা	র্মা	জ্ঞর্রর্সা	I
	খা০	না০	০	সব্	কি	ছু০০	
I	র্সা	র্রা	র্মা	জ্ঞা	-া	-া	I
	দেই	খে	লি	ব	০	০	
I	-া	-া	-া	-া	-া	জ্ঞর্রা	I
	০	০	০	০	০	পা	
I	জ্ঞর্রা	র্সা	র্সা	র্সণা	-া	র্সণা	I
	তা০	লে	তে	ট্রে০	ন	চ০	
I	দা	পা	-দা	।	।	দণা	I
	লি	ছে	০			পাক্	
I	ণা	ণর্সা	র্সা	র্রা	-া	র্মা	I
	দি	য়ে০	ঘুই	রে	০	লি	
I	জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	ব	০	০	০	০	০	
I	-া	-া	"জ্ঞা" II				
	০	০	চল্				

র্জ্ঞা ।।	র্মা	র্মা	র্মা	র্মা	-া	র্পা	।
দম্	দ	মের্	ঐ	উ	০	ড়া	
।	র্দা	র্দর্পর্মা	-া	র্মা	-র্পর্মা	র্মা	।
	ক	লে০	০	ক	০ন্	দি	
।	র্জ্ঞর্রা	-র্সা	র্সর্রর্সা	র্রা	-া	র্মা	।
	কে০	০	চই	লে	০	যা	
।	র্জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	-া	।
	ব	০	০	০	০	০	
।	-া	-া	র্জ্ঞর্রা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	।
	০	০	গঙ্	গার্	জ	লে	
।	র্সণা	-া	র্সণা	দা	পা	-দা	।
	নৌ০	০	কা০	চ	লে	০	
।	।	।	ণা	ণা	র্সা	র্সা	।
			নৌ	কা	তে	চাই	
।	র্রা	-া	র্মা	র্জ্ঞা	-া	-া	।
	পে	০	লি	ব	০	০	
।	-া	-া	-া	-া	-া	"র্জ্ঞা"	।।
	০	০	০	০	০	চল্	
ণর্জ্ঞা ।।	র্মা	র্মা	র্মা	র্মা	-া	র্পা	।
নৌ	কা	ধই	রে	সাঁ	০	তার্	
।	র্দা	র্দর্পর্মা	-া	র্মা	-র্পর্মা	র্জ্ঞা	।
	দি	য়ে০	০	গ	০ঙ্	গা	
।	র্রা	র্রা	-র্সা	র্সর্রা	-া	র্মা	।
	ন	দী	০	পা০	র	হ	

I	র্জা	-া	-া	-া	-া	র্রা
	ব	০	০	০	০	লো
I	র্জর্রা	র্সা	র্রর্সা	র্সা	-ণা	র্সণা
	কে০	ব	লে০	চ	ইদ্	দ০
I	দা	পা	-দা	।	।	দণা
	ত	লা	০			ঘর্
I	ণা	র্সা	র্সা	র্রা	-া	র্মা
	আ	ছে	দে	খে	০	লি
I	র্জা	-া	-া	-া	-া	-া
	ব	০	০	০	০	০
I	-া	-া	"র্জা" II			
	০	০	চল্			
ণর্জা II	র্মা	র্মা	র্মা	র্মা	-া	র্পা
লো	কে	ব	লে	চ	ইদ্	দ
I	র্দা	র্দর্পর্মা	-া	র্মর্পা	র্মা	র্জা
	ত	লা০	০	ঘর্	আ	ছে
I	-র্রা	-র্সা	র্সা	র্রা	-া	র্মা
	০	০	দে	খে	০	লি
I	র্জা	-া	-া	-া	-া	র্রা
	ব	০	০	০	০	কৃত্
I	র্জর্রা	র্সা	র্রর্সা	র্সণা	-া	র্সণা
	তি	বা	সে০	ব০	০	লে০
I	দা	পা	-দা	।	।	দণা
	শে	ষে	০			রায়

I	ণা	র্সা	র্সা	র্রা	-া	র্মা
	হো	টে	লে	ভা	ত্	খা
I	র্জ্ঞা	-া	-া	-া	-া	-া
	ব	০	০	০	০	০
I	-া	-া	"র্জ্ঞা" II			
	০	০	চল্			

|| ৮ ||

খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল—
মানুষ বাঁচার হবে কি হাল!
দুধে ভেজাল, তেলে ভেজাল, জলেতে হলো ভেজাল।
জিনিসপত্রের মূল্য বাড়ি' হইল আকাশ পাতাল।।
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল—
এভাবে চলিলে দেশ—যাবে চলি' পরকাল।
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী রয়ে যাবে চিরকাল।।
খাবারে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল—
সরকারের পদে নিবেদন করি আজিকাল।
শাসন বিভাগ নিদ্রা যায় কি, খেয়ে বাদশাহী চাল?
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল—
ভেজালদারী ব্যবসায়ী ভাব বসি' ক্ষণকাল।
কর্ম্মফলের অপরাধ খন্ডাবে না মহাকাল।।
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল—

(গানটির রচয়িতা : রাধানাথ মাহাত। ঢুঁড়্কু, পুরুলিয়া।)

খাবার ভেজাল ওষুধে ভেজাল...

			র্সা	র্রা	র্সা	না	I
			খা	বার্	ভে	জাল্	
II	ধা	পা	-ধপা	মা	-গা	মা	I
	ও	ষু	০০	ধে	০	ভে	

পা	-া	-া	-া	গা	মা	I
জা	০	০	ল্	মা	নুষ	
পা	ধা	না	র্সা	র্রা	-র্গরা	I
বাঁ	চার্	হ্	বে	কি	০০	
র্সা	-া	-না	-ধা	-ণা	-ধা	I
হা	০	০	০	০	০	
পা	-া	র্সা	র্রা	র্সা	না	I
০	ল্	খা	বার্	ভে	জাল্	
ধা	পা	-ধপা	মা	-গা	মা	I
ও	যু	০০	ধে	০	ভে	
পা	-া	পা	ধা	ধা	ধা	I
জা	ল্	দু	ধে	ভে	জাল্	
ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	I
তে০	০	লে	ভে	জা	ল্	
র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	র্রা	-র্জ্ঞর্রা	I
জ	লে	তে	হ্	লো	০০	
র্সা	ধা	-ণধা	-ধপা	-া	-া	I
ভে	জা	০০	০০	০	০	
-া	-া	র্সা	র্রা	র্সা	-না	I
০	ল্	জি	নিস্	পত্	ত্রের্	
ধাঃ	-পঃ	ধা	মা	গা	-মা	I
মু	ল্	ল	বা	ড়ি	০	
পা	-া	ধা	না	র্সা	-া	I
হ	ই	ল	আ	কা	শ	

I	র্রা	র্সা	-া	-া	-া	-া	I
	পা	তা	০	০	০	০	
I	-া	-া	র্সা	র্রা	র্সা	না	I
	০	ল্	খা	বার্	ভে	জাল্	
I	ধা	পা	-মপা	মা	-গা	মা	I
	ও	সু	০০	ধে	০	ভে	
I	পা	-া	পা	ধা	ধা	ধা	I
	জা	ল্	এ	ভা	বে	চ	
I	র্সা	-া	র্সা	না	-র্সা	-া	I
	লি	০	লে	দে	০	শ্	
I	র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	র্রা	-র্সা	I
	যা	বে	চ	লি	প	০	
I	না	ধা	-পধা	-া	-া	-পা	I
	র	কা	০০	০	০	ল্	
I	র্সা	র্রা	র্সা	না	ধা	পা	I
	দুর্	ভিখ্	খ	ও	ম	হা	I
I	-ধপা	মা	গা	-মা	পা	পা	I
	০০	মা	রী	০	র	য়ে	
I	ধা	র্সা	র্সা	-া	র্রা	র্সা	I
	যা	বে	চি	০	র	কা	
I	-া	-া	র্সা	র্রা	র্সা	না	I
	০	ল্	খা	বার	ভে	জাল্	
I	ধা	পা	-ধপা	মা	-গা	মা	I
	ও	সু	০০	ধে	০	ভে	

।	পা	-া	পা	ধা	ধা	ধ	।
	জা	ল্	সর্	কা	রেব্	প	
।	ধা	-া	ধা	না	ধা	-া	।
	দে	০	নি	বে	দ	০	
।	-র্সা	-া	র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	।
	০	ন্	ক	রি	আ	জি	
।	র্রা	-র্সা	-না	-ধা	-ণা	-ধা	।
	কা	০	০	০	০	০	
।	পা	-া	র্সা	র্রা	র্সা	না	।
	০	ল্	শা	সন্	বি	ভাগ্	
।	নধা	-পা	ধপা	মা	-গা	মা	।
	নি০	০	দ্রা০	যা	য়	কি	
।	পা	ধা	না	র্সর্রা	র্সা	-না	।
	খে	য়ে	বাদ্	শা০	হী	০	
।	ধা	-ণধপা	র্সা	র্ণা	র্সা	না	।
	চা	০০ল্	খা	বার্	ভে	জাল্	
।	ধা	পা	-ধপা	মা	-গা	মা	।
	ও	যু	০০	ধে	০	ভে	
।	পা	-া	পা	-ধা	ধা	ধা	।
	জা	ল্	ভে	জাল্	দা	রী	
।	ধর্সা	-া	র্সা	না	র্সা	-া	।
	ব্যা০	০	ব	সা	য়ী	০	
।	র্রা	র্গা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা	।
	ভা	ব	ব	সি	ক্ষ	ণ	

I	-না	ধা	-ণা	-ধা	-পা	-া	I
	০	কা	০	০	০	ল্	
I	র্সা	র্রা	র্সা	না	ধা	-পা	I
	কর্	ম	ফ	লের্	অ	০	
I	ধা	মা	-পা	পা	ধা	ধা	I
	প	রা	ধ্	খণ্	ডা	বে	
I	র্সা	র্সা	-া	র্রা	র্সা	-া	I
	না	ম	০	হা	কা	০	
I	-া	-া	র্সা	-র্রা	র্সা	না	I
	০	ল্	খা	বার্	ভে	জাল্	
I	ধা	পা	-ধপা	মা	-গা	মা	I
	ও	বু	০০	ধে	০	ভে	
I	পা	-া	-া	-া	-া	-া	IIII
	জা	০	০	০	০	ল্	

।। ৯ ।।

ঝাড়খণ্ড্ রাজ্য হাম্দের অধিকার—
অ ভাই কথাটা অনিলদাদার।
এই মাটিতে জন্ম মোদের এই মাটি যে মা আমার।
এই মাটিকে রক্ষা করার হাম্রা হলি দাবিদার।।
বনকাটি[১] বস্‌কইতা[২] বঠি[৩], লই হে বড় জমিদার।
বাপের জমি রক্ষা কইর্‌তে ধর সবাই হাতিয়ার।।
কাঁধেতে লাও তীর ধনুক, হাথে ধর তলোয়ার।
টাঙ্গি-বল্লম-ফার্সা লিয়ে ঘুরাও ইবার অধিকার।।
ঝাড়খন্ড্ রাজ্য অলগ্[৪] কইর্‌ব—না আশা জীবনটার।
শোষকেরা আগাঞ আসুক দেইখ্‌ব সাহস কেমন কার।।
লিবই লিব ঝাড়খন্ড্ রাজ্য কইর্‌ব রে ঝাড়খন্ড্ সনার[৫]।
কিরীটী খুড়া বলে, দুলাল—থাকে না কন ভাবার।।

পাদটীকা ঃ
(১- বন কর্তন ক'রে অর্থাৎ পরিষ্কার ক'রে
২- বসবাসকারী ৩- হই ৪-আলাদা ৫- সোনার।)

(গানটির রচয়িতা ঃ কিরীটী মাহাত। কালুহার, পুরুলিয়া।)

ঝাড়খণ্ড রাজ্য হামদের অধিকার ......

II	র্সা	র্জ্ঞা	র্রা	র্রর্সা	র্সা	-র্রর্সা	।
	ঝাড়্	খণ্	ড	রাজ্	জ	০০	
।	র্সা	ণা	-ধপা	-মা	গা	মা	।
	হাম্	দে	০০	র্	অ	ধি	
	পা	-া	-া	-া	গা	মা	।
	কা	০	০	র্	অ	ভাই	
	পা	পা	পধা	-া	-া	ধা	।
	ক	থা	টা	০	০	অ	
	না	-া	র্রা	র্সা	-া	-া	।
	নি	ল্	দা	দা	০	র্	
	র্সা	-া	র্রা	র্রা	রা	-া	।
	এ	ই	মা	টি	তে	০	
	র্রা	-া	র্গা	র্মা	র্গা	-র্রা	।
	জ	ন্	ম	মো	দে	র্	
	র্রা	-র্গর্রা	র্রা	র্সা	নধা	-া	।
	এ	০ই	মা	টি	যে০	০	
	না	-া	র্রা	র্সা	-া	-া	।
	মা	০	আ	মা	০	র্	

I	র্সনা	না	-র্সনা	ধা	ধা	-ণধা	I
	এই	মা	০০	টি	কে	০০	
I	ধপা	পা	-ধপা	মা	গা	-মা	I
	রথ্	খ্যা	০০	ক	রা	র্	
I	মপা	পা	-া	ধা	ধা	-া	I
	হাম্	য়া	০	হ	লি	০	
I	ধনা	-া	র্রা	র্সা	-া	-া	II
	দা	০	বি	দা	০	র্	
II	র্সর্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	-া	I
	বন্	কা	টি	বস্	ক	ই	
I	র্গা	র্মা	র্গাঃ	-র্রঃ	র্রা	-র্গর্রা	I
	তা	ব	ঠি	০	ল	০ই	
I	র্সা	-নর্সা	নর্সা	নধা	না	র্রা	I
	হে	০০	ব০	ড়০	জ	মি	
I	র্সনা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	দা০	০	০	০	০	র্	
I	না	না	-র্সনা	ধা	ধা	-ণধা	I
	বা	পে	০র্	জ	মি	০০	
I	ধপা	পা	-ধপা	মা	গা	-মা	I
	রথ্	খ্যা	০০	কইর্	তে	০	
I	পা	পা	পধা	ধা	-া	-া	I
	ধ	র	স	বা	০	ই	
I	না	-া	র্রা	র্সা	-া	-া	II
	হা	০	তি	য়া	০	র্	

।	পর্সা	সা	র্রা	র্রা	-া	-া	।
	কাঁ	ধে	তে	লা	০	ও	
।	র্রা	-া	র্গা	র্মা	র্গর্রা	-া	।
	তী	র্	ধ	নু	০০	ক্	
।	র্বা	র্গর্রা	র্সা	নর্ধা	-া	-া	।
	হা	থে০	ধ	ব০	০	০	
।	না	-া	র্রা	র্সা	-া	-া	।
	ত	০	লো	য়া	০	ন্	
।	র্সনা	না	-র্সনা	নধা	ধা	-ধপা	।
	টাঙ্	গি	০০	বল্	ল	০০ম	
।	পা	পা	-ধপা	মা	গা	-মা	।
	ফার্	সা	০০	লি	যে	০	
।	মপা	পা	-া	পধা	ধা	-া	।
	ঘু০	রা	ও	ই	বা	র্	
।	না	-া	র্রা	র্সা	-া	-া	।।
	অ	০	ধি	কা	০	ব্	
।।	পর্সা	র্সর্রা	র্রা	র্রা	র্বা	-া	।
	ঝাড়	খণ্	ড	রাজ্	জ	০	
।	র্রা	র্রা	র্গা	র্গর্মা	র্গা	-র্রা	।
	অ ·	ল	গ্	কইর্	ব	০	
।	র্রর্গর্রা	-া	র্সা	না	-ধা	-া	
	না০	০	আ	শা	০	০	
।	না	র্রা	-র্গর্রা	র্সা	-না	-র্বর্সা	।
	জী	ব	০ন	টা	০	০ব্	

I	না	না	-র্সনা	ধা	ধা	-নধা	
	শো	ষ	০০	কে	রা	০০	
I	পা	পা	-ধপা	মা	গা	-মা	I
	আ	গা	০এ্ঞ	আ	সু	ক্	
I	মপা	পা	ধা	ধা	-া	-া	I
	দেইখ্	ব	সা	হ্	০	স্	
I	না	না	-র্রা	র্সা	-নর্সা	-া	II
	কে	ম	ন	কা	০০	র্	
II	র্সা	র্সা	-র্রা	র্রা	র্রা	-া	I
	লি	ব	ই	লি	ব	০	
I	র্রা	র্রা	র্গা	র্গা	র্মর্গা	-র্রা	I
	ঝাড়	খণ্	ড	রাজ্	জ০	০	
I	র্রা	র্গর্রা	র্সা	না	না	র্রা	I
	কইর্	ব০	রে	ঝাড়্	খণ্	ড	
	র্গর্রা	-া	না	র্রর্সা	-া	-া	I
	স০	০	না	০০	০	র্	
	না	না	র্সনা	ধা	ধা	-ণধা	I
	কি	রী	টী০	খু	ড়া	০০	
	ধপা	পা	-ণধপা	মা	গা	-মা	I
	ব	লে	০০০	দু	লা	ল্	
	পা	পা	ধা	ণা	-া	র্রা	I
	থা	কে	না	ক		ভা	
	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	IIII
	বা	০	০	০	০	র্	

।। ১০ ।।

সরকারেই পদে নিবেদন—
মোদের বাঁচার উপায় কী এখন?
আমরা হলাম পুরুল্যার সাধাসিধে জনগণ।
খরায়-জরায় জর্জরিত পরনে ছেঁড়া বসন।।
রাজ্য ভিতর জেলা মোদের কেন পিছে পড়ি রন?
কলকারখানা কেন না-কর জেলায় স্থাপন?
মোদের বাঁচাবার লক্ষ্য বল কেন নাই এখন?
আমরা কি বিড়াল-কুকুর আমরা কি ইতরজন!
যোগ্যতা দেখিয়া কাজ দিবে, দিবে কিনা দিবে ধন?
কোন্ পথে বল্হ মোদের দারিদ্র্য হবে মোচন?
এক সাথে মিলিয়া সবে সাজাব আজ মহারণ।
ছিনিমিনি চইল্‌বে না আর লইয়া মোদের জীবন।।

(গানটির রচয়িতা ঃ রাধানাথ মাহাত। ডুঁড়্কু, পুরুলিয়া।)

রেরি পদে নিবেদন .....

II	ণা	-া	র্সা	ণা	ধা	-পমা	I
	স	র্	কা	রে	রি	০০	
I	মা	মা	-পমা	-া	রা	জ্ঞা	I
	প	দে	০০	০	নি	বে	
I	মা	-া	-া	মরা	রা	-জ্ঞা	I
	দ	০	ন্	মো০	দে	র্	
I	জ্ঞমা	মা	পা	পা	-া	-ধপা	I
	বাঁ	চার্	উ	পা	০	০য়্	
I	পণা	-া	র্সা	ণা	-া	-া	II
	কী	০	এ	খ	০	ন্	
	-া	-া	-া	মা	-া	পা	
	০	০	ন	আ	ম্	রা	

	হ	ল'					
।	পণ'	ণা	ণধা	ণা	-া	-া	।
	পু'	রু	ল্যা০	০	০	র্	
।	ণসা	র্রা	র্সা	ণা	-া	-া	।
	সা	ধা	সি	ধা	০	০	
।	ধা	ণা	ণপা	-া	-দপা	-মা	।
	জ	ন	গ০	০	০০	ন্	
।	মণা	ণা	-র্সা	র্সণা	ণা	-ধপমা	।
	খ	বা	য়	জ০	রা	০০য্	
।	মা	-া	পা	মা	জ্ঞরা	-জ্ঞা	।
	ভ	র্	জ	রি	ত০	০	
।	জ্ঞমা	মা	-া	পা	-া	-া	।
	প	র	০	নে	০	০	
।	ণা	ণা	-া	র্সা	ণা	-া	।।
	ছেঁ	ড়া	০	ব	স	ন্	
	-া	-া	-া ।।	মা	-া	পা	
	০	০	ন্	রা	জ্	জ	
	পা	পা	-া ।				
	ভি	ত	র্				
।	ণা	ণা	ধা	ণা	-া	-া	।
	জে	লা	মো	দে	০	র্	
	র্সা	র্ঋা	র্সা	ণা	-া	-া	।
	কে	ন	পি	ছে	০	০	

।	ণা	-া	ধা	পা	-দা	-পমা	।
	প	০	ড়ি	ব	০	০ন	
।	ণা	-া	র্সা	ণধা	মধা	-মপা	।
	ক	ল্	কার্	খা০	না০	০০	
।	মা	-া	পমপা	মা	জ্ঞরা	জ্ঞা	।
	কে	০	ন০০	না	ক০	র	
।	মা	পা	ণা	র্সা	ণা	-া	।।
	জে	লা	য়	স্থা	প	ন্	
	-া	-া	-া ।।	মা	পা	পা	
	০	০	ন্	মো	দের	বাঁ	
	পা	পা	-া ।				
	চা	বা	র্				
।	পণা	-া	ণা	ধা	ণা	-া	।
	ল	ক্	খ্য	ব	ল		
।	র্সা	ঋা	র্সা	-া	-ণা	ণা	।
	কে	ন	না	০	ই	এ	
।	দা	-ণা	-দা	-পা	-মা	-া	।
	খ	০	০	০	০	ন্	
।	মণা	-া	র্সা	ণা	-ধা	পা	।
	আ	ম্	রা	কি	০	বি	
।	মা	-া	-পমা	জ্ঞা	রা	-জ্ঞা	।
	ড়া	০	০ল্	কু	কু	র্	
।	মা	-া	পা	ধা	-ণা	র্সা	।
	আ	ম্	রা	কি	০	ই	

।	ধা	-ণা	-ধা	-পা	-দা	-পমা	II
	ত	০	০	০	০	০র্	
	-া	-া	-া II	মা	পা	পা	
	০	০	ন্	যোগ্	গ	তা	
	পা	ণা	ণা ।				
	দে	খি	য়া				
।	ণা	-া	ধা	ণা	-া	-া	।
	কা	জ্	দি	বে	০	০	
।	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	ণা	।
	দি	বে	কি	না	দি	বে	
।	পা	-া	-দপা	-মা	-া	-া	।
	ধ	০	০০	০	০	ন্	
।	ণা	-র্সা	ণা	ধা	পা	মা	।
	কো	ন্	প	থে	ব	ল্	
।	পা	মা	জ্ঞা	-রা	-জ্ঞা	-া	।
	হ	মো	দে	০	০	র্	
।	মা	পা	পা	পা	ণা	-া	।
	দা	রি	দ্র্য	হ	বে	০	
।	র্সা	ণা	-া	-া	-া	-া	II
	মো	চ	০	০	০	ন্	
	-া	-া	-া II	মা	পা	পা	
	০	০	ন্	এক	সা	থে	
	পা	ণা	-া ।				
	মি	লি	০				

I	ণা	ধা	ণা	-া	-া	-া	I
	য়া	স	বে	০	০	০	
I	র্সা	র্ঋা	র্সা	ণা	ণা	-া	I
	সা	জা	বো	আজ্	ম	০	
I	ধা	পা	-া	দা	-পা	-মা	I
	হা	র	০	০	০	ণ্	
I	ণা	র্সা	ণা	ধা	র্গরা	-মা	I
	ছি	নি	মি	নি	চই	ল্	
I	পা	মা	জ্ঞরা	-জ্ঞা	জ্ঞমা	-া	I
	বে	না	আ০	র্	ল	ই	
I	পা	পা	ণা	-া	-া	র্সা	I
	য়া	মো	দে	০	র্	জী	
I	ণা	-া	-া	-া	-া	-া	IIII
	ব	০	০	০	০	ন্	

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা

১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ — ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা — ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা ১৩৭২

২। ঐ — লক্ষ্মী ও গণেশ — পুরোগামী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৩

৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বাংলার ব্রত — বিশ্বভারতী, ১৩৫১

৪। অতুল সুর — বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিহাস — জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬

৫। ঐ — হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য — জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৮১

৬। ঐ — কলকাতা — জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪

৭। অমিযকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঁকুড়ার মন্দির — সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, ১৩৭১

৮। অশোক মিত্র সম্পাদিত (অরুণকুমার রায় সংকলিত) — পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা — ভারত সরকার দিল্লী, ১৯৮২

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) — মডার্ন বুক এজেন্সি কলকাতা, ১৯৬২

১০। অসিতবরণ চৌধুরী — সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট — এ মুখার্জী কলকাতা, ১৯৮৫

১১। অনুকূলচন্দ্র সেন — বর্ধমান-পরিচিতি — বুক সিণ্ডিকেট, কলকাতা, ১৩৭৩

১২। ঐ — বাঁকুড়া-পরিক্রমা — বুক সিণ্ডিকেট, কলকাতা, ১৯৭৬

১৩। অমলেন্দু মিত্র — রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর — ফার্মা কে. এল. এম. কলকাতা, ১৯৭২

১৪। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) — বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — জিজ্ঞাসা কলকাতা, ১৯৬৬

১৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোক-সাহিত্য (২য় খণ্ড) — কলকাতা, ১৯৬৩

১৬। ঐ — বাংলার লোক-সাহিত্য (৩য় খণ্ড) — কলকাতা, ১৯৬৫

১৭। ঐ — বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (১ম খণ্ড) — পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ কলকাতা, ১৯৬৬

১৮।	ঐ	বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (২য় খণ্ড)	এ. মুখার্জী কলকাতা, ১৯৬৬
১৯।	ঐ	বাংলার লোক-সংস্কৃতি	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট দিল্লী, ১৯৮২
২০।	ঐ	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস	এ. মুখার্জী, কলকাতা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৪
২১।	ঐ	বাংলার লোক-সাহিত্য	পবিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৫৭
২২।	উমা সেন	প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ	জিজ্ঞাসা কলকাতা, ১৯৭১
২৩।	এন. এ. নিকম ও বিচার্ড ম্যাক-কেওন	অশোকের অনুশাসন	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট দিল্লী, ১৯৬৭
২৪।	ঐতরেয় আরণ্যক		
২৫।	কলহ্ণ	রাজতরঙ্গিণী	
২৬।	কালিদাস	রঘুবংশম্	
২৭।	ঐ	মেঘদূতম্	
২৮।	কামিনীকুমার রায়	বাংলার লোক-দেবতা ও লোকাচার	কলকাতা, ১৯৮০
২৯।	কৃষ্ণ মিশ্র	প্রবোধ চন্দ্রোদয়	
৩০।	ক্ষিতিমোহন সেন	ভারতের সংস্কৃতি	বিশ্বভারতী, ১৩৫২
৩১।	গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	বাংলার লৌকিক দেবতা	দে'জ, ১৯৮৭
৩২।	গোদাবরী পারুলেকর	আদিবাসী বিদ্রোহ	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (৩য় মুদ্রণ) ১৯৮৩
৩৩।	গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত	প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়	ফার্মা কে. এল. এম, ১৯৭৭
৩৪।	চিত্তরঞ্জন লাহা	ধলভূমের লোকগীতি (২য় খণ্ড ঃ মকর)	পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৩৮৭
৩৫।	চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটা	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা, ১৩৮৬
৩৬।	চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	বাংলার পালপার্বণ	বিশ্বভারতী, ১৩৫৯
৩৭।	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	বাংলা সাহিত্যে মা	দে'জ, ১৯৭৩
৩৮।	জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পঞ্চোপাসনা	ফার্মা কে. এল. এম., ১৯৬০

৩৯। জীবনানন্দ দাশ — জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ — বেঙ্গল পাবলিশার্স কলকাতা, ১৩৭৭

৪০। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত — সাঁওতালী কবিতা — দে'জ, ১৯৭৬

৪১। তারাপদ সাঁতরা — ছড়া-প্রবাদে গ্রামবাংলার সমাজ — পিপল্স বুক পাবলিশিং কলকাতা, ১৩৮৮

৪২। তুষার চট্টোপাধ্যায় — লোক-সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান — এ. মুখার্জী, ১৯৮৫

৪৩। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন — বৈষ্ণব সাহিত্য — এস. ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৩৬৮

৪৪। দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত — টুসু ঃ ইতিহাসে ও সঙ্গীতে — পুস্তক বিপণি, ১৯৮২

৪৫। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত — ঋগ্বেদ সংহিতা

৪৬। দীনেশচন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং ৮ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫৬

৪৭। দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় — শক্তিদর্শন ও শাক্তকবি — ভারতী বুক স্টল কলকাতা, ১৩৭৪

৪৮। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা — ঝাড়খণ্ডী লোক-ভাষার গান — কলকাতা, ১৯৭৩

৪৯। ধোয়ী — পবনদূতম্

৫০। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত — শূণ্যপুরাণ — কলকাতা, ১৩১৪

৫১। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত — বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা — কলকাতা, ১৯৪০

৫২। নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ — বিশ্বভারতী, ১৩৫২

৫৩। ঐ — বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব — লেখক সমবায় সমিতি কলকাতা, ১৩৭৩

৫৪। ঐ — কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি — জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯

৫৫। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত — প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া — পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পূর্ত বিভাগ) প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৮

৫৬। পল্লব সেনগুপ্ত — পূজাপার্বণের উৎসকথা — পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৪

৫৭। পশুপতিপ্রসাদ মাহাত — ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও সমাজজীবন — সুজন পাবলিকেশন্স কলকাতা, ১৯৮২

৫৮।	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ	ভারত-কোষ ৫ খণ্ড	কলকাতা
৫৯।	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮ম সংস্করণ, ১৩৭১
৬০।	বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত	ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য	ডি. এম. লাইব্রেরী কলকাতা, ১৯৭৮
৬১।	বরুণ চক্রবর্তী	বাংলার লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস	সাহিত্যশ্রী কলকাতা, ১৩৮৪
৬২।	বাল্মীকি রামায়ণ		
৬৩।	বিধুশেখর ভট্টাচার্য	উপনিষদ	বিশ্বভারতী, ১৩৬২
৬৪।	বিনয় ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	কলকাতা, ১৯৫৭
৬৫।	ঐ	শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজ	অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা নতুন সংস্করণ, ১৯৮৭
৬৬।	বিনয় মাহাত	লোকায়ত ঝাড়খণ্ড	নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪
৬৭।	বিনয়তোষ ভট্টাচার্য	বৌদ্ধদের দেবদেবী	বিশ্বভারতী, ১৩৬২
৬৮।	বিমানবিহারী মজুমদার	শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৯
৬৯।	বিষ্ণু দে	স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত	বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৩৮০
৭০।	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	বৈদিক দেবতা	বিশ্বভারতী, ১৩৫৭
৭১।	ভবিষ্য পুরাণ		
৭২।	মযহারুল ইসলাম	ফোকলোর পরিচিতি	ঢাকা, ১৯৭৪
৭৩।	মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ	মহাভারত	
৭৪।	মানিকলাল সিংহ	পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪
৭৫।	ঐ	রাঢ়ের মন্ত্রযান	ঐ, ১৩৮৫
৭৬।	ঐ	রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম ও ২য় খণ্ড)	ঐ, ১৩৮৮
৭৭।	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	পূজাপার্বণ	বিশ্বভারতী, ১৩৫৮
৭৮।	ঐ	বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলকাতা, ১৩৬১
৭৯।	রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড	নবভারত পাবলিশার্স কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪

৮০। রবীন্দ্র রচনাবলী — ৩য় খন্ড (১৯৫৭) — বিশ্বভারতী

৮১। ঐ — ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৩) — ঐ

৮২। ঐ — ১২শ খণ্ড (১৩৬৮) — জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ

৮৩। ঐ — ১ম খণ্ড (১৯৮০) — পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৮৪। ঐ — ২য় খণ্ড (১৯৮২) — ঐ

৮৫। ঐ — ৩য় খণ্ড (১৯৮৩) — ঐ

৮৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য (১৯৬৪) — বিশ্বভারতী

৮৭। ঐ — সাহিত্যের পথে (১৯৬১) — ঐ

৮৮। ঐ — সঞ্চয়িতা (১৯৬৩) — ঐ

৮৯। ঐ — শেষ সপ্তক (১৩৬৭) — ঐ

৯০। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড — নবভারত পাবলিশার্স কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪

৯১। রামশঙ্কর চৌধুরী — ভাদু ও টুসু — কথাশিল্প, কলকাতা, ২য় প্রকাশ, ১৯৮১

৯২। রামেশ্বর ভট্টাচার্য — শিবায়ন — বঙ্গবাসী, ১৩১০
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

৯৩। শঙ্কর সেনগুপ্ত — বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি — ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্স কলকাতা, ১৯৭২

৯৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু — মধ্যযুগের কবি ও কাব্য — জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা ৩য় সংস্করণ, ১৩৭২

৯৫। শঙ্খ ঘোষ — শ্রেষ্ঠ কবিতা — দে'জ, কলকাতা, ১৯৭৮

৯৬। শান্তি সিংহ — লোকসংগীত সংগ্রহ ঃ ঝুমুর — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত একাদেমি (১৯৯৭)

৯৭। শশিভূষণ দাশগুপ্ত — শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে — এ. মুখার্জী কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৭০

৯৮। ঐ — ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য — ঐ, ১৯৬০

৯৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত — সমালোচনা সাহিত্য — এ. মুখার্জী, কলকাতা, ১৩৭৩

১০০। সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ) — ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৩

১০১। ঐ — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (অপরার্ধ) — ঐ, ১৯৬৫

১০২। ঐ — ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস — গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা ২য় সংস্করণ, ১৩৭৩

১০৩। ঐ সম্পাদিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত — চৈতন্যচরিতামৃত — সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৩

১০৪। সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় — শিব-ভাবনা — রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, ১৩৭৯

১০৫। সুধীরকুমার করণ — সীমান্ত বাঙ্লার লোকযান — এ. মুখার্জী, কলকাতা, ১৩৭১

১০৬। ঐ — লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ — গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৩৭২

১০৭। সুধীরকুমার মিত্র — হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ (১ম খণ্ড) — কলকাতা, ১৯৬২

১০৮। সুধীরচন্দ্র সরকার — পৌরাণিক অভিধান — এম. সি. সরকার, কলকাতা, ১৩৬৫

১০৯। সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত — রামপ্রসাদ জীবনী ও রচনাসমগ্র — গ্রন্থমেলা, কলকাতা, ১৯৭৫

১১০। সনৎকুমার মিত্র — পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা — বিশ্বাস পাবলিশিং কলকাতা, ১৩৮২

১১১। সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি — নবজাতক প্রকাশন কলকাতা, ১৯৮৩

১১২। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৪

১১৩। ঐ — বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে — জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫

১১৪। ঐ — সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস — ঐ, ১৯৭৬

১১৫। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় — পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোক-সাহিত্য — সাহিত্যপ্রকাশ কলকাতা, ১৯৬৯

১১৬। সুশীলকুমার দে সম্পাদিত — বাংলা প্রবাদ — এ. মুখার্জী, ২য় সংস্করণ, ১৩৫৯

১১৭। সুশীল রায় সম্পাদিত — বঙ্গ-প্রসঙ্গ — ওরিয়েন্ট বুক, কলকাতা, ১৩৭২

১১৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড) — উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ৫ম সংস্করণ, ১৩৮৮

১১৯। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া — সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৭১

১২০। ঐ সম্পাদিত — বৈষ্ণব পদাবলী — সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮০

১২১। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত — রূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বল নীলমণি — ভারতী প্রকাশন কলকাতা, ১৩৭২

১২২। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য — হিন্দু দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় খণ্ড) — ফার্মা কে. এল. এম. কলকাতা, ১৯৭৮

।। পত্রপত্রিকা ।।

১। 'অমৃত' পত্রিকায় (সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ) ২৯।২।৭৫ তারিখে প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধ 'টুসুগানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা'।

২। 'আখড়া' পত্রিকার (সম্পাদক অনিল মাহাত, পুরুলিয়া) তিনটি সংখ্যা। ১৯৮৫ এপ্রিল, জুলাই ও ১৯৮৬ জানুয়ারি সংখ্যা।

৩। আনন্দবাজার পত্রিকা ২০।১।৮৫ ও ১১।১১।৮৭।

৪। 'আজকাল' পত্রিকায় ৯।১।৮৩ প্রকাশিত মৎ রচিত প্রবন্ধ 'পুরুলিয়ার টুসু উৎসব'।

৫। 'দেশ' পত্রিকা ১১ই আষাঢ়, ১৩৭২ (২৬।৬।১৯৬৫) সংখ্যায় প্রকাশিত মানিকলাল সিংহের 'দক্ষিণ রাঢ়ের তুষু পর্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকা' প্রবন্ধ। (আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

৬। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত দীনেন্দ্রনাথ সরকারের 'নবান্ন ও নতুন ফসলের লোকায়ত উৎসব' প্রবন্ধ। ১৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭। 'পুরুলিয়া' পত্রিকার (বিজয় রায় সম্পাদিত, পুরুলিয়া পল্লী সঙ্ঘ, পুরুলিয়া) বিশেষ টুসু সংখ্যা (১৩৮০)।

৮। 'বর্তিকা' পত্রিকার (সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী) ২৭ বর্ষ, ১৯৮৩ বিশেষ পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা।

৯। 'মুক্তি' পত্রিকার (সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত) ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ অবধি প্রকাশিত সংখ্যাগুলি। ('মুক্তি' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক অরুণচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সংরক্ষণবিভাগ, শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া।)

১০। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি রচনা ঃ—

চেলিয়ামার মন্দির—২৩।১।৮৫
পাড়ার মন্দির—২৫।২।৮৫
পুরুলিয়ার জৈন মন্দির—১৭।৪।৮৫
মুখোশ এবং ছো-নাচ— ১৬।৬।৮৫
দেউলির পুরাকীর্তি— ২১।৮।৮৫

এখ্‌য়ান পরব—২২।১।৮৬
মল্লভূম ও বৈষ্ণবধর্ম—১৯।৩।৮৬
পাহাড়ীঝর্ণার মতো শিল্পবোধ—১৫।৪।৮৬
ভূতেশ্বরের দেবী সঙ্কটতারিণী— ১৮।৬।৮৬
পুরুলিয়ার সুপ্রাচীন মাতৃকামূর্তি— ২৩।৯।৮৬
বাংলা বনাম কুরমালি—৩।১।৮৭
ছো-মুখোশ ও ছো-শিল্পী—১৫।৪।৮৭
শুশুনিয়া আদিসভ্যতার ভূমি—৪।১০।৮৭
ঐ বিষয়ে সচিত্র আলোচনা—২৪।১০।৮৭
সবুজ ওড়না-ঢাকা অযোধ্যা পাহাড়— ১।১১।৮৭

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত বিশেষ সংকলন ১৯৮৫

'শিলাদিত্য' মাসিক পত্রিকায় (সম্পাদক : বিমল কর) প্রকাশিত মদীয় দীর্ঘ প্রবন্ধ 'লোক-উৎসব তুষু'। ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ সংখ্যা।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা (১৩৪৬) 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' প্রবন্ধ।

'হারিয়াড সাকাম' পত্রিকা (সম্পাদক ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক) মেচেদা, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ প্রকাশিত সংখ্যাগুলি। সম্পাদকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ইউ. জি. সি.-র আনুকূল্যে ও পুরুলিয়া রঘুনাথপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে ১।১২।৮৫ থেকে ৩।১২।৮৫ তিনদিনব্যাপী ঐতিহাসিক আলোচনাচক্রে [The original settlers of Purulia District–their History and Cultural Transition through Ages] পঠিত এবং ঐ স্মারকপত্রিকায় প্রকাশিত মৎলিখিত প্রবন্ধ 'পুরুলিয়ার জনজীবন ও লোক-সংস্কৃতির ধারা।'

।। ইংরেজি গ্রন্থ ।।

1. Ahmed Hasan — Pre history and Proto history of Eastern India
Firma K. L. M. Calcutta, 1960.

2. A. A. Macdonell — Vedic Mythology
Strassburg, 1897.

3. A. S. Altekar — The Position of Women in Hindu Civilization
(From Pre historic times to the Present today)
Motilal Banarasidass, Delhi (3rd edn.) 1962.

4.	Amiyakumar Banerjee	District Gazatteers of Bankura & Birbhum Calcutta, 1968.
5.	Alan Dundes	The Study of Folklore Berkeley, 1965.
6.	Archer Taylor	Folklore and the Student of Literature (vol. II) The Pacific Spectator, 1948.
7.	Bhagwat Saran Upadhyaya	Women in Rgveda S. Chand & Co., New Delhi, 1974.
8	B. Ray	Census Handbook of Purulia, 1961.
9.	Benedetto Croce	AEsthetic
10.	Copenhegen	International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore (Vol. I), 1960.
11.	C. E. Buckland	Bengal under the Lieutenant Governors Vol. I & II, 1902.
12.	C. M. Bowra	Primitive Song, 1962.
13.	C. M. Bompas	Folklore of the Santal Parganas London, 1909.
14.	E. B. Tylor	Primitive Culture Vol. II (2nd edn.) 1873
15.	E. T. Dalton	Descriptive Ethnology of Bengal Calcutta, 1872.
16.	F. Engels	The Origin of the Family the Private Property and the State.
17.	G. A. Grierson	A Linguistic Survey of India Calcutta, 1899.
18.	H. S. Risley	Tribes and Castes of Bengal London, 1891
19.	H. Coupland	Bengal District Gazetteers Manbhum Calcutta, 1911.
20.	H. K. Deychondhuri	God in Indian Religion Calcutta, 1969.

21. Jeannine Auboyer — Daily Life in Ancient India (From 200 B.C. to 700 A.D.) The Macmillan Company, Newyork, 1965.

22. J. G. Frazer — The Golden Bough (A bridged edn.) London, 1954.

23. J. E. Harrison — The Ancient Art & Ritual, 1925.

24. L. S. S. Omally — Bengal District Gazetteers, Midnapore Calcutta, 1911.

25. L. S. S. Omally — Bengal District Gazetteers, Singbhum, Saraikela, Kharswan Calcutta, 1910.

26. N. K. Bose — Culture and Society in India Calcutta, 1967.

27. N. M. Penzer — The Ocean of Story Vol. IV London, 1925.

28. R. C. Dutta — History of Civilization in Ancient India Vol. III Calcutta, 1889

29. R. C. Mazumdar — History of Ancient Bangal Calcutta, 1974

30. R. H. Doorman — The origin of Primitive Superstition, 1929.

31. R. V. Williams — Folksong Encyclopaedia Britanica (14h edn.), 1932.

32. Suniti Kumar Chatterjee — The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. I Rupa & Co., Calcutta, 1975.

33. Suniti Kumar Chatterjee — Languages and Literatures of Modern India Prakash Bhavan, Calcutta, 1963.

34. Sashibhusan Dasgupta — Obscure Religious Cults

35. Sukumar Sen — History of Bengali Literature Sahitya Akademi, 1960

36. Shyam Parmar — Folklore of Madhya Pradesh New Delhi, 1972.

37. S. C. Roy — The Mundas and their Country
Thackur Spink, 1912.

38. S. C. Roy — Oraon Religion and Custom
Ranchi, 1928.

39. Subhas Chandra Mukhopadhyay — Glimpses of the History of Manbhum
Calcutta, 1983.

40. T. S. Eliot — The Sacred Wood

41. Vincent A. Smith — The Early History of India (From 600 B.C. to Muhammadan Conquest)
Oxford University Press, London (4th edn.), 1957.

42. W. W. Hunter — The Statistical Account of Bengal
London, 1877.

43. West Bengal District Gazetteers, Purulia, 1985.

JOURNALS

1. Binoy Ghosh – Cultural Profile of Purulia.
2. Circular of District Inspector of Schools, Manbhum, 1948.
3. D. P. Sinha – Journal of Social Research Vol. I, No. I, 1958.
4. Epigraphia Indica – Vol. X III, P. 133.
5. Plan and Progress in Purulia District 1966-67.
6. P. K. Bhowmik – Tusu Festival in Midnapore
Indian Folklore, Vol. I, No. 2, 1958.
7. Report of States Reorganisation Commission, 1955.
8 S. K. Bhowmik – Tusu Songs Bulletin of the Cultural Research Institute Vol. X VI, No. 1-4, 1981.